মহানবীর স. প্রতিরক্ষা কৌশল

জেনারেল আকবর খান

মহানবী (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল

মেজর জেনারেল আকবর খান

মহানবী (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল

'হাদীছে দেফা' নামক বিখ্যাত উর্দূ গ্রন্থের
বাংলা তরজমা

তরজমায়
আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মহানবী (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল ঃ মেজর জেনারেল আকবর খান ।। তরজমা ঃ আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ।। ই. ফা. প্রকাশনা ঃ ১১৫২/১।। ই. ফা. গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭'৬৩।। প্রথম প্রকাশ ঃ শা'বান, ১৪০৪ ।। বৈশাখ, ১৩৯১ ।। মে, ১৯৮৪ ।। দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ রমযান, ১৪০৭ ।। বৈশাখ, ১৩৯৪ ।। মে, ১৯৮৭ ।। প্রকাশক ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-২ ।। প্রচ্ছদ ঃ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ।। মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে ঃ পেপার কনভার্টিং এণ্ড প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা--২ ।।
মূল্য ঃ সাতষট্টি টাকা মাত্র

MOHANOBI (Sm)-er PRATIRAKHSHA KAUSHAL : Defence Strategy of the great Prophet (Sm) written in Urdu by Maj. Gen. Akbar Khan, translated into Bengali by A. S. M. Omar Ali and published by Prof. Abdul Ghafur, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka. May 1987.
Price : Tk. 67·00 U.S. $ 4·50

বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের
স্বাধীনতা রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ বীর মুজাহিদ ও
সিপাহী-জনতার উদ্দেশে

অনুবাদকের অন্যান্য প্রকাশিত বই

- ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার (অনূদিত)
- ঈমান যখন জাগলো ,,
- ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (৩য় খণ্ড)
- খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)
- মুহাম্মদ বিন কাসিম
- ইসলামী রেনেসাঁর অগ্রপথিক (১ম খণ্ড)
- গল্প পড়ি জীবন গড়ি (শিশু-কিশোর গ্রন্থ)
- তাঁরা ছিলেন মানুষ (,,)

আমাদের কথা

জীবনের অপর নাম সংগ্রাম। মানুষ এবং মানুষের জীবনাদর্শের ইতিহাসে সংগ্রাম বা যুদ্ধ-বিগ্রহ একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা। ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। তবে সেই প্রতিষ্ঠা-ক্ষণ থেকেই মানবতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ ইসলামের মূলোৎপাটনের ষড়যন্ত্র শুরু হয়, যার জের অদ্যাবধি চলছে। রসূলে করীম (সা) ইসলামের দা'ওয়াত দিতে গিয়ে গোড়া হতেই তদানীন্তন আরব সমাজের কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হন। তাঁর নবূওতের প্রথম তের বছরের মক্কী যিন্দেগীতে তিনি ও তাঁর সাথীবৃন্দ অপরিসীম ধৈর্য সহকারে সব জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে যান। কিন্তু আদর্শের স্বার্থে শেষ দশ বছর তিনি আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ-সংগ্রাম পরিচালনা করেন।

বর্তমান গ্রন্থ রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিরক্ষা সংগ্রামসমূহে তাঁর অনুসৃত নীতি ও কর্মপন্থার উপর আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম সমর-বিশারদ মেজর জেনারেল মুহাম্মদ আকবর খানের লিখিত 'হাদীছে দেফা'-র বাংলা তরজমা। রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর অসংখ্য সার্থক পুস্তক থাকলেও তাঁর যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কে পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশী নয়—আর যা-ও বা দু'একটা আছে, সেগুলোও সমরবিদদের রচনা নয়। প্রখ্যাত সমরবিদ হিসাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও প্রতিরক্ষা-কৌশল সম্বন্ধে মেজর জেনারেল আকবর খানের এ পুস্তক তাই স্বাভাবিকভাবেই অসাধারণ গুরুত্বের দাবিদার।

যুদ্ধজয়ের জন্য বিশাল দেশ, বিরাট সৈন্যবাহিনী এবং বিপুল অস্ত্র-সম্ভার অপরিহার্য বলে আমাদের মধ্যে যে সাধারণ ধারণা প্রচলিত আছে, বিভিন্ন জিহাদে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসৃত নীতি ও কর্মকৌশল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেয়। বর্তমান গ্রন্থের লেখক এ গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিভিন্ন যুদ্ধের তুলনার মাধ্যমে এ সত্য প্রমাণ করেছেন। এ দিক দিয়ে এ পুস্তক সাম্রাজ্যবাদ,

সম্প্রসারণবাদ ও আধিপত্যবাদের আগ্রাসী বিষদৃষ্টিতে আপতিত যে কোন ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে আশার বাণী শোনাতে সক্ষম।

বাংলাদেশ তার স্বাধীনতা রক্ষার প্রশ্নে আজ যখন এক ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তখন রসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসৃত প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কিত এই পুস্তক আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক মহাসংকট উত্তরণে বিপুলভাবে সহায়ক হতে পারে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আর এজন্যই এই পুস্তকখানি পাঠক-পাঠিকাদের সামনে দ্বিতীয় বার উপস্থাপিত করতে পেরে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারে লাখো শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁর রহমতের আশ্রয় হোক আমাদের প্রধান অবলম্বন।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ — আবদুল গফুর
১৫-৫-৮৪ — প্রকাশনা পরিচালক

অনুবাদকের আরয

আল-হ'ামদু লিল্লাহ!

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে জেনারেল আকবর খান লিখিত 'হাদীছে দেফা' নামক বিখ্যাত উর্দূ গ্রন্থের বাংলা তরজমা 'ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল' নামে প্রকাশিত হ'ল। যে মহান রাব্বু'ল-'আলামীনের অপার রহমতে এটি পাঠকের হাতে পৌঁছুতে পারল, তাঁরই দরবারে সর্বপ্রথম সিজদানত হচ্ছি এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে অশেষ শুকরিয়া পেশ করছি।

রসূল আকরাম (সা)-এর উপর এ পর্যন্ত অনেক বই লেখা হয়েছে এবং অন্যান্য ভাষায় লিখিত অনেক বইয়ের তরজমাও ইতোমধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ জাতীয় আরও একটি বইয়ের তরজমা করবার প্রয়োজন কেন অনুভব করলাম---এ প্রশ্ন পাঠকের মনে জাগতে পারে। এ জাতীয় সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থের লেখক এই কৈফিয়ত দিয়েছেন ঃ

"হুযূর আকরাম (সা) কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন জিহাদ সম্পর্কে লেখকের জ্ঞান ও জানাশোনার সম্পর্ক যতখানি, তাতে উর্দূ কিংবা অন্য কোন ভাষায় আজ পর্যন্ত এমন কোন গ্রন্থ নেই যাতে রসূল আকরাম (সা)-এর সৈনিক জীবনের উপর যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ আলোকপাত করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, এদিক থেকেও তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়ার বুকে কত উন্নত ও অনন্য!"

লেখকের উক্ত কৈফিয়তের সঙ্গে আমি যোগ করতে চাই, "হুযূর আকরাম (সা) কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন জিহাদ সম্পর্কে অনুবাদকের জ্ঞান ও জানাশোনার সম্পর্ক যতখানি, তাতে বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত এমন কোন গ্রন্থ প্রণীত কিংবা অনূদিত হয়নি, যাতে রসূল আকরাম (সা)-এর সৈনিক জীবনের উপর যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ আলোকপাত করা হয়েছে এবং দেখান হয়েছে যে, এদিক থেকেও তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব পৃথিবীর বুকে কত উন্নত ও অনন্য!"

আমি লেখকের এ বক্তব্যের সঙ্গেও সম্পূর্ণ একমত যখন তিনি বলেন ঃ "আমরা মহানবী (সা) সম্পর্কে সব কিছুই জানি, সব কিছুই গর্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পরম ভক্তিভরে বর্ণনাও করি। কিন্তু এটা জানি না যে, তিনি তাঁর

মিশনকে কিভাবে সাফল্য ও পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন, কি কৌশলেই বা সে-সব কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, প্রতিরক্ষাশাস্ত্রে তাঁর আসনই-বা কোথায় আর প্রতিরক্ষা নীতিতে এর গুরুত্বই বা কতখানি? আমরা যখন রসূল করীম (সা)-কে সর্বক্ষেত্রে সর্ববিষয়ে এবং সর্বপ্রকারে অনুকরণ ও অনুসরণ করাকে ওয়াজিব নয় বরং ফরয মনে করি, তখন তাঁর সৈনিক জীবন, সামরিক নেতৃত্ব ও প্রতিরক্ষার কলা-কৌশল থেকে কেন দূরে থাকব? কেন এসব বিস্মৃত হব? এ থেকে কেনই-বা পথ-নির্দেশ লাভ করা হবে না? কেনই-বা তাঁর মণি-মুক্তাসদৃশ মহান কার্যাবলী উপেক্ষা করে অন্যদের পরিত্যক্ত জিনিসকে লুফে নেওয়া হবে?”

এরপর রসূল আকরাম (সা)-কে একজন সফলতম মুজাহিদ, সিপাহ-সালার, প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ ও সমরশাস্ত্রের ইমাম হিসাবে অভিহিত করে লেখক নিজের ৫০ বছরের দীর্ঘ সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দাবি করেছেন, “তাঁর মহান ব্যক্তিসত্তা যেমন অপরাপর সকল দিক দিয়েই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়, এদিক দিয়েও তিনি তেমনি অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। দুনিয়ার যাবতীয় অগ্রগতি, বস্তু-সম্ভার ও উপকরণের সকল প্রাচুর্য সত্ত্বেও নীতি, কলা-কৌশল ও কর্মের দিক দিয়েও তাঁর মর্যাদার আসন সর্বোচ্চ ও অতুলনীয়।”

লেখক একজন ভক্ত মুসলমান হিসাবেই কেবল এ দাবি করেন নি; বরং দু’দু’টি বিশ্বযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী সৈনিক এবং আধুনিক সমরনীতি ও সামরিক কলা-কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ একজন সফল অধিনায়ক হিসাবেই তিনি এ দাবি পেশ করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে দক্ষ ও যোগ্য হিসাবে খ্যাত জেনারেলদের পরিচালিত যুদ্ধ এবং সে সব যুদ্ধে অনুসৃত নীতি ও সামরিক কলা-কৌশলকে তিনি এক দিকে রেখেছেন, অপর দিকে রেখেছেন রসূল আকরাম (সা) কর্তৃক পরিচালিত জিহাদ ও সে সব জিহাদে অনুসৃত নীতি ও সামরিক কলা-কৌশলকে; এরপর উভয়ের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ ও অনুসরণযোগ্য। বিশেষ করে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হিরো খ্যাতনামা জেনারেলদের অনুসৃত নীতি ও সামরিক কলা-কৌশলের নজীর টেনেছেন এ প্রসঙ্গে প্রচুর। সমর-বিজ্ঞানে সচেতন যে কোন পাঠক এ থেকে কেবল উপকৃতই হবেন না, বরং অনেককেই এ বিষয়ে অধিকতর গবেষণায়ও উৎসাহিত করে তুলবে---সন্দেহ নেই।

লেখক উম্মার একজন দরদী বন্ধু হিসাবে মুসলমানদের বোধশক্তি, জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অবস্থা দেখে মাতম করেছেন এবং বলেছেন ঃ

"আমরা নেপোলিয়ন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁকে রাষ্ট্রনীতি ও সরকারের গগনচুম্বী নায়কের আসনে সমাসীন করেছি এবং তাঁর কার্যাবলী মুগ্ধ বিস্ময়ে ও ভক্তি গদগদ চিত্তে পড়ি ও দেখে থাকি। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর সামগ্রিক গুণাবলী, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে এতটা অজ্ঞ যেন জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির সঙ্গে আঁ-হযরত (সা)-এর কোন সম্পর্কই ছিল না এবং তিনি রাজনীতি, রাষ্ট্র-পরিচালনা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ বিষয়ে যেন কোন দিক-নির্দেশনাই রেখে যান নি।

"প্রথম মহাযুদ্ধ আমাদের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়েছে, আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়েছে, কিন্তু তথাপি আমরা আমাদের আলস্যের ঘুম ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠিনি; উলটো অন্যের যাদুমন্ত্রের শিকার হয়ে হুশ-জ্ঞান, সংহতি ও ঐক্যের যে ছিটেফোঁটার অবশিষ্টটুকু ছিল সে পুঁজিটুকুও আমরা হারিয়ে বসেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত ঘটনা ঘটল এবং মাথার উপর দিয়ে তা চলেও গেল, কিন্তু আমরা একবারও পাশ ফিরলাম না। আঁ-হযরত (সা)-এর নাম মুখে উচ্চারণকারী এবং তাঁরই পদাংক অনুসরণ-কারী হিসাবে দাবিদার আমরা অন্যদের প্রতারণা জালে গ্রেফতার এবং নিজেদের দাসত্বপনা ও অসহায়তায় পরম তুষ্ট হয়েই থাকলাম।"

বর্তমান যুগে সাধারণ্যে প্রচলিত এ ধারণারও লেখক প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে, যে জাতি বা যে রাষ্ট্রের নিকট উড়োজাহাজ, আণবিক বোমা, বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং অঢেল ধন-সম্পত্তি রয়েছে, বিজয় নিশান কেবল তারাই উড়াবে। লেখকের মতে এ ধারণা কেবল ভুলই নয়—তা মারাত্মক এবং আত্মঘাতীও বটে। তিনি জয়-পরাজয়ের পেছনে যে মৌলিক কারণ ক্রিয়াশীল তা উদ্‌ঘাটন করে বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক ও নজীরের মাধ্যমে পেশ করেছেন। আজকের বৃহৎ প্রতিবেশীর ভয়ে ভীত মুসলিম যুব ও জন-মানসে এর প্রতিকিয়া গভীর। আলোচ্য পুস্তকের এতদসংক্রান্ত বলিষ্ঠ বক্তব্য আমাকে কেবল পাঠেই নয়, বরং এর তরজমায়ও উৎসাহী করে তোলে।

ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্পের দায়িত্বে থাকাকালেই আমি এর তরজমার কাজে হাত দিয়েছিলাম এবং সে দায়িত্বে থাকাকালীন ২৩ মাস সময়ের মধ্যে আমি এর তরজমা শেষ করি। প্রকল্পের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে গিয়ে

যে পরিশ্রম আমাকে করতে হয় তার জন্যে নিজের কাজের প্রতি যথাযথ সুবিচার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও অনুবাদক বন্ধুবর মাওলানা আবদুল আওয়াল এর সম্পাদনা করতে যে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন সাধারণ ধন্যবাদে তার মূল্য শেষ হওয়ার নয়। এরপরও তরজমার সাবলীলতায় যদি কোন বিঘ্ন ঘটে তাহলে সেটা আমার অক্ষমতা বলেই মনে করতে হবে। পরবর্তী সংস্করণে এই দুর্বলতা দূরীকরণে আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না---এ আশ্বাস আমি আমার পাঠককে দিতে পারি।

অনুবাদকের আরয লিখতে বসে অনেকের উৎসাহপূর্ণ সহযোগিতার কথা আমার মনে পড়ছে। মনে পড়ছে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশের প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া-র কথা। এ বইয়ের পেছনে তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা কোন দিনই ভুলবার নয়। এর ভূমিকাও তিনি লিখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আকস্মিকভাবে তাঁকে চলে যেতে হয় বলে তাঁর সেই ইচ্ছা অপূর্ণই থেকে গেছে। সাবেক মহাপরিচালক জনাব আ. জ. ম. শামসুল আলমকে আমার এ মুহূর্তে বেশী মনে পড়ছে। আমার লিখিত ও অনূদিত প্রতিটি বইয়ের পেছনেই তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল ক্রিয়াশীল। এই বইয়ের অনূদিত পাণ্ডুলিপি দেখেও তিনি সপ্রশংস মন্তব্য করেছিলেন। তবে তিনি চান, আমি আরও বড় কিছু করি। আমার প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম স্নেহ-ঋণ অপরিশোধ্য।

প্রকাশনা পরিচালক অগ্রজপ্রতিম পরম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আবদুল গফুর-এর নিকট সকল বিষয়েই আমি আকণ্ঠ ঋণে আবদ্ধ। বৈষয়িক কোন কিছু দিয়েই তাঁর স্নেহ-ঋণ পরিশোধ হবার নয়, আর সে চেষ্টাও আমার নেই। এ বইয়ের পেছনে তাঁর অবদানও কম নয়। বন্ধুবর মওলানা ফরীদুদ্দীন মাসউদ, শ্রদ্ধেয় হাফেজ মঈনুল ইসলাম, ভ্রাতৃপ্রতিম সহকর্মী জনাব আজিজুল ইসলাম, সম্মানিত শাহাবুদ্দীন ভাই, অগ্রজতুল্য শেখ ফজলুর রহমান, বন্ধুবর হাসান আবদুল কাইয়ুম ও আবুল খায়ের আহমদ আলীসহ ফাউণ্ডেশনের যে সব কর্মকর্তা ও কর্মচারী এ বইয়ের প্রকাশের কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন এই মুহূর্তে আমি তাঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। প্রবাল প্রিন্টিং প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব এম. এস. জামানকে আমি একান্তভাবে স্মরণ করছি। তাঁর ঐকান্তিক

সহযোগিতা ছাড়া এ বই এত সত্বর প্রকাশিত হ'ত না। সংশ্লিষ্ট প্রেসের সকল কর্মচারীকেও এতদসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আল্লাহ্ পাক সকলের আশা-আকাঙ্খাকে সম্পূরণ করুন।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ছে আমার পরম শ্রদ্ধেয় আত্ম-ভোলা শিক্ষক অধ্যাপক আবদুস সাত্তারের কথা। আমার উচ্চ শিক্ষার পেছনে তাঁর অবদান কতখানি, একমাত্র আল্লাহ রাব্বু'ল-'আলামীন তার সাক্ষী। তাঁর স্নেহ এ অধম এত বেশী পেয়েছে যা খুব কম ছাত্রই তার শিক্ষক থেকে পেয়ে থাকে। তাঁর স্নেহ-ঋণ শোধ করার ধৃষ্টতা আমার কোনদিনই হবে না। বিনা প্রশ্নে এবং বিনা তর্কে যাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা যায় তেমন ব্যক্তি একমাত্র তিনিই হতে পারেন। এতদ্‌সঙ্গে আমার সুদীর্ঘ ছাত্রজীবনের সে সব শ্রদ্ধেয় মুদাররিস ও শিক্ষককেও আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি যাঁদের দু'আ ও স্নেহ এ অধমের জীবনকে পবিত্র ও ধন্য করেছে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাক তাঁদের সকলকেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নসীব করুন।

পরিশেষে আমি আমার জীবন-সঙ্গিনী বেগম জেবুননেসাকে আমার অকৃত্রিম প্রীতি জানাই। তিনি আমাকে নানাভাবে এ বইয়ের অনুবাদ কর্মে প্রেরণা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে পুরস্কৃত করুন।

তরজমাসহ বইটিকে সার্বিক দিক দিয়ে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে যে কোন মতামত ও পরামর্শ মূল্যবান বিবেচিত হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে সে পরামর্শের প্রতিফলন থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

সাধারণ পাঠক বিশেষ করে প্রতিরক্ষা বিভাগের সদস্যবৃন্দ যদি এ বই পাঠে এতটুকুও উপকৃত হন তাহলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

দ্বিতীয় সংস্করণের আরয

আল-হা.মদু লিল্লাহ! 'ইসলামে প্রতিরক্ষা কৌশল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ 'মহানবী (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল' নামে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। বহু আগেই এর ১ম সংস্করণ নিঃশেষ হলেও অনাকাঙ্খিত কতকগুলো ঘটনা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে এই অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটিয়েছে।

বর্তমান সংস্করণ ত্রুটিমুক্ত করতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। এরপর বিশিষ্ট সাহিত্যিক নজরুল-বিশেষজ্ঞ বর্তমানে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'অগ্রপথিক'-এর নির্বাহী সম্পাদক অগ্রজপ্রতিম শ্রদ্ধেয় শাহাবুদ্দীন ভাইকে এর বাকী কাজটুকু করে দেবার জন্য অনুরোধ জানাই। তিনি আমার সে অনুরোধ রক্ষা করায় আমি তাঁর নিকট চিরঋণী হয়ে রইলাম। ফলে বর্তমান সংস্করণ পূর্বের সংস্করণের চেয়ে যে অনেক উন্নত হয়েছে তা সঙ্গত কারণেই আশা করা চলে।

এবার গ্রন্থের শেষে 'নির্ঘণ্ট' এবং 'গ্রন্থকার পরিচিতি' যোগ করা হয়েছে। নির্ঘণ্ট তৈরীতে আমার স্ত্রী বেগম জেবুন্নেছা এবং স্নেহের কন্যা মরিয়ম জামিলা ও জামিলা কুলছুম এবং পুত্র জাবিদ ইকবাল প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়েছে। সাধারণ ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের অমর্যাদা করতে চাই না। দো'আ করি, আল্লাহ পাক তাদের এই খেদমতের জাযা দিন।

বর্তমান সংস্ক রণ মুদ্রণ ও প্রকাশের পেছনে পেপার কনভার্টিং-এর জনাব মাহবুবুল হক ও জনাব সিরাজুল ইসলাম এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের প্রকাশনা শাখার উপ-পরিচালক সহকর্মী বন্ধুবর লুতফুল হকের অবদান সবচেয়ে বেশী। তাঁদের প্রতি রইল আমার অসরিসীম কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি। আল্লাহ হাফিজ।

—অনুবাদক

সূচীপত্র

দু'টি কথা

হুযূর আকরাম (সা) (তাঁর উদ্দেশ্যে আমার জীবন কোরবান হোক) পরিচালিত বিভিন্ন জিহাদ সম্পর্কে লেখকের জ্ঞান ও জানাশোনার সম্পর্ক যতখানি, তাতে উর্দূ কিংবা অন্য কোন ভাষায় আজ পর্যন্ত এমন কোন গ্রন্থ নেই যাতে রসূল আকরাম (সা)-এর সৈনিক জীবনের উপর যথাযথ ও পূর্ণাঙ্গ আলোকপাত করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যে, এদিক থেকেও তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব দুনিয়ার বুকে কতো উন্নত ও অনন্য।

আল্লাহ্ পাক দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্যের 'উছমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-বিষয়ক প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ হামিদুল্লাহ্‌কে কল্যাণকর প্রতিদানে ভূষিত করুন। তিনি মহানবী (সা)-এর জীবনের এই দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন এবং 'নবী যুগের সমরক্ষেত্র' শিরনামে দু'টি বিরাট পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেছেন। অধিকন্তু তা প্রকাশের পূর্বে তিনি বিভিন্ন ঘটনা ও স্থানের সঠিক তথ্য ও চিত্র পরিবেশনের উদ্দেশ্যে স্বয়ং দু'বার পবিত্র হেজাযে গমন করেন এবং এই সফরে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করে সরেযমীনে সব কিছু প্রত্যক্ষ করেন। অবশেষে অত্যন্ত পরিশ্রম করে তিনি এসব যুদ্ধ-বিগ্রহের চিত্র অংকন করেন।

আমি উপরিউক্ত গ্রন্থ দু'টি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। বস্তুত এটি একটি মহান ও প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং লেখক সত্যিকার আবেগ-উদ্দীপনার সঙ্গে গ্রন্থ দু'টি রচনা করেছেন। শুধু এইটুকু করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, রসূল আকরাম (সা) পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধের উপরও তিনি অব্যাহতভাবে কাজ করে চলেছেন। আল্লাহ্‌র মর্জি ভবিষ্যতেও তিনি এভাবে কাজ করে যাবেন। কিন্তু ডক্টর সাহেব একথা স্বীকার করে বলেছেন ঃ

'আমি সমর-বিজ্ঞান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নই। যদি আমি এ বিষয়েও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতাম তাহলে গভীর পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ শক্তি, যা আমি নবী করীম (সা)-এর পবিত্র জীবনের এ দিকটি সম্পর্কে লাভ করেছি,—তার দ্বারা আমি অলসতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার আবরণ ভেদ করে সত্যের উজ্জ্বল শিখা সৃষ্টি করতে পারতাম, যে অন্ধকার মুসলমানদের চিন্তা ও উপলব্ধির জগতকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।'

হুযূর আকরাম (সা)-এর জীবনের এ দিকটির প্রতি খুবই কম গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ফলে রসূল (সা) পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধ ও অন্যান্য ঘটনা সম্পর্কে অদ্ভুত ও আশ্চর্য রকমের সব বিভ্রান্তি প্রচারিত হয়েছে। আর এতে কেবল সাধারণ লোকেরাই নয়, অনেক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরাও এর শিকার হয়ে পড়েছেন। বদর যুদ্ধের প্রাথমিক ঘটনাবলী এর একটি ছোট্ট উদাহরণ। ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের ধারণা, বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় হুযূর আকরাম (সা)-এর একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আবূ সুফিয়ানের কাফেলা লুট করা।

শ্রদ্ধেয় ডঃ হামিদুল্লাহ্ও এ ধারণার পেছনে মদদ যুগিয়েছেন এবং লণ্ডন থেকে প্রকাশিত 'ইসলামিক রিভিউ' পত্রিকার ১৯৫২ সনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় তিনি এ সম্পর্কে প্রমাণপঞ্জী পেশ করে বলেছেন যে, এই অভিযানে রসূল করীম (সা)-এর গতিবিধি অত্যন্ত গোপনীয় ছিল। এমন কি তিনি উটের গলার ঘন্টিও খুলে ফেলেছিলেন। রাতের বেলায় তিনি পথ চলতেন যেন প্রতিপক্ষ মুসলিম বাহিনীর গতিবিধি টের না পায়। কিন্তু রওয়ানা হবার পরবর্তী অবস্থা সাক্ষ্য দেয় যে, এ ধারণা বিলকুল ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন এবং রসূল করীম (সা)-এর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কাফেলা লুট করাই যদি এ সফরের একমাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'ত তাহলে সেজন্য দীর্ঘ-বিলম্বিত, আঁকা-বাঁকা, দুর্গম ও কষ্টসাধ্য রাস্তা এখতিয়ার করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। বদর প্রান্তরে পৌঁছে অবস্থান নেওয়ারও কোন অবকাশ ছিল না। তাঁকে তো এগিয়ে গিয়ে কাফেলার উপর হামলা করাই উচিত ছিল। আর আবূ সুফিয়ানকে এতটা সুযোগ দেবারও দরকার ছিল না যাতে সে বদর প্রান্তরে গিয়ে জানবার সুযোগ পায়, রসূল করীম (সা) ও তাঁর সঙ্গী মুজাহিদ বাহিনী বদর উপকণ্ঠে পৌঁছেছে কিনা। অতঃপর সে যখন বিভিন্ন কার্যকারণ ও সাক্ষ্য-প্রমাণে মহানবী (সা)-এর পৌঁছে যাও-য়ার ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হ'ল তখন তাকে এতটা অবকাশ দেবারও দর-কার ছিল না যে, ফিরে গিয়ে কাফেলার যাত্রাপথ পরিবর্তন করবে এবং মুজাহিদ বাহিনীর নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হুযূর (সা) জেনেশুনেই তাদের উপেক্ষা করেন, আর মুশরিক কুরায়শ কাফেলা নিরাপদে নাগালের বাইরে চলে যায়। তিনি বদর প্রান্তর গভীরভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন, লোকজনের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করে

কুরায়শ বাহিনী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন; সাহাবীদের সঙ্গে করে মোর্চাবন্দী ও ব্যূহ রচনার ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করেন। এর দ্বারা কুরায়শ বাহিনীকে স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার জালে ফাঁসিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য।

রওয়ানা হবার মুহূর্তে যদি তিনি লক্ষ্য ও অবস্থান সম্পর্কে কিছু প্রকাশ না করে থাকেন আর মুজাহিদ বাহিনী যদি মনে করেই থাকে যে, তাঁরা কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে তাহলে তা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তিনি নীরবতা এজন্যই অবলম্বন করেছিলেন যে কোন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ জেনা-রেলই নিজ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে কারো নিকট কিছু প্রকাশ পেতে দেন না। মুসলমানদের এরূপ ধারণার কারণ শুধু এই ছিল যে, কয়েকদিন আগেই রসূল করীম (সা)-এর প্রেরিত কতিপয় বিশিষ্ট জানবায সহচরকে মক্কার নিকটে গিয়ে মুশরিক কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করতে তারা দেখেছে এবং সে কাফেলার সর্দারকেও শমন-সদনে প্রেরণ করতে দেখেছে। তাঁরা মক্কার নিকটে গিয়ে যখন এ ধরনের সাহসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন সেখানে আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে প্রত্যাবর্তনকারী যে কাফেলা মক্কা থেকে বহুদূরে রয়েছে এবং নানা রকমের মালমাত্তা ও নগদ অর্থকড়ি, হীরা-জওয়াহেরাত নিয়ে ফিরছে, সুতরাং তাদের মুকাবিলা অবশ্যই করা হবে।

অভিযানের লক্ষ্য গোপন রাখার অপর একটি কারণ এও ছিল যে, হুযূর (সা) আনসারদের সঙ্গে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন তা ছিল এই যে, তাঁরা মুসলমান (মুহাজির)-দের পক্ষে সেই সময় শুধু অস্ত্র ধারণ কর-বেন যখন মুসলমানদের উপর হামলা হবে অর্থাৎ মক্কার কুরায়শ বাহিনী যখন মদীনার উপর চড়াও হবে তখন প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা রসূল (সা)-এর সহগামী হবেন। যদি তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহের অভিপ্রায় ব্যক্ত ক'রে এবং প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে রওয়ানা হতেন তবে তাঁর বাহিনীর ভেতর দুর্বলতা দেখা দেওয়ার আশংকা ছিল। আনসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হ'ত এবং বিরোধী দুশমন ও মুনাফিকরা অপপ্রচারের পুরোপুরি সুযোগ পেত। এভাবে বাহ্যিক প্রতিকূল আচরণ মুসলমানদের মেরুদণ্ড দুর্বল করে দিত।

মুসলমানদের মনে যেভাবে কাফেলা লুট করার ইচ্ছা সক্রিয় ছিল ঠিক তেমনি মক্কার মুশরিকদের মনেও বিভ্রান্তি দেখা দেয়। তারা মনে করতে শুরু করে যে, মুসলমানরা যখন মক্কার উপকণ্ঠে এসে অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে আমাদের সম্পদ লুট করতে পারে, তখন এত বড় কাফেলা তারা

কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। সুতরাং তারা নিজেদের সৈন্যবাহিনী ও মিত্র গোত্রগুলো জড়ো করে। কাফেলার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে একটি বাহিনী প্রস্তুত করা হয় এবং প্রায় এক হাযার লড়াকু সৈন্য ও সমরোপকরণ-সহ একটি বাহিনী বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যায়। অপরদিকে এটা হুযূর আকরাম (সা)-এর দূরদৃষ্টি এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ে অতীব বিচক্ষণ-তার পরিচায়ক যে, তিনি বদর প্রান্তরকে পূর্ব থেকে যুদ্ধের জন্য মনোনীত করে ফেলেছিলেন। এভাবেই তিনি কাফির কুরায়শ বাহিনীকে স্বীয় প্রতি-রক্ষা ব্যূহজালে ফাঁসিয়ে নিজের নির্বাচিত সমরক্ষেত্রে লড়তে বাধ্য করেন এবং তাদেরকে পরাজিত করে চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকারে পরিণত করেন।

এর বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান গ্রন্থের যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে। এখানে সেসব ঘটনার উল্লেখ এজন্যই করা হ'ল যে, যেসব ভুলভ্রান্তি প্রায় সব ঐতিহাসিকই করেছেন, পূর্বসূরী সেই সব ইতিহাসবিদের অনুসরণ করতে গিয়ে ডঃ হামিদুল্লাহ্‌র মত ব্যক্তিও একই ভুলের শিকার হয়েছেন। এর কারণ সম্পর্কে ডঃ হামিদুল্লাহ বলেছেন, "হুযূর আকরাম (সা) পরিচালিত জিহাদের সংখ্যা অনেক হলেও সমর-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সেসব যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু পড়তে বা শুনতে পাওয়া যায় না। তেরোশ' বছর পূর্বের সংঘটিত যুদ্ধের উপর লেখার জন্য ঐতিহাসিক ঘটনাপঞ্জী ছাড়াও সৈনিকের অভিজ্ঞতা এবং সমর-বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে, আর সামরিক অভিজ্ঞতা এবং সমর-বিজ্ঞান সম্পর্কে জানার আগ্রহই আমাকে এই গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে।'

বর্তমান গ্রন্থটি লেখা ও প্রকাশ করবার পেছনে একটাই উদ্দেশ্য---আর তা হ'ল রসূলে আকরাম (সা)-এর পবিত্র সত্তার এ দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করা যা অদ্যাবধি সাধারণ ও বিশিষ্ট সব লোকের দৃষ্টিতেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে এবং যার প্রতিরক্ষাগত কলা-কৌশল ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বের তুলনা যেমন কোথাও নেই, তেমনি তা সম্ভবও না। আমরা মহানবী (সা) সম্পর্কে সব কিছুই জানি, সব কিছুই গর্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পরম ভক্তিভরে বর্ণনাও করি। কিন্তু এটা জানি না যে, তিনি তাঁর মিশনকে কিভাবে সাফল্য ও পূর্ণতার দ্বার-প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন, কি কৌশলেই-বা সেসব কর্ম সম্পাদন করেছিলেন; প্রতিরক্ষা শাস্ত্রে তাঁর আসনই-বা কোথায় আর প্রতিরক্ষা নীতিতে এর গুরুত্ব-ই-বা কতখানি। আমরা যখন রসূল করীম (সা)-কে সর্বক্ষেত্রে সর্ব বিষয়েও সর্বপ্রকারে অনুকরণ ও অনুসরণ করাকে ওয়াজিব নয় বরং ফরয মনে করি,

তখন তাঁর সৈনিক জীবন, সামরিক নেতৃত্ব ও প্রতিরক্ষার কলা-কৌশল জানা থেকে কেন দূরে থাকব? কেন আমরা তা বিস্মৃত হব? এ থেকে কেনই বা পথ-নির্দেশ লাভ করা হবে না আর কেনই বা এর উপর আমল করাকে অপরিহার্য মনে করা হবে না; কেনই বা তাঁর মণি-মুক্তাসদৃশ মহান কার্যাবলী উপেক্ষা করে অন্যদের পরিত্যক্ত জিনিসকে লুফে নেওয়া হবে?

এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিশ্চয়ই সহজ নয়। কিন্তু আমরা আমাদের সাধ্যমতো বিস্তারিতভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে, হুযূর আকরাম (সা) অত্যন্ত সঙ্গীন ও নাযুক অবস্থাতেও কিভাবে কাজ করেছেন; তাঁর প্রতিরক্ষার কলা-কৌশল, সামরিক গতিবিধি এবং আক্রমণ ও প্রত্যাঘাতের নীতি কত শ্রেষ্ঠ ও উন্নতমানের ছিল; শত্রুর উপর তাঁর ভীতিকর প্রভাব কতখানি পড়েছিল। যেখানে বাতিল পুরস্তী, বিপথগামিতা, মুনাফিকী ও শত্রুতার ব্যাপক প্লাবন দু'কূল আছড়ে পড়েছে, সেখানে আমানতদারী, আল্লাহ্-ভীতি, সৎকর্মশীলতা, ভদ্রতা ও শালীনতাবোধের রাজত্ব কিভাবে কায়েম হয়েছিল এবং দারিদ্র্য ও চরম অসহায় অবস্থার পরিবর্তে স্বস্তি, নিরাপত্তা এবং সচ্ছলতা কিভাবে সহজলভ্য হয়ে উঠেছিল; সত্যের পয়গামের সঙ্গে জিহাদের সম্পর্ক কি এবং রসূল করীম (সা) পরিচালিত বিভিন্ন যুদ্ধ-জিহাদ এবং দুনিয়ার অন্যান্য যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যেই বা পার্থক্য কি?

অতএব আমরা দাবি করেছি, আর এ দাবি করেছি জীবনের দীর্ঘ অভি-জ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে যে, রসূল আকরাম (সা)-এর মহান ব্যক্তিসত্তা যেমন অপরাপর সকল দিক দিয়েই অনুসরণীয় ও অনু-করণীয় ঠিক তেমনি সিপাহসালার, মুজাহিদ, প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ এবং সমরশাস্ত্রের ইমাম হিসাবেও রসূল (সা)-এর পবিত্র সত্তা সর্বদাই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবেন। দুনিয়া যত উন্নতিই করুক, বস্তু-সম্ভার ও উপায়-উপকরণের যত প্রাচুর্যই ঘটুক, কিন্তু নীতি, কলা-কৌশল ও কর্মের দিক দিয়ে তাঁর মর্যাদার সমতুল্য মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।

এই গ্রন্থটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে সম্ভবত এ ধরনের প্রথম প্রয়াস। আর তাই এতে নানা রকম মানবীয় দুর্বলতাজনিত ভুলভ্রান্তি থাকাটা অস্বাভা-বিক নয়। বিজ্ঞ পাঠকদের নিকট তাই বিনীত আবেদন, সেগুলো ক্ষমা করে নিজেদের মূল্যবান পরামর্শ ও মতামত দ্বারা তাঁরা যেন আমাকে উপ-কৃত হবার সুযোগ দেন এবং যেখানেই কোনরূপ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত

হবে কিংবা সিদ্ধান্তে পৌঁছার ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়বে— সেসব অবগত করিয়ে লেখককে যেন শুকরিয়া জ্ঞাপনের সুযোগ দেন।

যে সব সুধী পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষার ইতিহাস পড়েছেন তাঁদের দৃষ্টিতে এ ধরনের ত্রুটি নজরে পড়বে যে, অমুক কোম্পানীর পরিচালনা কার অধীনে ন্যস্ত ছিল এবং তমুক যুদ্ধের সারিবদ্ধকরণ ও ব্যূহ রচনা কিভাবে করা হয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একে ত্রুটি বলা যায়; তবে তা এমন নয় যে, গ্রন্থের উদ্দেশ্য এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য পেশ করতে তাতে অসুবিধা হবে। আমাদের আসল উদ্দেশ্য হ'ল, হুযুর আকরাম (সা)-এর সামরিক নৈপুণ্য, প্রতিরক্ষাগত কলা-কৌশল ও সৈন্য পরিচালনার নিপুণতা প্রকাশ করা। এজন্য অধীনস্থ সেনানায়ক ও সাহাবীদের মহান কার্যাবলীর বর্ণনার কোন প্রয়োজন নেই এবং এর কোন অবকাশও নেই। তাঁদের জীবন ও যিন্দেগীর সকল গৌরবজনক সাফল্য ও ঔজ্জ্বল্য তো সেই পবিত্র সত্তার আলোকেই আলোকিত। অনুরূপ বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও গ্রন্থ রচনায়ও আমরা গতানুগতিক পদ্ধতি পরিহার করে নিজস্ব স্বতন্ত্র পন্থা অনুসরণ করেছি, আর তা হ'ল এই যে, বক্তব্যকে তার মৌলিক উৎস ও ফুটনোট দ্বারা আমরা ভারাক্রান্ত করে তুলতে চাইনি। আমাদের ধারণায় এ পদ্ধতি সাধারণ পাঠকের পাঠাবেগ ও পাঠোৎসাহের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। লেখার সাবলীলতা এতে ক্ষুণ্ন হয় এবং মনে হয় লেখক যেন তাঁর এতদসংক্রান্ত চেষ্টা ও সাধনার ইশতেহার পেশ করে পাঠকের কাছ থেকে প্রশংসাধন্য স্বীকৃতির প্রত্যাশী। অন্যথায় লেখক যে উল্লিখিত ও উদ্ধৃত বক্তব্য পেশের ক্ষেত্রে পুরো-পুরি আমানতদারী রক্ষা করেছেন তার কি প্রমাণ আছে? তাছাড়া সংক্ষিপ্ত হাওয়ালা ও বর্ণনা থেকে প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিষ্কার বিশ্লেষণ এবং বর্ণনা-সূত্র অবলম্বনের উদ্দেশ্যও এতে অর্জিত হয় না; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য উদ্ধৃতির ফলে পাঠক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, এ বই লিখতে গিয়ে অন্য কোন বইয়ের সাহায্য আমি নিই নি। বর্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনাকালে আমার সামনে ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক নির্ভরযোগ্য বইপত্র ছিল। রসূল করীম (সা)-এর সীরাত এবং তাঁর পরিচালিত যুদ্ধ-সংক্রান্ত তামাম ঘটনা ও অবস্থা সেসব থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন ও উদ্ধৃত করবার পর বর্ণনানুসারে প্রতিটি গতিবিধি ও ব্যূহ রচনাকে নকশাকারে ঢেলে সাজিয়ে

এর পেছনের কার্যকারণ নির্ণয় আমি নিজেই করেছি এবং যুক্তিগ্রাহ্য সম্পর্ক সৃষ্টির পর তা থেকে প্রতিরক্ষা বিষয়ে প্রয়োজনীয় সবক ও ফলাফল লাভ করেছি। এসবই আমার নিজস্ব; এতে আমার পঞ্চাশ বছরের সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ আমাকে অত্যন্ত সহায়তা করেছে। অধিকন্তু সরকারী প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও চিঠি-পত্রাদিও আমার জন্য সহায়ক হয়েছে যা আমার দীর্ঘ সৈনিক জীবনের বিভিন্ন পর্বে ও সময়ে আমি পেয়েছি। আমি ঐ সব লেখকের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

আল্লাহ তা'আলা সকলকে কল্যাণকর প্রতিদান দিন।

জানুয়ারি, ১৯৫৩

মুহাম্মদ আকবর খান
কুদসী, মালীর রোড, করাচী

মহানবী (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল

প্রতিরক্ষার গোড়ার কথা

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মানবীয় প্রকৃতি

যুদ্ধ-বিগ্রহ মানবীয় প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি যুগেই যুদ্ধ-বিগ্রহ কোন-না-কোন আকারে দুনিয়ার বুকে বিরাজমান ছিল। বর্তমান কালে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে এক বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। বর্তমানে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য সকল ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হতে পারে না যতক্ষণ না আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত ও মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যুদ্ধের ভয়াবহ ঘনঘটা গোটা মানবগোষ্ঠীর উপর সততই সঞ্চরণশীল।

প্রথম মহাযুদ্ধের অকল্পনীয় ধ্বংসের প্রেক্ষিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা লীগ অব নেশন্‌স জন্মলাভ করে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যায় ১৯৩৯ সালে জার্মানীর ডিক্‌টেটর হের হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণার পর। তিনি এই ঘোষণা দ্বারা গোটা বিশ্বকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অগ্নিগর্ভে নিক্ষেপ করেন। যুদ্ধকালীন সময়েই জন্ম নিল জাতিসংঘ। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল দুনিয়াকে যুদ্ধের ধ্বংস ও রক্তাক্ত হানা-হানি থেকে বাঁচানো যা ছিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেরও লক্ষ্য। কিন্তু এতদ্‌-সত্ত্বেও কি যুদ্ধের স্থায়ী বিপদ কেটে গেছে? এ ব্যাপারে কেউই নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারে না; বরং মানুষের মনে এ আশংকাই বদ্ধমূল যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিধিলিপির মতই অনিবার্য সত্য।

আগেই বলেছি, যুদ্ধ-বিগ্রহ একটি মানবীয় প্রকৃতি বা ফিতরত। একটি দেশকে যুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহী না হওয়া সত্ত্বেও যুদ্ধ করতে হয়। উদাহরণত বলা যায়, কোন একটি দেশ এমন একটি দেশের উপর হামলা করে বসল যে আদৌ লড়াই করতে ইচ্ছুক নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হলে বাধ্য হয়েই তাকে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণ এমন একটি মৌলিক অধিকার যা ছিনিয়ে নেওয়া যায় না।

কুরআনুল করীমে বলা হয়েছে—আল্লাহ্ পাক 'রাব্বুল-আলামীন' যখন হযরত আদম (আ)-কে পয়দা করার ফয়সালা করলেন তখন তিনি ফিরিশ্তাদের বলেছেনঃ আমি আদমকে সৃষ্টি করতে চাচ্ছি; সে যমীনের বুকে আমার খলীফা হিসাবে খিলাফতের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবে। এতে ফিরিশ্তাকুল আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ পেশ করেঃ খোদাওয়ান্দ করীম! আদম তো দুনিয়াতে ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করবে (সুতরাং তাঁকে সৃষ্টি না করাই ভাল)। আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রতিটি যুগ এবং যমানাতেই যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছে তা তার উদ্দেশ্য জোর-জুলুমই হোক কিংবা জোর-জুলুমের মূলোৎপাটনই হোক।

বিশ্ববিজয়ী জেনারেলগণ

আলেকজাণ্ডারকে 'আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট' এজন্য বলা হয় যে, তিনি য়ুরোপ ও এশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অতি অল্প দিনে জয় করে নিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে তিনিও পরিপূর্ণ জেনারেল ছিলেন না। কেননা তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনীই, তা সে যে-কোন কারণেই হোক, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে ভারতবর্ষ থেকে স্বীয় অভিলাষ পূরণে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

নেপোলিয়নের সামরিক ও রণ-প্রতিভা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর; সমগ্র য়ুরোপ তিনি তছনছ করে দেন। লোকে তাঁকে একাই দশ হাযার সৈনিকের সমকক্ষ বলে মনে করত। তাঁর উদ্ভাবিত ও অনুসৃত সব রণনীতি ছিল অনড় ও অটল। য়ুরোপের সামরিক স্কুলগুলোতে সে সব পড়ানো হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর মত নামকরা জেনারেলকেও পরাজয় বরণ করে কয়েদখানায় বন্দী দশায় নিতান্ত অসহায় ও মজবুর মানুষের মতই জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। তাঁকেও সফল, সার্থক ও পরিপূর্ণ জেনারেলরূপে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা হয়।

সিংহহৃদয় রিচার্ডও বহু যুদ্ধ বিজয়ের শিরোপা লাভে ধন্য হন। কিন্তু তিনিও ব্যর্থমনোরথ হয়ে মারা যান। হ্যানিবলের পরিণতিও হয়েছিল তাই। বর্তমান যুগে জার্মান-অধিপতি হিটলার সমগ্র দুনিয়াকে

ভীষণভাবে নাড়া দেন এবং নাস্তানাবুদ করে ছাড়েন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মাঝ দিয়ে তাঁর সকল কিছুর অবসান ঘটে। সঠিক অর্থে তাঁকেও পরিপূর্ণ ও সফল জেনারেল হিসাবে বিবেচনা করা চলে না।

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, বিপদাপদ, দুর্যোগ ও ব্যর্থতা দ্বারা মানুষের স্বভাবজাত কর্মশক্তি খুবই প্রভাবিত হয়। মানবীয় ফিতরত বা প্রকৃতি একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত বিপদ ও দুর্যোগ বরদাশ্‌ত করতে পারে। রবারের তৈরী বেলুনের উদাহরণই নিন না কেন। বেলুনে বাতাস ভরতে থাকুন। এরপর ক্রমাগত বাতাস ভরা অব্যাহত রাখুন। তারপর এমন এক সময় আসবে যখন তা আর বাতাস ধারণ করতে সক্ষম হবে না, ফেটে যাবে। ঠিক তেমনি মানুষের উপর আপতিত বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টের বোঝা যখন বরদাশ্‌তের বাইরে চলে যায় তখন তার ফিতরত জবাব দিয়ে বসে, সে আত্মসমর্পণ করে। সেনাপতির ভেতর সহ্যশক্তিও তাঁর যোগ্যতা ও ক্ষমতা মুতাবিকই হয়ে থাকে। পরাজয় এবং ব্যর্থতার প্রভাব মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে ভীরুতা, স্বল্পবুদ্ধিতা, নিষ্ঠুরতা এবং বিদ্রোহাত্মক আচরণের ন্যায় দুর্বলতা সৃষ্টি করে। কিন্তু নেতার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত, তাঁর দূরদর্শিতা, সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা এবং যোগ্যতা তাঁর সৈন্যবাহিনী থেকে এসব দুর্বলতাকে দূরে রাখে। এদিক দিয়ে হুযূর আকরাম (সা) ছাড়া সারা দুনিয়ার অপর কোন সৈন্যাধিপতি দৃষ্টিগোচর হন না যিনি এই মাপকাঠিতে সম্পূর্ণরূপে উৎরে যান।

মানুষ আদিকাল থেকেই লড়াই চালিয়ে আসছে এবং পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিভেদ নিষ্পত্তির স্বার্থে তাকে শেষাবধি তলোয়ার হাতে নিতে হয়েছে। উল্লিখিত মানবীয় প্রকৃতির কারণেই বিভিন্ন রাষ্ট্রও স্বীয় অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করে থাকে অথবা এভাবে বলা যায় যে, মানুষ স্বভাবতই যুদ্ধ-বিগ্রহ-লিপ্সু। মানুষের জন্মের সেই ঊষালগ্ন থেকে এভাবেই চলে আসছে। যদি তার প্রকৃতিতে অস্বাভাবিক ও আকস্মিক কোন পরিবর্তন সংঘটিত না হয় তবে ভবিষ্যতেও এটাই হতে থাকবে। যুদ্ধ-বিগ্রহে পরাজয়ও আছে---এ কথা মানুষ খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। আর সেহেতু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসান কখনোই হবে না।

আজকালকার একটা সাধারণ ধারণা হ'ল, যে জাতি বা যে রাষ্ট্রের নিকট উড়োজাহাজ, আণবিক বোমা, বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং অঢেল

ধনসম্পদ রয়েছে বিজয় বৈজয়ন্তী কেবল তারাই উডডীন করবে। এটা নতুন কোন কথা নয়। আগেও লোকে বলত যে, একমাত্র সে সব জাতিই বিজয় লাভ করতে পারে যাদের নিকট বিশাল সৈন্যবাহিনী ও প্রচুর অর্থ-বিত্ত রয়েছে। অথচ এটা ভুল এবং আদতেই ভুল ধারণা, কিন্তু সাধারণ মানুষ তা আদৌ বুঝতে চেষ্টা করে না। ফল এই দাঁড়ায় যে, বহু জাতি যিল্লতি ও ধ্বংসের অতল গহ্বরে এমনভাবে নিপতিত হয় যে, অতঃপর তা থেকে আর সামাল দিয়ে উঠতে পারে না। আমাদের সামনে হিটলারের নজীর বিদ্যমান। হিটলার জার্মানীকে সব রকমের অস্ত্রে সজ্জিত করে বিরাট শক্তিশালী এক বাহিনী গঠন করেন এবং এর সাহায্যে তিনি জার্মানীকে বিশ্ববিজয়ী শক্তিতে পরিণত করার চেষ্টা করেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়।

পরাজয়ের কারণ নির্ণয়ে পর্যবেক্ষক মহলের ভেতর একাধিক মতের সৃষ্টি হয়। কেউ বলেন, যদি হিটলার ইংরেজ বাহিনীকে ডেনমার্ক থেকে ইংলণ্ড না যেতে দিতেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ইংলণ্ডের উপর হামলা করতেন তাহলে যুদ্ধের ফল হয়তো ভিন্ন হ'ত। কেউ বলেন, হিটলার যদি জাবালুত্তারিক (জিব্রাল্টার) ও স্পেন অধিকার করে ফেলতেন তাহলে বৃটেনকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারতেন। কিছু লোকের ধারণা— আল-আলামীন রণক্ষেত্রে হিটলার যদি ফিল্ড মার্শাল রোমেলকে সময় মতো সাহায্যকারী বাহিনী পাঠিয়ে দিতেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই বৃটেন পিছু হটত। একটি গ্রুপের মতে, রাশিয়া আক্রমণ ছিল হিটলারের সব চেয়ে বড় ভুল। এ সবই যদি সঠিক মেনেও নেওয়া হয় তবুও বাস্তব সত্য স্বীয় স্থানে অটল থাকে যে, সৈন্যবাহিনীর কামিয়াবী ও সাফল্য নেতার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। তাঁর সুদৃঢ় ও সুউচ্চ মনোবল, মহান চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা, সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বিচক্ষণতা এবং দিল ও দিমাগ তথা মন-মগজের অন্যান্য যোগ্যতার উপর সাফল্য বহু বিষয়েই নির্ভর-শীল হয়ে থাকে। এটাই সেসব কার্যকারণ যা জয়-পরাজয়ের ফয়সালা অতীতেও যেমন করেছিল, এখনও করছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে। এসব কার্যকারণের উপর ভিত্তি করেই আরবের একজন পিতৃমাতৃহীন যুবক স্বীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমগ্র বিশ্ববাসীকে চ্যালেঞ্জ করছেন। প্রথম দিকে তাঁকে বিভিন্নমুখী বিপদ-আপদ ও ঝঞ্ঝা-মুসীবতের মুখোমুখী হতে

হয় এবং পরাজয় ও ব্যর্থতার (?) কারণে দেশ ছেড়ে অন্য স্থানে হিজরত করে চলে যেতে হয়। কিন্তু সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও গতিপথ তিনি কখনই হারান না। অবশেষে বিশ্ববাসী সে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করল যে, অল্প দিন পরে সেই হিজরতকারী ব্যক্তিটিই বিজয়ী বেশে প্রত্যাবর্তন করছেন, স্বীয় নীতিমালা বাধাহীনভাবে প্রচার করছেন এবং দুনিয়াকে শান্তি ও নিরাপত্তার ন্যায় মহা-মূল্যবান সম্পদ দ্বারা ভরে তুলছেন।

রসূল করীম (সা)-এর পবিত্র জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং এর থেকে শিক্ষা লাভ

এসব কিভাবে হ'ল? হুযূর আকরাম (সা)-এর সাফল্য লাভের আসল কারণ কি ছিল? পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে এসব প্রশ্নেরই জবাব দানের চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা এজন্য করা হয়েছে যেন মুসলমানদের সামনে তাঁর পবিত্র জীবনের এ দিকটি খোলাখুলি ও বিস্তৃতভাবে এসে যায়। যদিও এটা ঠিক যে, মুসলিম বিজয়-ইতিহাসের পাতাগুলো নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়েছে; সে সবের লেখকও আজকের দুনিয়ায় নেই, আর যতটুকু অবশিষ্ট আছে তার মূল্যও গল্পলোকের কল্প-কাহিনীর চেয়ে বেশী কিছু নয়। গভীর বিশ্লেষণ ও সত্য অন্বেষণের জগত আজ তমসাবৃত! তথাপি বিনীত এ প্রচেষ্টা এজন্যেই যেন এ অন্ধকারটুকু আর অবশিষ্ট না থাকে এবং কুহেলিকাচ্ছন্ন অন্ধকার ভেদ করে সত্যের প্রদীপ্ত সূর্যসম মহামূল্যবান সম্পদ যা এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্তভাবে এখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে কিংবা মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে তাকে পুনরায় একত্র করা যায়, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এ থেকে উপকৃত হতে পারে।

রসূল করীম (সা) পরিচালিত জিহাদ

রসূল করীম (সা) পরিচালিত বিভিন্ন জিহাদ এবং অতীত ও বর্তমান যুগের অপরাপর যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে যে পার্থক্যটা সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে তা হ'ল, অন্যদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা। সুতরাং একজন বিজয়ী ও অপরজন পরাজিত হবার পর যখন সন্ধি স্থাপিত

হয় তখন তা শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবর্তে ভাবী যুদ্ধের কারণ অর্থাৎ হিংসা ও জিঘাংসার উদ্দাম স্পৃহা সঙ্গে নিয়ে আসে। এর বিপরীতে রসূল আকরাম (সা)-এর সমস্ত যুদ্ধের অবশেষ শান্তি ও নিরাপত্তার উপর গিয়ে শেষ হচ্ছে অর্থাৎ যেখানে অন্যান্য যুদ্ধ জুলুম-নির্যাতন ও ধ্বংসের বিস্তার ঘটিয়েছে, সেখানে এ যুদ্ধ তামাম দুনিয়াকে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের দা'ওয়াত জানিয়েছে। সন্ধি শর্ত স্থির করবার মুহূর্তে অমুসলিম বিজেতার নিয়ত সব সময় এটাই থাকে যেন বিজিত জাতিকে অধিক থেকে অধিক-তর মজবুর ও অসহায় অবস্থার শিকারে পরিণত করা যায়। আর তাই তারা বলে যে, আগামীতে বিজয়ী জাতির সীমারেখা এই হবে, এই হবে বিভিন্ন জাতির শক্তির ভারসাম্য; অতঃপর পরাজিত জাতিকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে হবে যেন তারা চিরদিনের তরে গোলামে পরিণত হয় এবং তাদের সহায়-সম্পদ, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন একদম যেন ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়। এ ধরনের কঠিন শর্তারোপ বিজিত জাতির মন-মানসে প্রতিশোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর অর্জিত বিজয়ের পর সন্ধির শর্ত স্থির করতে গিয়ে হামেশাই বিজিত জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ ও মঙ্গলকে সামনে রাখা হয়েছে এবং তাদেরকে শান্তি, স্বস্তি, সাম্য ও ন্যায়বিচারের মহামূল্যবান সম্পদ দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে।

বিশ্বযুদ্ধ ও তার কারণ

সম্ভবত এ কথাগুলো উপলব্ধি করা আরও বেশী সহজ হবে যখন সংক্ষিপ্তভাবে সেসব কারণ বর্ণনা করা হবে যার দরুন অল্পদিনের ব্যবধানে বিশ্বকে দু' দু'টি বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত সংঘর্ষ, নজীরবিহীন ধ্বংস ও বর্বরতার ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হয়। শুধু প্রত্যক্ষই নয় বরং এর মাঝ দিয়ে তাকে অতিক্রমও করতে হয়েছে। এসব যুদ্ধে উভয় পক্ষের মৌলিক নীতি এই ছিল যে, বিজয়ীর পক্ষে পরাজিতের সঙ্গে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি অবলম্বন করা আহাম্মুকী। পরাজিত পক্ষের উপর সর্বপ্রকার জুলুম ও বাড়াবাড়ি করা অবাধে জায়েয এবং তাদের উপর জোর-যবরদস্তি তথা শক্তি প্রয়োগ এবং ধনসম্পদসহ সব কিছু ছিনিয়ে নেওয়া বিজয়ী পক্ষের জন্মগত অধিকার।

এ প্রসঙ্গে হিটলারের সেই বক্তৃতার উদ্ধৃতি পেশ করাই যথেষ্ট হবে যা তিনি ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান পার্লামেন্টে দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন ঃ

১৯১৯ সালে গুলী ভর্তি পিস্তলের মুখে আমাদের থেকে বিশেষ শর্ত সম্বলিত দলীলের উপর দস্তখত করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আমাদের এমন ধমকও দেওয়া হয়েছিল যে, যদি এসব শর্তের উপর দস্তখত না করা হয় তাহলে জার্মানীর লাখ লাখ অধিবাসী ক্ষুধা ও অনাহারের অসহনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করে মারা যাবে। এ ধরনের যবরদস্তিমূলক দস্তখত নেবার পর আমাদেরকে বলা হয়, এই দলীল আইনগতভাবেই অটল ও অনড় থাকবে (অর্থাৎ এর কোন হেরফের হবে না)।

এই ভাষণে হিটলার চার্চিলের সেই বক্তব্যেরও পুনরাবৃত্তি করেন যা তিনি ১৯১৯ সালের ৩রা মার্চ কমন্স সভায় পেশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ 'আমাদের অবরোধ সফল হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে জার্মানী এখন ক্ষুধা ও অনাহারে ছটফট করছে।'

মজার কথা এই যে, ইংলণ্ডের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও পর্যবেক্ষক লয়েড জর্জ সন্ধি সম্মেলনের সদস্যদের সেই সময়ই সতর্ক করে দিয়েছিলেন ঃ 'যদি আপনারা জার্মানীর সমস্ত নয়া উপনিবেশ ছিনিয়ে নেন, তাদের নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীর সদস্য-সংখ্যা একেবারেই কমিয়ে দেন এবং তাদের অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর আদৌ অনুমতি না দেন তখন জার্মানীর যদি দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মে যে, সন্ধির শর্তাবলী নেহায়েত অন্যায়ভাবে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে এর প্রতিশোধ গ্রহণে তারা অবশ্যই ময়দানে নামবে এবং আমাদের জুলুম ও যবরদস্তি এবং নানারূপ বাধা-নিষেধ তাদের ভেতর আত্মত্যাগ, কোরবানী ও শৌর্যবীর্যের আবেগসমূহকে উদ্দীপিত করে তাদেরকে আমাদের মুকাবিলায় এনে দাঁড় করাবে।'

কিন্তু সন্ধির ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যবৃন্দ লয়েড জর্জের এ পরামর্শে কান দেননি। আর এভাবেই তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ রোপণ করেন।

এর সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কয়েক শতাব্দী থেকে ইংলণ্ডের এই পলিসিই চলে আসছে যে, য়ূরোপের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর একের বিরুদ্ধে অপরকে উস্কে ও লেলিয়ে দিয়ে দু'টি বিবদমান গ্রুপে বিভক্ত করে রাখতে হবে যেন সেখানে (য়ুরোপীয় ভূখণ্ডে) শক্তির ভারসাম্য বজায়

থাকে। বৃটেন প্রথমে এটা দেখতো যে, তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র অত্যন্ত দুষ্ট ও ঝগড়াটে ; বরং তা এই যে, ভবিষ্যতে সে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও তার বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতি যেন বিপজ্জনক হুমকী হয়ে না দাঁড়াতে পারে। যদি সে প্রাকৃতিক সম্পদ, বাণিজ্য কিংবা এ ধরনেরই অন্য কোন কারণে শক্তিশালী হয়ে উঠতো তাহলে বৃটেন য়ূরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের সহযোগিতায় তাকে দাবিয়ে দিত। কিন্তু সন্ধির পর প্রতিপক্ষকে এতটা কমযোর ও দুর্বল করে দিত না যাতে সে একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায় এবং য়ূরোপে শক্তির ভারসাম্য নষ্ট হয়। সম্ভবত আমেরিকা এবং ফ্রান্স লয়েড জর্জের পরামর্শকে এরই ভিত্তিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল—বিশেষত এই কারণে যে, সে সময় বৃটেন ফ্রান্সের ব্যাপারে ভীত ছিল। কেননা সে য়ূরোপে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী থাকতে চাচ্ছিল, অথবা এটাও সম্ভব যে, এবার তারা বৃটেনকে বেকায়দায় ফেলতে চাচ্ছিল যেন সে বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর না হতে পারে ; অতএব এ মুহূর্তে সে যুদ্ধ-বিগ্রহে জড়িয়ে থাকুক। এ ব্যাপারে আমেরিকা ও ফ্রান্সের মধ্যে কোন গোপন সমঝোতা হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়।

বৃটেন তার স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে লীগ অব নেশন্‌সের ভিত্তি স্থাপন করে। এতে বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। ১৯১৯ সালে ফ্রান্স বৃটেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য প্রদান করে। তাতে করে কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কামিয়াব হন। কিন্তু ১৯২৩ সালে তৎকালীন য়ূরোপের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র ফ্রান্স জার্মানীর রুহর নামক এলাকা যখন যবর-দখল করে নেয়, তখন বৃটেন জার্মানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র পাকাতে শুরু করে এবং অত্যন্ত গোপনভাবে জার্মানীকে পুনর্বার শক্তিশালী হবার পেছনে মদদ যোগাতে থাকে। এই মদদ যোগাবার ভিত্তিতেই জার্মানীতে ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গের অধীন এমন একটি সরকার কায়েম হয় হিটলার ছিল যার যোগ্য উত্তরসূরী।

সে সময় বৃটেন একটি কঠিন বিপদ ও অসুবিধার মধ্যে ছিল অর্থাৎ ১৯১৩ সালের মত ১৯৩৫ সালে বৃটেন দুনিয়ার ব্যাংক পলিসির উপর আর একক কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল না। অর্থনীতির কেন্দ্র তখন লণ্ডনের পরিবর্তে নিউইয়র্কে গিয়ে আসর জমিয়েছে। বৃটেন সোনা-রূপার নিয়ন্ত্রণ ও বিনিময়ের উক্ত কেন্দ্রকে পুনরায় লণ্ডনে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছিল।

এতদুদ্দেশ্যে সে স্বর্ণ মূল্যমানের একটি নবতর আইন প্রবর্তন করে। এরপর ১৯২৫ থেকে ১৯'৩১ পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে তার বাণিজ্যিক যুদ্ধ অব্যাহত থাকে যার পরিণতিতে বৃটেন আমদানী ক্ষেত্রে ঘাটতির কারণে স্বীয় প্রতিরক্ষা খাতে খুবই কম ব্যয়ে সক্ষম হয়। এদিকে ফ্রান্স ও জার্মানী দিন দিন শক্তিশালী হয়ে চলেছিল। অর্থ সংকটের এই পরিণতি গোপন রাখার জন্য সে একটি নতুন পন্থা উদ্ভাবন করে যাতে এর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কিছুটা তার ফুরসত মেলে এবং বাণিজ্যিক যুদ্ধে আমেরিকাকে পেছনে ফেলে দ্রুত সামনে অগ্রসর হতে পারে। উল্লিখিত কৌশল ও পরিকল্পনা এই ছিল যে, সকল রাষ্ট্রই নিজেদের সৈন্যবাহিনী কমিয়ে ফেলবে যাতে করে দুনিয়ার বুকে পুনর্বার যুদ্ধের কোনরূপ আশংকা আর না থাকে। অতএব এরই ভিত্তিতে লীগ অব নেশন্‌সে যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের উপর বাধা-নিষেধ আরোপের প্রস্তাব পেশ করা হয়। বৃটেন যেহেতু আর্থিক সংকটের কারণে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়-বরাদ্দ খুবই কম করছিল, সেহেতু সে তার এই নগণ্য ব্যয়-বরাদ্দকে দুনিয়ার সামনে নমুনা হিসাবে পেশ করে। জার্মানী কিন্তু লীগ অব নেশনসের সদস্য ছিল না। সে তার সৈন্য-সংখ্যা ও সমর শক্তি বৃদ্ধি করতে শুরু করে। এতে খোদ বৃটেনের মদদ ও ইশারা-ইঙ্গিতও ছিল। আর এ কারণেই বৃটেন হিটলারকে ভয়াবহ ও বিপজ্জনক রূপ ধারণ করতে দেখেও 'উহ্' শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারেনি। বৃটিশ গভর্নমেন্ট বৃটেনবাসীর সামনে ফ্রান্স কিংবা জার্মানীর মুকাবিলায় সমর প্রস্তুতির কোন বাজেটও পেশ করতে পারেনি। আর করলেও তাকে ইস্তফা দিতে হ'ত। এজন্যই ১৯৩৯ সালের পহেলা নভেম্বর যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হ'ল তখন বৃটিশ গভর্নমেন্ট বৃটেনবাসীকে যুদ্ধের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অবহিত করতে পারেনি এবং এও বলতে পারেনি জার্মানীর বিরুদ্ধে আমাদের পুরনো নীতি অর্থাৎ শক্তির ভারসাম্য রক্ষার খাতিরে যুদ্ধ করতে হবে এবং নতুন জার্মানীর জীবিকার্জন, বাণিজ্য পথ, শিল্প ও কৃষির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বৃটিশ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য রক্ষাই হবে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। অন্য কথায়, বৃটেন জার্মানীর বাণিজ্যের অস্বাভাবিক বিকাশের বিরোধী অথবা বলতে পারেন---বৃটেন জার্মানীকে একেবারে ধ্বংস ও বরবাদ করতে চায় না, কিন্তু য়ুরোপে শক্তির ভারসাম্য ধজায় রাখতে চায়।

কিন্তু ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটেন যখন যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন এ যুদ্ধের নাম দিল "ক্রুসেড" (ধর্মযুদ্ধ) এবং রাজনৈতিক স্বার্থকে শিকেয় ঝুলিয়ে রেখে হিটলার এবং তাঁর নাজী সহযোগীদের ধ্বংস সাধনে কোমর বেঁধে লাগল। এরূপ নীতি পরবর্তীকালে বৃটেনকে এমন এক সংকট ও সমস্যার আবর্তে নিক্ষেপ করল যার হাত থেকে সে আজও নিষ্কৃতি পায়নি। আর এখন বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, আণবিক বোমা, জীবাণুবাহী গোলা ও গ্যাস শেলের ধ্বংসকরী ক্ষমতার ভয়াবহ আশংকায় থরথর করে কাঁপছে।

কতিপয় সাক্ষ্য-প্রমাণ

এখানে যে চিত্র পেশ করা হ'ল তা সহজে বোঝার জন্য উপরের ভাষ্যের সমর্থনে রূশ পর্যবেক্ষক ও চিন্তাবিদের মতামত পেশ করা যাচ্ছে। তাতে এ ব্যাপারে প্রতিটি দলের ও গ্রুপের ধ্যান-ধারণা চোখের সামনে ফুটে উঠবে। স্টালিন ১৯৩৪ সালে বলেছিলেনঃ

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধ জার্মানদের অন্তর-রাজ্যে প্রতিশোধ গ্রহণের এমনি এক আবেগ-স্পৃহা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করে দিয়েছে যা অদ্যাবধি বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। এই যুদ্ধের বদৌলতেই রাশিয়া অভিজাত সম্প্রদায় ও শাসকগোষ্ঠীর কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হয়েছে এবং একই কারণে সোভিয়েট ইউনিয়ন পৃথিবীর মানচিত্রে অস্তিত্ব লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কম্যুনিস্টদের জন্য যে আরো সুসংবাদ বয়ে আনবে না তাই-বা কে বলতে পারে।

১৯৩৯-এর ১০ই মার্চ তিনি অপর এক বিবৃতিতে বলেনঃ

আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যেন আমরা যুদ্ধবাজদের ধোকায় পড়ে আমাদের দেশকে এক সাগর রক্তের মাঝে নিক্ষেপ না করি ... ইত্যাদি।

এর পরই তিনি হিটলারের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। কিন্তু পোল্যাণ্ডের উপর জার্মানীর হামলার মুহূর্তে পোল্যাণ্ড নিজেদের অংশ ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয় এবং আলাদা হয়ে পরবর্তী সুযোগের অপেক্ষায় থাকে যেন মোক্ষম মুহূর্ত আসা মাত্রই নিজের স্বার্থ উদ্ধারে সক্ষম হয়। ক্রমা-গত যুদ্ধের ফলে উভয় পক্ষই দুর্বল হয়ে পড়ে, আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে

যায়। এজন্য রাশিয়ার ধারণা ছিল, বিজয়ী ও বিজিত উভয়ের ভেতরেই ক্ষুধাসহ যুদ্ধের অনিবার্য কুফলের কারণে কম্যুনিস্ট ধ্যান-ধারণার প্রসার ও ব্যাপ্তি সহজ হয়ে যাবে অর্থাৎ তারা যুদ্ধে জড়িত উভয় পক্ষের যুদ্ধোত্তর কুফলের অংশীদার হতে সরাসরি অস্বীকার করল; বরং এ থেকে ফায়দা হাসিলের জন্য একটি সুচতুর পরিকল্পনা তৈরী করল এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়া তার নিজস্ব সেনাবাহিনী ও সমর শক্তি বর্ধিত করতে থাকল যেন মোক্ষম মুহূর্তে তাকে কাজে লাগানো যায়।

এখন জার্মানীর অধিকার ও স্বার্থের অবস্থার কথা একবার হিটলারের নিজের মুখেই শুনুন। তিনি বলেনঃ

"কোন দেশের সীমারেখার গুরুত্ব এর উপর নির্ভর করে না যে, সে তার অভ্যন্তরে দেশবাসীর জন্য যথেষ্ট খাদ্যশস্য কিংবা কাঁচা মাল উৎপাদন করতে পারে---বরং তার উপর নির্ভর করে যে, রাজনৈতিক এবং প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে সে নিরাপদ কিনা" অর্থাৎ হিটলার ১৯১৪ সালের পূর্বেকার নয়া উপনিবেশগুলোই চাচ্ছিলেন না---বরং তিনি জার্মানীর সীমান্ত রেখাকে আরও বিস্তৃত ও প্রসারিত করে জার্মানীকে প্রতিরক্ষার দিক দিয়েও মযবুত ও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চাচ্ছিলেন যেন তিনি সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে নিরাপদ হতে পারেন। শুধু তাই নয়, জার্মানীকে দুনিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবেও তিনি গড়ে তুলতে চাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর অমর গ্রন্থ "মেইন ক্যাম্ফ"-এ পরিষ্কার লিখেছিলেন যে, তাঁর দেশের বিস্তৃতি সঠিকভাবে রূশীয় এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণ ও দখল প্রতিষ্ঠা দ্বারাই হতে পারে। আর রাশিয়ানরা জাতিগতভাবে হেয়-তর; সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম জাতির কেন্দ্রভূমি জার্মানী রাশিয়ার নিকট থেকে প্রয়োজন মাফিক এলাকা ছিনিয়ে নেবার অধিকার রাখে। বিশেষ করে এজন্য যে, রাশিয়ার উপর ইহুদীদের প্রভাব লক্ষ্যণীয়ভাবে অধিক এবং তাদেরকে ইহুদী বিপদাশংকা থেকে বাঁচানো জার্মানীর মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

হিটলার মনে করতেন যে, এই বিরাট সাম্রাজ্যের উপর ইহুদীরা তাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দীর্ঘদিন কায়েম রাখতে পারবে। এজন্য তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, রূশ অধিবাসীরা ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব-বলয়ের

হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য রাশিয়ায় জার্মানীর বিজয়ীর বেশে প্রবেশকে খোশ আমদেদ জানাতে অপেক্ষা করবে।

দৃশ্যত হিটলারের খাহেশ ছিল, জার্মানী মান-মর্যাদার সঙ্গে স্বাধীনভাবে জীবন যাপনে সক্ষম হোক এবং তাঁর দেশ শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরিগণিত হোক। কিন্তু এই খাহেশের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য সমগ্র দুনিয়াটাকে একেবারে ওলট-পালট করে দেওয়াকেও আবার তিনি জায়েয মনে করতেন।

আমেরিকা এই যুদ্ধটাকে নিজেদের বাণিজ্য বিকাশের স্বার্থে অত্যন্ত সুলক্ষণ বলে মনে করত। কেননা সে জানত যে, এভাবেই তার সর্বাপেক্ষা বড় প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেন এবং তার সাথে সাথে জার্মানী, ফ্রান্স ও জাপান ময়দান থেকে পথ ছেড়ে সরে যাবে।

এসব ধ্যান-ধারণা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মন-মগজে লালিত হচ্ছিল। যুদ্ধের শরীক দলগুলো যুদ্ধ ঘোষণার মুহূর্তে এসব ধ্যান-ধারণাকে যেসব রঙে ও রূপে পেশ করেছিল, দুনিয়াবাসী সে সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল। এখন এটাই দেখতে হবে যে, এই পবিত্র (?) যুদ্ধ যা মিত্রশক্তি শুরু করেছিল এবং যাকে জার্মানী ও তার সহযোগীবৃন্দ জীবন-মরণ যুদ্ধ নামে অভিহিত করেছিল—কোন্ মূলনীতির উপর চলেছিল।

যুদ্ধের লক্ষ্য

পশ্চিম জাতিগোষ্ঠীর প্রতিরক্ষা-কৌশল ও নীতি কতিপয় সামরিক পর্যবেক্ষকের চিন্তা-ভাবনার নির্যাসমাত্র। এদের মধ্যে জার্মানীর মশহুর জেনারেল ক্লজউইজ (Clause witz), মলিটকে (Moltke), ডেলব্রাক (Delbruck) প্রমুখ বিখ্যাত। ডেলব্রাক ক্লজউইজের চিন্তাভাবনা ও ধ্যান-ধারণাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের ধারণায় যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দু'ধরনের হয়ে থাকে ঃ

কোন বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল ঃ

১. যখনই এই রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল হয়ে যাবে তখন সন্ধি করে যুদ্ধ বন্ধ করাটাই সমীচীন। সেজন্য এই যুদ্ধে প্রতিরক্ষা-কৌশল ও নীতির লক্ষ্য হয়ে থাকে যুদ্ধের ময়দানে চূড়ান্ত ও পরিপূর্ণ বিজয় লাভ।

শেষ নিশ্বাসটুকু বাকী থাকা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া ঃ

২. চূড়ান্ত যুদ্ধে যেন দুশমন সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও পর্যুদস্ত হয়ে যায় এবং ভবিষ্যতে আর কখনই যেন সে মাথা তুলে দাঁড়াতে সক্ষম না হয়। এই লক্ষ্য হাসিলের জন্য যুদ্ধ চলাকালীন কতিপয় পন্থা অনুসৃত হয় ঃ

ক. প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার মাধ্যমে শত্রু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিংবা অসহযোগিতার মনোভাব জাগিয়ে তোলা।

খ. শত্রু পক্ষের উপর সম্পদ ও আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে সে দেশে অশান্তির বিস্তার ঘটানো এবং তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

গ. বিভিন্ন ধরনের সামরিক চাপ সৃষ্টি করে দুশমনকে বাধ্য ও অসহায় বানিয়ে ফেলা।

কতিপয় ঘটনা ও প্রমাণ

চার্চিল যেমন বৃটেনের কয়েক শতাব্দীর পুরনো ও পরীক্ষিত 'শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা'-র নীতিকে পেছনে ঠেলে নাজীবাদের বিরুদ্ধে 'পবিত্র ক্রুসেড যুদ্ধ' ঘোষণা করেন, ঠিক তেমনি হিটলারও স্বীয় প্রতিরক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞদের রায় এবং নিজের জেনারেল স্টাফের পরামর্শ উপেক্ষা করে নিজস্ব মনগড়া কার্যকলাপ শুরু করেন। যদিও যুদ্ধের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত তিনি জেনারেল স্টাফের পরামর্শ নিতে থাকেন, কিন্তু পরবর্তীকালে এ পরামর্শ গ্রহণ আর প্রয়োজন বোধ করেন নি। ১৯৩৯ সালের এক বক্তৃতায় তিনি অতীতের সমরবিশেষজ্ঞ এবং বর্তমান কালের জেনারেল স্টাফ সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ

'কে বলে যে, আমি ১৯১৪ সালের যুদ্ধের নির্বোধ নীতিমালা ভবিষ্যতের যুদ্ধেও অব্যাহত রাখব? আমি কি অদ্যাবধি এ ব্যাপারে পূর্ণ প্রয়াস চালাই নি যে, এ ধরনের ধ্যান-ধারণাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দেব? অধিকাংশ লোকই এ ধরনের কথাবার্তা বুঝতে একেবারে অক্ষম। তারা না ভবিষ্যত দেখতে পায়, না নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনই করতে পারে। অন্যদের কথা নাই-বা বললাম, আমাদের জেনারেলরাও তো বুদ্ধু। তারা কেবল রশি মেপে মেপে পথ চলতেই অভ্যস্ত, আর গ্রন্থকীট বলতে যা বুঝায় তারা তো তাই। বুদ্ধিমান

ও সুচতুর উদ্ভাবক এ ধরনের স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদের থেকে সব সময় দূরে থাকে।'

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী তাঁর জেনারেলদের এর চেয়ে আর কিইবা বেশী অপমান ও বেইয্যতি করতে পারেন এবং এর থেকে অধিকতর স্পষ্টভাবে নিজের আস্থাহীনতার প্রকাশ আর কিভাবে করা যেতে পারে। অতঃপর এর সঙ্গে তিনি এও এলান করেনঃ আমি জার্মান জাতির জন্য যবরদস্ত ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য কায়েম করতে চাই। তিনি এর নাম রেখেছিলেন 'লেবেসরাম' (Lebesraum)।

হিটলার যেখানে এই নতুন নীতির উপর চলার ঘোষণা দিচ্ছিলেন, সেখানে চার্চিল মিত্র শক্তির কাউন্সিলে যথেষ্ট প্রভাবশালী সমরবিদ জেনারেল দুহেত-এর (Guilio Douhet) প্রতিরক্ষা নীতির সমর্থনকারীতে পরিণত হন। উক্ত জেনারেলের প্রতিরক্ষা নীতি ছিলঃ যখন বিবদমান দুটি পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যায় তখন উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে জয়লাভের জন্য নৌ, স্থল ও বিমান শক্তির সাহায্যে পরিকল্পনা তৈরী করে এবং যখন কোন পক্ষ বিরোধী পক্ষের সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিতে সক্ষম হয় তখন পরাভূত ও পরাজিত রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মনোবলও ভেঙে পড়ে এবং পরাজিত সেনাবাহিনী অস্ত্র সমর্পণ করে। শেষ পর্যন্ত উক্ত পক্ষের কোমর ভেঙে দেওয়া হয়। সব সময় এই নীতিই চলে আসছে এবং ১৯১৪-১৮-এর যুদ্ধেও তাই হয়েছিল। ময়দানে যুদ্ধরত সেনাবাহিনী যখন হেরে গেল তখন পরাজিত দেশ সন্ধির জন্য দরখাস্ত করল অর্থাৎ দেশের অধিবাসীদের মনোবল সৈন্যবাহিনীর পরাজয়ে ভেঙে পড়ে এবং তাদের মনোবল ভেঙে পড়ায় স্বয়ং রাষ্ট্রও তার পরাজয় স্বীকার করে নেয়। সুতরাং কি কারণ থাকতে পারে যে, সাধারণ রীতি-পদ্ধতি অনুসারে লড়াই করার পরিবর্তে বিপক্ষ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের উপর বিমান শক্তির সাহায্যে হামলা চালিয়ে তাদের মনোবল ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানো হবে না অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার পরিবর্তে আমরা বিমান বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে অতি অল্প সময়ে আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারি। এর অর্থ এই যে, আমরা যদি শত্রুপক্ষের কতিপয় শহরের বাসিন্দাদেরকে বিমান থেকে বোম্বিংয়ের সাহায্যে ঘর-বাড়ী পরিত্যাগে বাধ্য করি তবে নিশ্চিতভাবেই শত্রুপক্ষের নাগরিকদের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়বে।

এ ধরনের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া তাদের উপর অত্যন্ত গভীর ও সুদূর-প্রসারী হবে। কেননা এ অভিজ্ঞতা স্বয়ং তাদেরই হবে এবং তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সেই ভয়-ভীতির চেয়ে নিশ্চিতই অধিকতর বেশী হবে যা তারা নিজ রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী পরাভূত ও পরাজিত হবার পর অনুভব করত। সুতরাং যদি কোন রাষ্ট্রের বিমান বাহিনী হেরে যায় এবং প্রতিপক্ষের বিমান বাহিনী আকাশ থেকে অনবরত অগ্নিবর্ষণ ক'রে তার শিল্প, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী ও উপকরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ধ্বংস করে দেয়, আর অধিবাসীদের ক্রমাগত মরণের মুখে ঠেলে দিতে থাকে তাহলে সে দেশের সাধারণ মানুষ অবশ্যই খেয়াল করবে যে, এখন দুশমনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখা অর্থহীন; এখন তাদের নিকট সন্ধির আবেদন পেশ করাই সমীচীন অর্থাৎ সে সব অধিবাসীর পরাজয়ের অনুভূতি তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই হয়ে যাবে। একটি শহরের এই অবস্থা সম্পর্কে পার্শ্ববর্তী অন্য শহরবাসী শ্রবণমাত্রই তাদের সকল উৎসাহ-উদ্যম নিবে যাবে আর মনোবল যাবে ভেঙে। এমতাবস্থায় কোন সরকারই কিংবা তার সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রজা-সাধারণকে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে বাধ্য করতে পারে না বিশেষ করে সেই সময় যখন সেই দেশের আমদানী-রফতানীর উৎস, খাদ্যোপকরণ ও অন্যান্য জীবিকা সম্পর্কিত বিষয়াদি একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ অতীতে প্রতিপক্ষের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি-সামর্থ্যকে পরাভূত করে নিজেদের বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হ'ত। বর্তমানে এই মূলনীতির আলোকে বেসামরিক নাগরিকদেরকেও ভীত-সন্ত্রস্ত, গৃহহীন ও সহায়-সম্বলহীন করে প্রতিপক্ষ রাষ্ট্রের সরকারকে দুর্বল ও নির্জীব করে তোলাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে।

এসব নীতির উপর যদি একবার একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায় তবে এমন মনে হবে যে, যুদ্ধের প্রতিরক্ষা কৌশলের মূলনীতির উপর এসবের গভীর প্রভাব পড়বে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপার তা নয়। লড়াইয়ের বেলায় প্রতিরক্ষা কৌশলের নীতিসমূহ তাই থাকবে যা আগেও ছিল। অবশ্য এর ব্যবহারিক দিক বদলে গেছে। পরে এর উপর পর্যালোচনা করা হবে। এখানে শুধু এইটুকু দেখতে হবে যে, মিত্রশক্তির এই পবিত্র যুদ্ধ আস্তে আস্তে সব রকমের আন্তর্জাতিক আইন নির্মমভাবে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। ঐ আইন সকল জাতিগোষ্ঠীর শহর-বন্দর, নগর ও শহরবাসী এবং

শিল্পাঞ্চলের উপর গোলা কিংবা বোমা নিক্ষেপকে অন্যায় ও অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছিল। কিন্তু তারাই এই যুদ্ধে উল্লিখিত নীতি ও আইন-কানুনকে পেছনে ঠেলে নির্দোষ ও নিরপরাধ জনসাধারণের উপর উড়োজাহাজ থেকে গোলা বর্ষণ করেছে, আণবিক বোমা নিক্ষেপ করেছে এবং বিনা ওজরে ও বিনা কারণে উল্লিখিত আইন নির্মমভাবে ভঙ্গ করেছে।

এসব ঘটনা এজন্যই বর্ণনা করা হ'ল যেন আমাদের জনগণ বর্তমানে সভ্য হিসেবে কথিত জাতিগোষ্ঠীর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং পবিত্র ঘোষণাসমূহের প্রকৃতি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে। অপর দিকে নবী যুগের অবস্থা ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ঘটনাবলীর সঙ্গে তা তুলনা করে দেখতে পারে। অধিকন্তু একদিকে তারা তাদের সর্বাপেক্ষা সফল ও যোগ্য অধিনায়ক রসূল আকরাম (সা) থেকে প্রতিরক্ষা নীতি ও সামরিক কলা-কৌশল সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করুক, অপর দিকে তাঁর প্রতিরক্ষা কৌশলের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্য অনুধাবন করুক। এভাবেই অবহিত হওয়া যাবে যে, হুযূর আকরাম (সা) আমাদের জন্য এক্ষেত্রে কোন্ পথ ও দিক-নির্দেশনা রেখে গেছেন যার উপর আমল করে আমরা অতীত ও বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদেরকে অতিক্রম করে যেতে পারি।

আজকাল যুদ্ধের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য থাকে এক রকম আর তার প্রকাশ ঘটে অন্য কিছু। এর ভেতর আজগুবী ধরন ও আজগুবী ভাষা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেজন্য যুদ্ধ যখন শেষ হয় তখন সন্ধির মুহূর্তে বিজয়ী পক্ষ থেকে আর একটি নবতর যুদ্ধের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। আর এ কারণেই দুনিয়া থেকে শান্তি ও স্বস্তি উঠে গেছে, উঠে গেছে বিশ্বাস; অধর্মের ঘটছে শ্রীবৃদ্ধি আর ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির মর্যাদা গেছে হারিয়ে। আমাদের বিশ্বাস যে, অন্যান্য ধর্ম ও মযহাবের অনুসারী এবং সভ্য বলে কথিত জাতিগোষ্ঠী নবী করীম (সা) অনুসৃত প্রতিরক্ষা নীতি ইনসাফ ও নিরপেক্ষতার দৃষ্টি নিয়ে অধ্যয়ন করবে এবং এর উপর আমল করে দুনিয়ার বুক থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকা খতম করে দেবে যেন হৃত ও লুপ্তপ্রায় শান্তি ও নিরাপত্তার ন্যায় মূল্যবান সম্পদ আমরা পুনরায় ফিরে পেতে পারি।

সমর-নীতি ও সমরোপকরণ

জেনারেল ফ্রান্সিসস টুকার (Tucker) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উপর যে পর্যালোচনা করেছেন তা মোটেই কম উপভোগ্য নয়। তিনি লিখেছেন ঃ

"আমরা যখন বিগত রক্তাক্ত বিশ্বযুদ্ধে শামিল হয়েছিলাম তখন আমাদের এ ব্যাপারে আদৌ কোন জ্ঞান ছিল না যে, সম্মুখে গিয়ে এ যুদ্ধ কি ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করবে—ঠিক তেমনি এর পূর্বে যেমন জানা ছিল না ১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধ কোন্ পদ্ধতিতে লড়া হবে। প্রশ্ন এই যে, আমরা কখনোই জানতে পারব না যে, ভবিষ্যতের লড়াইগুলো কোন্ অবস্থার প্রেক্ষিতে লড়া হবে। কিন্তু একথা আমি পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও আস্থা সহকারে বলতে পারি যে, আমরা কখনো একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না আগামী দিনে যুদ্ধ কিরূপে সংঘটিত হবে। অবশ্য আমরা আন্দায করতে পারি যে, ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষা কৌশলের গণ্ডির মধ্যে কিভাবে এবং কোন্ নীতির উপর লড়াই করা হবে। যুদ্ধের পদ্ধতি প্রথম থেকেই একটি বিশেষ নীতি-নিয়মের ছাঁচে ঢালাই হয়ে আসছে এবং এর ভেতর নেহায়েত অস্বাভাবিক অবস্থা ছাড়া খুবই কম পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে।

"এই পরিবর্তন দ্বারা এই অর্থ বুঝানো হচ্ছে যে, আগেকার দিনে যুদ্ধ-বিগ্রহ দু'টি দেশের সীমান্ত থেকে শুরু হ'ত। আজকের দিনে সে বিমানের সাহায্য-সহযোগিতাও লাভ করে থাকে। এজন্য বিবদমান ও প্রতিপক্ষ দু'টি দেশের অভ্যন্তর ভাগ থেকেই যুদ্ধ শুরু হয় এবং উভয় পক্ষ যুদ্ধ ঘোষণা করার মুহূর্তে—বরং বলা চলে এর আগেই শত্রু এলাকার বাসিন্দা ও শহরগুলোর উপর বিমানের সাহায্যে বোমা বর্ষণ করতে পারে। যেহেতু পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোতে যেসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেসব থেকে উল্লিখিত বর্ণনার সমর্থন মেলে, সুতরাং এ ব্যাপারে আর অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর জনসাধারণ প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের এই বলে দোষারোপ করেছিল যে, তারা দূরদর্শিতার সঙ্গে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে নি এবং যুদ্ধ-পদ্ধতি সম্পর্কে তারা ভ্রান্ত ধারণার মাঝে ঘুরপাক খাচ্ছিল। জেনারেল টুকার-এর (Tucker) ভাষায় ঃ

"আমরা আমাদের সেই ভ্রান্তি স্বীকার করি। কিন্তু এর যিম্মাদারীর অধিকাংশ (দোষারোপ এবং অপবাদ) সেই সব রাজনীতিবিদের উপর

আরোপিত হয় যারা জনসাধারণের নিকট নিজেদের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রেখেছিল এবং বিশ্ববাসীকে চীৎকার করে ডেকে বলছিলঃ সৈন্য সংখ্যা হ্রাস কর, অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করে দাও। এর সঙ্গে সঙ্গেই বৃটেনের রাজনীতিবিদরা সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বীয় সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে দেন, অস্ত্র নির্মাণ কারখানা বন্ধ করে দেন এবং জনসাধারণের মন-মানসে যুদ্ধ সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি করে মানসিক, শিক্ষাগত ও চারিত্রিক দিক থেকে দেশকে পঙ্গু করে দেন। প্রতিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্যারেড গ্রাউণ্ডের সৈন্য-দের চলাচল ও গতিবিধির ভেতর মশগুল থেকে যেমন নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়, তেমনি সাধারণ নাগরিকদের অজ্ঞতা দূর করার প্রয়োজনীয়তাকেও পুরোপুরিভাবে অনুভব করতে হবে। তাদের সচেতনতা এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই সম্পর্ক ও সংযোগ কেবল তখনই সৃষ্টি হবে যখন বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের নব নব আবিষ্কারকে সামনে রেখে তা থেকে সঠিক ফলাফল গ্রহণ করা হবে।"

প্রতিরক্ষা কৌশল

এই ধারণা করা যে, আমাদের নিকট হাতিয়ার কম, আর অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানাও নেই---এজন্য আমাদের করণীয় তেমন কিছু নেই, এ ব্যাপারে আমরা অক্ষম; এটাই সেই আত্মবিশ্বাসের স্বল্পতা ও ওযরখাহি যা দূর করবার জন্য রসূল আকরাম (সা)-এর যুদ্ধ বিষয়ক কার্যক্রমের বিস্তৃত ঘটনাবলী পাঠক সমীপে তুলে ধরতে সাহসী হয়েছি। গভীরভাবে চিন্তা করুন যে, রসূল করীম (সা)-এর সৈন্যদল, অস্ত্রশস্ত্র এবং আর্থিক দিক দুশমনের মুকাবিলায় কখনও কি এক-দশমাংশও ছিল? এর পরেও কি তিনি হতোদ্যম হয়েছিলেন কিংবা হিম্মত হারিয়েছিলেন? যদি তা না হন কিংবা না হারান তবে কেন তা হননি এবং হারান নি? কখনও কি আমরা তাঁর প্রতিরক্ষা কৌশল অধ্যয়ন এবং গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখবার কষ্ট স্বীকার করেছি? প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভীরু মানসিকতা, দৃঢ় মনোবল ও গভীর আত্মবিশ্বাসের অভাবের দরুনই এমনটি হয়েছে। এ ব্যাপারে অধিক কিছু লিখবার ও আলোচনা করবার আগেই এটা বলে দেওয়া আবশ্যক যে, প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল বলতে কি বোঝায়।

জার্মানীর মশহূর প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ক্লজ উইজ প্রতিরক্ষা বিষয়ে স্বীয় বিশ্বখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল বলতে আমরা বুঝি, নিজ দেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দুশমনের সঙ্গে লড়াই করা। অর্থাৎ প্রতিরক্ষা নীতির অধীন যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হ'ল স্বীয় রাষ্ট্রের স্বার্থ দুশমন কর্তৃক স্বীকার করিয়ে নেওয়া। প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল যুদ্ধের পরিকল্পনাকে এমনভাবে চালাই করে যে, যুদ্ধের বিভিন্ন ফ্রন্টে যে লড়াই চালিয়ে যাওয়া হয় তা একই নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত মুতাবিক হবে। তাতে করে প্রতিরক্ষা কৌশল সে সব যুদ্ধের কাংক্ষিত ফল লাভের ক্ষেত্রে বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।"

জার্মানীর অপর একজন প্রখ্যাত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ মলিটিকে এই বিষয়টি নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল দ্বারা আমরা বোঝাতে চেয়েছি, প্রতিরক্ষা বিষয়ক সে সব সিদ্ধান্ত যা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য বাস্তবে প্রয়োগ করেন।"

বর্তমান অবস্থায় প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশলের ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল বলতে সেই পরিকল্পনা বোঝায় যা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের খাতিরে সেনাবাহিনীর চলাচল ও গতিবিধির জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল কিন্তু শুধু সৈন্য চলাচলের পরিকল্পনা প্রণয়ন করাই নয়; বরং আসল এবং মৌলিক লক্ষ্য হ'ল রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল। অতঃপর এই পরিকল্পনার আওতায় সৈন্য চলাচল যখন শুরু হয়ে যায় তখন একে সমরশাস্ত্র বলা হয়। এখন প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশলের সীমানা কোথায় গিয়ে শেষ হয় এবং সমরশাস্ত্রই-বা কোথায় গিয়ে সমাপ্ত হয় সে ব্যাপারে অত্যন্ত যাচাই-বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। কেননা এ দু'টোর ভেতর রয়েছে খুব গভীর ও নিকটতম সম্পর্ক। প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেমন সাময়িক রাজনীতির নীতি-নিয়মের অধীন হয়ে থাকে তেমনি সমরশাস্ত্র ও যুদ্ধ বিষয়ক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও প্রতিরক্ষা নীতির আওতাধীন হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে, অনেক সময় সাময়িক রাজনৈতিক কৌশল রাষ্ট্রের প্রকৃত ও চিরন্তন পলিসি থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতিরও হতে পারে। উদাহরণত, য়ূরোপের 'শক্তির ভারসাম্য রক্ষার

নীতি' পরিত্যাগ করে ১৯৩৯ সালে বৃটেনের নাজীবাদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ ঘোষণা'র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শুধু লড়াইয়ে জেতাই ছিল না, বরং যুদ্ধশেষে স্বীয় রাজনৈতিক স্বার্থ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবস্থাদির উপর নজর রাখাও তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যখন রাজনৈতিক কৌশল স্থায়ী পরিকল্পনার উপর কাজ করে না তখন তাকে সাময়িক রাজনৈতিক পলিসিও বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক পলিসি এবং প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশলের মধ্যে খুব কমই পার্থক্য হয়ে থাকে অর্থাৎ সে সময় সাময়িক রাজনৈতিক পলিসি এবং প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল চিরন্তন রাজনৈতিক পলিসির অধীন হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক পলিসি-পরিকল্পনা প্রথমেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যায় যে, রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার উপকরণ যুদ্ধের রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য একত্র করা যেতে পারে। এভাবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও শিল্প উপকরণকে চরমভাবে উন্নত করা হয়। জনসাধারণকে রাষ্ট্রের খাতিরে আত্মত্যাগ ও কুরবানীর জন্য তৈয়ার এবং শেষ নিশ্বাসটুকু বাকী থাকা পর্যন্ত দুশমনের মুকাবিলার জন্য উৎসাহিত করা হয়। এভাবে যুদ্ধরত সৈন্যদের সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে এবং এ সাহায্য-সহযোগিতা প্রতিরক্ষা কৌশল পরিকল্পনার আওতায় স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সৈনিকদেরকেও অনুরূপ ও সমান্তরালভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া রাজনৈতিক পরিকল্পনার অধীন দুশমনের উপর আথিক ও নৈতিক চাপ সৃষ্টি করাও জরুরী হয়ে পড়ে যেন তাদের উৎসাহ ও মনোবল ভেঙে যায় এবং মুকাবিলা করবার মত হিম্মত আর না থাকে। এভাবেই দুশমনকে পরাজিত করবার যাবতীয় কলা-কৌশল ও চেষ্টা-তদবীরের উপর গভীর চিন্তা-ভাবনা করে এর প্রয়োগ ঘটাবার সকল জরুরী পন্থাই এখতিয়ার করা হয়।

এর সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধকালীন মুহূর্তে এটাও খেয়াল রাখতে হয় যে, তার সমাপ্তিতে ভারসাম্য এমনভাবে রক্ষা করতে হবে যেন শান্তি ও নিরাপত্তা এবং জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত হয়। রাজনৈতিক পরিকল্পনায় যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালেই এবং যুদ্ধ চলাকালে এসব বিষয়ে বরাবরই চিন্তা-ভাবনা করা হয়ে থাকে।

সমর কৌশল ও প্রতিরক্ষা কৌশল

যদিও প্রতিরক্ষা কৌশল ও সমর কৌশলের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা নির্ধারণ করা কঠিন তবুও মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে একে অপরের থেকে বিলকুল আলাদা। সমর কৌশলের উদ্দেশ্য দুশমনের সঙ্গে লড়াই করা এবং প্রতিরক্ষা কৌশল-পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি হ'ল যতদূর সম্ভব ন্যূনতম যুদ্ধ না করেই শত্রু সৈন্যের মনোবল ভেঙে দেওয়া। আর বাস্তব সত্য এই যে, প্রতিরক্ষা কৌশল সেই মুহূর্তে অত্যন্ত উঁচু দরের মনে করা হয় যখন দুশমন মনোবল হারিয়ে যুদ্ধ ব্যতিরেকেই অস্ত্র সমর্পণ করে। এর উদাহরণঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ফৌজের সামরিক গতিবিধির দরুন বেলজিয়াম এলাকার মিত্র বাহিনী একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল এবং পরে ডেনমার্ক থেকে পালিয়ে জান বাঁচিয়েছিল।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গির উদাহরণ হুযূর আকরাম (সা)-এর মক্কা বিজয়। এই হামলা পরিচালনায় হুযূর আকরাম (সা)-এর পরিকল্পনা এমন নিখুঁত ছিল যে, মুসলিম ফৌজের আকস্মিক আবির্ভাবে মক্কার কাফিররা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের হিম্মত ও মনোবল এতটা দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে, কোনরূপ প্রতিরোধ কিংবা মুকাবিলা ব্যতিরেকেই নিজেদের পরাজয় তারা স্বীকার করে নিয়েছিল।

মূলত এই পরিকল্পনা এমন একটি ফৌজী চালের ফলশ্রুতি যা প্রাকৃতিক ও স্বীকারযোগ্য যুক্তিশাস্ত্রের মূলনীতি মুতাবিক শত্রুর উপর পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে দেয়। যেমন---

১. দুশমনের পশ্চাদ্দেশের রাস্তা, যেদিকে পরাজয়ের সম্মুখীন হওয়া অবস্থায় সে পিছু হটতে পারে, এমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় অথবা সমরশাস্ত্র মুতাবিক এমনভাবে সৈন্য চালনা করতে হয় যাতে শত্রুপক্ষের যুদ্ধের চিত্র অর্থাৎ রণক্ষেত্রের দিক আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় অথবা তাদের সামরিক ব্যবস্থাপনার ভেতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

২. সৈন্যদের গতিবিধি এমন হতে হবে যেন শত্রু সৈন্য ছোট ছোট অংশে বিভক্ত হয়ে যায় এবং তারা একত্র হয়ে হামলা না করতে পারে অথবা অন্ততপক্ষে তাদের সমর-সম্ভার ও রসদ পরিবহন ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়ে পড়ে। এ ধরনের প্রতিটি সামরিক গতিবিধি দুশমনের মনে কাপুরুষতা ও ভীরুতা সৃষ্টি করে এবং সাধারণভাবে এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া খুবই

গভীর হয়ে থাকে। কিন্তু উল্লিখিত বিস্তারিত অবস্থা সে মুহূর্তে অধিক প্রভাবশালী হয়ে থাকে যখন বিভিন্ন উপায় উক্ত প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য একই সময়ে এখতিয়ার করা হয় অর্থাৎ আকস্মিক ও অতর্কিত হামলার সঙ্গে তাদেরকে বিভ্রান্তির শিকারেও পরিণত করতে হবে যেন দুশমন অস-হায় অবস্থায় হিম্মত হারিয়ে বসে এবং তাদের গোটা প্রতিরক্ষা হতভম্ব হয়ে পড়ে এবং কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা কিংবা বুঝে উঠবার যোগ্যতা ও ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলে।

যুদ্ধের ময়দানে প্রতিটি ফ্রন্ট দু'মুখো নীতি গ্রহণ করে থাকে এবং প্রতি-রক্ষা সংক্রান্ত মূল পলিসি ব্যবহারেরও দু'টি দিক থাকে। কোন্ মুহূর্তে কোন্ পন্থা ও পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন সমীচীন হবে তার ফয়সালা অবস্থা মাফিক ফৌজী কম্যাণ্ডারই করে থাকেন। যুদ্ধে হামলা ও আত্মরক্ষার প্রশ্ন পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে। যেমন, তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ চলা-কালে ঢালের ব্যবহার চলত এবং উভয়পক্ষের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকত যে, প্রতিপক্ষের এমন জায়গায় আঘাত হানতে হবে যেখানে সে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে না পারে অথবা এমন সময় হামলা পরিচালনা করতে হবে যখন আত্মরক্ষার ব্যাপারে তার (শত্রুর) ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-ভাবনা হবে বিক্ষিপ্ত। এমনিভাবে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার অধীন স্বীয় সৈন্যবাহিনীর যবরদস্ত শক্তিকে এমন কোন জায়গায় যদি সমাবেশ ঘটানো যায় যেখানে শত্রু-সৈন্য বিক্ষিপ্ত থাকবে তবেই তাদের উপর কার্যকর আঘাত হানা সম্ভব হবে। কার্যকরীভাবে প্রতিটি পরিকল্পনা এমন হওয়া উচিত যেন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অবস্থা ও মওকা মাফিক এর ভেতর পরিবর্তন সাধন করা যায়। এতে দুশমন শুধু প্রতিপক্ষের অভিপ্রায় সম্পর্কেই অনবহিত থাকে না বরং বিভিন্ন-মুখী চেষ্টা-তদবীর প্রতিহত করার চিন্তায় তাদের মধ্যে বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং এভাবেই খোলা ময়দান পেয়ে তাদের উপর মারাত্মক আঘাত হানা যেতে পারে। এই মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি যুদ্ধের ময়দানে এবং আঘাত হানতে কার্যকর করা দরকার। অবশ্য যেহেতু সে সময় উভয় ফৌজই সামনা-সামনি কিংবা একে অপরের নিকটবর্তী থাকে, সেহেতু শত্রুকে খুব বেশী একটা বেখবর ও অসতর্ক রাখা যায় না। তথাপি সম্মুখস্থ ফৌজের সেই অংশের উপর হামলা করা যেতে পারে যেখানে তাদের মোর্চা (ব্যূহ) খুব কমযোর থাকে। যেরূপ বৃক্ষের মূলকাণ্ডের উপর শাখা-প্রশাখা

তথা ডালপালা না থাকলে তাতে ফলফুল আসে না, ঠিক তেমনি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় নতুনত্ব ও কারুকার্য না থাকলে তা থেকে ঈপ্সিত লক্ষ্য হাসিল করা যায় না। যুদ্ধ দ্বারা যে রাষ্ট্র ও সরকারের রাজনৈতিক লক্ষ্য হবে শুধু বিজয় লাভ, সে যদি যুদ্ধ-পরবর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলী গভীর অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ না করে তবে তার পরিণতি স্বয়ং তার জন্যই ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হবে। কেননা এ ধরনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে ভবিষ্যত যুদ্ধের বীজ উপ্ত থাকে। অতঃপর কোন সরকার যদি যুদ্ধের রাজনৈতিক ফায়দা লুটবার উদ্দেশ্যে তার নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে অধিক শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করে বসে তবে সে এতদূর পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তার বিজয়ও তার জন্য দুর্দশা ও দুর্ভোগের কারণে পরিণত হয়। এর বহু উদাহরণ রয়েছে। ১৯৩৯-৪৫-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাই ধরুন না কেন! বিজয়ী বৃটেন ও ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত নাযুক ও দুঃখজনকরূপে সঙ্গীন হয়ে গিয়েছিল। আর বিজিত জার্মানী ও জাপান তো বিলকুল ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিল।

বিভিন্ন রাষ্ট্র যখন আপোসে সম্মিলিত হয়ে কোন দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামে তখন এরূপ লড়াইয়ে অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে বড়ই জটিল ও ঘোরালো পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। প্রাথমিক অবস্থায় সবাই একই চিন্তা-ভাবনা ও একই লক্ষ্যাভিসারী হয়ে থাকে। কিন্তু যেই না যুদ্ধ ক্রমান্বয়ে দীর্ঘতর রূপ নিতে থাকে, পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সমস্যা ও সংকটের সৃষ্টি হতে থাকে। এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা তাদের রাজনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও সভ্যতার স্বার্থ অবশ্যই কিছু না কিছু এবং কোথাও না কোথাও বৈপরিত্যমূলক এবং এই বৈপরিত্যই সময়ের ব্যবধানে ক্রমান্বয়ে হ্রাস না পেয়ে বরং বাড়তে থাকে। এজন্য বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও সন্ধির শর্তাবলী কখনও তৃপ্তি ও সান্ত্বনাদায়ক হয় না। বিগত বিশ্বযুদ্ধগুলোর অভিজ্ঞতা এ কথারই প্রমাণ দেয় যে, তাদের সন্ধিই আগামী যুদ্ধের সূচনা-পর্বে মোড় নেয়। ১৯১৪-১৮-এর বিশ্বযুদ্ধের সন্ধির শর্তাবলী ইতিপূর্বেই পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১৯৩৯-৪৫-এর সন্ধির পরিণতি এবং ফলাফলও দেখুন, মিত্রশক্তি স্থায়ীভাবে বিবদমান দু'টি গ্রুপ ও দু'টি ব্লকে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং তৃতীয় যুদ্ধের প্রস্তুতিতে লিপ্ত হয়েছে। ইতিহাসে শিক্ষার জন্য এ ধরনের বহু উদাহরণ মিলবে। কিন্তু তথাপি দুনিয়ার সামনে এ

অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণ এবং সমস্যা-সংকটের হাত থেকে নাজাত লাভের কোন পন্থাই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। মিত্রশক্তির যুদ্ধের মূলনীতির অধীন একটি দেশ বাকী সব দেশ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ফলে অপরাপর রাষ্ট্র এর প্রতি ঈর্ষাতুর হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ সালের পর রাশিয়া-আমেরিকার শক্তি ও ক্ষমতার জটিল দ্বন্দ্ব আমাদের সামনেই রয়েছে।

লোভী ও তৃপ্ত হুকূমত

দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলো সাধারণত দু'ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের রাষ্ট্র যেগুলো নিজস্ব সীমারেখা এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক স্বার্থ নিয়েই তৃপ্ত থাকে---তা তার এই তৃপ্তির কারণ যা-ই হোক না কেন। দ্বিতীয় ধরনের কিছু রাষ্ট্র আছে যারা নিজেদের সীমারেখা এবং অন্যান্য স্বার্থ বৃদ্ধির মতলবে থাকে। তৃপ্ত রাষ্ট্র একটি বিশেষ সীমারেখার পর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির সঙ্গে আপোস-সমঝোতায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু লোভী রাষ্ট্র শত্রুর পরিপূর্ণ ধ্বংস সাধন এবং নিরংকুশ বিজয় লাভে আকাংক্ষী হয়ে থাকে। উল্লিখিত অবস্থায় রাজনৈতিক পলিসির দিক দিয়ে ঐ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বাহ্যত মিল দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে ওরা এক হয় না। এজন্য প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল পরিকল্পনাও পরিবর্তিত হতে থাকে—পরিবর্তিত হতে থাকে এর সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং বিজেতার শর্তাদিও। আর যেহেতু লোভের মাত্রা বাড়তে থাকে, সেহেতু মিত্রপক্ষের ভেতর মতান্তর ও মনান্তর অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

এসব পরিণাম দৃষ্টে তৃপ্ত হুকূমত অনেক সময় শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করে। সে চায় না কোনরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হতে কিংবা কোনরূপ বিপদ-আপদে জড়িয়ে পড়তে। তার আসল উদ্দেশ্য হল, শান্তির সঙ্গে জীবন যাপন করা। কিন্তু প্রশ্ন হল এ ধরনের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য কি ধরনের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণ করা সঠিক ও শুদ্ধ হবে? এটাকে যদি সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলেও আমরা তাৎক্ষণিকভাবে বলতে পারি যে, যেহেতু এ ধরনের হুকূমতের আত্মরক্ষাই একমাত্র কামনা, সেজন্য প্রতিরক্ষা

নীতির মাধ্যমে শুধু নিজ দেশের হেফাজত করতে হবে। আর এর উপর ভিত্তি করেই পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। বিশেষ করে এজন্যই যে, এতে নিজ দেশের খুবই কম অর্থ ব্যয় হবে। কিন্তু ইতিহাস বলছে, যে রাষ্ট্রই এ ধরনের প্রতিরক্ষা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে এবং এর উপর আমল করেছে তারাই ধ্বংস হয়ে গেছে। ইরানী হুকূমত চেঙ্গীয খানের সামনে তিষ্ঠাতে পারে নি; সুলতান মাহমূদ গযনবীর হামলার মুখে হিন্দুস্তানের রাজা শেষ হয়ে যায়। ফ্রান্স ১৯৩৯ সালে মেজিনিউ লাইনের উপর হাঁটু গেড়ে স্বপ্ন-বিভোর অবস্থায় কাল ক্ষেপণ করছিল। জার্মানী ফ্রান্সের উপর কব্জা জমিয়ে বসার পর তার এই ঘুম ভাঙল। এ ধরনের আরও বহু উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু কোন দেশ যদি তার আত্মরক্ষার জন্য এই নীতি গ্রহণ করে যে, যদি অপর কোন দেশ তার উপর হামলার দুঃসাহস দেখায় তবে ইটের বদলে সে পাথর দিয়েই তার জবাব দিবে, তবে সে দেশ সম্মান ও শান্তির সঙ্গে জীবন যাপন করে।

বৃটেনের দৃষ্টিভঙ্গি ১৯১৪ সাল পর্যন্ত অনেকাংশে এটাই ছিল এবং য়ূরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জের মধ্যে অত্যন্ত কড়াকড়িভাবেই এ নীতি সে অনুসরণ করেছে। সে কয়েকবারই য়ূরোপীয় রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। কিন্তু বিজয় লাভের পর য়ূরোপের কোন অংশের উপরই সে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেনি; বরং শক্তির ভারসাম্য রক্ষার নীতির উপর সে অটল ও অনড়ভাবে কায়েম থেকেছে। কিন্তু যখনই এই নীতি থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে তখন তার পরিণতি কি হয়েছে তা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার,—কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ রাখে না।

হুযূর আকরাম (সা)-ও এ নীতির উপর পুরোপুরিভাবেই দাঁড়িয়েছিলেন, এ সম্পর্কে সামনে অগ্রসর হয়ে আলোচনা করা যাবে। অবশ্য এখানে এতটুকু বুঝে নেওয়া দরকার যে, এই মূলনীতির উপর আমলকারী হুকূমতের জন্য অপরিহার্য হল নিজ সৈন্যবাহিনীকে সার্বিকভাবে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অবস্থায় তৈরি রাখা—প্রয়োজনবোধে ফৌজ যেন যে কোন দিকে এবং যে কোন দেশে অত্যন্ত সহজে ও যোগ্যতার সঙ্গে চলাচল করতে পারে, দুশমন কোনরূপ বিপজ্জনক ও কার্যকর আঘাত হানার পূর্বেই যেন তার সৈন্যবাহিনী সেটাকে ছিন্নভিন্ন ও ব্যর্থ করে দিতে পারে।

লোভী ও আগ্রাসী হুকূমতের উদাহরণ নেপোলিয়ন ও হিটলারের রাজত্বকালের চেয়ে বেশী আর কী হতে পারে! তাঁরা বিজয়ের আকাশচুম্বী কামনার

মধ্যেই নিজেদেরকে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। ক্ষমতার অহংকার ও গর্ব অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে থাকে। ক্ষমতাকে যদি সঠিক পন্থায় ব্যবহার করা না যায়, তাহলে ক্ষমতাবানের ক্ষমতা খোদ তাকেই ধ্বংস করে দেয়। যদিও ক্ষমতার উপর আস্থা ও ভরসা এবং লড়াই করার আবেগ ও প্রেরণা বিজয় লাভের জন্য অপরিহার্য বিষয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই ব্যক্তি ও সেই জেনারেল—যিনি দৃঢ় মনোবল এবং অসীম ধৈর্য ও স্থৈর্যের সঙ্গে কর্ম সম্পাদনে সক্ষম—তিনি সেই বাহাদুর জেনারেল অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য যিনি জোশ ও আবেগে উন্মত্তপ্রায় হয়ে পড়েন। আবেগোন্মত্ত ও ভাবপ্রবণ রাজনৈতিক নেতা ও সেনাধ্যক্ষ দেশ, জাতি ও সেনাবাহিনীর জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাজনীতিবিদ এবং সিপাহসালারকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু ও দূরদর্শী হতে হয়। তাঁদের বিরাট ও বিশালকায় বিজয়ের পরিবর্তে ভবিষ্যতের স্থায়ী শান্তির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, যখন কোন শান্তিপ্রিয় জনগোষ্ঠী যুদ্ধের ব্যাপারে মজবুর হয়ে পড়ে তখন আক্রমণকারী ও উস্কানী প্রদানকারী জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভীষণভাবে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়। পক্ষান্তরে আক্রমণকারী জাতিগোষ্ঠী তার প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী দেখার পর পিছু হটতে থাকে। কিন্তু শান্তির রক্ষক জাতিগোষ্ঠী প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ নিশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে য়ায়। এমন কি কোন কোন সময় প্রতিশোধ গ্রহণেও তারা উদ্দাম হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় সেই সব জাতিগোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত সতর্কতা ও পরিণামদর্শিতার সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং যথাসম্ভব সত্বর সাময়িক সন্ধি করে উত্তেজনা ও আবেগ প্রশমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এখানে শুধু রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং হুকুমতের সমূহ সংকটের উপর একটা সাধারণ পর্যালোচনা করা হ'ল। প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশলকে বাস্তবে রূপদানকারী সিপাহসালার ও সেনানায়কগণ সেই সব হুকুমত ও রাজনীতি বিদের আদেশ পালন করে থাকেন। এভাবে সাধারণ পর্যালোচনার অর্থ এই যে, জনসাধারণ ও ক্ষমতাসীনদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সংহতি রক্ষা করা যেমন জরুরী, তেমনি তাদের আকাংক্ষাকে বাস্তব রূপদানকারীদের উপর আস্থা স্থাপন করাও অপরিহার্য। তাদের সব সময় অবস্থার প্রতি সদা-সতর্ক ও ওয়াকিফহাল থাকা দরকার যেন তাদের নির্দেশ বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতা,

যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর করা যায়। এতদ্ভিন্ন এই প্রসঙ্গে শায়খ সা'দীর নিম্নোক্ত উপদেশটি অত্যন্ত গুরুত্ব ও বিবেচনার দাবি রাখে :

সৈনিককে অর্থ দাও—তারা জান দিয়ে দেবে,
যদি অর্থ না দাও, পৃথিবীতে কেউ শির দেবে না।

এই দৃষ্টিভঙ্গি কি প্রতিরক্ষা নীতির, না শুধু শায়খ সা'দীর ? সামনে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান

আরব একটি উপদ্বীপ। পারস্য-উপসাগরের দিকে উপকূলভাগের ঢালু জায়গা বিস্তৃতি ও প্রশস্ততার দিক দিয়ে খুবই কম। কিন্তু লোহিত সাগরের উপকূল একদম খাড়া এবং অনেকটা বেমানান মনে হয়। এজন্যই ভূভাগ পশ্চিম উপকূলের দিকে উঁচু। লোহিত সাগর সংলগ্ন এলাকার উত্তর ও দক্ষিণ অংশ উঁচু। যেমন য়ামান এলাকা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে আট হাজার ফুটেরও বেশী উঁচু। মধ্যবর্তী এলাকার উচ্চতা দুই হাজার ফুট। কিন্তু মক্কার পশ্চিমাঞ্চল এক হাজার ফুট উঁচু। কতকস্থানে বিশেষ করে খায়বারে কোন কোন পাহাড় আট হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু। এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, লোহিত সাগরের উপকূলের দিকে এবং তার বরাবর প্রথমেই একটি উঁচু পাহাড় রয়েছে। এই পাহাড় ও সাগরের মধ্যবর্তী স্থানে অপেক্ষাকৃত কম উঁচু একটি পাহাড় রয়েছে যা উপকূল বরাবর চলে গেছে। এখানে গাছপালা খুব কম দেখা যায়। যদিও কিছু থাকে তাও সূর্যের প্রখর ও প্রচণ্ড দাহে ঝলসে যাওয়ার মত হয়। এই ভূখণ্ডটি যদিও অনুর্বর, কিন্তু ইতিহাসে খুবই মশহূর। এটাই সেই ভূখণ্ড তওরাতে যার নাম 'উরবিয়াহ' বলা হয়েছে। বনী ইসরাঈল মিসর ভূমিতে পৌঁছুবার পূর্বে এরই প্রান্তরে বছরের পর বছর ধরে ঘোরাফেরা করেছে। এখানেই তূর পর্বতকে চিহ্নিত করা হয় যার উপর আরোহণ করে হযরত মূসা ('আ) আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে বাকবিনিময় করেছিলেন এবং যেখান থেকে বনী ইসরাঈলের জন্য বিধান নিয়ে এসেছিলেন। এখানেই সেই পাথর রয়েছে যেখানে মূসা (আ)-এর লাঠির আঘাতে ঝরনা প্রবাহিত হয়েছিল এবং এই পবিত্র ভূমিতে শহর-জনপদ এখন বিরান হয়ে গেছে।

হেজায

হেজায ইসলাম ও ইসলামী সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি এবং আরব দেশের একটি প্রদেশ মাত্র। প্রাকৃতিক দিক দিয়ে এটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত এবং পাঁচটি অংশই একে অপরের সমান্তরালভাবে অবস্থিত।

ক. উপকূল বরাবর এলাকা অত্যন্ত বালুকাময়। এতে প্রবালের কঙ্করময় ভূমি রয়েছে এবং কতক জায়গা বিশেষ করে প্রান্তরময় এলাকা অত্যন্ত কম চওড়া। সমুদ্রোপকূল বরাবর ভূমি সমতল।

খ. উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পাহাড়ী এলাকার উচ্চতা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে অপেক্ষাকৃত কমে এসেছে। মক্‌কার নিকট এই পাহাড়ের উচ্চতা মাত্র দু হাজার ফুট।

গ. উত্তর অংশের সমতট উঁচু। এখানে আগ্নেয়গিরির লাভা রয়েছে যার কারণে উক্ত পাহাড়ের উপর কোন গভীর নালা নেই। তার ঢালুরেখাও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত। মক্‌কা মু'আজ্জমা এবং তায়েফের পশ্চিম দিকে এর উচ্চতা সমুদ্র থেকে এক হাজার ফুট।

ঘ. বড় পাহাড়। এটা ঐ সমস্ত স্থানে অধিকতর উঁচু যেখানে এর চূড়ায় লাভা জমে আছে, বিশেষ করে হেমা ও খায়বারে যেখানে এর উচ্চতা যথাক্রমে ছ' হাজার ও আট হাজার ফুট। কিন্তু মক্‌কা মু'আজ্জমার নিকট এর উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুটের মত।

ঙ. পূর্ব ঢালুর সর্বাপেক্ষা উঁচু অংশ মধ্য আরবের দিকে ক্রমান্বয়ে নেমে গেছে।

হেজাযে জনপদ খুবই কম। কসবা ও শহরগুলো রয়েছে উদ্ধৃত 'ক' ও 'গ' এলাকায়। যেমন য়াম্বু', জেদ্দা প্রভৃতি প্রথমভাগে পড়ে এবং মক্‌কা মু'আজ্জমা, মদীনা মুনাওয়ারা 'গ' এলাকায় পড়ে। খায়বার এবং তায়েফ প্রভৃতি দ্বিতীয় অংশে অবস্থিত।

বড় বড় উপত্যকা ও মরূদ্যানগুলোতে বর্ষাকালীন যেসব নালা প্রবাহিত সেগুলোর উৎপত্তি বড় পাহাড় থেকে। এসব নালা 'গ' এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দ্বিতীয় অংশের বুক চিরে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। সে সব উপত্যকা ও মরূদ্যানে স্থায়ীভাবে পানি থাকে না। অবশ্য বৃষ্টির দিনে কখনো বিরাট প্লাবন দেখা দেয়।

বড় পাহাড়ের উত্তর দিকের ঢালু উপত্যকাগুলো অধিকতর গভীর এবং ঢালু। এগুলো পর্যায়ক্রমে ভূমধ্যসাগরে গিয়ে শেষ হয়েছে।

এই সব উপত্যকার কারণে সমগ্র দেশটি সাংঘাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন। ফলে যাতায়াত অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ এবং এরই কারণে হেজাযে চলাফেরা বেশীর ভাগ উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক রাস্তা হয় সমুদ্র বরাবর অথবা 'ঙ' এলাকা দিয়ে হয়ে থাকে। এই রাস্তা এসেছে সিরিয়া থেকে। ভ্রমণকারী ও পর্যটকগণ অধিকাংশই ঐ সব রাস্তাই ব্যবহার করে। হেজায রেলওয়েও উল্লিখিত রাস্তায় নির্মাণ করা হয়েছে। ঐ সব উপত্যকার কারণে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে যাতায়াত নেহায়েত কষ্টসাধ্য। যেহেতু এর প্রান্তদেশ খুবই ঢালু, সেহেতু এখানে কৃষিকর্ম একেবারে বেকার ও নিষ্ফল। হেজাযের প্রান্তর এলাকায় এসব কারণেই জনবসতি খুবই কম এবং এসব জনপদ সম্পর্কে বাইরের দুনিয়া খুব কমই জানে। অবশ্য স্বল্পোচ্চ এলাকাতে ঐসব উপত্যকা খুব বেশী গভীর নয় এবং তার প্রান্তদেশও খুব বেশী ঢালু নয়। ফলে এসব জায়গায় ক্ষেত-খামারের কাজ হয়ে থাকে।

উপত্যকাগুলোর মধ্যে সর্বাধিক মশহূর 'হাম্‌দ' উপত্যকা। এই শহর ওয়েজ্‌হ-এর (Wejh) কয়েক মাইল দক্ষিণ হতে শুরু হয় যেখানে দু'টি নালা—একটি খায়বার, অপরটি আওরিদ্‌হ (Aweiridh) থেকে বহির্গত হয়ে মিলিত হয়। এই উপত্যকা থেকে মদীনা মুনাওয়ারার কাটা খালগুলো পানি পায় এবং এরই কারণে মদীনার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচুর খেজুর বাগান দেখতে পাওয়া যায়। অপরাপর মশহূর উপত্যকাগুলো আমলিজ (Umlejh), য়াম্‌বু' (Yambo), রবুঘ (Rabugh), কাদীমাহ (Qadhimah) জেদ্দাহ্ (Jeddah) এবং লিথ-এর (Lith) পার্শ্বস্থ এলাকা থেকে বেরিয়েছে। এই কারণে শুধুমাত্র উপকূলবর্তী এলাকা বরাবর বিভিন্ন স্থানেই খেজুর বাগান দৃষ্টিগোচর হয় না, বরং তিহামা (Tehama), মক্‌কা ও মদীনার মধ্যবর্তী এলাকাগুলোতেও খেজুর বাগান দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এসব খেজুর বাগান-সমৃদ্ধ এলাকাতে স্থায়ী বসতি অর্থাৎ বড় বড় জনপদ নেই। সেগুলোর উপর বরং আশে-পাশের কবিলাগুলোরই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত।

দক্ষিণ হেজাযের উপত্যকাগুলো গভীর নয়, আর তাই সেগুলো দিয়ে যাতায়াত খুব একটা দুর্গম নয়; বরং হাম্‌দ উপত্যকা মদীনার দক্ষিণ দিকে হাজীগণের যাতায়াতের জন্য অধিক ব্যবহৃত হয়। অনুরূপভাবে অপরাপর

উপত্যকাগুলো যেমন মদীনা থেকে য়্যামবু'র মধ্যবর্তী এবং জেদ্দা-মক্কার মধ্যবর্তী এলাকাও ব্যবহৃত হয়। অনুরূপ কিছু উপত্যকা উপকূলবর্তী রাস্তাগুলোর জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে হেজাযকে অনাবাদী ও অনুর্বর এলাকা বলা হয়ে থাকে। খেজুর বাগান খুব কম। উপকূলের যেখানে উপত্যকাগুলো সমুদ্রে প্রবেশ করে সেই এলাকা ভিন্ন বাকী উপকূলের উপর সব জায়গায় প্রবালের পাহাড়। সেখানে সর্বদাই হালকা বালি উড়তে থাকে। পাহাড় শুষ্ক, গাছপালা খুব কম। অবশ্য কোথাও কোথাও চূনা পাথর মেলে এবং ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড় ও গাছ নজরে পড়ে। হেজায সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, অনুর্বর হবার কারণে উত্তর অংশ নজ্‌দ এবং উপকূল এলাকার মাঝখানে এটা একটা বাধা ও প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। আর হেজায শব্দের অর্থও তাই অর্থাৎ প্রতিবন্ধক।

হেজাযের বড় বড় শহরগুলোর মধ্যে তায়েফ, মক্‌কা ও মদীনা প্রধান।

তায়েফ

ছ'হাজার ফুট উঁচুতে অত্যন্ত সবুজ ও শ্যামলিমাময় স্থান এই তায়েফ। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও সৌন্দর্যের কারণে এর খ্যাতি অত্যন্ত মশহূর। বর্তমানে সৌদী হুকূমতের রাজধানী। তায়েফের গোলাপ এবং গোলাপ থেকে প্রস্তুত আতর ইসলামের প্রভাত-সূর্য উদিত হবার পূর্ব থেকেও মক্‌কা মু'আজ্জমার সমস্ত অনুষ্ঠানেই ব্যবহৃত হ'ত। তায়েফের আঙুর থেকে প্রস্তুত শরাব অত্যন্ত মশহূর এবং প্রাচীনকাল থেকেই প্রস্তুত হয়ে আসছে। মধু, কলা, আঞ্জীর (পেয়ারা), আঙুর, যয়তূন, আড়ু, তরমুজ ইত্যাদি প্রচুর উৎপন্ন হয়। এর শ্যামলিমা, সৌন্দর্য এবং উৎপাদনাধিক্যের কারণে একে আরববাসী 'বেহেশ্‌ত' বলে থাকে।

মক্কা মু'আজ্জমা

এটা অত্যন্ত প্রাচীন শহর। একে 'উম্মুল-কুরা' বা প্রাচীন নগরী বলা হয়। ইসলাম-রবি এখান থেকেই উদিত হয়েছিল। প্রাচীনকাল থেকেই একে পবিত্র মনে করা হ'ত। লোহিত সাগর থেকে প্রায় ৪৮ মাইল দূরে একটি অনুর্বর পাহাড়ী উপত্যকায় অবস্থিত। গ্রীষ্ম মৌসুমে অত্যধিক গরম

পড়ে। প্রাচীনকালে গরম মসলার বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ভারতবর্ষ, মালয় ইত্যাদির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এই শহর হয়েই বণিকরা স্থলপথে শাম ও য়ামান যেত। য়াহূদী বণিকের বসতি ছিল এখানে বেশী। খেজুরের ব্যবসাও চলত খুব। জমজমাট ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাপ এর থেকেই করা যাবে যে, যে কাফেলাকে উপলক্ষ করে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার উটগুলোর পিঠে ৫৯ হাযার দীনার মূল্যের বিত্ত-সম্পদ বোঝাই ছিল।

মক্‌কার জন্য প্রয়োজনীয় সাজ-সামান, দরকারী খোরাক ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী বাইরে থেকে আনা হয়। এখানে শিল্পের কোনরূপ প্রসার ঘটেনি।

মদীনা মুনাওয়ারা

ইসলাম আগমনের পূর্বে একে য়াছরিব বলা হ'ত। মক্কা মু'আজ্জমা থেকে প্রায় তিনশ' মাইল উত্তরে অবস্থিত। এটাও মক্‌কার মতই গরম মসলার বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। রোমান হুকূমত যখন ফিলিস্তীন জয় করে তখন বহু সংখ্যক য়াহূদী এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ও কৃষি কার্যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। বহু খেজুর বাগানের এরা ছিল মালিক। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকদের ধারণা যে, এইসব য়াহূদীই প্রথমে য়াছরিবকে 'মদীনা' নাম দিয়েছিল। হুযূর আকরাম (সা)-এর হিজরতের পর থেকে একে 'মদীনাতুন্নবী' বা মদীনা মুনাওয়ারা বলা হতে থাকে। য়াম্‌বু' এখান থেকে ১৩০ মাইল দূরে অবস্থিত।

আবহাওয়া

হেজাযে বৃষ্টির পরিমাণ খুব কম। হেজাযের অবশিষ্ট এলাকার তুলনায় মরু প্রান্তরে কিছুটা বেশী পরিমাণে বৃষ্টি হয়ে থাকে। গ্রীষ্ম মৌসুমে মক্‌কায় তুফানী হাওয়া, মেঘের গর্জন, বিজলীর চমক এবং কড়কড় শব্দের সঙ্গে বৃষ্টি হয়ে থাকে। বৃষ্টির পানি দ্রুতবেগে উপত্যকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। দুই-একদিন নালা ও গর্তগুলো পার হবার উপযোগী থাকে না। তারপর যায় শুকিয়ে। তায়েফে যথেষ্ট বৃষ্টি হয়। তথাপি বর্ষার কোন মৌসুম সেখানে নেই।

মক্কা মু‘আজ্জমা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ৮০০ ফুট উঁচু। আশে-পাশের পাহাড়গুলো শুষ্ক ও অনুর্বর। এজন্যই এখানকার আবহাওয়া খুব গরম। গ্রীষ্ম মৌসুমে এই এলাকা গরমে খইয়ের মত ফুটতে থাকে।

এর বিপরীতে মদীনা মুনাওয়্যারার তাপমাত্রা গ্রীষ্ম মৌসুমে বড় জোর ৭০ ডিগ্রীর মত, এর বেশী সাধারণত হয় না। এজন্য স্বাস্থ্যের পক্ষে এর আবহাওয়া তামাম বছর ধরেই অত্যন্ত সুন্দর ও উপযোগী থাকে। মক্কা ও নিম্ন এলাকার খেজুর বাগান-সমৃদ্ধ এলাকাতে জ্বরের প্রকোপ খুব বেশী। মক্কায় আমাশয় ও মহামারী রোগের প্রাদুর্ভাব অতি মামুলী ব্যাপার; মক্কা এবং তায়েফের পার্শ্বস্থ পাহাড়গুলোর উচ্চ টিলার উপর কখনো কখনো বরফ জমে। মক্কায় দিনের বেলায় যেখানে খুব গরম পড়ে, সেখানে রাতের বেলা বেশ ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক হয়ে থাকে।

হেজাযের সাইমূম (মরুভূমির ঝড়) অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে থাকে। কাফেলার যাত্রীসাধারণ যখন আসমানের প্রান্তদেশে লাল আভা দেখতে পায় তখনই এটাকে সাইমূম-এর পূর্ব লক্ষণ ধরে নেয়। লাল আভার পর অন্ধকার এবং এরপর হলুদ বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর গোটা এলাকা সূক্ষ্ম বালুকণায় ছেয়ে যায় যেগুলো বাতাস এভাবে ছড়িয়ে দেয় যেভাবে তুফান তরঙ্গ-ফেনা ছড়িয়ে থাকে। প্রান্তরের বালুকারাশি হাওয়ায় উড়ে উড়ে প্রবাহের সৃষ্টি করে। তখন শ্বাস গ্রহণ করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। ঠোঁট যায় শুকিয়ে আর উটগুলো পেরেশান হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। অবশেষে হেরে গিয়ে যমীনের বুকে থুতনী দিয়ে আঘাত করতে থাকে। মানুষ ও জীবজন্তুর শক্তি যায় নিঃশেষ হয়ে। গরমের প্রচণ্ডতা তাদেরকে বিপর্যস্ত ও বদহাল করে দেয়। সৃষ্টি হয় বালির নব নব পাহাড় আর পথভোলা তখন অতি সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে পড়ে। এই লূ-হাওয়ার কারণে বহু জীব-জানোয়ার ও মুসাফির প্রাণ হারিয়ে থাকে।

ময়দান

এই এলাকা দ্বারা হেজাযের সেই অংশকে বুঝিয়ে থাকে জনসাধারণ যাকে ‘জাবালে ময়দান’ বলে। এটা উত্তর-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকা। কিন্তু এর অর্থ প্রকৃতপক্ষে সেই এলাকা যা তিরিশ ধাপ উত্তরে আরদুল-বালাদের মাঝখানে অবস্থিত।

এই এলাকাটি অত্যন্ত দুর্গম ও পাহাড়ী। এখানে সাধারণ গ্রামের চাইতে বড় স্থায়ী বসতি খুবই কম এবং যেগুলো আছে তাও সাধারণত সমুদ্রোপকূল বরাবর। হেজায রেলপথ এই এলাকায় অবস্থিত। মা'আন (Maan) থেকে ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত দারুল-হামরা-র (Darul Hamra) মধ্যে তবূক ভিন্ন আর কোন বসতি নেই। সেখানে রয়েছে রেলওয়ে স্টেশন। কতিপয় ঝুপড়িও দৃষ্টিগোচর হয় সেখানে। তবূকে প্রায় তিনশ' লোকের বাস। উপকূলীয় এলাকা ৭ মাইল থেকে ১৫ মাইল পর্যন্ত চওড়া এবং অত্যন্ত চিকন বালি-কণা দ্বারা পেটাই করা---যেখানে বর্ষার নালাসমূহ সমুদ্রে গিয়ে মিলিত হয়। কিছু ক্ষেত-খামার ও ঘর-বাড়িও নজরে পড়ে। ঐ সব নালায় মিসর থেকে আগত কাফেলাসমূহ নিজেদের জন্য পানির কূয়া খনন করে নিয়েছিল। সার্মা (Sarma) সর্বাপেক্ষা বড় খেজুরের বাগান। সে এলাকার মশহূর কসবাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

'আকাবা

এই কসবাটি 'আকাবা উপসাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত যার ব্যাস প্রায় তিন মাইল। এর কোণা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিক নির্দেশ করে। উপসাগরের মুখের নিকট উপকূল অত্যন্ত নিচু এবং যেখানে নালা-এ-আরাবা (উপত্যকা) সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেখানে কিনারাগুলোয় বালির উঁচু উঁচু টিলা রয়েছে। 'আকাবায় বড় জোর পঞ্চাশ-ষাটটি বাড়ি আছে। তুর্কী আমল থেকে সেখানে পুলিশের একটি চৌকি এবং একটি টেলিগ্রাফ অফিস অবস্থিত। সঙ্গে একটি সেনা ইউনিটও সেখানে সব সময় অবস্থান করে। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে কিছু খেজুর বাগান রয়েছে। কিন্তু এখানে কোন মৎস্যজীবীদের নৌকা চোখে পড়ে না। আবহাওয়া খারাপ। জ্বরের ব্যাপক প্রকোপ সম্পর্কে অভিযোগ শুনতে পাওয়া যায়। মিষ্টি ও সুপেয় পানির একটি মাত্র কূয়া রয়েছে, তাও আবার বসতি এলাকার বাইরে। এর থেকেই সবাই পানি পান করে। বাকী সব কূয়ার পানি লবণাক্ত। এখানে একটি ক্ষুদ্রাকারের কেল্লাও আছে। তাতে মিসরের হাজীদের কাফেলার জন্য খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি জমা থাকে। কেল্লার পশ্চিম দিকে জাহাজগুলোর গতি-নির্দেশক অতি প্রাচীনকালের একটি বাতিঘর আছে।

মুয়াইলাহ

এটি 'আকাবা থেকে প্রায় ১৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে প্রায় পঞ্চাশটি বাড়ি-ঘর রয়েছে। এটা মিসরের হাজীদের বিশ্রাম ও আরাম স্থল এবং বেদুঈনদের বাণিজ্যিক কেন্দ্র। নিকটেই খেজুরের কিছু বাগান আছে। উপত্যকায় কূয়া খনন করে খাবার পানি পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পানির পরিমাণ যদিও যথেষ্ট, কিন্তু তবুও কিছুটা লবণাক্ত। এখানে অধিক পরিমাণে ভেড়া পালিত হয়। উপকূল অত্যন্ত নিচু। সমুদ্র থেকে অভ্যন্তরীণ এলাকার দিকে গেলে বহু সু-উচ্চ পাহাড় মিলবে। গ্রামের পাশে কোন বন্দর কিংবা পোতাশ্রয় নেই, কিন্তু প্রবাল পাহাড়ের পশ্চাৎ-ভাগে নৌকা থামার জায়গা রয়েছে। সমুদ্রের দিক থেকে সেখানে পৌঁছুবার রাস্তা দুরূহ ও দুরতিক্রম্য এবং প্রবল বাতাসে তা একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এখান থেকে একটি রাস্তা মদীনা মুনাওয়ারার দিকে চলে গেছে। মুয়াইলাহ ব্যতীত এই এলাকায় ধাবা-র (Dhaba) মত আরও ছোট ছোট গ্রাম রয়েছে।

সমুদ্রোপকূলের মেঠো অংশের পশ্চাদ্ভাগে যেখানে 'আকাবা উপসাগর অবস্থিত, যমীন হঠাৎ করেই চার হাজার ফুট উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু লোহিত সাগরের নিকটে সাত হাজার এবং নয় হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু পাহাড় রয়েছে। এই সব পাহাড়ের পশ্চাদ্ভাগে উচ্চ মালভূমি ছয় হাজার ফুট উচ্চে। এইসব পাহাড় ও উচ্চ মালভূমির মধ্যবর্তী স্থানে বালুকাভূমি কংকরময়। এখানে গাছপালা ও ঝোপ-ঝাড় খুবই কম। এর পেছনে উচ্চ প্রান্তরভূমি লাল রঙের বালুময়। প্রায় পঞ্চাশ মাইল চওড়া এই এলাকার কোথাও উচ্চ টিলা রয়েছে। ঐগুলোকে স্থানীয় অধিবাসীরা 'হিসমা' (Hisma) বলে। প্রান্তরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শুষ্ক পর্বতশ্রেণী যার জমাট লাভার শৃঙ্গগুলো আশে-পাশের এলাকা থেকে ১৪০০ ফুট উঁচু। এসব ছোট-খাট পাহাড়ের পর যমীন ঢালু হয়ে গেছে এবং পশ্চিম ও মধ্য আরব ভূমি পর্যন্ত এভাবেই ঢালু হয়ে চলে গেছে।

হাম্দ উপত্যকা (WADI HAMD)

এটা সেই এলাকা যা ২৭ অনুক্রম আরদুল-বালাদ থেকে ২৪ অনুক্রম আরদুল-বালাদ পর্যন্ত চলে গেছে। এর বৃষ্টির সমস্ত পানিই হাম্দ

উপত্যকায় আসে এবং এই উপত্যকা বা নালা ওয়েজ্‌হ (Wejh) থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে খায়বার উপত্যকা ও ইরদাদাহ্‌র মিলন-মোহনা থেকে বেরিয়ে লোহিত সাগরে গিয়ে মিশে যায়। হেজায রেলওয়ে এখান থেকে সমুদ্রোপকুলের সমান্তরাল রেখায় প্রায় ১৫০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে। এই মধ্যবর্তী এলাকা সম্পর্কে বিস্তারিত উপায়ে সঠিকভাবে কিছু বর্ণনা দেওয়া যাবে না। কেননা এই অংশকে অদ্যাবধি কোন নির্ভরযোগ্য পরিব্রাজক অতিক্রম করেনি। অবশ্য এদিক দিয়ে অতিক্রমকারী পর্যটক-মুসাফিরদের ভাষ্য যে, উপকূল যা উত্তরাংশ থেকে অধিক অনুর্বর এবং সুবা ময়দানের পাহাড় দু'টোই এই অংশের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চলে গেছে। পাহাড়ী এলাকার ঢালু জায়গা অত্যন্ত গভীর। কিন্তু যখনই আমরা একটু একটু করে দক্ষিণ দিকে যাব এই পাহাড় উচ্চতায় কম হতে থাকে। য়ামবু'র উত্তরে পুনরায় কিন্তু বেশ উঁচু হয়ে গেছে। এই উঁচু পাহাড়ের নাম জাবালে রাদওয়াহ (Radwah)। হাঁম্‌দ নামক নালা (স্রোতঃস্বিনী) এই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে অতিক্রম করে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয়। এই এলাকার ভেতর দিয়ে দু'টি রাস্তা চলে গেছে। প্রথমটি ওয়েজ্‌হ (Wejh) থেকে আল-'আলা (Al-'Ala) পর্যন্ত; দ্বিতীয়টি য়াম্বু' (Yambo) থেকে মদীনা পর্যন্ত। হাজী কাফেলার যে প্রসিদ্ধ রাস্তা মদীনা যায়, তা এই প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অংশকে তেরছাভাবে অতিক্রম করে। এই রাস্তায় বেশ কিছু ছোট ছোট বস্তী আবাদ হয়ে গেছে। গোটা এলাকার ভেতর এই রাস্তাটি কেবল সর্বাধিক ঘনবসতিই নয় বরং এর ভেতর ছোট ছোট ঝুপড়ীর স্থায়ী বসতিও রয়েছে। কিন্তু এগুলো এত ছোট যে, এদের ভেতর কোন একটিকেও কসবা বলা চলে না। হাম্‌দ উপত্যকার স্থায়ী আবাদীগুলোর নাম নিচে উল্লেখ করা গেল।

ওয়েজ্‌হ (WEJH)

ছোট একটি কসবা যা এই নামের উপসাগরের তীরে অবস্থিত। পানি লবণাক্ত এবং দুষ্প্রাপ্য। ছোট্ট বাজার। সমুদ্রোপকূল বরাবর ষাট-সত্তুর ফুট উঁচু প্রবাল পাহাড়। এর থেকে প্রায় চার মাইল ভেতরের দিকে কিছু ছোট ছোট পাহাড় রয়েছে। প্রবালের পাহাড় এবং এইসব পাহাড়ের মধ্যবর্তী এলাকার যমীন লবণাক্ত ও দলদলে। কসবার বন্দর জাহাজ চলাচলের

জন্য বেশ উপযোগী এবং নিরাপদ। উপসাগরের গতিমুখ আনুমানিক ৩০০ গজ চওড়া। এই কসবা দিয়ে হাজীদের কাফেলা অতিক্রম করে।

আমলেজ্‌হ (UMLEJH)

এই গ্রামে প্রায় একশ'র মত বসতবাটি আছে। এখানে খেজুর গাছের ঝাড় আছে; কিন্তু খুবই মামুলী ধরনের। এই গ্রাম ছোট বন্দরটির জন্য উন্নতির পথে অগ্রসর। নৌকার আনাগোনা এখানে বেশী। এর কারণ এখান থেকে মদীনা মুনাওয়ারার দূরত্ব ১৪০ মাইল, আর রাস্তাও বেশ ভাল। বহু লোক এখান থেকে গিয়ে হেজায রেলওয়ে স্টেশন এস্তেবাল-এ ট্রেনে আরোহণ করে। এই স্টেশনটি এখান থেকে একশ' মাইল দূরে। এলাকা মোটামুটি সবুজ ও শ্যামলিমাময়। যদি চেষ্টা চালানো হয় তবে এই উপসাগরে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে খুব সুন্দর বন্দর গড়ে তোলা যায়।

য়াম্বু' (YAMBO)

সমুদ্রোপকূল ও পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী অনুর্বর ভূমিতে অবস্থিত। এখানেও একটি উপসাগর রয়েছে। এখানে মদীনাগামী হাজী কাফেলার জন্য ব্যবহৃত বন্দর বিদ্যমান। এই বন্দরটি প্রকৃতি-সৃষ্ট। এর উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য সম্ভবত আজ পর্যন্তও কোন প্রয়াস কিংবা তৎপরতা চালোনো হয়নি। উপসাগরে যাতায়াতের সামুদ্রিক রাস্তা সহজগম্য। উপকূল-মুখকে প্রকৃতি একটি বালুকাময় উপদ্বীপের দ্বারা, যার বুনিয়াদ প্রবাল পর্বতের উপর স্থাপিত, নিরাপদ বানিয়েছে। উপদ্বীপের আড়ালে নৌকাগুলো প্রচণ্ড ও উত্তাল সামুদ্রিক তরঙ্গের হাত থেকে বেঁচে নোঙর ফেলতে পারে। মদীনাগামী কাফেলা কয়েক শতাব্দী থেকে একে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বায়তুল্লাহ শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। বন্দরে পানি বেশ গভীর। কতক স্থানে ১৮ ফুট, আবার কতক স্থানে তা ৬ ফুট। কিন্তু বস্তী খুব নোংরা। সুয়েজ খাল খনন এবং এতে বড় বড় জাহাজের আনাগোনার পূর্বে এর গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। কেননা য়ূরোপ ও আফ্রিকার কাফেলা অধিকাংশ এপথেই

আসা-যাওয়া করত। মিষ্টি ও সুপেয় পানির স্বল্পতা রয়েছে। এ পানি কসবার কয়েক মাইল দূরের কূয়া থেকে নিয়ে আসা হয়। উত্তর-পূর্ব দিকে রয়েছে খেজুরের বিখ্যাত বাগান।

আল-'আলা (AL-'ALA)

এটি বেশ বড় খেজুর বাগান-সমৃদ্ধ কসবা। হেজায রেলওয়ের কারণে এর খুবই উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। খেজুর বাগানগুলো কয়েক মাইল লম্বা এবং কয়েক মাইল চওড়া। এখানকার খেজুর খুবই বিখাত। যে ঝরনা থেকে এখানে পানি সিঞ্চিত হয় তার পানি ঈষদুষ্ণ এবং গন্ধকের অংশ মিশ্রিত। এখানে গোসল করার জন্য দূর-দূরান্তর থেকে লোক সমাগত হয়। পর্দানশীন মহিলাদের জন্য আলাদা পর্দাঘেরা ব্যবস্থা রয়েছে। কূয়ার পাড়েও কিছু খেজুর বাগান রয়েছে। কিন্তু এর পানি লবণাক্ত ও ঠাণ্ডা। খেজুর ভিন্ন লেবু এবং আলুও জন্মে। কোথাও কোথাও আঙুরের লতাপূর্ণ বাগানও দেখা যায়। এখানকার জমি উর্বর। এ কারণে উট ছাড়া গাভী, বকরী, গাধা এবং ঘোড়াও এখানে যথেষ্ট সংখ্যক পালিত হয়।

মদীনা মুনাওয়ারা

এর বর্ণনা পূর্বেও করা হয়েছে। এটি হেজায রেলওয়ের আখেরী স্টেশন। কিন্তু এখন এটাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ২৩০ ফুট। তিন দিক দিয়ে পাহাড় ঘেরা। কোথাও পাঁচ মাইল দূরত্বে, আবার কোথাও তা প্রায় এগারো মাইল। শহরের প্রান্তর এলাকা দক্ষিণ দিকে এবং উন্মুক্ত। এখানে কয়েকটি নালা বিভিন্ন দিক থেকে এসে মিলিত হয়েছে। ফলে পানির আধিক্যের কারণে শহর-উপত্যকা বেশ সবুজ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত।

শহরের দু'টি অংশ—পুরনো মদীনা ও নতুন মদীনা। দু'টি অংশই পরস্পরের থেকে আলাদা দৃষ্টিগোচর হয়। পুরনো শহরের কয়েকটি ফটক বিভিন্ন রাস্তার নিরাপত্তা বিধান করে।

বাব আশ-শামী

শামী দরজা ওহোদ পাহাড়ের রাস্তার মাথায় অবস্থিত।

বাব আল-জুমা

এখান থেকে নজদের প্রধান শাহী সড়ক শুরু হয়েছে। এটা পূর্ব দিকে অবস্থিত।

বাব আল-কা'বা

এটা দক্ষিণ দিকে। এখান থেকে কা'বা শরীফের দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে।

বাব আল-আম্বরী

এটা পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখান থেকে য়ামবু'র দিকে রাস্তা গেছে। যে সব কাফেলা পদব্রজে কিংবা ট্রেনযোগে আগমন করে তারা এই দরজা অতিক্রম করে আল-মুনাক্‌কা নামক প্রান্তরে অবস্থান করে। যাদের ঘর ভাড়া নেয়ার সামর্থ্য নেই তারা হজ্জ মওসুমে এই এলাকায় তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করে। এই ময়দান থেকেই অতঃপর বাব আল-মিসরে প্রবেশ করে।

শহর এলাকা খুবই সবুজ ও শ্যামল। এখানে ১৫০ প্রকারের খেজুর উৎপন্ন হয়। পানির রয়েছে প্রাচুর্য। কতিপয় কূয়ার পানি লবণাক্ত এবং কোথাও কোথাও যমীনও লবণাক্ত। এখানে দুনিয়াভর মুসলিম মিল্লাতের লোকজন এসে বসতি গেড়েছে এবং এখানে বিয়ে-শাদীও করেছে; সেজন্য লোকজনের রক্তে নানা জাতি ও বর্ণের সংমিশ্রণ ঘটেছে বেশী। শুধুমাত্র ভাষাগত দিক দিয়েই একমাত্র তাদের আরব বলা যেতে পারে। কিন্তু আশে-পাশের খেজুর বাগান এলাকার লোকদের ভেতর, বিশেষ করে বেদুঈনদের ভেতর, বাইরের রক্তের মিশ্রণ ঘটেছে খুবই কম। জীবিকার সাধারণ মাধ্যম কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্য।

তায়মা

ছোট্ট একটি খেজুর বাগান-সমৃদ্ধ জনপদ। মালভূমির নিম্ন অংশে অবস্থিত। এই ময়দানের উর্বর মাটির উপর বর্ষিত বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হয়ে নিম্নভূমিতে পতিত হয় এবং সেখানে সারের কাজ দেয়। এখানে খেজুরের একটি বড় বাগান আছে, আর এর আশেপাশে অন্যান্য ছোট ছোট খেজুর বাগানও রয়েছে। আবহাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী। ঘরবাড়ি যদিও কাঁচা কিন্তু বেশ প্রশস্ত ও হাওয়া-ভরপুর এবং বাগ-বাগিচার কারণে বাড়িঘর স্বল্প দূরত্বে নির্মিত। জমি উর্বর হওয়ায় খেজুর ভিন্ন গম, যব ও জোয়ারেরও চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। আনারস, আলু, পেয়ারা, লেবু, নারাঙ্গী, আঙুর ইত্যাদিও উৎপন্ন হয়। বসতির অধিকাংশই বেদুঈন। এদেরকে দেখলে মিশ্র জাতি (শংকর) বলে মনে হয়। হাবশী রক্তের মিশ্রণ প্রকটভাবে ধরা পড়ে।

খায়বার

খেজুর বাগান-সমৃদ্ধ এই জনপদটি ছোট ছোট বস্তীর সংমিশ্রণ। এটি হাররা প্রান্তরে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২০০০ ফুট উচ্চতার উপর অগ্ন্যুৎপাতকারী পাহাড়ের গভীর প্রস্তরময় নিম্নভূমিতে অবস্থিত। উৎক্ষিপ্ত লাভা প্রস্তরের রঙ কোথাও সবুজ—কোথাও খাকী রঙের আধিক্যসহ সবুজ। ইসলামের ইতিহাসে এর একটি সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এখানে বড় বড় ধনবান ও মালদার য়াহূদী বাস করত। তাদের পেশা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও টাকা-পয়সার লেন-দেন। আরব গোত্রগুলোর পরস্পরের ভেতর লড়াই-ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে তারা নিজেরা নিরাপদ শান্তি ও স্বস্তির জীবন-যাপন করত এবং তাদের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখত। বহু মযবুত কেল্লা তারা এখানে নির্মাণ করেছিল। আর এসব কেল্লার কারণে খায়বারকে দুর্ভেদ্য ও অজেয় বলে মনে করা হ'ত এবং আরব গোত্রগুলো এদের উপর হামলা পরিচালনা করতে ইতস্তত করত।

খায়বার কংকরময় ভূমির যে নিম্নভাগে অবস্থিত তা বাকী পাহাড় থেকে আলাদা যায়দিয়া নামক উপত্যকার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এটা সেখানকার অন্যান্য উপত্যকা থেকে সর্ববৃহৎ। কংকরময় ভূমির উপরিভাগ

৪—

সমতল ময়দান। এর দৈর্ঘ্য প্রায় চারশো গজ এবং প্রস্থ দু'শো গজ। এখানে প্রাচীর বেষ্টিতত একটি কূয়া রয়েছে। বিপদ-মুহূর্তে কূয়াটি খুবই উপকারী এবং কার্যকর প্রমাণিত হয়ে থাকে। সঞ্চিত পানি প্রচুর। প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর এবং মযবুত দরজার কারণে জায়গাটি খুবই নিরাপদ। ঝরনার পানি ঈষদুষ্ণ এবং গন্ধকযুক্ত, কিন্তু লবণাক্ত নয়। যমীন বেশ লবণাক্ত। যদি পর্যায়ক্রমিক চাষ-বাসের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অল্প দিনেই এ অবস্থার উন্নতি ঘটবে। কৃষিকর্মের জন্য বলদ ব্যবহার করা হয়। একমাত্র দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া যখন বেদুঈন গোত্রগুলো এই এলাকায় এসে চাষবাস করতে থাকে—উট খুবই কম ব্যবহৃত হয়। আবহাওয়া খারাপ। জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত ব্যাপক ও সাধারণ ব্যাপার। এজন্য জমির আরব মালিকগণ মদীনা মুনাওয়ারায় বসবাস করেন এবং চাষ-বাস হাবশী গোত্রগুলো করে। আর তাদেরকে আরবের কৃষক নামে অভিহিত করা হয়। এই এলাকায় আরব বেদুঈনদের অধিকারকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তারা এখানকার চারণ ক্ষেত্রে নিজেদের পশু-পাল চরাতে পারে। দুর্ভিক্ষের সময় হাবশী কৃষকেরা আনন্দের সঙ্গে নিজেদের যমীনের অর্ধেক অংশ তাদেরকে কৃষির জন্য দিয়ে দেয়। কিন্তু মরু প্রান্তরে যখন ফসলের চারা গজায় তখন বেদুঈন গোত্রগুলো ফিরে যায় এবং খেজুরের যে নতুন গাছ লাগায় অথবা যে ফসল বপন করে তার মূল্য টাকা-পয়সা কিংবা ফসলের একটা অংশের বিনিময়ে নিয়ে নেয়। কয়েক হাজার হাবশীর এখানে বসতি রয়েছে। তারা খেজুর ও খাদ্যশস্যের আবাদ করে। ভূমির মালিক শুধুমাত্র আরব গোত্রগুলো। অন্যেরা ভূমি ক্রয় করে এর মালিক হতে পারে না।

পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোতে বিশেষ করে পশ্চিম দিকে কিছু ভূখণ্ড রয়েছে; সেখানে হাবশীরা নিজেদের বসতি স্থাপন করেছে। এসবের মালিক হাবশীরাই যারা এখানে ক্ষেত-খামারের কাজ করে।

এখানে বিশেষভাবে খেজুরের ব্যবসা চলে থাকে। কিন্তু খেজুরের মান খুব উন্নত নয়। কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে জোয়ার, ভুট্টা, যব ইত্যাদি। বেদুঈন গোত্রগুলো এসব খরিদ করে নিয়ে যায়। বসন্ত মওসুমে এখানে একটি মেলা বসে। কয়েক দিন পর্যন্ত এ মেলা চলে। এতে দূর-দূরান্তরের বণিকেরা কেনা-বেচার জন্য আগমন করে। দারিদ্র্যের ছাপ গোটা এলাকা জুড়ে। হাবশীরা খুবই হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করে নিজেদের জীবিকা উৎপন্ন করে।

দক্ষিণ দিকের এলাকা

এই এলাকা ২৪ ডিগ্রী উত্তর 'আরদু'ল-বালাদ থেকে ২০ ডিগ্রী উত্তর 'আরদু'ল-বালাদ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর দক্ষিণ দিকে আসীর এলাকার আরম্ভ যেখানে হেজাযের সেই বিভক্তি, যা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ সমুদ্রোপকূলীয় ভাগ, উপকূল বরাবর পাহাড়, মালভূমির প্রান্তরময় এলাকা এবং বড় বড় পাহাড় এখানে বিলকুল আলাদা দৃষ্টিগোচর হয়। অবশ্য সমুদ্রসংলগ্ন গিরিশ্রেণীর উচ্চতা অত্যন্ত স্বল্প হয়ে যায়। বিশেষ করে রবূগ (Rabugh) থেকে মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত হাজী কাফেলার রাস্তা অত্যন্ত ধুলিময়। এর উচ্চতা দু' হাজার ফুটের বেশী নয়। কিন্তু এটা যখন জাবাল-ই-সা'দিয়া (Jebel-e-Sa'diyah) পর্যন্ত পৌঁছয়, যা জেদ্দা থেকে মক্কার পথে দক্ষিণ দিকে কিছু দূরে অবস্থিত, তখন এর উচ্চতা আবার বেড়ে যায়। উপকূলের উত্তর ভাগ কৃষিযোগ্য। জেদ্দা এবং এর উত্তর থেকে রাবূগ পর্যন্ত ভূমি উর্বর হবার কারণে কতকগুলো ছোট ছোট বসতি এবং খেজুর বাগান রয়েছে। দক্ষিণ দিকে মালভূমি। মালভূমি প্রান্তর ধূলো-বালিতে ভরপুর। অবশ্য ওয়াদী-ই-ফাতিমা (Wadi-e-Fatima)-র যে ভূখণ্ড মক্কার উত্তর থেকে বের হয়ে জেদ্দার দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত, তা অত্যন্ত উর্বর। এই ভূখণ্ডে কয়েকটি খেজুর বাগান রয়েছে এবং এর একটা বিরাট উল্লেখ-যোগ্য অংশই চাষের অধীন। মদীনা থেকে প্রায় এক শ' মাইল পর্যন্ত পাহাড়ী এলাকায় কয়েকটি আবাদযোগ্য উর্বর স্থান রয়েছে। এটা যতই মক্কার দিকে আসতে থাকে ততই হতে থাকে বিরান, অনুর্বর ও অনাবাদী। কিন্তু জাবাল-ই-কোরা (Jebel–e–Qura) থেকে শ্যামল-সবুজের রাজত্ব শুরু হয়। আর তায়েফে তো এই এলাকা শাশ্বত বেহেশ্‌তরূপে ধরা দেয়। তায়েফের দক্ষিণ দিককার যমীনও বেশ উর্বর। এই ভূখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ শহর ও জন-পদের বিবরণ এখানে দেওয়া গেল।

মক্কা মু'আজ্জমা

এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে। মক্কা ইসলামী বিশ্বের ধর্মীয় ও রূহানী কেন্দ্র। এটি একটি গভীর উপত্যকায় অবস্থিত যার চতুর্দিকে কয়েক শ' ফুট উঁচু পাহাড় প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। এজন্যই

সম্ভবত কোন যুগেই এর হেফাজতের জন্য চারদিকে দেওয়াল ঘেরা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়নি। উপত্যকার তিন দিকের রাস্তা রুখবার জন্য প্রাচীন যুগে প্রাচীর ছিল বটে, কিন্তু এখন আর তা দৃষ্টিগোচর হয় না। অবশ্য এর তিনটি দরজার নাম আজও লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে।

মদীনার রাস্তা এবং জেদ্দা থেকে দক্ষিণ দিকের রাস্তা দু'টোই জাবাল-ই-হিন্দী (Jabal-e-Hindi)-র ছত্রচ্ছায়ায় মিলে বাব আল-'উমরাহ (Bab Al-'Umrah) অর্থাৎ পশ্চিম দিক দিয়ে শহরে পেঁছয়। য়ামনের রাস্তা দক্ষিণ দরজা দিয়ে। মিনা ও 'আরাফাতের রাস্তা উত্তর দরজা বাব আল-মু'আল্লা (Bab-El-Mu'alla) এবং শহরের উঁচু অংশ থেকে এসেছে। মক্কার চতুর্দিকে কয়েকটি নতুন বসতি রয়েছে; যেমন, বেদুঈনদের মারকায (কেন্দ্র), মিসরীয় ক্যাম্প, সিরীয় হাজীদের ছাউনী ইত্যাদি।

শহরের দৈর্ঘ্য প্রায় তিন মাইল আর প্রস্থ হবে প্রায় দু' মাইলের মত। পবিত্র স্থানসমূহ—যেমন, কা'বা শরীফ ও মাদরাসা—ইত্যাদি শহরের দক্ষিণ অংশে পড়েছে। ছোট্ট কাটা খালের সাহায্যে 'আরাফাত পর্বত থেকে পানি এসে থাকে যা শহরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। পানির পরিমাণ যথেষ্ট এবং সুপেয়ও বটে। যমযম কূপ এখানেই অবস্থিত। এর গভীরতা প্রায় চল্লিশ ফুট। এর পানি প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ হাজী দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যায়।

মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকার জমি একেবারেই অনুর্বর। এজন্য কৃষি কাজ খুব কম হয়ে থাকে। খেজুর বাগানও হাতে গোনা কয়েকটি। শহরের প্রয়োজনীয় সব ধরনের খাদ্য-দ্রব্য বাইরে থেকে আসে। কোন শিল্প নেই। জনগণের জীবিকা হজ্জ্ব ও 'উমরাহ উদযাপন উপলক্ষে আগত মুসাফির ও পর্যটকদের খেদমত, পথ-প্রদর্শন ও তাদের মাল-মাত্তা বহনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যিয়ারতকারী মুসাফির সারা বছর ধরেই দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে থাকে। হজ্জের মৌসুমে তো কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হয়। শহরের অধিবাসী এক লক্ষের মত হবে।

মক্কা মু'আজ্জমার আবহাওয়া যদিও খুব শুষ্ক ও গরম, কিন্তু স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে বেশ ভালো। সুউচ্চ পাহাড়-পর্বতে ঘেরা হবার কারণে বাতাস খুব কম। ধূসর ও রুক্ষ পাহাড়ের কারণে প্রচণ্ড গরম পড়ে। রাত্রিকাল থাকে অধিকাংশই ঠাণ্ডা। সারা বছরে দু'একবার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

কিন্তু বৃষ্টির পরিমাণ অধিক হলেই কয়েক ফুট পর্যন্ত পানি জমে যায়। অতঃপর শহরের দক্ষিণ দরজা দিয়ে তা ময়দানের দিকে চলে যায়। আর সেই সঙ্গে বয়ে নিয়ে যায় শহরের যত আবর্জনা।

হেজাযের অধিবাসী

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে হেজায ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা কিছুটা বিস্তারিতভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। যাঁরা হেজাযের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন কিংবা যাঁরা ইংরেজী ভাষা জানেন না, তাঁরা এর থেকে দরকারী তথ্য পেতে পারেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আরববাসীদের ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবিকার উপায়-উপকরণ, জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

সাংস্কৃতিক ও বংশগত অবস্থা

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরববাসীদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ছিল শতধা-বিচ্ছিন্ন। তারা বিভিন্ন খান্দান, গোত্র ও দলে ছিল বিভক্ত। সামগ্রিক কোন ব্যবস্থাপনা তাদের ছিল না। প্রতিষ্ঠিত কোন রাষ্ট্রও ছিল না। প্রতিবেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর ভয়ে তারা সদা সন্ত্রস্ত থাকত। তাদের জীবন-যাপন চলত বহু কষ্টে। উট ও ভেড়া-বকরীর দুধ এবং খেজুর ব্যতীত আর কোন প্রকার খাদ্য সহজলভ্য ছিল না। যবের রুটী ধনবান লোকের পক্ষেও মিলানো কষ্টকর ছিল। 'জোর যার, মুল্লুক তার' এই ছিল তাদের একমাত্র আইন। গোত্রগুলো ছিল পরস্পর-যুদ্ধমান। যদিও আরবী ভাষা-ভাষী লোক সে যুগেও এশিয়া ও আফ্রিকার একটা বিরাট অংশে বসবাস করত, কিন্তু বিশৃংখলা, অনৈক্য ও গৃহযুদ্ধের কারণে তাদের কোন রাষ্ট্রনৈতিক শৃংখলা ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ছিল না। বিভিন্ন ধর্ম আরবী ভাষা-ভাষীদেরকে আলাদা গোত্র ও জাতি-সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে রেখেছিল। যে সময় হুযূর আকরাম (সা) আবির্ভূত হন, আরবের অধিবাসীরা তখন অত্যন্ত দীন-হীন ও অধঃপতিত অবস্থায় জীবনযাপন করছিল। আর এই হীনতা ও অধঃপতিত অবস্থা তাদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। তিনি তাদেরকে এই অধঃপতন থেকে উন্নতি ও সৌভাগ্যের চরম মার্গে

নিয়েই পৌঁছাননি বরং ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও সংহতির ইসলামী সম্পর্কে সম্পৃক্ত করে তাদেরকে এমনিভাবে দুনিয়ার বুকে চিরঞ্জীব রেখে গেলেন যে, আজ দুনিয়ার বুকে তাঁর নাম নেবার মত লক্ষ নয়, কোটি কোটি জনসমষ্টি বিদ্যমান।

সাধারণত ধারণা করা হয় যে, আরবের সকল অধিবাসীই আরব। এ ধারণা ঠিক তেমনি যে, য়ূরোপের সমস্ত লোকই বুঝি ইংরেজ। তেমনি আরবের সমস্ত অধিবাসীকেই আরব মনে করা হয়ে থাকে। অথচ য়ূরোপেও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর আবাস রয়েছে। আরবদের ভেতর যদিও এ ধরনের আলাদা জাতি-সত্তা নেই, তবুও তাদের ভেতর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর লোক বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বর্তমান রয়েছে, ঠিক যেমনি বর্তমান রয়েছে এই উপমহাদেশে। যেমন, যে সমস্ত আরব মক্‌কা মু'আজ্জমার মত শহরের অধিবাসী, তারা কোন এক যুগে খাঁটি আরব বংশোদ্ভূত ছিল। কিন্তু আজ তারা সেই সমস্ত জাতিগোষ্ঠীর ভেতর মিশ্রিত হয়ে গেছে যারা ইসলামের পূর্বে ও পরে হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করত এবং যাদের মধ্যে অনেক লোকই বিয়ে-শাদী করে এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যেত। কিন্তু সে সমস্ত অধিবাসী যারা দেশের অভ্যন্তরভাগে বাস করত, যারা বাইরের লোকদের থেকে ছিল সম্পূর্ণ সম্পর্কমুক্ত, তাদের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই ছিল এই মিশ্রণের বাইরে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এই কারণে যে, সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীর শিরা-উপশিরায় একটা দীর্ঘকাল ধরে হাবশী রক্ত মিশ্রিত হচ্ছিল।

আরব জাতিগুলোর নিকট তাদের বংশ-তালিকা অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। তারা সগৌরবে নিজেদের পূর্ব-পুরুষদের আলোচনা করে থাকে।

মূলের দিক দিয়ে আরবের সকল কবিলাকে (গোত্র) তিনটি প্রধান কবিলার শাখা মনে করা হয়। কবিলা তিনটি হ'ল ঃ

বনী কাহতান

এই কবিলা সর্বদা য়ামনে বসবাস করত। এই শাখার মূল কবিলা-ই-'আরিবা, যারা নির্ভেজাল ও অবিমিশ্র আরব বলে দাবি করে। বর্ণিত আছে যে, কাহতান—যিনি নূহ ('আ)-এর পৌত্র সামের পুত্র, 'আরবী ভাষার জনক।

বনী 'আদনান

এরা হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-এর বংশধর। এদেরকে মিশ্রিত বংশ বলা হয়। কেননা এরা যখন মক্কায় আসে তখন তাদের ভেতর কতক লোক য়ামনের মহিলাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এজন্য তাদের বংশধরদেরকে 'মুতা'আরিবাঃ' (শংকর বা মিশ্রিত) নামে ডাকা হতে থাকে।

বনী খুযা'আ

এরা হযরত ইসমা'ঈল ('আ)-এর ভ্রাতা ফারওয়ার বংশধর বলে মনে করা হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল এদের পেশা। এই কবিলার লোকেরা ইরান প্রভৃতি দেশের মহিলাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এজন্য আরববাসীরা এদের শাখাকে 'আজমী' বলে এবং এদেরকে বিশ্বাসের অযোগ্য এবং ঝগড়াটে দাঙ্গাবাজ মনে করে। তাদেরকে সম্মানের চোখেও দেখা হয় না। য়ামনের আরবদের সম্পর্কে তাদের অভিযোগ এই যে, তারা ইরানী ভাষার শব্দ-ভাণ্ডার শামিল করে আরবী ভাষাকে ভেজাল বানিয়ে ফেলেছে।

আরব জাতি-গোষ্ঠীর ভেতর এই কবিলাগুলো মূল ও বুনিয়াদ হিসেবে মর্যাদার দাবিদার এবং এদেরই শাখা-প্রশাখা সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

মশহুর কবিলাসমূহ

এখন সে সব কবিলার আলোচনা করা হচ্ছে যারা হুযুর আকরাম (সা)-এর সহযোগী ও বিরুদ্ধবাদী হিসাবে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল।

আরব কবিলাগুলোর ভেতর বিশিষ্ট আসন ও সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী কুরায়শ বংশীয়েরা। মক্কার ব্যবস্থাপনা এবং কা'বার খিদমত ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব এদেরই হাতে ন্যস্ত ছিল। কুরায়শদের বিভিন্ন পরিবার ও গোষ্ঠী বিভিন্ন খিদমত আঞ্জাম দিত। আরববাসীদের যদি কোন আশ্রয়-স্থল ও কেন্দ্র থেকে থাকে তবে তা এই কা'বা এবং এটি যে শহরে অবস্থিত

তার নাম মক্কা। আর এটার আশ্রয়স্থল ও কেন্দ্র হিসাবে প্রাপ্ত মর্যাদা ও সম্মানের কারণেই কুরায়শরা তামাম আরব কবিলার ভেতর সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হিসাবে গণ্য হ'ত এবং এরই কারণে মক্কার বাণিজ্যিক গুরুত্ব ছিল এত বেশী প্রতিষ্ঠিত। কুরায়শদের মশহূর খান্দানগুলো হচ্ছে ঃ

বনী হাশিম, বনী উমায়্যা, বনী নওফল, বনী 'আবদুদ্দার, বনী আসাদ, বনী 'আদী, বনী মাখযূম, বনী তাইম, বনী জুমাহ, বনী সাহম। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত পদগুলি ছিল মৌরসী যার অধিকার খান্দানের সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠের উপর ন্যস্ত হ'ত।

বনী হাশিম

বনী হাশিমের নিকট কা'বা ঘরের চাবি রক্ষিত হ'ত। এর সর্দার কা'বার তত্ত্বাবধান ও হেফাজতের যিম্মাদার হতেন এবং তারাই বায়তুল্লাহ্‌র দ্বার খুলে যিয়ারতকারীদের ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। এদের দায়িত্বে ন্যস্ত অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ খিদমত ছিল যিয়ারতকারী ও মুসাফিরদের পানি পান করানো। সে যুগে পানির ছিল ঘাটতি, সেজন্য এই খিদমত ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বনী উমায়্যা

বনী উমায়্যা যুদ্ধকালে কুরায়শদের পতাকা বহন করত। এই পতাকায় থাকত ঈগল পাখীর প্রতীক। এটা যখন যুদ্ধের ময়দানে নামানো হ'ত তখন এটারই যেন কার্যকর ঘোষণা হ'ত যে, কবিলার প্রতিটি শক্ত-সামর্থ্য, সুস্থ ও সঠিক স্বাস্থ্যের অধিকারী লোককে এ পতাকাতলে একত্রিত হওয়া দরকার। খান্দানের যিনি সর্দার তিনিই হতেন যুদ্ধের সিপাহসালার এবং তেজারতী কাফেলার নেতা।

বনী 'আবদুদ্দার

এরা হতেন দারু'শ-শূরা বা পরামর্শ কেন্দ্রের মুহাফিজ বা রক্ষক। এর অপর নাম ছিল দার-উ'ন-নদওয়া। এতে চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের লোকেরা নিজেদের

সামাজিক সমস্যাদির ব্যাপারে জরুরী সলা-পরামর্শ করার জন্য একত্রিত হতেন। এতদ্ভিন্ন এখানে বিয়ের অনুষ্ঠানাদিও সুসম্পন্ন করা হ'ত। মেয়েদের সাবালকত্বের বয়স চূড়ান্তভাবে বাছাই করার সময় সাবালকত্বের পোশাক পরিধান করানো হ'ত। এখানেই যুদ্ধের এলানও করা হ'ত। যুদ্ধের ময়দানে রওয়ানা হবার প্রাক্কালে গোত্রের পতাকা উন্মোচিত করা হ'ত এবং এখান থেকেই সৈন্যবাহিনী একত্রিত হয়ে দুশমনের মুকাবিলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'ত।

বনী নওফল

তারা দান-খয়রাতের অর্থ জমা করত এবং তা দ্বারা অভাবী ও দুঃস্থ লোকদের সাহায্য করা হ'ত। একে 'ইফাদাঃ' (পরোপকার) বলা হ'ত। ফসলের মওসুমে প্রতিটি ব্যক্তি তাদের আয়-আমদানির একটি নির্দিষ্ট অংশ বনী নওফলের সর্দারকে দিয়ে দিত।

বনী তাইম

এরা রক্তপণ ও জরিমানার অর্থ আদায় করত। এ জাতীয় যিম্মাদারী ছিল বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সে যুগে লড়াই-ঝগড়া সংঘটিত হ'ত প্রায়ই।

বনী জুমাহ

এই কবিলা সফর ও যুদ্ধে রওয়ানা হবার প্রাক্কালে ইস্তিখারা করত। কতক সময় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও ইস্তিখারা করা হ'ত। বিশেষ ধরনের তীরের দ্বারা লটারী বা ভাগ্য-পরীক্ষা করা হ'ত। অধিকাংশ সময় ইস্তিখারার ভিত্তিতে লড়াই পরিচালনা করা হ'ত কিংবা মুলতবী করে দেওয়া হ'ত।

বনী সাহম

বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তিকে গহনাপত্র বা নগদ অর্থ-কড়ি যা-ই কিছু দেওয়া হ'ত, এরা সে সবের হিসাব রক্ষা ও দেখাশোনা করত।

ব্যক্তিগত যিম্মাদারী ছাড়াও এসব খান্দান এব্যাপারেও যিম্মাদার হ'ত যে, কোন ব্যক্তি কা'বা ঘরে লড়াই-ঝগড়া, গালি-গালাজ এবং শোরগোল করে যেন একে অসম্মান না করতে পারে। যদি কোন কবিলা অথবা খান্দানের ভেতর কোন অভ্যন্তরীণ ঝগড়া-ফাসাদ হয়ে যেত তাহলে বাকী খান্দানগুলোর সর্দার আপোসে মিলেমিশে তা দূর করতে কোশেশ করত এবং বিবদমান পক্ষ তাদের হস্তক্ষেপ ও প্রদত্ত ফয়সালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত।

জীবন ও জীবিকা

ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও এসব খান্দানের জীবিকার উপকরণ ছিল ভেড়া-বকরী চরানো। উট এবং ভেড়া-বকরীর পাল চরানোর উদ্দেশ্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। দুধ, পনীর, খেজুর এবং মিলে গেলে যবের রুটির উপর দিন গুজরান করত। পশুর গোশ্‌ত ছিল তাদের বিশেষ খাদ্য। রাহাজানী, লুটমার এবং ফেতনা-ফাসাদকে তারা খুব বেশী খারাপ মনে করত না। প্রতিশোধ-স্পৃহা এবং ঈর্ষাপরায়ণতা ছিল তাদের অভ্যাস। মেয়েদেরকে সাধারণত তাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মেরে ফেলা হ'ত অথবা জীবিত দাফন করে ফেলত। বেশ্যাবৃত্তি ছিল উন্নতির চরম মার্গে। গৃহ-যুদ্ধ ছিল জীবনের একটা মামূলী ব্যাপার। কামজ প্রবৃত্তি-পূজা নৈপুণ্য ও শরাফতীর অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। মেয়েদের ভেড়া-বকরীর ন্যায় মনে করা হ'ত। মদ্যপান ছিল সাধারণ ব্যাপার এবং এর থেকেও বিস্ময়-কর ব্যাপার হ'ল এ সবকে দূষনীয় মনে করা হ'ত না; বরং লোকে এসব ব্যাপারে একে অন্যের প্রতিযোগিতায় বাজী ধরত এবং নিজের কুকর্মগুলিকে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করত। কিন্তু এর সঙ্গে খেলাধুলার প্রতিও তাদের শখ ছিল প্রবল। ঘোড়দৌড়, তীরন্দাযী, নেযাবাজী ও কুস্তি লড়াইয়ের প্রতি-যোগিতা হ'ত। প্রত্যেক কবিলার আলাদা আলাদা প্রতিমা ছিল। ধর্ম ও রসম-রেওয়াজের অনুসরণ করা হ'ত কঠোরভাবে। একারণেই অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাদের আলাদা ধর্মবিশ্বাসের কারণে লড়াই-ঝগড়া চলত। কবিলার সর্দারকে মনে করা হ'ত শ্রদ্ধার পাত্র। তার অনুসরণ ও আনুগত্য ছিল বাধ্যতামূলক এবং তার প্রভাব ও কর্তৃত্ব তার ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল হ'ত। জনসাধারণ কোনরূপ সংবিধান কিংবা আইন-কানূনের

নামও শোনেনি কোন দিন। শক্তিশালী ও যবরদস্ত ক্ষমতাধরের প্রতিটি কথাই ছিল অনুমোদিত। মক্কার বাইরে হজ্জ মওসুমে প্রতি বছর একটি বিরাট মেলা বসত। এতে আরবের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে লোক এসে জমায়েত হ'ত। নিজ নিজ দেব-মূর্তির পূজা করত এবং মেলায় কেনাবেচা করত। এর ফলে মথার রওনক যেত অনেক বেড়ে এবং তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও ঘটত প্রসার।

গ্রামের লোকদের রসম-রেওয়াজ, আচার-অভ্যাস ও চাল-চলন শহরের লোকদের থেকে ছিল স্বতন্ত্র। তাদের আযাদী ছিল সাংস্কৃতিক বন্ধন থেকে অপরিচিত, জীবনের টানা-পোড়েনের কারণে অত্যন্ত পাষাণ-হৃদয় এবং কঠোর পরিশ্রমী, কষ্ট-সহিষ্ণু, স্বল্প আহার্যের উপর বেঁচে থাকায়, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুসীবতে অভ্যস্ত। আহার্য দ্রব্যের ন্যায় পোশাক-আশাকের ব্যাপারেও তারা অত্যন্ত সাদা-সিধে প্রকৃতির ছিল।

য়াছরিব (মদীনা)

এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রাচীনকাল থেকে য়াহূদীরা বসবাস করছিল। তারা সিরিয়ার খৃস্টানদের জুলুম ও শক্তি প্রয়োগের কারণে এখানে পালিয়ে এসেছিল। এদের তিনটি গ্রুপ ছিল। তন্মধ্যে একটি ছিল বনী নাযীর গোত্র। তারা খায়বার উপত্যকায় বসবাস করত। তিনটি গোত্রই ছিল পেশায় কৃষিজীবী। তারা সুদের কারবার করত। তাদের বহু জমাজমি ও বাগান ছিল। এদের ছাড়া আরো কতিপয় ক্ষুদ্র য়াহূদী গোত্রের বসতি ছিল। কিছু কাল পর আরব কবিলা বনী কাহতানের আওস ও খাযরাজ গোত্র য়াছরিবে আগমন করে। য়াহূদীরা ছিল আল্লাহ্র প্রত্যাদিষ্ট কিতাবের অধিকারী। প্রথম দিকে য়াহূদীরা বোৎপরস্ত দু'টি খান্দানের সঙ্গে মিলেমিশেই বসবাস করে আসছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মযহাবী (ধর্মীয়) বিভিন্নতা ও পার্থক্যের কারণে একে অপরের দুশমনে পরিণত হয়। য়াহূদীরা নিজেদের ঐক্য ও সংহতি এবং সম্পদ ও প্রাচুর্যের কারণে তাদের উপর জয়যুক্ত হয়। য়াহূদীদের জুলুম-সিতম ও অশান্তি সৃষ্টি যখন সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন আওস ও খাযরাজ গোত্র নিজেদের বিবাদ ভুলে গিয়ে পরস্পরে একতার বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও সংঘবদ্ধভাবে তাদের মুকাবিলা করে এবং তাদের

পরাজয় বরণে বাধ্য করে। কিন্তু তাদের এ বিজয় চূড়ান্ত ছিল না। সুতরাং উভয় পক্ষ বরাবরের মতই যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। এই কাহতান বংশের লোকেরাই মক্কার বাৎসরিক মেলার সুযোগে হুযূর আকরাম (সা)-এর যিয়ারত লাভের সৌভাগ্য হাসিল করে য়াছরিববাসীদের ভেতর সর্বাগ্রে ঈমান এনেছিল। এভাবেই ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম য়াছরিব পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং এরাই রসূলুল্লাহ (সা)-কে য়াছরিব আগমনের দা'ওয়াত জানিয়েছিল।

বেদুঈনদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য

এখন আরবের মরুবাসীদের বিশেষ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা করা হচ্ছে। আর তা যে কোন জাতির জীবনে অপরিহার্য অঙ্গ এবং তাদের ধ্যান-ধারণা, আবেগ-উদ্দীপনা ও উত্থান-পতনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত যেন তা থেকে তাদের মযহাব, জীবন-দর্শন ও জীবন-সাধনার বিভিন্ন প্রকাশ ও সোপান থেকে এ কথা পরিমাপ করা যেতে পারে তারা উন্নতি কিংবা অবনতির কোন্ স্তরে অবস্থান করছে।

মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জীবনের সকল সংযোগ সূত্র কতিপয় প্রাকৃতিক স্বভাব এবং এমন সব উপলব্ধিহীন গুণাবলী দ্বারা সম্পৃক্ত যা সে জন্মগতভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে থাকে। একেই প্রকৃতি বা স্বভাব বলা হয় এবং এই স্বভাব তথা প্রকৃতিই তার আবেগ-অনুভূতি, ক্রিয়া-কলাপ ও কার্যাবলীর গোটা সীমারেখা নির্দিষ্ট করে। যেভাবে ব্যক্তির প্রকৃতি ও স্বভাব এবং তার মেযাজ বিভিন্ন হয়ে থাকে এবং সেই প্রকৃতি তথা স্বভাবে ও মেযাজের সংযোগ সাধনে যেখানে অন্যান্য বিষয়বস্তু শামিল হয়ে থাকে সেখানে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতায় উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ প্রভাবসমূহের কার্যকারিতাও বিরাট ভূমিকা পালন করে।

এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'ল এই যে, দুনিয়ার যে অংশই সবুজ শ্যাম-লিমাময় এবং আল্লাহ-প্রদত্ত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর, যেখানে জীবিকা অর্জন অপেক্ষাকৃত সহজ, সেখানকার লোকেরা স্বাভাবিকভাবেই আরাম-প্রিয় ও দুর্বলমনা হয়ে থাকে। তাদের ভেতর বিপদ মুসীবত ও কষ্ট-কাঠিন্য বরদাশ্ত করবার মত মৌলিক উপকরণ কম থাকে। জীবন সংগ্রামে তাদেরকে পশ্চাতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এর বিপরীতে দুনিয়ার যে সব

অঞ্চল শুষ্ক ও অনুর্বর, প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য যেখানে খুব কম উৎপন্ন হয় এবং জীবনোপায় কঠিন ও আয়াসসাধ্য, সেখানকার লোকেরা কঠোর পরিশ্রমী, উদ্যমী, সহনশীল, নির্ভীক, সাহসী, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে থাকে এবং তাদের গোটা জীবনটাই টানাটানি ও কঠোর চেষ্টা-সাধনার ভেতর যাপিত হয়ে থাকে।

এমনিতেই তো আরবের সকল অধিবাসীই অন্য যূথ বা দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত; কিন্তু মরুবাসী বেদুঈনরা স্বদেশী শহুরে অধিবাসীদের থেকেও ভিন্ন প্রকৃতির। শহুরে সংস্কৃতির প্রতি তাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা চিরকালের। মুক্ত-আযাদ ও বাধা-বন্ধনহীন মরু জীবনকে সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দিয়েছে তারা সব সময়ই। গ্রহণ ও বর্জন এবং পসন্দ ও অপসন্দের ধারণা তাদের একেবারে প্রকৃতিগত। কিন্তু এ থেকে একথা বোঝাও ঠিক হবে না যে, প্রখর প্রতিভা ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে তাদের ভেতর কোন ত্রুটি আছে কিংবা তারা কোন প্রকার মানবেতর শ্রেণীর মখলূক। এতে সন্দেহ নেই যে, তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সাংস্কৃতিক উন্নতির কোন পাল্লায় যদি মাপা হয় তবে তাদের একেবারেই প্রাথমিক স্তরের দৃষ্টিগোচর হবে। আধা বন্য মরু-জীবন যে সীমাবদ্ধ জীবনের জন্ম দিয়েছে তারা তার বাইরে এক কদম ফেলতেও নারাজ। কিন্তু বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার দিক দিয়ে তারা দুনিয়ার তামাম রাখাল ও মরুবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভেতর অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য। তাদের স্বভাব ও চাল-চলন তথা রীতিনীতি বন্য প্রকৃতির; কিন্তু তাদের চিন্তা ও কল্পনার জগত বন্যতা ও বর্বরতা থেকে মুক্ত। যে অবস্থা ছিল আজ থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে—আজও তা তেমনি আছে। একমাত্র মযহাব ভিন্ন আর কোন কিছুরই তাদের সামান্যতম পরিবর্তনও হয় নি। সবুজ ও উর্বর ভূখণ্ডে স্থায়ী ধরনের লোক বাস করে এবং ক্ষেত-খামার ও কৃষিকর্মের দ্বারা রুটি-রুযী উৎপন্ন করে থাকে। কিন্তু শুষ্ক অনুর্বর ও বালুকাময় মরু প্রান্তরে শুধুমাত্র বেদুঈনরাই থাকে। তারা ভিন্ন আর কেউ থাকেও না, থাকতে পারেও না। বেদুঈন জীবনের পেশা দু'টি ঃ এক, পরস্পরে লড়াই-ঝগড়া করা; দুই, ভেড়া-বকরী ইত্যাদি পালন। লড়াইয়ের ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত নির্ভীক, সাহসী ও রক্ত-পিপাসু। যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্ষতিপূরণ কিংবা রক্তপণ আদায়ের মাধ্যমে তার নিষ্পত্তি ঘটে, তারা লড়াই বন্ধ করে না। কিন্তু যেখানে তারা যুদ্ধবাজ ও রক্ত-পিপাসু, সেখানে তারা আনুগত্য পোষণে ও হুকুম-বরদারীতেও অনন্য। যদি তারা খেয়ালী ও সন্দেহপরায়ণ

হয়ে থাকে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তারা গর্বিতও বটে। তাদের প্রকৃতি নেহায়েত সাদামাটা ও নির্মল। ‘আকীদা ও বিশ্বাস অত্যন্ত দুর্বল এবং শিশুদের মতই তারা নেহায়েত কৌতূহলী। কিন্তু যখন কোন খেয়াল কিংবা ‘আকীদা-বিশ্বাস তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায় তখন কোন বিরাট থেকে বিরাটতর বাধাকেও তারা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ওয়াদা রক্ষায় ও সংকল্পে অটল এবং বিরাট থেকে বিরাটতর কর্মের জন্যও তৈয়ার। এক দিকে মুক্ত আযাদ, দানশীল ও উদার হৃদয়, অপরদিকে ক্রোধের বেলায় দিগ্বিদিক জ্ঞানহীন ও তিরিক্ষি মেযাজ। হস্তপদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি তাদের চোস্ত ও সুস্থ। সাহসিকতা ও আবেগ-উদ্দীপনার ক্ষেত্রে বৃদ্ধেরাও যুবকদের সমগোত্রীয়। কোন বৃদ্ধ বেদুঈন কখন রেকাবে পা রেখে ঘোড়ায় সওয়ার হয় না; প্রত্যেকেই লাফ দিয়ে সওয়ার হয়ে থাকে। সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে তারা নজীরবিহীন। দুঃখ-কষ্ট ও তকলীফ-মুসীবতে অভ্যস্ত। প্রতিশোধ গ্রহণের বেলায় এতটাই নির্দয় ও নির্মম যে, ক্ষমা ও দয়া-ধর্মের নামও যেন তারা শোনে নি। কিন্তু দানশীলতা ও মেহমানদারীর ক্ষেত্রে আবার এতখানি আগুয়ান যে, দুশমনও যদি আশ্রয় গ্রহণে এগিয়ে আসে তবে যে কোন মূল্যে তাকে হেফাজত করবে, প্রতিপালন করবে। দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং চিন্তার ঐক্য-নজরে মান-‘ইযযতের একটি বিশেষ মানদণ্ড কায়েম করে দিয়েছে। শরাফত, ভদ্রতা ও ‘ইয্যত-আবরূর মাধ্যম ছিল তলোয়ার ও মেহমানদারী। যদি এ সবকে পরস্পর-বিরোধী বিষয়ের সমাবেশ বলা হয় তাহলে ভুল বলা হবে না। দানশীলতা ও মেহমানদারীর প্রেরণা ও আবেগের সঙ্গে লুটতরাজ, হত্যা ও ধ্বংস, নির্দয়তা ও খুন-খারাবীর সঙ্গে আত্মীয়তা ও প্রশস্ত হৃদয়; পরস্পর-বিরোধিতার এর থেকে বড় নজীর আর কী হতে পারে! কিন্তু যদি পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার কার্যকারণ সামনে রেখে আত্মবিশ্লেষণ করা হয়—তবে কোন কিছুই আশ্চর্য ও অদ্ভুত মনে হবে না। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও রুক্ষতা, উৎপাদনের স্বল্পতা, জীবন উপকরণের ঘাটতি, রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলার অভাব একত্রে মিলে জোর-যবরদস্তি এবং গ্রহণ ও বর্জনের এমন একটি বাধ্যতামূলক ও অনিবার্য ভুলের জন্ম দিয়েছে যে, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে যা ন্যায়-অন্যায়, জায়েয-নাজায়েয, ঠিক-বেঠিক এবং হালাল-হারামের সকল সীমারেখাই একে অন্যের সঙ্গে ঘুলিয়ে গেছে। যদি এভাবে ঘুলিয়ে না যেত তাহলে আরবদের ভেতর কেবল হয়তো মন্দেরই প্রকাশ ঘটত কিংবা ঘটত শুধুই ভাল ও উত্তমের

প্রতিফলন। কিন্তু পরিবেশের প্রভাব উভয় ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ হ'ত বিধায় এরা পরস্পর-বিরোধী দোষ-গুণের সমাহারে গড়ে উঠেছে এবং বিবেকের স্বাভাবিক দাবি মন্দগুলোকে ভালো দিয়ে পরিমাপ করার অবকাশ সৃষ্টি করে বীরত্ব ও মেহমানদারী এবং দানশীলতা ও প্রশস্ত হৃদয় ইত্যাদি গুণাবলীকে জীবিত রেখেছে।

বেদুঈনদের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ তাদের আযাদী। তারা শহরে এবং গ্রামের অধিবাসীদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে। কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র তাদেরকে পরাভূত ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করতে পারেনি। আরবরা অবশ্য পরাজিত হয়েছে, কিন্তু তাদের দেশ গোলামে পরিণত হয়ে থাকেনি। তারা তাদের ব্যক্তি-সত্তাকে প্রতিটি যুগে এবং সর্বাবস্থায় বজায় রেখেছে। তাদের তমদ্দুন, তাদের ভাষা ও তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি সকল বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত রয়েছে।

ইসলামের প্রভাব

ইসলামের বিপ্লবী ঝাণ্ডার নিচে একত্র হয়ে আরব যে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী সম্পাদন করেছে, যেরূপ দ্রুততার সঙ্গে একটি বিশ্বকে অভিভূত ও পরাভূত করেছে, তার পেছনে যেমন ছিল ইসলামের জোশ ও প্রেরণা এবং ঈমানী কুওত, তেমনি ছিল তাদের আত্মস্বার্থের কারণে লড়াই করে মরবার জযবা, যা তাদের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উত্তরাধিকার সূত্রে চলে আসছিল। নির্ভীকতা, সাহসিকতা এবং বীরত্ব ও বাহাদুরী তো ছিলই, ইসলাম তার উপর শান দিয়ে এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে প্রতিদান ও পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে তাকে জিহাদ ও অগ্রগামী হবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে। বদান্যতা ও প্রশস্ত হৃদয় থেকে সৈনিকসুলভ বীরত্বের মহামূল্যবান সম্পদ উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত হয়। আর য়ূরোপ ও আমেরিকার জাতিগোষ্ঠী তাকে অনুসরণীয় অনুকরণীয় হিসাবে গ্রহণ করে। কিন্তু মনগড়া কল্পনা, সন্দেহ ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে বেশী দিন তারা ভারসাম্যের সংকীর্ণ পথের উপর টিকে থাকতে পারে নি। শুরু হ'ল গৃহযুদ্ধ। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রে ভ্রমণ ও অবস্থাদির বিস্তারিত পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ যে, আরবরা বিশ্বের শরীফ ও মর্যাদাবান

জাতিগোষ্ঠীর ভেতর সর্বাপেক্ষা শরীফ কওম। আধুনিক গবেষণা ও পর্যা-লোচনার দ্বারা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের ধূলোমাটি থেকে খনন করে বের করা তমদ্দুন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ইতিহাস যেমন নীরব, তেমনি সে আরবের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পর্কেও নীরব। বস্তুত এই তমদ্দুন ছিল হযরত রসূল করীম (সা)-এর যুগ থেকে দূরতম অতীতের তমদ্দুন। হুযূর আকরাম (সা)-এর যুগে আরববাসী উন্নত শ্রেণীর ভাষা, কাব্য ও সাহিত্য সম্পদের মালিক ছিল। কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের এই ভাণ্ডার অল্পদিনেই একেবারে হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়ে যায় নি। তাদের সাংস্কৃতিক চেতনা শতাব্দীর পর শতাব্দীর দীর্ঘপথ-পরিক্রমায় তাকে এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়েছিল যে, তারা প্রায় দু'হাযার বছর থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের কারণে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সংস্কৃতি-বান জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। এ ধরনের যোগাযোগ সব সময়ই জাতীয় উন্নতি ওঅগ্রগতির সহায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু আরবের লোকেরা নিজেদের অর্জিত যোগ্যতা দ্বারা জাতীয় সম্পদের ফুলবাগিচায় এমনই কর্ষণ করেন যে, আত্মস্বার্থ ও বাস্তব কর্মের জগতে তারা উন্নত শ্রেণীর ব্যক্তিসত্তার অধিকারী হয় এবং ব্যক্তিসত্তা ব্যক্তি ও সমাজ উভয় জীবনের বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর হিসাবে বিরাজমান থাকে।

সমর-কৌশল

আরববাসীরা জন্মগতভাবেই যুদ্ধবাজ। কিন্তু জীবনের অন্য পদ্ধতিগুলোর উপর যেমন পরিবেশের ছাপ রয়েছে ঠিক তেমনি তাদের যুদ্ধপদ্ধতিও দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং তাদের স্বাভাবিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তারা কখনো এক স্থানে স্থির থেকে লড়াই করত না, সব সময়ই পশ্চাদ-পসরণের রণকৌশলে তারা যুদ্ধ করত—আজকাল যাকে গেরিলা যুদ্ধ বলা হয়। প্রাচীনকালে মিসর ও সিরিয়ার মধ্যে অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে আরবের লোকেরা কখনো সিরিয়া আবার কখনো-বা মিসরীয়দের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের স্বল্পতার কারণে যেহেতু তারা লুটতরাজ করত এবং এতদুদ্দেশ্যে দূরদরাজ এলাকার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ত, সেজন্য সতর্কতামূলকভাবে রোমান সম্রাট কয়েকবার তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন। কিন্তু তাদের যুদ্ধপদ্ধতি ছিল একইরূপ

যা অদ্যাবধি চলে আসছে অর্থাৎ সেই পশ্চাদপসরণ এবং সেই দুশমনকে আকস্মিক ও অতর্কিত হামলা করে পেরেশান করে তাদের ক্লান্ত ও শ্রান্ত করে দেওয়ার রণকৌশল অথবা পরাজয়ের আশংকা দেখামাত্রই মরুভূমির অভ্যন্তরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। সেজন্য যখনই কোন নিয়মিত ফৌজ হামলা করতে অগ্রসর হ'ত তখনই আরবীরা সাধারণত তাদের রসদপত্রের বাহন কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের উপর রাত্রিকালীন অতর্কিত অভিযান চালাত। উড়োজাহাজ আবিষ্কারের পূর্বে বেদুঈনরা ছিল ভয়াবহ দুশমন এবং কোন নিয়মিত বাহিনীকে নিজেদের উপর হামলার সুযোগ তারা কখনই দিত না। উটের উপর সওয়ার হয়ে খুবই স্বল্প আহার্য ও পানীয়ের উপর নির্ভর করে দীর্ঘ দূরত্ব অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে অতিক্রম করত এবং যুদ্ধের ময়দানে অনুরূপ দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ার পর চকিতেই নির্দিষ্ট জায়গায় পুনরায় একত্র হবার মত গুণের কারণে তারা একটি জগতকে অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেছিল। উষ্ট্রারোহীদের রসদ পরিবহনের জন্য যেমন আলাদা বাহনের দরকার পড়ত না---তেমনি রসদের ব্যাপারেও তাদের কোন প্রকার উৎকণ্ঠা ছিল না। প্রতিটি উষ্ট্রারোহী স্বীয় উষ্ট্রের উপর ছয় সপ্তাহের সামান রাখতো যার ভেতর থাকত খেজুর এবং আধা-বস্তা আটা। আরবের উট প্রচণ্ড গরম মওসুমেও পানি পান ব্যতিরেকেই ১৫০ মাইলের দূরত্ব তিন দিনে অতিক্রম করে। এর অর্থ এ নয় যে, উট কিংবা ঘোড়াই অস্বাভাবিক গুরুত্বের অধিকারী---বরং এটাই বলা উদ্দেশ্য যে, অপরাপর ফৌজের মুকাবিলায় একজন আরব সওয়ার কত দীর্ঘ দূরত্ব কত দ্রুততা ও ত্রস্ততার সঙ্গে অতিক্রম করে থাকে! চলাচলের ক্ষেত্রে এই দ্রুততা ফৌজের জন্য খুবই উপকারী ও প্রয়োজনীয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য

প্রাচীনকালে আরববাসী ছিল এশিয়ার সর্ববৃহৎ বণিক সম্প্রদায়। তাদের তেজারতী কারবার দূরপ্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জ থেকে য়ুরোপ ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলো পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল এবং এরই ভিত্তিতে এশিয়াবাসীদের কমবেশি সম্পর্ক য়ুরোপ আফ্রিকার দেশগুলোর সঙ্গে কায়েম ছিল। আরবে খেজুর ভিন্ন এমন কোন বস্তু নেই যা তারা অন্য দেশের বাজারে পেশ করতে পারে। এজন্য তারা এশিয়ার মাল সিরিয়া, রোম, এবং য়ুরোপ-আফ্রিকার দেশগুলোতে

৫—

নিয়ে যেত এবং সেখানকার তেজারতী সামান এশিয়াতে নিয়ে আসত। এই সব সামানের ভেতর সুগন্ধী মসলা, সুবাসিত 'আতর, হীরা-জওয়াহেরাত, বিলাস-সামগ্রী এবং গোলাম-বাঁদীও অন্তর্ভুক্ত থাকত। এই সব ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সংস্কৃতিবান জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকার ফলে শহুরে আরববাসী আয়েশী জীবন সম্পর্কে ছিল খুবই ওয়াকিফহাল এবং এর সামগ্রিক উপাদানের ছিল অধিকারী। দীর্ঘকাল যাবত য়ুরোপীয়-দের একটা ধারণা ছিল যে, আরবেই মসলার উৎপাদন হয় আর এজন্যই আরবের লোকেরাই কেবল এর ব্যবসা করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এসব পণ্য তাদের সামুদ্রিক জাহাজ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, চীন, শ্রীলংকা প্রভৃতি স্থান থেকে নিয়ে আসত এবং স্থল পথের কাফেলা এগুলো সিরিয়া, মিসর, রোম প্রভৃতি স্থানে পৌঁছে দিত।

ধর্ম ও 'আকীদা-বিশ্বাস

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদের ধর্ম ও আকীদা-বিশ্বাসে বেশ কিছু পার্থক্য ছিল। 'অধিকাংশ লোক সূর্য ও নক্ষত্রের পূজো করত। কেউ কেউ এই বিরাট সৃষ্টিজগতে কয়েকজন খোদা আছেন বলে মনে করত এবং তাদের নামে আলাদা আলাদা মূর্তি নির্মাণ করে তাদের পূজো করত। কিতাবধারীদের মধ্যে ছিল য়াহূদী ও 'ঈসায়ী সম্প্রদায়। য়াহূদীরা নিজেদের সর্বাধিক মনোনীত এবং শ্রেষ্ঠতর মাখলূক (সৃষ্টি) হিসাবে মনে করত। তারা তওরাতের রদবদল করে একেবারে বিকৃত করে দিয়েছিল। 'ঈসায়ীরা প্রায়শ্চিত্তের মতবাদে এবং পিতা-পুত্র ও পবিত্রাত্মার ত্রিত্ববাদে ছিল বিশ্বাসী। মুশরিক ও পুতুল-পূজারীদের সর্বাপেক্ষা বড় উপাসনালয় ও আশ্রয়কেন্দ্র ছিল কা'বা এবং এতে ৩৬০ টি মূর্তি স্থান পেয়েছিল। এসবের পূজো ও যিয়ারতের জন্য আরববাসীরা প্রতি বছর দেশের দূরদরাজ ও প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগমন করত। মূর্তির গঠনাকৃতি হ'ত প্রতিটি গোত্রের 'আকীদা-বিশ্বাস মুতাবিক। 'হোবল' ছিল বিখ্যাত দেবমূর্তির নাম। এ দেব-মূর্তিটি ছিল বনী শায়বানের। এর আকৃতি ছিল বৃক্ষের ন্যায়। পাথর-খোদাই করা কয়েকটি দেবমূর্তি কা'বার বাইরে কিছুটা দূরত্বে স্থাপিত ছিল। এগুলোকে 'আনসাব' (প্রতিষ্ঠিত মূর্তি) বলা হ'ত। এই দেবতাগুলোর ভক্ত অনুরক্তেরা

এসবের উদ্দেশ্যে উট কুরবানী করে উৎসর্গ করত। মাদী উট যেহেতু দ্রুতগামী হয়ে থাকে সেজন্য তা মূল্যবান মনে করা হ'ত। মাদী বাচ্চা পয়দা হলে মালিক খুব খুশী হ'ত এবং একে দেবতার দান মনে করত। কোন উটনীর পর্যায়ক্রমিক মাদী বাচ্চা পয়দা হ'লে তাকে তখন দেবতার নামে উৎসর্গ করা হ'ত আর একে বলা হ'ত 'সায়েবা'। সায়েবা অবস্থায় পুনরায় মাদী বাচ্চা পয়দা হ'লে এই বাচ্চাকে 'বহীরা' বলা হ'ত। তার কান ছিদ্র করে দেবতার নামে তাকে উৎসর্গ করে দেওয়া হ'ত। 'সায়েবা' ও 'বহীরা'-র চুল ও পশম কাটা, গোশ্‌ত খাওয়া, সওয়ার হওয়া এবং তার পৃষ্ঠে বোঝা বহন করা নিষিদ্ধ ছিল। 'সায়েবা'র দুধ পান করা ছিল নিষিদ্ধ। অবশ্য মেহমানদের সামনে বরকতস্বরূপ তা পেশ করা যেত।

কুরায়শরা যখন পুত্র-সন্তানের খত্‌না করত কিংবা বিয়ে দিতে চাইত অথবা মুর্দাকে দাফন করত অথবা কারও নসবনামায় সন্দেহ হ'ত এবং সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য অবগত হতে চাইত, তখন তারা 'হোবল' দেবতার নামে এক শত দিরহাম নজরানা পেশ করত, পেশ করা হ'ত কুরবানীর জানোয়ার। এরপর পাশা নিক্ষেপকারী সেই ব্যক্তিকে---যার জন্য কোন নির্দেশ অথবা অনুমতি লাভের দরকার পড়ত,---হোবল ঠাকুরের সামনে বসিয়ে এভাবে আরজী পেশ করত, 'হে প্রভু প্রতিপালক! এই ব্যক্তি অমুকের বেটা অমুক। আমরা তার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করতে চাই। আপনি প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে দিন।' এরপর পাশা নিক্ষেপকারী ব্যক্তি পাশা নিক্ষেপ করত। পাশার ফলাফল যদি এরূপ বের হ'ত ঃ এ তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, তাহলে তাকে অত্যন্ত শরীফ ও অভিজাত মনে করা হ'ত। আর যদি ফলাফল বের হ'ত ঃ সে অন্য---তবে তাকে মিত্র মনে করা হ'ত, আর যদি সংকর তথা মিশ্রিত ফলাফল বের হ'ত তবে তার বংশে 'সন্দেহ' থেকে যেত। ঠিক এমনি অন্যান্য কাজেও সঠিক 'নির্দেশ' ও 'সত্য' এবং সঠিক জানার ক্ষেত্রে যদি ফলাফল বেরুত 'হাঁ' তবে সে কাজ অবশ্যই করা হ'ত, আর 'না' হলে এক বছর পর্যন্ত তা করত না। পরবর্তী বছরে পুনরায় পাশা নিক্ষেপ করা হ'ত।

হিন্দুদের মত কয়েকটি গোত্র জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, মানুষের রূহ তার ভাল ও মন্দ কর্মের ফলাফল মুতাবিক মানুষ কিংবা পশুর আকৃতিতে পুনরায় এই দুনিয়ায় আগমন করে থাকে। নিহতের হত্যার প্রতিশোধ সম্পর্কে বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না হত্যার বদলা

নেওয়া হয় নিহতের আত্মা পেচক আকৃতিতে প্রতিশোধ কামনায় 'খুন চাই' 'খুন চাই' বলে চীৎকার করে ফেরে।

জুয়া খেলা ও শরাব পান ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। ব্যভিচারকে দূষণীয় মনে করা হ'ত না। ছেলেরা মাতাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ হিসাবে লাভ করত। নারীর মর্যাদা গবাদি পশুর চেয়ে বেশী কিছু ছিল না। পুরুষের এরূপ এখতিয়ার ছিল, যেভাবে সে চাইবে নারীর থেকে ফায়দা লুটতে পারবে। কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়াকে তারা অশুভ মনে করত। যে কবিলার নিকট যত বেশী উট, ঘোড়া, পশুপাল এবং ভেড়া-বকরী থাকত সে কবিলাকে তত বেশী সম্মানীয় মনে করা হ'ত। উটের গোশ্‌ত কুরবানী ও যিয়াফতের ক্ষেত্রে কাজে লাগত। পশম দিয়ে তাঁবু ও পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত হ'ত। উটনীর দুধ ছিল প্রধান খাদ্য। উটের চামড়া দিয়ে তাঁবু, পানির মশক, ঢাল প্রভৃতি তৈরি করা হ'ত। উটের মল শুকিয়ে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হ'ত। পশু-চারণ ভূমি এবং পানির ঝরণার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের উদ্দেশ্যে অধিকাংশ লড়াই পরিচালিত হ'ত এবং বছরের পর বছর ধরে তা চলত। উদাহরণস্বরূপ, লবুস যুদ্ধ একাদিক্রমে চল্লিশ বছর ধরে চলেছিল এই সূত্র ধরে যে, বনী বকর গোত্রের এক ব্যক্তি ঘোষণা করেছিলঃ অমুক পশু-চারণ ক্ষেত্র আমার গোত্রের। এতে অপর গোত্রের কোন মানুষ তার পশু চরাতে পারবে না। বনী সা'লাবের এক ব্যক্তি অন্য কোন কবিলার মেহমান হয়েছিল। হঠাৎ করে তার একটি উটনী উল্লিখিত চারণভূমিতে চলে যায়। বনী বকরের যে মহিলা এই চারণ-ভূমির রক্ষিকা ছিল---সে এই উটনীর পালান কেটে তাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ৪৯৪ 'ঈসায়ীতে যে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে তা ৫৩৪ 'ঈসায়ী পর্যন্ত চলেছিল এবং আরবের বহু কবিলাই এতে যোগ দিয়েছিল। যখন এক কবিলা অপর কবিলার সমর্থনে এগিয়ে যেত, তখন দু'টি কবিলার সর্দার একত্রিত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবার কসম খেত। এই প্রথাকে "মুহাল্লিফা" (পারস্পরিক হলফ বা শপথ) এবং পারস্পরিক সাহায্যের শপথ বাক্য উচ্চারণকারীকে 'হালীফ' বা মিত্র বলা হ'ত।

ওয়াকে'আয়ে ফীল বা হাতীর ঘটনা

আঁ-হযরত (সা)-এর জন্মের এক বছর পূর্বে ৫৭০ 'ঈসায়ীতে হাব্‌শ (আবিসিনিয়া)-এর 'ঈসায়ী বাদশাহ স্বীয় সেনাপতি আবরাহাকে পাঠিয়ে

য়ামন জয় করেন। আবরাহা সেখানে একটি আলীশান গির্জা নির্মাণ করে সাধারণ লোকজনকে হুকুম দেয় যেন তারা খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করে গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে। এই হুকুম তামিল করাতে সে অনেকখানি সফল হয়েছিল এবং য়ামন ছাড়া আশেপাশের লোকও 'ঈসায়ী হয়ে গিয়েছিল। আবরাহা চাইত যে, সমগ্র আরবই 'ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করুক। কিন্তু সে যখন দেখতে পেল যে, আরবের প্রায় সমস্ত কবিলাই কা'বাকে তাদের ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে মান্য করে থাকে এবং সেখানে গিয়ে পুতুল পূজো করে, তখন সে এর কেন্দ্রীয় মর্যাদা খতম করে দেবার উপায় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে। অতঃপর বিজিত এলাকার যে সব অধিবাসী তখনও পর্যন্ত 'ঈসায়ী মযহাব কবুল করে নি,---তাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করে তারা যেন কা'বা যিয়ারতে আর গমন না করে। এই নির্দেশের ফলে পুতুলপূজারী আরবদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে এবং এদের মধ্যকার কিছু লোক ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়ে গির্জার অসম্মান করে। এর ফলে আবরাহা মূর্তি-পূজকদের শাস্তি প্রদান এবং কা'বা ঘরকে ভেঙে-চুরে মিসমার করে দেবার একটা বাহানা পেয়ে যায়। অতঃপর সে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে মক্কার দিকে যাত্রা করে। এই বাহিনীর সঙ্গে অনেকগুলো হাতীও ছিল। আজকাল যুদ্ধের ময়দানে ট্যাংকের সাহায্যে কাজ করা হয় কিংবা বিরাট বিরাট বৃক্ষ উপড়ে ফেলা ও বড় দালান-কোঠা ভেঙে ফেলার জন্য বুলডোজার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সে যুগে এসব করা হ'ত হাতীর সাহায্যে। আবরাহার ধারণা ছিল যে, কা'বা মিসমার এবং মূর্তি-পূজকদের কেন্দ্র খতম করে দিলে খৃস্ট ধর্ম বিস্তারের পথে সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায় দূর হয়ে যাবে। মক্কাবাসীরা আবরাহা ও তার সৈন্যবাহিনীর আগমন সংবাদ শোনামাত্রই ঘর-বাড়ি ছেড়ে আশেপাশের পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। সে সময় কুরায়শ এবং মক্কাবাসীদের সর্দার ছিলেন 'আবদুল মুত্তালিব। ইনি বেশ প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। আবরাহা প্রথমে পৌঁছেই মক্কাবাসীদের সমস্ত পশুপাল আটকে ফেলে যাতে করে তারা মজবুর ও অনন্যোপায় হয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টিতে এগিয়ে না আসে। এর ভেতর 'আবদুল মুত্তালিবের পশুপালও ছিল। 'আবদুল মুত্তালিব পশুপাল ছাড়িয়ে আনতে আবরাহার নিকট গেলে আবরাহা তাঁকে বলে ঃ তোমার চিন্তা তোমার পশুপাল নিয়ে, কিন্তু যে কা'বা মিসমার করতে আমি এসেছি---সে সম্পর্কে কোন চিন্তা নেই? 'আবদুল মুত্তালিব জবাব

দেন ঃ পশুপাল আমার, এজন্যই তা আমি ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। কা'বা আল্লাহ্‌র ঘর, তা রক্ষা করার চিন্তাও তাই তাঁরই। একথা শোনার পর আবরাহা নিশ্চুপ হয়ে যায় এবং 'আবদুল মুত্তালিবের পশুপাল ছেড়ে দেয়। মক্‌কাবাসীদের ভেতর ভয়, সন্ত্রাস ও নিশ্চুপতা লক্ষ্য করে সে মনে করে যে, তারা কা'বা ধ্বংসে কোনরূপ প্রতিরোধে এগিয়ে আসবে না। অতঃপর পরদিন হস্তিবাহিনী নিয়ে কা'বার দিকে চলল সে। বাহিনীর সামনের সবচেয়ে ভাল হাতীটার উপর সে নিজেই সওয়ার ছিল। উদ্দেশ্য ছিল নিজের হাতিটার সাহায্যে যেন সে ধ্বংসের কাজ শুরু করাতে পারে। কিন্তু কিছু দূর যাবার পর তার হাতী থেমে গেল। সামনের দিকে আর অগ্রসর হতে চাইল না। এটা দেখে সে মাহুতদের আক্রমণ করার নির্দেশ দিল। এমন সময় আসমানে দেখা দিল আবাবীল পাখির ঝাঁক। তারা তাদের চঞ্চু থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কংকর নিক্ষেপ করে। আবরাহার হস্তিবাহিনী বেদিশা হয়ে ঊর্ধ্ব-শ্বাসে পলায়ন করে। এই অস্বাভাবিক ঘটনায় কা'বার মর্যাদা ও পবিত্রতার প্রভাব অসামান্যভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আর মূর্তিপূজকদের নিজেদের দেবতাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। যে বছর এই ঘটনা সংঘটিত হয় মক্‌কাবাসীরা সেই বছর থেকে নতুন বছর গণনা শুরু করে এবং উক্ত বছরের নাম রাখে 'আম আল-ফীল বা হাতীর বছর।

এখানে এ ঘটনার বর্ণনা এজন্য করা হ'ল যেন মূর্তির প্রতি মক্‌কাবাসী-দের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও প্রীতি এবং হুযূর আকরাম (সা)-এর তবলীগী ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বাধার পরিমাপ করা যায়। সঙ্গে সঙ্গে যেন এও জানা যায় যে, যেখানে একজন যবরদস্ত বাদশাহ মক্‌কার মুশরিক ও মূর্তিপূজকদের শিরক ও মূর্তিপূজোর বিরুদ্ধে তার সকল শক্তি ও প্রভাব খাটানো সত্ত্বেও বিজয় লাভ করতে পারেনি—বরং হাতীর ঘটনা তাকে আরও পাকাপোক্ত ও দৃঢ়তা দান করে—সেখানে একজন দীনহীন এতীম একাকী সফল হলেন এবং এ পথে সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে বিজয় লাভে ধন্য হন।

হেজাযের আশেপাশের দুনিয়া

যে সময় ইসলামের প্রভাব-সূর্য তার ঝলমলে রূপ নিয়ে উদিত হয়, হেজাযের পার্শ্ববর্তী দুনিয়া তখন কয়েকটি বড় বড় সাম্রাজ্যে বিভক্ত ছিল ঃ

উত্তর-প্রাচ্যে ইরানীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত আর উত্তর-পশ্চিমে রোমানদের। ইরানী সিংহাসনে তখন ন্যায়-বিচারক বাদশাহ নওশেরওয়াঁ সমাসীন এবং রোমের শাসন-কর্তৃত্ব তখন হেরাক্লিয়াসের বজ্র মুঠিতে। কোন এক যুগে এসব সাম্রাজ্য উন্নতি ও অগ্রগতির শীর্ষে ছিল। রোম সাম্রাজ্যের সীমারেখা উত্তর আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিসর সবই ছিল এর অধীন। তারা ব্যবিলনের দক্ষিণে ফোরাত নদীর তীরে হীরা নামক শহর পত্তন করেছিল। এর দালান-কোঠা, বাগ-বাগিচা ও ধন-দৌলতের খ্যাতি সারা দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত ছিল। ইরানী সাম্রাজ্যে তখন অগ্নি-পূজকদের ধুমধাম চরম শিখরে। তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, সামরিক শক্তি ও বিলাস উপকরণের প্রাচুর্যের বদৌলতে বিশ্বের সর্বাপেক্ষা অভিজাত সম্প্রদায় মনে করা হ'ত। কিন্তু ইরানী ও রোমানদের পারস্পরিক বিরোধ ও দ্বন্দ্ব এবং ধারাবাহিক যুদ্ধ-বিগ্রহ উভয়কেই ঝাঁঝরা করে ফেলেছিল।

য়ূরোপের উত্তর ও পশ্চিম অংশ ছিল বন্য ও বর্বর সম্প্রদায়ের লুট-পাটের কেন্দ্রভূমি। মিসর এবং আফ্রিকার উত্তরাংশ যদিও রোমানদের অধীন ছিল, কিন্তু তাদের কর্তৃত্ব ছিল শিথিল ও মামুলী ধরনের। জুলুম-নিপীড়নের কারণে তাদের প্রতি লোকজন ছিল বিরূপ। গথ জাতির হাতে ছিল স্পেন। এই আধা-সভ্য ও আধা-বন্য সম্প্রদায় একে জয় করলেও শান্তি ও নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা তারা কায়েম রাখতে পারে নি। তারা রোমান সাম্রাজ্যের সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু কিছুদিন বাদেই তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত গথদের সেখান থেকে বিতাড়িত ও বহিস্কৃত হতে হয়।

ভারতবর্ষে তখন ব্রাহ্মণদের উত্থান যুগ। কিন্তু 'ঈসায়ী পঞ্চম শতাব্দীতে ইরানীরা ভারতবর্ষের বিখ্যাত রাজা চন্দ্রগুপ্তের খান্দান খতম করে হুন জাতির হুকূমতের বুনিয়াদ পত্তন করে। এ জাতির সর্দারের নাম ছিল তুরান। ৭২ বছর পর্যন্ত এই বংশ রাজত্ব করে। এর পর হিন্দু রাজন্যবর্গ বিদ্রোহ করে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে দেয়। 'ঈসায়ী পঞ্চম শতাব্দীতে সিন্ধুর হিন্দু রাজা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। সিন্ধু নদের কিনারে এর রাজ-ধানী আন্নোর ছিল খুবই সুন্দর এবং আলো ঝলমলে শহর। ঐতিহাসিকরা একে আদ-দৌর এবং আসরোর নামে অভিহিত করেছেন। তার সাম্রাজ্যের

সীমারেখা কাশমীর থেকে ইরানের মাকরান প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এর উত্তরে পাহাড়ী এলাকা কিরমান শহর এবং দক্ষিণে আরব সাগর। ব্যবস্থাপনা ও শাসন-শৃংখলা বেশ ভালই ছিল। 'ঈসায়ী ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাসানী সম্রাট মাকরানের রাস্তা ধরে হামলা করে সিন্ধুর রাজাকে পরাজিত করেন। কিন্তু তিনি তাঁর নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রাখেন নি; বরং লুট-তরাজ করে ফিরে যান। ফলে এই এলাকা হিন্দু রাজাদের নিয়ন্ত্রণেই থেকে যায়। সে যুগে এখানকার সংস্কৃতি ছিল আশ্চর্য সর্ব রসম-রেওয়াজের সমাহার। ইন্দ্রিয় পূজো ও বিলাসিতার রাজত্ব চলছিল চরমে। একই মহিলা একই সময়ে কয়েকজন স্বামীর স্ত্রী হতে পারত। নৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা অবনতির দিকে চলছিল আর দারিদ্র্য ও মূর্খতার চলছিল ব্যাপক রাজত্ব।

কিন্তু আশেপাশের দুনিয়ার অবস্থার বিবিধ চিত্র থেকে আরববাসী ছিল নিরাপদ ও মুক্ত। গ্রীক, রোমান ও ইরানীদের রাজত্বের নেশা জগতকে তছনছ করেছে। আবিসিনিয়াধিপতির ক্ষমতার সীমারেখা য়ামন পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু হেজায এদের তুর্কী তাজীর দাপট থেকে বেঁচে ছিল, কেউ তাকে পদানত করতে পারে নি। হেজাযবাসীদের এই গর্ব অত্যন্ত সংগত যে, তারা অন্য কোন ধর্ম ও মযহাব কিংবা অপর কোন জাতিগোষ্ঠীর গোলামী থেকে হামেশাই স্বাধীন ছিল।

এখন হেজাযের আশেপাশের দুনিয়ার ধর্মীয় অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। রোম সাম্রাজ্য ছিল খৃস্টীয় মতবাদের লালন-ভূমি আর ইরান ছিল অগ্নি-পূজকদের লালনভূমি। সিরিয়ার রাজধানী দামেশক খৃস্টীয় মতবাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল। খৃস্টানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় নেতা আল-নিভাস এখানেই থাকতেন। তিনি খৃস্টান মতবাদের ভেতর একটি নতুন মযহাবের দীক্ষা দেন। বিয়ে-শাদীকে মন্দ ও খারাপ বলে অভিহিত করেন। দ্বিতীয় বিয়েকে তিনি ব্যভিচার নামে আখ্যায়িত করেন। মজূসীরা আগুনের পূজো করত। তারা পাপ ও পুণ্যের তথা নেকী ও বদীর দুই খোদা মানত। আসমানী বস্তুনিচয়কে বিশ্ব-কারখানার উপর শক্তিমান মনে করত। মূর্তি-পূজো ছিল সর্বত্রই একটা সাধারণ ব্যাপার। জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক উপলব্ধির সমস্ত পুঁজিই কোন না কোন মূর্তির প্রতি উৎসর্গীত ছিল। সম্মান ও মর্যাদা ছিল মানবীয় বোধের ঊর্ধ্বতর কোন বস্তু। সাধারণ

এবং অনুভূত মূর্তির খোদাই থেকে যদি কিছু বেঁচে থাকত তবে তা বংশ, রঙ ও রক্তের মূর্তি খোদাইয়ের জন্য ওয়াক্ফ ছিল।

এটাই ছিল সেই অবস্থা যার মধ্যে তৎকালীন দুনিয়া নিপতিত ছিল। শুধুমাত্র হেজাযই অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক, কার্যত নৈতিক ও চারিত্রিক এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক রীতিপদ্ধতিহীন অবস্থায় ছিল না, তার পার্শ্ববর্তী গোটা দুনিয়ার উপরও তখন ঘনঘটা ঘোর অন্ধকারে ছেয়েছিল। কিন্তু মক্কার একজন নিরক্ষর ব্যক্তি দুনিয়ার এই অন্ধকার ও গোমরাহীকে দূর করবার জন্য একাকীই সকল মুসীবতের মুকাবিলা করে স্বীয় সদ্বংশজাত সাথীদেরকে এ থেকে বের করে দুনিয়ার রাহবার ও নেতৃ-পদে অধিষ্ঠিত করেন। মানব জাতির জন্য চিরন্তন কল্যাণ ও সৌভাগ্যের রাস্তা খুলে দেন। আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার শৈশব ও যৌবন

ফ্রান্সের মশহুর প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ জোমিনী (Jomini) বলেছেন, যে ব্যক্তি সমর নীতি ও যুদ্ধের কলাকৌশল এবং এতদ্‌সংক্রান্ত রাজনীতি বুঝতে চায় তার জন্য বাধ্যতামূলক যে, যুদ্ধের আসল দলীল-দস্তাবেজগুলো যেন সে মন দিয়ে অধ্যয়ন করে এবং এরই সঙ্গে যুদ্ধের মূলনীতি যেন যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে বুঝে নেয়। কেননা সমরশাস্ত্র শুধুমাত্র একটি বিজ্ঞানই নয়; বরং এটি একটি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক নাটক যেখানে রক্ত দিয়ে হোলী খেলা হয়। এ কারণেই দূর অতীতের যুদ্ধগুলোর অধ্যয়ন থেকে আমরা একটা সীমা পর্যন্ত শুধুমাত্র এটা পরিমাপ করতে পারি, 'যুদ্ধ দ্বারা আমাদের দাবি কি আর আমরাই বা কী বুঝি এ থেকে।' কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এখন সৈনিক হবার জন্য সমর শাস্ত্রের কোন্ অংশের অধ্যয়ন ফলপ্রসূ ও উপকারী? শুধুমাত্র এতটুকু পড়ে নেওয়া যে, কোন যুদ্ধ কি কি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে চলেছিল অথবা সে যুদ্ধের ইতিহাস কী,—খুব বেশী উপকারী নয়। লড়াই যখন একইভাবে, একই স্থানে এবং একই নমুনায় আজ পর্যন্ত কখনই সংঘটিত হয়নি—তখন কি দরকার যে, আমরা দূর অতীতের লড়াইয়ের ইতিহাস অধ্যয়ন করব।

মানুষই যুদ্ধের রক্তাক্ত নাটকের অভিনেতা এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত সকল কার্যই মানবীয় চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর আমল করতে গিয়েই

জন্মলাভ করে থাকে। এজন্য আমাদের মতে, কোন ব্যক্তি যদি কোন যুদ্ধকে সঠিকভাবে বুঝতে চায় তবে তার উচিত প্রথমে সেই মানুষটিকে বুঝতে চেষ্টা করা যিনি সেই সফল যুদ্ধ পরিচালনার নায়ক এবং যার যুদ্ধ সংক্রান্ত কৃতিত্ব ও কার্যাবলী আমাদের সামনে নমুনা ও দৃষ্টান্তস্বরূপ এসেছে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রথমে আমাদের সেই ব্যক্তি অর্থাৎ সেই জেনারেলের জীবনে-তিহাস গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করা উচিত। কেননা উক্ত লড়াইয়ের ইতিহাস উল্লিখিত জেনারেলের জীবনেতিহাসেরই একটি অংশ। এভাবেই আমরা উক্ত জেনারেলকে মানুষ হিসাবেও বুঝে নেব এবং আমাদের এও জানা হয়ে যাবে যে, তাঁর ভেতর এমন কোন বৈশিষ্ট্য ছিল যার কারণে তিনি এত বড় বিজয়ী বীর হয়েছিলেন, তাঁর দিল ও দিমাগের সামর্থ্য ও যোগ্যতার অবস্থা কি ছিল, তাঁর ভেতর কখন এবং কিভাবে এই উচ্চাকাংক্ষা ও দুঃসা-হস সৃষ্টি হ'ল। এটা প্রকৃতিগত ও আল্লাহ্র প্রদত্ত, না কি ইতিহাসের ঘটনা-প্রবাহের সৃষ্টি? ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং ব্যক্তিত্বের অধ্যয়ন থেকে একটি উপকারী ও ফলপ্রসূ শিক্ষাই শুধু আমাদের মিলবে না—বরং এটাও জানা যাবে যে, তার নিজস্ব লালন-পালন ও বর্ধিত হবার ভেতর তিনি কি কি পর্যায় অতিক্রম করেছেন এবং কিভাবে করেছেন। তাঁর উচ্চাকাংক্ষা ও দুঃসাহস এবং উন্নত মনোবলের গুণসমূহ এই পর্যায়ে কিভাবে পৌঁছেছে। অধ্যয়নের পদ্ধতি এবং তাঁর লক্ষ্য যদি এই না হয় তবে তা একদম বেকার ও অর্থহীন। তা থেকে হিম্মত ও দৃঢ় মনোবলের ক্ষেত্রে উন্নতি, উন্নত চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা কিছুতেই সৃষ্টি হতে পারে না।

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবন-চরিত এবং তাঁর যুদ্ধ-সংক্রান্ত সফলতা ও কৃতিত্বের নজীর দুনিয়ার ইতিহাসে আর দ্বিতীয় নেই। ইনিই সেই ব্যক্তিত্ব যিনি যুদ্ধের পর পরাভূত জাতিগোষ্ঠীকে সঠিক অর্থেই শান্তি ও নিরাপত্তার অমূল্য সম্পদ দানে ধন্য করেছেন। তাঁর জীবন-চরিত শুধু প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি বিভাগে, যুগের প্রতিটি সন্ধিক্ষণে পরিপূর্ণ পথ-প্রদর্শক হিসাবে বিবেচিত হবার দাবি রাখে। আর তাই তার অধ্যয়ন কোন একটি অংশ কিংবা একটি দিক দিয়ে নয় বরং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ করা উচিত। সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে পাঠকের সামনে তারই একটি পরিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত-সার পেশ করা হবে।

খান্দান ও পিতৃপুরুষ

হুযূর আকরাম (সা) ছিলেন কুরায়শ বংশের সর্দার 'আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র এবং 'আবদুল্লাহ বিন 'আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। কুরায়শ ছিল কেনানা বংশের একটি শাখা। হযরত ইসমা'ঈল যবীহুল্লাহ্ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি থেকে এই বংশের উৎপত্তি । ব্যক্তিগত ও বংশগত আভিজাত্য এবং মর্যাদার কারণে 'আবদুল মুত্তালিব কা'বা ঘরের মুতাওয়াল্লী ছিলেন। আরবের গোত্রগুলো তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। হাতীর ঘটনা তাঁরই মুতা-ওয়াল্লী থাকাকালীন সংঘটিত হয়। সন্তান-সন্ততি ছিল অনেক। তেরোজন পুত্র-সন্তান এবং কন্যা-সন্তান ছয়জন। আবূ তালিব, যুবায়র এবং 'আবদু-ল্লাহ্ এক স্ত্রীর গর্ভে এবং হামযা, 'আব্বাস, আবু লাহাব প্রমুখ অন্য বিবি-দের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 'আবদুল্লাহ্ জ্ঞান, প্রখর বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্যশীলতা, সহিষ্ণুতা, মিষ্টি ব্যবহার, উন্নত চরিত্র সৌন্দর্যে ছিলেন বিশিষ্ট ও সবার অগ্রগামী এবং তিনি 'আবদুল মুত্তালিবের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। মক্কাবাসীরাও তাঁর পসন্দনীয় চরিত্র ও স্বভাবে এবং উত্তম ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল।

"আবদুল মুত্তালিবের মাতৃকুল ছিলেন য়াছরিবের অধিবাসী। সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই তিনি তাঁর শৈশবকাল কাটান। চাচা মুত্তালিব বিন 'আব্দ মনাফ হাজীদের মেহমানদারীর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি এই দায়িত্ব পান। হযরত ইসমা'ঈল যবীহুল্লাহ্ (আ)-এর বিখ্যাত কুয়া যমযম তিনি পরিষ্কার করান এবং কুয়া থেকে যে সব লুকনো ধন-সম্পদ পাওয়া যায় তার সোনা-দানাগুলো পাত্রা-কারে কা'বার দরজায় টাঙ্গানো হয়। এই সব কাজের জন্য মক্কাবাসী ও আরব গোত্রগুলো 'আবদুল মুত্তালিবের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় এবং তাঁকে অস্বাভাবিক সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে থাকে।

'আবদুল মুত্তালিব স্বীয় পুত্র 'আবদুল্লাহ্র বিয়ে দেন মক্কার অভিজাত কবিল্লা বনী যুহরার নেতা ওয়াহ্হাব বিন মনাফের কন্যা আমিনার সঙ্গে। আমিনা দু'দিক দিয়েই অভিজাত বংশের হওয়া ছাড়াও ব্যক্তিগত শরাফতী, প্রখর মেধা, উত্তম চরিত্র ও সৌন্দর্যাকৃতির দিক দিয়ে সমগ্র মক্কার মেয়েদের ভেতর একটি বিশিষ্ট আসনের অধিকারিণী ছিলেন। বিয়ের কয়েকদিন পর 'আবদুল মুত্তালিব 'আবদুল্লাহকে একটি তেজারতী কাফেলার সঙ্গে সিরিয়ায় পাঠান এবং ফিরতি পথে য়াছরিব থেকে খেজুর আনার ফরমায়েশ

দেন। এই সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'আবদুল্লাহ য়াছরিবে ইন্তিকাল করেন। প্রত্যাবর্তনে অহেতুক বিলম্ব হওয়ায় 'আবদুল মুত্তালিব পুত্র হারিছকে খবর সংগ্রহের জন্য পাঠান এবং সেখানে তাঁর ইন্তিকালের খবর পান। 'আবদুল মুত্তালিব এ সংবাদে অত্যন্ত আঘাত পান। এ ঘটনা হুযূর (সা)-এর জন্মের দু'মাস আগের ঘটনা[১] অর্থাৎ এতীম অবস্থায় তিনি দুনিয়ার বুকে তশরীফ রাখেন।

জন্ম ও পরবর্তী ঘটনা

আঁ-হযরত (সা)-এর জন্ম সন ছিল ৫৭১ সনের ২২শে এপ্রিল।—দিনটি ছিল সোমবার। যে মুহূর্তে 'আবদুল মুত্তালিব পৌত্রের জন্মের খবর পান সে সময় তিনি কা'বা শরীফে ছিলেন। সংবাদ পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশী হন। তিনি বর্ণনা করেনঃ ঘরে ফিরে আমি আঁতুড় ঘরে পুত্রবধূকে আওয়াজ দিয়ে বললাম, 'আমাকে বাচ্চা দেখাও।' আমিনা বললেনঃ আমাকে অদৃশ্য থেকে হেদায়েত দেওয়া হয়েছে যে, তিন দিন পর্যন্ত শিশুকে যেন কাউকে না দেখাই। কিন্তু তাঁর দেয়া উত্তরের প্রতি পরওয়া না করেই আমি অগ্রসর হলাম এবং বাচ্চাকে দেখতে চাইলাম। এমন সময় একটি ভয়ংকর আকৃতি আমাকে থামিয়ে দিল এবং বললঃ তাঁকে তিন দিন পর্যন্ত দেখো না। তিন দিন পর পৌত্রকে কোলে উঠিয়ে কা'বা ঘরে নিয়ে গেলাম। তাঁর জন্য আমার প্রভু-প্রতিপালকের বরকত হাসিল করলাম এবং নাম রাখলাম 'মুহাম্মদ' (সা)।

আরব নেতৃবর্গের দস্তুর মুতাবিক তাঁকে দ্বিতীয় মাসেই দুধ পান করানোর জন্য হালিমা সা'দীয়াকে সোপর্দ করা হয়।

হালিমা সা'দীয়ার বর্ণনাঃ শিশু ছিল অত্যন্ত সুশীল ও শিষ্ট—প্রশংসনীয় স্বভাববিশিষ্ট এবং ধৈর্যশীল। নিজে একদিকের স্তন থেকে দুধ পান করতেন এবং অপর দিকের স্তনের দুধ আমার শিশু-সন্তান 'আবদুল্লাহর জন্য রেখে দিতেন। নয় মাসে কথা বলতে আরম্ভ করেন এবং দ্বিতীয় বছরেই দুধ পান ছেড়ে দেন। এরপর আমি তাঁকে বিবি আমিনার নিকট

১. অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে, হযরতের জন্মের ছয় মাস পূর্বে পিতা 'আবদুল্লাহ মারা যান। —অনুবাদক।

নিয়ে আসি। আপন সন্তানকে দেখে তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং আমার বারংবার অনুরোধে পুনরায় তাঁকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি দেন।

আঁ-হযরত (সা)-এর বয়স যখন পাঁচ বছর—তখন থেকে তিনি মা'র সঙ্গে থাকতে শুরু করেন। বিবি আমিনার দাসী উম্মে আয়মান বলেনঃ হযরত (সা) খুব শান্ত শিষ্ট, সাদা-সিধে, খোলামেলা স্বভাব এবং মার্জিত আচরণের শিশু ছিলেন। বিছানায় কখনো তিনি পেশাব কিংবা পায়খানা করেন নি। পিপাসা লাগলে নিজে থেকেই পানি নিয়ে পান করতেন। কখনো জিদ করতেন না। যা পেতেন তাই খেতেন, নিজ থেকে কিছু চাইতেন না। হযরতের বয়স যখন ছ'বছর তখন বিবি আমিনা আমাকে সাথে করে স্বীয় আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে[১] রওয়ানা হন। এক বছর অবস্থানের পর মক্কায় আসার পথে আবওয়া নামক স্থানে তিনি ইন্তিকাল করেন এবং আমি হযরত মুহাম্মদ (সা)-কে নিয়ে তাঁর দাদা 'আবদুল মুত্তালিবের নিকটে আসি। পুত্রবধূর ইন্তিকালে 'আবদুল মুত্তালিব অত্যন্ত আঘাত পান এবং হযরতের লালন-পালন ভার নিজ দায়িত্বে উঠিয়ে নেন। কিন্তু তাঁরও সময় এসেছিল। হযরতের আট বছর বয়সে তিনি পরপারের ডাকে সাড়া দিলেন, কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে আপন পুত্র হযরতের চাচা আবু তালিবকে ডেকে তাঁর লালন-পালন ও দেখাশোনাসহ সার্বিক দায়িত্বভার সোপর্দ করেন। আবু তালিব তাঁকে আপন সন্তানাধিক মুহব্বত ও স্নেহে লালন করেন। সর্বদাই তিনি তাঁর খেয়াল রাখতেন। যখনই বাচ্চাদের নিয়ে কোন কথা উঠত তিনি ভাতিজা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর প্রশংসনীয় গুণাবলীর বর্ণনা অত্যন্ত খুশী মনে করতেন এবং তাঁর আদব-আখলাক, সত্য ভাষণ ও পাক-পবিত্রতার সীমাহীন তা'রীফ করতেন।

'আবদুল মুত্তালিবের পর আবু তালিব কুরায়শ সর্দার এবং কা'বার মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন। তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রদ্ধেয় আসনকে সবাই স্বীকৃতি দিত। যে দিনগুলোতে মক্কায় এসব ঘটনার প্রকাশ ঘটছিল আরব প্রতিবেশী ইরান ও রোম সাম্রাজ্যে তখন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ৫৭০ 'ঈসায়ীতে ইরান সম্রাট নওশেরওয়াঁর ইন্তিকাল এবং তদস্থলে তৎপুত্র হরমুয (৪র্থ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। নতুন সম্রাট ছিলেন উচ্ছৃংখল, জালিম এবং

১. অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে মা আমিনা স্বামী 'আবদুল্লাহ্‌র কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে য়াছরিবে গিয়েছিলেন। —অনুবাদক।

বিলাসী লম্পট। ফলে প্রজা-সাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রোম সম্রাট সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি ইরানের উপর হামলা করেন। এদিকে হরমুয যখন রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত, অপরদিকে উত্তরদিক দিয়ে তখন তাতার বাহিনী এসে চড়াও হয়। চারদিকে তখন রক্তারক্তি, খুন-যখম ও রাহাযানির রাজত্ব চলছে। জেনারেল বাহরাম—যিনি রোমান ও তাতার বাহিনীকে পরাজিত করেছিলেন, হরমুযের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে সিংহাসনচ্যুত করেন এবং প্রজাবৃন্দ তৎপুত্র পারভেযকে তখতে সমাসীন করলে জেনারেল বাহরাম তারও বিরোধিতা করেন। পারভেয কনস্টানটিনোপলে পালিয়ে যান এবং মরিসের সাহায্যে সিংহাসন পুনরুদ্ধারে সফল হন। এরপর দু'টি সাম্রাজ্যের ভেতর শান্তি ও সৌহার্দমূলক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

সিরিয়া সফর

সে সময়ে আবু তালিব বাণিজ্যোপলক্ষে সিরিয়া গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হযরতের বয়স তখন দশ বছর।[১] তাঁরও যাবার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হ'ল। তিনি আব্দার ধরে আবু তালিবের সঙ্গে রওয়ানা হন। কাফেলা সিরিয়ার বসরার পাহাড়ী এলাকা সাঈদ-এর প্রান্তদেশে পৌঁছলে সেখানে তাঁবু ফেলা হয়। এলাকাটি ছিল চিরসবুজ ও শ্যামল-সুন্দর। দূর-দূরান্তের কাফেলা এখানে এসে থাকত। এতদ্ভিন্ন সেখানকার শাসন কর্তৃপক্ষও ছিল ন্যায়পরায়ণ। সেজন্য বিভিন্ন ধর্মের লোক রোমানদের জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে সেখানে এসে বসবাস শুরু করেছিল। এদের ভেতর বহীরা নামক একজন 'ঈসায়ী পাদরীও ছিলেন। তিনি সেখানে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন। মেহমানদারীর জন্য তিনি ছিলেন মশহূর। তিনি একটি বিরাট মুসাফিরখানা বানিয়েছিলেন যেখানে সাধারণভাবে মুসাফিরেরা অবস্থান করত। আবু তালিবের কাফেলা উক্ত সর্দারের গির্জার নিকট এসে থামে। যে মুহূর্তে কাফেলার লোকেরা নিজ নিজ উটের পিঠের হাওদা খুলছিল সে সময় রাহেব বা পাদরী তাদের নিকট আসেন। আবু তালিব এর আগেও গির্জার নিকট থেমেছিলেন, কিন্তু এর আগে রাহেবের কখনো আগমন ঘটে নি কিংবা কোনরূপ দৃকপাতও করেন নি। এবার কিন্তু তিনি কাফেলার লোকজনের সঙ্গে

১. অনেকের মতে হযরতের বয়স তখন বার বছর ছিল। ---অনুবাদক।

খুব মেলামেশা করেন এবং প্রত্যেককেই খুব গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেন, আর তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট এসে তাঁকে দেখা মাত্রই তিনি চমকে ওঠেন এবং বহুক্ষণ ধরে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করতে থাকেন। অতঃপর আবু তালিবকে জিজ্ঞেস করেনঃ এ কে? আবু তালিবঃ এ আমার পুত্র। এই বলেই ভাতিজার গুণাবলী বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন, যিনিই একে দেখেন---পসন্দ করেন। বৃদ্ধ রাহেব বললেনঃ এই বালকের ভেতর বিশেষ একটা দীপ্তি আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তোমাদের কাফেলা যখন আসছিল তখন ছিল প্রচণ্ড রৌদ্র। আমি জানালা দিয়ে দেখতে পেলাম, খোলা আসমানে একখণ্ড মেঘ আগাগোড়া তাঁর মাথায় ছায়া দিতে দিতে আসছিল। এরপর হযরত (সা)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমার মাযহাব কী? তিনি জওয়াব দেনঃ আমার পূর্বপুরুষ তো মূর্তি-পূজক, কিন্তু আমি যাঁর সন্ধানে আছি তা কোথাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না এবং এখন পর্যন্তও তা কোথাও মেলেনি। আমার দিল মূর্তিকে সিজদা করতে চায় না। এজন্য আমি আজও সেগুলোর সামনে মাথা নোয়াই নি।

একথা শোনার পর রাহেব অত্যন্ত খুশী হন এবং ইচ্ছে করেই বলেনঃ মনে হচ্ছে তুমি য়াহূদীদের আসমানী কিতাব পড়েছ। জবাবে তিনি বলেনঃ আমি নিরক্ষর। জানি না কিতাবে কি লেখা আছে! তবে আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, আপনারা সবাই ভুল পথে আছেন এবং এ কারণেই আমি মূর্তি পূজোকে গোমরাহী মনে করি। এর বেশী কিছু আমার জানা নেই। এই বলে আঁ-হযরত (সা) উট চরাতে চলে গেলেন।

এরূপ কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার পর রাহেব গির্জায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য রান্না করে কাফেলার লোকদের নিকট ফিরে যান। এর পর তাদেরকে সেই বালককে ডেকে দেবার জন্য আবেদন জানান। তিনি এলে রাহেব আবু তালিবকে বললেনঃ আপনি তো বলেছিলেন যে, এ আমার পুত্র, কিন্তু এর তো এতীম হবার কথা! আবু তালিব বললেনঃ অবশ্য ঠিকই বলেছেন। এ এতীম এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। মাতৃগর্ভে থাকতেই সে এতীম হয়ে যায়। এর পর রাহেব আবু তালিবের অনুমতিক্রমে আঁ-হযরত (সা)-এর পৃষ্ঠদেশ খুলে দেখেন এবং তাদের ধর্মীয় কিতাবে লিখিত বর্ণনা মুতাবিক যা তিনি পড়েছিলেন---মোহরে নবুওতের চিহ্ন দেখতে পান। এটি দেখে রাহেব বলেনঃ এই বালককে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং

য়াহূদীদের হাত থেকে একে পূর্ণ হেফাজতের ব্যবস্থা করুন। তারা যেন এর আলামত ও নিশানা না দেখতে পায়! অন্যথায় তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে প্রয়াস চালাবে। ইনি অত্যন্ত বিখ্যাত পুরুষ হবেন। য়াহূদীরা এঁর দুশমন, তাই সিরিয়ায় তাঁর অবস্থান সমীচীন নয়।

মূর্খতার রাজত্ব

এখানে সংক্ষেপে একথা বলে দেওয়া আবশ্যক যে, যেখানে আরবের মূর্খ জাহেলরা মূর্তিপূজো ইত্যাদিতে লিপ্ত ছিল এবং গোমরাহীর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তাদেরকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছিল সেখানে য়াহূদী ও নাসারাগণও তাদের ধর্ম ও মাযহাবের মৌলিকত্ব থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়েছিল। তাদের ধর্মীয় কিতাবসমূহ বিকৃতি (তাহ'রীফ) ও অবৈধ হস্তক্ষেপ দ্বারা ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হয়ে মনগড়া ও কল্প-কাহিনীর সংকলনে পরিণত হয়েছিল। রাহেব ও পাদরিগণ নিজেদের 'আকীদা তথা ধ্যান-ধারণার প্রচার করছিল। উদাহরণত সিরিয়ার রাজধানী দামেশককে লেনুস-এর নেতৃত্ব কায়েম ছিল। মুসিল-এ ইস্কাফ জেরুম স্বীয় মাযহাবের প্রচার ও প্রসারে ছিল ব্যস্ত। আমুরিয়ায় পিটার্সের আলাদা গির্জা ছিল। বসরায় ছিল রাহেব বহীরার ধর্মীয় কর্তৃত্ব। এভাবেই 'ঈসায়ী মাযহাব রাহেব ও পাদরীদের ব্যক্তিগত 'আকীদা-বিশ্বাসের ভেতর বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। জনসাধারণ তাওহীদ-এর অর্থ বুঝতে ছিল অক্ষম ও অপারগ। রাজনৈতিক দিক দিয়ে আরবের উত্তরাংশ এবং সিরিয়ার উপর রোম সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ ছিল প্রতিষ্ঠিত। লোহিত সাগরের উপকূল বরাবর মক্কার দক্ষিণে সমদ্রোপকূল পর্যন্ত হাবশ সম্রাটের কর্তৃত্ব ছিল। এই সম্রাট ছিলেন 'ঈসায়ী। ফোরাত ও দজলা নদীর উপত্যকাগুলোতে ইরানীদের পতাকা ছিল উড্ডীন। এরা ছিল অগ্নি-পূজক।

সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আঁ-হযরত (সা) পাঁচ বছর পর্যন্ত আবু তালিবের প্রতিপালনাধীন থাকেন। সে সময় কুরায়শ বংশের দু'টি শাখা কানানা ও হাওয়াযিন কবিলার ভেতর চারবার লড়াই সংঘটিত হয়। আর তা হরব-এ-ফুজ্জার বা অন্যায়কারীদের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এসব লড়াইয়ের শেষ ও চূড়ান্ত লড়াইয়ে হুযূর আকরাম (সা) আপন চাচা আবু তালিবের

সঙ্গে শরীক হন। কিন্তু এতে তিনি কারোর উপর আক্রমণোদ্যত হন নি, কাউকে ক্ষতিগ্রস্তও করেন নি। এ যুদ্ধে হাওয়াযিন পরাজিত হয়। আরব-বাসী এই ঘটনাকে 'য়াওমে শার্ব' নামে স্মরণ করে থাকে।

জীবিকার সংগ্রাম

আবু তালিবের সন্তান-সন্ততি ছিল অনেক। মক্কায় জীবিকার কোন উপকরণ কিংবা রুটি-রুজি উপার্জনের কোন মাধ্যম ছিল না। হযরতের বয়স তখন পনের বছর। একদিন তাঁর চাচা হযরতের নিকট নিজের আর্থিক দৈন্য-দশা ও তজ্জনিত বিব্রতকর অবস্থার কথা বলেন এবং এও বলেনঃ যদি তুমি তৈরি থাক তবে কোথাও তোমার চাকুরীর চেষ্টা করি। তিনি বললেনঃ চাচাজান! আমি এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আবু তালিব হযরতকে নিয়ে খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদের নিকট যান। খাদীজা ছিলেন মক্কার বিখ্যাত ধনবতী ব্যবসায়ী। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি বিধবা হন। পিতাও বহু ধন-দৌলত রেখে মারা যান। খাদীজা ছিলেন সে সব সম্পদের একচ্ছত্র মালিক। তেজারতী কারবার ছাড়াও উট, গাভী, ভেড়া, বকরীও ছিল তাঁর অগণিত। স্বামীর মৃত্যুর পর মক্কার নেতৃবৃন্দের অনেকেই তাঁর নিকট শাদীর পয়গাম পাঠিয়েছিল। কিন্তু তিনি তা কবুল করেন নি। আবু তালিব পরিচয় করিয়ে দেবার পর হযরত খাদীজা (রা) যিনি হযরতের বিশ্বস্ততা ও শরাফতীর খ্যাতি ইতিপূর্বেই শুনেছিলেন, হযরত (সা)-কে তাঁর বাণিজ্য কাফেলার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেন। খাদীজার তেজারতী কাফেলার কয়েকজন ব্যবস্থাপক ছিল। তাদের সবার নেতৃত্বে ছিলেন মায়সারা নামের আযাদকৃত একজন গোলাম। যেহেতু তিনি (খাদীজা) হযরতের মেহনত, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততায় প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিতা ছিলেন, সেজন্য মায়সারাকে তিনি বিশেষভাবে তাকীদ করে দেন যেন সে মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখে এবং কাফেলার প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর সম্পর্কে পুরো রিপোর্ট পেশ করে।

কাফেলা সিরিয়ায় পৌঁছুলে সেখানে এক মনযিলে নসতূরা নামের এক 'ঈসায়ী রাহেবের গির্জার নিকট যাত্রা বিরতি করে। আঁ-হযরত একটি গাছের নীচে বসা ছিলেন। উক্ত রাহেব হযরতকে দেখা মাত্র ছুটে আসেন

এবং বলেন ঃ গাছের তলদেশে যে নওজোয়ান বসে আছেন তিনি কে? মায়সারা জবাব দেয় ঃ ইনি কুরায়শ সর্দারের পুত্র এবং এ কাফেলার সর্দারও বটেন! রাহেব বললেন ঃ ইনি শুধু কাফেলার নয়, কোন এক সময়ে ইনি সারা দুনিয়ার সর্দারও হবেন। এ কথা শুনে মায়সারা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয় এবং এর কারণ জানতে চায়। রাহেব বললেন ঃ এই বৃক্ষের নীচে আজ পর্যন্ত নবী ভিন্ন অপর কেউ উপবেশন করে নি। তাঁর চোখ এবং অপরাপর আলামত পরিষ্কার বলছে, ইনি আমাদের কিতাবের লিখিত বর্ণনা মুতাবিক আখেরী যমানার নবী হবেন। আফসোস, সে সময় আমি জীবিত থাকব না! হায়! আমি যদি তাঁর খেদমত করে নাজাত লাভ করতে পারতাম! এরপর রাহেব মায়সারাকে তাঁর উপর খেয়াল রাখতে এবং তাঁকে একাকী না ছেড়ে দিতে বিশেষভাবে তাকীদ করেন।

কাফেলার মাল-সামান কয়েক দিনের ভেতরই হাতে হাতে কয়েক গুণ মুনাফায় বিক্রি হয়ে যায়। এ সফরে এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটে যদ্দ্বারা কাফেলার সকলেই আঁ-হযরত (সা)-এর ভক্তে পরিণত হয় এবং তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার গুণগ্রাহী হয়ে ওঠে। ফেরার পথে মক্কার অল্প দূর বাকী থাকতেই কাফেলার লোকেরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, মুহাম্মদ (সা) স্বীয় সওয়ার হাঁকিয়ে সামনে অগ্রসর হবেন এবং সবার আগে গিয়ে খাদীজাকে এই বিপুল মুনাফার তথ্য অবহিত করবেন। বর্ণিত আছে যে, সে সময় খাদীজা স্বীয় প্রাসাদের ছাদে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি দেখতে পান যে, একজন নওজোয়ান ছুটে আসছেন দ্রুত উট হাঁকিয়ে এবং এক টুকরো মেঘ আগাগোড়া তাঁর মস্তকে ছায়া প্রদান করে আসছে। তিনি তাঁর দ্বার-রক্ষককে পাঠিয়ে দেন জেনে আসতে যে, আসলে লোকটা কে এবং কোথা থেকে আসছে। সে যখন হযরতের কাছে পৌঁছুল তখন তিনি পরিচয় দিয়ে বলেন ঃ আমি তো তাঁরই কাফেলার সর্দার। কাফেলার লোকদের সিদ্ধান্তক্রমে খাদীজাকে এবারের অর্জিত বিপুল মুনাফার সুসংবাদ শোনাবার জন্যই সর্বাগ্রে চলেছি। কাফেলার অবশিষ্ট লোকেরাও ইতিমধ্যে এসে পড়ে। খাদীজা মায়সারা ও অন্যান্য দলপতিকে হযরতের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সবাই তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে এবং মায়সারা 'ঈসায়ী রাহেব বর্ণিত সকল কথাই খুলে বলে। রাহেবের কথা ও প্রদত্ত উপদেশ খাদীজার অন্তরে দারুণ রেখাপাত করে। অতঃপর এ ছাড়াও ফেরার পথে এক টুকরো মেঘকে হযরতের

মাথায় ছায়া প্রদান করতে তিনি নিজেই দেখেছিলেন। ফলে আঁ-হযরত (সা) সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণায় তখন একটা নতুন জগত জন্ম নিতে শুরু করে। কিছু দিন তিনি তাঁর ধ্যান-ধারণাকে গোপন ও প্রচ্ছন্ন রাখেন। এরপর এমন একটি সময় এসে উপস্থিত হয় যখন তিনি নিয়ম মাফিক হযরত (সা) -কে শাদীর পয়গাম পাঠান। হযরত (সা) জানান ঃ এ ব্যাপারে আমার চাচা আবু তালিবের মতামত ও অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক। সুতরাং খাদীজা (রা) আপন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফলের হাতে আবু তালিবকে পয়গাম পৌঁছুবার সঙ্গে মূল্যবান তোহফাও পাঠিয়ে দেন। আবু তালিব উভয়ের বয়সের ব্যবধান থাকার কারণে ইতস্তত করছিলেন। কেননা আঁ-হযরত (সা)-এর বয়স তখন পঁচিশ বছর আর বিবি খাদীজার বয়স চল্লিশ। কিন্তু আবু তালিবের স্ত্রীর পরামর্শক্রমে সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়। আবু তালিব আত্মীয় -বান্ধবসহ হযরত (সা)-কে সঙ্গে নিয়ে খাদীজার ঘরে গিয়ে ওঠেন। এখানেই বিয়ে হয় এবং আবু তালিব খুতবা প্রদান করেন।

এই হচ্ছে হযরত (সা)-এর পঁচিশ বছরের পবিত্র জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া চিত্র। কিন্তু এর উপর কোনরূপ পর্যালোচনা করার পূর্বে এটা দেখা দরকার যে, দশ বছর বয়স থেকে পঁচিশ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত তাঁর জীবন-বৃত্তান্ত ও ঘটনার গুরুত্ব কি? তাঁর ভবিষ্যত জীবনের এবং সে জীবনের মিশনের উপর তার কী প্রভাব পড়েছে এবং সে সময়কার অর্জিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে ভবিষ্যতে তিনি কি কাজ সম্পাদন করেছেন? সংক্ষেপে তা এভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

১. দশবছর বয়ঃক্রমকালে তিনি সেই সব ভূখণ্ড প্রথম চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেন যার উপর অগ্রসর হয়ে তাঁকে ভবিষ্যতে চূড়ান্ত লড়াই লড়তে হয়। এরপর দ্বিতীয় দফা সে সময় দেখেন যখন তিনি উপলব্ধি ও সাবালকত্বের বয়সে গিয়ে উপনীত হয়েছেন। এর সমস্ত রাস্তা, মনযিল, পাহাড় ও মরু-ভূমির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় এবং প্রয়োজনীয় ও বিস্তারিত তথ্য লাভ করেন। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার এ ধরনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন অত্যন্ত প্রয়োজন।

২. পনের বছর বয়সে ফুজ্জার যুদ্ধে শরীক হয়ে তিনি যুদ্ধের পন্থা ও মূলনীতিসমূহের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। একজন স্বচ্ছ চিন্তার

অধিকারী, তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক, দৃঢ় মনোবল, প্রখর মেধা ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন দূরদর্শী ও সতর্ক যুবকের পক্ষে এ অভিজ্ঞতা অত্যন্ত ফলদায়ক ও উপকারী প্রমাণিত হয়েছে।

৩. এই বয়সে তিনি আরবের তপ্ত মরুভূমিতে পর পর কয়েক বছর পর্যন্ত কঠোর মেহনত ও কষ্টসাধ্য জীবন যাপন করে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং অল্পে তুষ্টি লাভের প্রশিক্ষণ লাভ করেন, জীব-জানোয়ারের রক্ষণাবেক্ষণ ও পশুপাল চরানোর গুরুত্ব সঠিকভাবে উপলব্ধি করেন। প্রান্তর ও ময়দানের যিনি সর্দার—তাঁর জন্য এ প্রশিক্ষণ খুবই দরকার ছিল।

৪. তিনি কাফেলার সর্দারীর অভিজ্ঞতা লাভ করে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি শেখেন। তিনি কাফেলার ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা রক্ষা এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে পুরো ওয়াকিফহাল হয়ে যান। এভাবেই বিভিন্ন জাতের ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নেতৃত্ব করে সিপাহসালারের যিম্মাদারী সম্পূর্ণরূপে বুঝে নেন।

৫. তাঁর সত্যবাদিতা, ঈমানদারী, সহমর্মিতা, কঠোর পরিশ্রম ও সাহসিকতার স্থায়ী ছাপ নিকট ও দূরের লোকজনের উপর স্থায়ীভাবে পড়েছিল। একজন সিপাহসালারের জন্য এসব গুণাবলী অপরিহার্য। অতীত ও বর্তমানের বড় বড় সব সামরিক পর্যবেক্ষক এবং প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ এ ব্যাপারে একমত যে, সেনাধ্যক্ষের ভেতর এসব গুণাবলী থাকা অপরিহার্য। আঁ-হযরত (সা) এই বয়সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা এবং নিজস্ব প্রশংসনীয় গুণাবলীর দিক দিয়ে সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কসুলভ উন্নততর ও উত্তম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর তীক্ষ্ণ সজাগ মস্তিষ্ক ও দূরদর্শিতা এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে তাঁর বিরাট সাহায্যকারী ও সহযোগী বানিয়ে দিয়েছিল।

বিয়ে-শাদীর পর

আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পর হযরত খাদীজা (রা) নিজের সকল গহনাপত্র, নগদ অর্থ-কড়ি, সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি স্বীয় আত্মীয়-স্বজন ও শ্রদ্ধেয় অভিভাবকদের জানিয়ে হযরতের হাওয়ালা করে দেন। আঁ-হযরত (সা)স্বীয় স্ত্রী হযরত খাদীজা (রা)-এর সম্মতিক্রমে সে সব গরীব ও অভাবী লোকদের ভেতর বন্টন করে দেন। যত গোলাম

-বাঁদী ছিল সবাইকে আযাদ করে দেন এবং হুযূর আকরাম (সা) স্বীয় সম্মানিতা স্ত্রীর সঙ্গে দরবেশী জীবন যাপন করতে থাকেন।

কা'বা ঘর নির্মাণ

৬০০ 'ঈসায়ীতে মক্কায় অত্যধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়। এর দরুন কা'বা ঘরের বুনিয়াদে ফাটল সৃষ্টি হয়। ফলে সকল কবিলা সম্মিলিত ভাবে তা পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লোহিত সাগরে একটি জাহাজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কুরায়শরা তার কাঠগুলো খরিদ করে তা দিয়ে কা'বার ছাদ বানাবার সামান যোগাড় করে। কা'বায় একটি অন্ধকূপ ছিল যেখানে লোকেরা তাদের নজরানা নিক্ষেপ করে যেত। সে সব টাকা-কড়ি বের করে তা দিয়ে নির্মাণের আবশ্যকীয় কার্য সম্পূর্ণ করার ফয়সালা করা হয়। কিন্তু যখনই কোন সময় নির্মাণ কাজ শুরু করার ইচ্ছা করা হয়েছে—তখন কোন না কোন ঘটনা এমনভাবে এসে দেখা দিয়েছে যাকে কুলক্ষণ মনে করে সব কিছু মুলতবী করে দেওয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যখন নির্মাণের সময় এল তখন এর কাজের সব কিছু সকল কবিলার ভেতর ভাগ করে দেওয়া হ'ল। এই কর্মবন্টনকে সবাই মেনে নেয়। কিন্তু হাজারে আসওয়াদ সরানো এবং পূর্বের স্থানে পুনঃস্থাপনের প্রশ্নে ঝগড়া বেধে যায়। প্রতিটি কবিলাই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রাধিকারের দাবিতে এই গৌরবজনক কাজ সম্পাদন করে গর্বিত হতে চাচ্ছিল। ফলে ঝগড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সকল কবিলাই লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়। শেষ অবধি মক্কার একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, কাল ভোরে যে ব্যক্তি বনী শায়বা দরজা দিয়ে সর্বপ্রথম কা'বা ঘরে প্রবেশ করবে তাঁকে সালিশী মানা হবে এবং তিনি যে ফয়সালা দেবেন তার উপর আমল করা হবে। ঘটনাক্রমে পরদিন ভোরে উল্লিখিত দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন হযরত রসূলে করীম (সা)। তিনি তখন 'আল-আমীন' উপাধিতে মশহূর হয়ে আছেন। তাঁর সত্যবাদিতা ও আমানতদারী সর্বজনস্বীকৃত ছিল। তাঁকে দেখে সকলেরই মুখ খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সবাই বলতে থাকে : 'আল-আমীন' এসে গেছেন। তিনি যে ফয়সালা দেবেন তা মেনে নিতে আমরা সবাই রাযী আছি। তিনি এ ঝগড়া এমনই বুদ্ধিমত্তা ও সুন্দরতম পন্থায় মিটিয়ে দেন যে, সব কবিলাই

এতে তৃপ্ত হয়। তিনি প্রথম একটি চাদর বিছান। অতঃপর স্বহস্তে হাজারে আসওয়াদ উঠিয়ে তার উপর রাখেন। এরপর কবিলার প্রতিনিধিদের ডেকে বলেন চাদর ধরে হাজারে আসওয়াদ উঠিয়ে নিতে। সবাই উঠিয়ে নেয় এবং স্থাপনের জায়গায় এটাকে নিয়ে পৌছুলে তিনি স্বহস্তে পুনরায় তা উঠিয়ে সেখানে রেখে দেন। আর এভাবেই একটি বিরাট ঝগড়ার অবসান ঘটে।

ধ্যান-সাধনা

আঁ-হযরত (সা)-এর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর। বেশীর ভাগ সময় তাঁর ধ্যান ও সাধনার ভেতর কাটত। শহরের বাইরে হেরা গুহায় পরপর কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি অবস্থান করতেন এবং সেই সত্যের সন্ধানে মগ্ন থাকতেন যার বাসনা তাঁর দিলকে সর্বদাই বেকারার করে রাখত। এভাবেই অনেক মাস ও বছর হ'ল অতিবাহিত। অবশেষে 'ঈসায়ী ৬১১ সনে ২৭ রমযান হযরতের চল্লিশ বছর বয়সে জিবরাঈল (আ) হেরা গুহায় তাঁর নিকট আগমন করেন এবং বলেনঃ পড়ুন। হযরত জবাব দিলেনঃ আমি উম্মী,— পড়তে জানি না। এতে হযরত জিবরাঈল (আ) নবী করীম (সা)-কে আপন বুকে জড়িয়ে এত জোরে চাপ দেন যে, ভয়ে ও কষ্টে তিনি ঘাবড়ে যান। এরপর জিবরাঈল (আ) পুনরায় রাসূল করীম (সা)-কে পড়তে বলেন। তিনি ভীতভাবে পড়লেন, اقراء باسم ربك الذى خلق অর্থাৎ 'পড় তোমার রব-এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।" এরপর জিবরাঈল (আ) চলে যান। এ ঘটনায় হযরত (সা) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি সেখান থেকে সরাসরি ঘরে তশরীফ নেন এবং হযরত খাদীজা (রা)-কে বলেনঃ আমাকে কম্বলাবৃত কর। তিনি কম্বলাবৃত করেন এবং অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। হযরত (সা) দ্বিধাজড়িত কন্ঠে ভীত হবার কারণ বর্ণনা করেন এবং বলেনঃ আমি আশ্চর্য ধরনের ঘটনায় পড়েছি। হযরত খাদীজা (রা) বলেনঃ আল্লাহ্ পাক আপনাকে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন ও হেফাজত করবেন। আপনি সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও রহম-দিল; আপনি অপরের বিপদ-মুসীবতে গিয়ে কাজে লাগেন, মিসকীন ও অভাবী লোকের

সাহায্য করেন; অতএব আল্লাহ্ পাক আপনাকে কখনই একাকী পরিত্যাগ করবেন না। আমার একান্ত বিশ্বাস---আপনি নবী হবেন।

এরপর হযরতকে সঙ্গে নিয়ে তিনি তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফলের কাছে যান এবং সব কিছু খুলে বলেন। ওয়ারাকা ছিলেন 'ঈসায়ী এবং স্বীয় মাযহাবের একজন বিরাট 'আলিম। হযরত খাদীজা (রা)-এর বর্ণনা শুনে তিনি বললেনঃ খাদীজা! ঘটনা যদি এ ধরনেরই ঘটে থাকে যার বর্ণনা তুমি দিলে—তবে কসম সেই পবিত্র সত্তার যাঁর কব্জায় আমার জীবন, ইনিই সেই ফেরেশ্‌তা জিবরাঈল যিনি হযরত মূসা (আ)-এর নিকট এসেছিলেন। আমার জ্ঞান আমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছে যে, ইনিই উম্মতের নবী হবেন। কিন্তু রিসালতের প্রকাশ এবং সত্যের প্রতি দা'ওয়াত জানাবার কারণে তাঁকে নিদারুণ তকলীফ স্বীকার করতে হবে, কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে।

ইসলামের সূচনা

اقراء باسم ربك ওয়াহীর মাধ্যমে তাঁকে নবুওত দান করা হয় এবং يا ايها المدثر আয়াত দ্বারা রিসালত প্রদান করা হয়। বর্ণিত আছে যে, একদিন আঁ-হযরত (সা) আরাম করছিলেন। ইতিমধ্যে হযরত জিবরাঈল (আ) আসেন এবং আওয়াজ দেনঃ ওঠ, কাপড় পবিত্র রাখ, অপবিত্র ও নাপাক বস্তু থেকে দূরে অবস্থান কর, মানুষকে আল্লাহ্‌র 'আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন কর এবং আপন 'রব'-এর মাহাত্ম্য বর্ণনা কর। জিবরাঈল (আ) হযরতকে ওযূ করতে শেখান এবং সালাত আদায় করান। অতঃপর তিনি ঘরে ফেরেন, হযরত খাদীজা (রা)-কে ওযূ করতে শেখান এবং সালাত আদায় করান। এভাবে হযরত খাদীজা (রা) সকলের আগে ইসলাম কবুল করেন। এরপর হযরতের চাচাতো ভাই 'আলী (রা) ঈমান আনেন এবং একত্রে সালাত আদায় করেন।

ইসলামের দা'ওয়াত এখন থেকেই শুরু হয়ে গেল। আঁ-হযরত (সা) লোকদের আল্লাহ্‌র পয়গাম শুনিয়ে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে থাকেন। প্রাথমিক যুগে যখন সালাতের ওয়াক্ত এসে যেত হযরত তখন স্বীয় নও-মুসলিম বন্ধুদের নিয়ে মক্কার বিভিন্ন গিরিপথে চলে যেতেন এবং মুশরিক-দের বিরোধিতার ভয়ে লুকিয়ে সালাত আদায় করতেন। লোকেরা কিন্তু

সত্বরই এ খবর জানতে পারে। তাওহীদের আওয়াজে মুশরিক ও কাফিররা ছিল পেরেশান। তারা হযরতের বিরুদ্ধে শত্রুতা শুরু করে। কতক লোক আফসোস করত এবং বলত যে, বড় সৎকর্মশীল, সত্যবাদী আর আমানতদার মানুষ ছিল মুহাম্মদ। কিন্তু গুহায় রিয়াযত (কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা) -এর ফলে এখন আর তাঁর মাথার ঠিক নেই। আরবের লোকেরা ছিল হয় মুশরিক ও মূর্তিপূজক নতুবা কাফির ও বে-দীন। তাদের নিকট তাওহীদ ও রিসালতের আওয়াজ খুব আশ্চর্যজনক ও অদ্ভুত মনে হয়। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 'আকীদা-বিশ্বাস, আচার-অভ্যাস ও চাল-চলনের বিরোধিতার যা প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত স্বাভাবিকভাবেই তা-ই হ'ল। যত দিন এ দা'ওয়াত একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির ভিতর ছিল আবদ্ধ ততদিন মুশরিক ও কাফিররা বিরোধিতার ব্যাপারে ততটা কঠোরতা অবলম্বন করেনি। কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের ফরমান মুতাবিক যখন প্রকাশ্যভাবে তবলীগ শুরু হ'ল তখন এ বিরোধিতাও সকল গণ্ডি ও সীমারেখা উল্লঙ্ঘন করে। শত্রুতা সাধন, গালি-গালাজ ও শোরগোল সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোন অপচেষ্টাই আর বাদ রইল না। কিন্তু আবু তালিব ছিলেন কুরায়শ সর্দার এবং কা'বা ঘরের মুহাফিজ ও মুতাওয়াল্লী আর মক্কার সমস্ত লোকই তাঁকে সম্মান ও সমীহ করত, সেজন্য রসূলে করীম (সা)-কে কেউ ক্ষতি সাধন করতে সাহসী হয়নি। অবশ্য ইসলামের প্রকাশ্য তবলীগের সঙ্গে শিরক ও মূর্তিপূজার বিরোধিতা যে পরিমাণে হ'ত কাফিররাও সে পরিমাণ ক্রোধান্বিত হ'ত। সুতরাং তারা আবু তালিবের নিকট অভিযোগ দায়ের করেঃ আপনি আপনার ভাতিজাকে কা'বার উপাস্য দেবীদের খেলাফ কথা বলতে ও বক্তৃতা দিতে বারণ করুন। কিন্তু এ অভিযোগে কোন ফল হ'ল না। আঁ-হযরত (সা) বরাবরের মতই তবলীগের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কাফিররা সত্যের এই আওয়াজকে রুখতে কোনভাবেই সফল ও কামিয়াব হতে পারল না। তিন বছর গেল এভাবেই। হুযূর আকরাম (সা) খুশীর মাহ্ফিলে কিংবা বিষাদের দরবারে, বাজারের অলিগলিতে কিংবা মক্কার বাৎসরিক মেলায়, মোট কথা প্রতিটি স্থানে সময় সুযোগ ও মওকা মিলতেই লোকদেরকে আল্লাহ্র পয়গাম শোনাতেন আর কাফির ও মুশরিকরা তাঁর উপর ঠাট্টা ও বিদ্রুপ-বাণ ছুঁড়ে মারত, নিক্ষেপ করত বিষাক্ত বাক্য-বাণ। তারা তাঁকে পাগল ঠাওরাত, পথ চলতে শোরগোল করত। 'ঈসায়ী ৬১৩ সনে সাফা পর্বতে আরোহণ

করে তিনি মক্কার কুরায়শদের একত্রিত করেন। সবাই তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার স্বীকৃতি দেয়। তাওহীদের আওয়াজ কানে যেতেই তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়। একদিকে ছিল এই বিরোধিতা যা আস্তে আস্তে শত্রুতায় পর্যবসিত হচ্ছিল, অপর দিকে মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছিল। কাফিরকুল আবু তালিবের কারণে আঁ-হযরত (সা)-কে কোনরূপ ক্ষতি সাধন করতে সমর্থ হচ্ছিল না। কিন্তু যে মুসলমানের উপরই একটু কর্তৃত্ব চলত তাকেই ভীষণ যন্ত্রণা দিত। বিরোধিতা ও শত্রুতার এই ক্রমবর্ধমান তুফানে আবু তালিবের মর্যাদা ছিল অত্যন্ত নাযুক। তিনি তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও যেমন যেতে পারছিলেন না—আবার আঁ-হযরত (সা)-এর বিচ্ছেদ-যন্ত্রণাও সইতে পারছিলেন না। হযরতের সঙ্গে তাঁর শুধু স্নেহ-প্রীতির সম্পর্কই ছিল না, তিনি তাঁকে উত্তম স্বভাব-বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর কারণে সম্মান ও শ্রদ্ধাও করতেন। লোকেরা দেখল, তাঁর নিকট অভিযোগ পেশের কোন আছরই হচ্ছে না, তখন কবিলার সর্দারবৃন্দ মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল, মুসলমানদের কঠিন শাস্তি দিতে হবে। প্রথম থেকেই মুসলমানদের উপর জুলুম-নিপীড়ন চলছিল। এই ফয়সালার পর শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার আর কোন আশাই রইল না। তখন আঁ-হযরত (সা) তাদের আবিসিনিয়ায় চলে যাবার পরামর্শ দিলেন। এরই প্রেক্ষিতে মুসলমানদের একটি ছোট্ট কাফেলা লুকিয়ে আবিসিনিয়ায় গমন করে। এই অবস্থা দেখে তারা সেখানেও মুসলমানদের পিছু নেয় এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারে নিজেদের লোক পাঠিয়ে দাবী জানায়, এসব লোকেরা কলহপ্রিয় ও পাপী সম্প্রদায়। তাদেরকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। তাদের সে অভিযান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এ ব্যর্থতায় তাদের ভেতর প্রতিশোধ-স্পৃহা শত গুণ বর্ধিত হয়। তারা মুসলমানদের বয়কট করতে শুরু করে এবং আঁ-হযরত (সা)-এর মাথা কেটে আনবার জন্য একটা বিরাট অংকের পুরস্কার ঘোষণা করে। এজন্য মহাবীর ওমর তৈরি হন। কিন্তু হযরতকে কতল করার পরিবর্তে তিনি নিজেই মুসলমান হয়ে যান। এ অস্ত্রও যখন ব্যর্থ হ'ল—তখন কাফিররা লোভ দেখাতে শুরু করল এবং বলে পাঠাল যে, মুহাম্মদ (সা)-এর যদি খাহেশ হয় তাহলে আমরা তাঁর জন্য সোনা-দানা ও টাকা-কড়ির স্তূপ বানিয়ে দেব। যদি তিনি ক্ষমতার অভিলাষী হন তবে তাঁকে নেতৃপদে বরণ করব; আর

কোন বড় ঘরের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীকে শাদী করতে চাইলে তাও দিতে পারি। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে এ সবের কী সম্পর্ক! তিনি এসব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। আবু তালিব কুরায়শদের শত্রুতার পরিমাপ করে বনী হাশিম গোষ্ঠীর সাহায্য চাইলেন। বনী হাশিম সাহায্যের জন্য তৈরি হলে কুরায়শরা তাদেরকেও বয়কট করে। এ ঘটনা 'ঈসায়ী ৬১৬ সনের। শেষাবধি অবস্থা অত্যন্ত নাযুক হয়ে দেখা দিলে এবং কুরায়শদের কঠোর শৃঙ্খলের হাত থেকে বাঁচার আর কোন সম্ভাবনা ও উপায়ান্তর না দেখে আঁ-হযরত (সা)-এর হেফাজতের জন্য আবু তালিব তাঁর পুরো খান্দানসহ পাহাড়ের একটি ঘাটিতে চলে যান। এই ঘাটি পরে 'শা'বে আবু তালিব' বা 'আবু তালিব গিরিসংকট' নামে মশহুর হয়। এই ঘাটিতে হুযূর আকরাম (সা), আবু তালিব এবং তাঁদের গোটা খান্দান তিন বছর অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট, আর্থিক অনটন ও সংকটের ভেতর কাটান। কুরায়শরা খানাপিনার সামগ্রী পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। খাবার মতো কোন কিছুই যখন আর অবশিষ্ট রইল না, তখন বৃক্ষের লতাপাতা, ছাল ও শুকনো চামড়া চিবিয়ে চিবিয়ে কাল কাটিয়েছেন। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর তবলীগের ধারা অব্যাহতই রইল। যে গোত্রই কা'বা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন করত কিংবা মেলা অথবা বাজারে একত্রিত হ'ত---তিনি তাদের নিকট গমন করতেন, আল্লাহ্ তা'আলার পয়গাম পৌঁছে দিতেন, শির্ক ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে তওহীদবাদী ও মুসলমান হবার জন্য উৎসাহিত করতেন। তিন বছর পর নবী করীম (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা অবহিত করেন যে, কুরায়শরা অন্যান্য গোত্র ও কবিলার সঙ্গে বয়কটের যে অঙ্গীকার করেছিল তার লিখিত ঘোষণাপত্রটি আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত না হওয়ায় তা কীটদষ্ট হয়ে গেছে। আঁ-হযরত (সা) বিষয়টি নিয়ে আবু তালিবের সঙ্গে আলোচনা করেন। আবু তালিব অঙ্গীকারের ঘোষণা-পত্রটি চেয়ে পাঠান। দেখা গেল তা আর পাঠযোগ্য নেই। ঠিক সে মুহূর্তেই ঘোষণা-পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হ'ল। আর ঘাটি থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'ল বনী হাশিম।

আব তালিব গিরিবর্ত্মের মুসীবতের যুগে আঁ-হযরত (সা)-এর সহ-ধর্মিনী হযরত খাদীজা (রা) ইহধাম ত্যাগ করেন। এরপর বয়কটের কঠিন দিনগুলো থেকেও অব্যাহতি মিলল। । হুযূর আকরাম (সা) সকল খান্দান সমেত মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তার কিছু দিন পর চাচা আবু

তালিবেরও ইন্তিকাল হ'ল। তাঁর ইন্তিকালে মুশরিকদের উৎসাহ গেল আরও বেড়ে। তারা রসূল করীম (সা)-কে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগল।

মক্কায় কষ্ট ও নির্যাতনের অব্যাহত ধারা চলছিল। সত্যের পয়গাম তায়েফবাসীদের কানে পৌঁছুবার উদ্দেশ্যে তিনি তায়েফ গমন করেন। কাফিররা তাঁর পেছনে কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তিকে পাঠিয়ে দেয়। তাদের কুৎসায় তায়েফবাসীরা হযরতের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেই ক্ষান্ত থাকে নি, তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং কোনরূপ আশ্রয় দিতেও অস্বীকার করে। তাই নয়, তারা অত্যন্ত বদ আচরণ করে। যখন তিনি ফিরে আসছিলেন তখন অসভ্য ও উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা হযরতকে এত পাথর মেরেছিল যে, তিনি একেবারে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। নবূওতের একাদশ বছরে মক্কায় মে'রাজের ঘটনা সংঘটিত হয়। তিনি আসমানের উপর তশরীফ নেন এবং আল্লাহ্ পাকের সঙ্গে কথাবার্তা বিনিময় করেন।

ইসলামের তবলীগ তথা প্রচার ও প্রসার ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। কাফির ও মুশরিকদের শয়তানী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে আবু তালিবের ব্যক্তিসত্তা পৃথিবীতে রসূলে করীম (সা)-এর হেফাজতের একটি বড় মাধ্যম ছিল। তাঁর ইন্তিকালে আর কোন প্রতিবন্ধকতা রইল না। ফলে ইসলামের দুশমনেরা তাদের ঘৃণিত ইচ্ছার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। কিন্তু তথাপিও আঁ-হযরত (সা)-এর দৃঢ়তায় ও স্থৈর্যে এতটুকু চিড় ধরে নি। তবলীগের অব্যাহত ধারায় একদিন য়াছরিবের আওস ও খাযরাজ গোত্রের কিছু লোকের নিকট তিনি গমন করেন। তারা মক্কার উপকণ্ঠে 'আকাবা নামক উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। তারা কা'বা যিয়ারত করতে এসেছিলেন। তিনি তাদেরকে আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছান এবং ইসলামের সৌন্দর্য তাদের সামনে তুলে ধরেন। তারা মুসলমান হন। পরের বছর য়াছরিব থেকে আরও কিছু লোক মক্কায় আসেন। তিনি তাদের মধ্যেও ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। তারাও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তারা শুধু মুসলমানই হননি, হযরতকে য়াছরিবে যাওয়ারও দা'ওয়াত দেন, ঘোষণা করেন সত্যের হেফাজত ও সহায়তা প্রদানের। আঁ-হযরত (সা) তাদের দা'ওয়াত কবুল করেন। এই নও-মুসলিমেরা য়াছরিব প্রত্যাগমন ক'রে সেখানকার লোকদের ভেতর ইসলামের ব্যাপক চর্চা ও আলোচনা শুরু করেন। তারা হযরতের প্রশংসনীয় গুণাবলী ও অনুপম চরিত্রের বর্ণনা দেন। এর ফলে য়াছরিবের অন্যান্য

লোকজনের অন্তরেও ইসলামের সৌন্দর্য বাসা বাঁধতে শুরু করে এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে।

মক্কাবাসী যখন য়াছরিবে ইসলামের উন্নতি ও প্রসারের খবর পেল তখন তারা ইসলামকে জড়ে-মূলে উৎখাত করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিল। নেতৃস্থানীয় লোকেরা মিলিত হয়ে এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, আঁ-হযরত (সা)-কে কতল করা হোক। শুধু কতল করাই নয়, কতলের পুরো পরিকল্পনা তৈরী করে তারা তাকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে লোকও নির্বাচিত করে ফেলে। এর সঙ্গে সঙ্গে যেসব লোক ঈমান এনেছিল তাদেরকেও সম্ভাব্য সকল উপায়ে আক্রমণের শিকারে পরিণত করতে শুরু করে। মুসলমানদের পক্ষে মক্কায় অবস্থান অসহনীয় ও অসম্ভব হয়ে উঠল। আঁ-হযরত (সা) তাদের হিজরত করে য়াছরিব চলে যাবার জন্য পরামর্শ দেন। এতে ক্রমান্বয়ে এক শতের মত পরিবার য়াছরিব গমন করে। কাফির কুরায়শকুল যখন খবর পেল যে, একমাত্র নবী করীম (সা), ‘আলী ও আবু বকর ছাড়া আর সব মুসলমান য়াছরিব পৌঁছে গেছে তখন তারা তাদের পরিকল্পনাকে সত্বর কার্যকর করার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা গ্রহণ করে। একদিন রাতের বেলা এই কাজে নিযুক্ত কাফিররা হযরত (সা)-এর ঘর ঘেরাও করে এবং তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে। সবার অলক্ষ্যে আঁ-হযরত (সা) এই ঘেরাও থেকে বেরিয়ে হযরত আবু বকর (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে তিন দিন যাবত ছওর গিরিগুহায় আত্মগোপন করে থাকেন। কাফিরদের এই ব্যর্থতা অত্যন্ত দুঃসহ মনে হয়। তারা হযরত নবী করীম (সা)-কে গ্রেফতার করবার জন্য জনতার মাঝে বিরাট অংকের পুরস্কার ঘোষণা ক'রে সবাইকে লোভাতুর করে তোলে, সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে গুপ্তচর প্রেরণ করে, কিন্তু ব্যর্থতা ছাড়া তাদের আর কিছুই জোটেনি। আঁ-হযরত (সা) দেখলেন বিপদ অনেকটা কেটে গেছে। তিন দিন পর তিনি দূরতিক্রম্য ও দুস্তর মরুপথ অতিক্রম করে ‘ঈসায়ী ৬২২ সনের ২রা জুলাই য়াছরিব পৌঁছেন।

য়াছরিববাসীদের উপর হযরতের আগমন দারুণ রেখাপাত করে। তারা তাঁর সত্যবাদিতা, সাদাসিধে জীবন, ঈমানদারী, ন্যায়পরায়ণতা, দৃঢ় ও উন্নত মনোবল, বিশ্বস্ততা, প্রতিজ্ঞাপালন ও সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতাবোধ, একদম নিকট থেকে দেখার এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও উচ্চ মর্যাদার সঠিক পরিমাপ করার সুযোগ লাভ করেন। তাঁর পবিত্র সীরত ও কর্মের উত্তম

সৌন্দর্য যেই অবলোকন করত সেই মুগ্ধ ভক্তে পরিণত হ'ত এবং ঈমান আনয়ন করত। ফলে ইসলামের অনুসারীদের বৃত্ত ক্রমেই প্রসারিত হতে থাকে। বহু দিনের লালিত গোত্রীয় বিদ্বেষ দূরীভূত হয়ে যায়। মুহাজির ও আনসার ভাই ভাই-এ পরিণত হয়—রক্তের স্বাতন্ত্র্য যায় মুছে। তাদের গোটা জীবনটাই আগাগোড়া রহমতে পরিণত হয়। য়াছরিব এতদিন পর্যন্ত য়াছরিব নামেই পরিচিত ছিল। নবী করীম (সা)-এর আগমনের পর থেকেই তা মদীনাতুন্নবী বা নবীর শহর নামে নতুন পরিচিতি লাভ করে যা অদ্যাবধি মদীনা নামে সারা বিশ্বে মশহূর।

অন্যাদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা)

কোন এক কবি বলেছেন, 'প্রিয়তমের কথা অন্যদের মুখে শুনতে সব-চাইতে ভাল লাগে।' এই দৃষ্টিকোণ থেকে আঁ-হযরত (সা) সম্পর্কে ভিন্ন ধর্মী-দের কিছু বক্তব্য এই অধ্যায়ে উল্লেখ করা গেল।

প্রখ্যাত ফরাসী প্রাচ্যবিদ ডকটর গুস্তাভ লী মান তাঁর "আরব তমদ্দুন" নামক গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে একটি রিপোর্ট লিখেছেন। এখানে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ফ্রান্স ধর্মীয় দিক দিয়ে অত্যন্ত গোঁড়া ও প্রাচীন-পন্থী। সেখানে আজ পর্যন্তও রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচলিত এবং এটাই সেই দেশ যেখান থেকে ক্রুসেড যুদ্ধের প্রচণ্ড রণ-দামামা বেজে উঠেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সে যুদ্ধের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্ররূপে ছিল। তিনি লিখছেন ঃ

"এখন আরব ঐতিহাসিকদের সংবাদগুলো সামনে রেখে হযরতের ব্যক্তি-গত জীবন, আচার-আচরণ ও স্বভাবের চিত্র পেশ করতে কোশেশ করব। আবু'ল-ফিদা তাঁর সমসাময়িকদের বর্ণনার ভিত্তিতে লিখেছেন ঃ

"হযরত 'আলী (রা) রসূল করীম (সা)-এর প্রাথমিক অনুসারী। তিনি তার হুলিয়া এভাবে বর্ণনা করছেন, 'হযরত ছিলেন মধ্যমাকৃতির। মাথা ছিল বড় এবং দাড়ি মুবারক ছিল বেশ ঘন। শরীর ছিল সুঠাম, সুদৃঢ়, মযবুত ও বলিষ্ঠ। চেহারা মুবারক ছিল পরিপূর্ণ ও ভরা এবং শরীরের রঙ ছিল লাল ও সাদায় মিশ্রিত। রূহানী ভিত্তিতে তিনি তামাম দুনিয়া জাহানের ভেতর অগ্রগামী ছিলেন। অত্যধিক 'ইবাদত-বন্দেগী তাঁকে বাজে ও অনর্থক

বাক্য ব্যয়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। অধিকাংশ সময় তিনি নীরব থাকতেন। চেহারা থেকে উন্নত শ্রেণীর পুণ্য ঝরে পড়ত। স্বভাব ছিল অত্যন্ত অমায়িক ও ন্যায়পরায়ণ। পরিচিত ও অপরিচিত, সবল ও দুর্বল সবার প্রতি ছিল তাঁর একইরূপ দৃষ্টি। গরীব ও মিসকীনদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রেম ও দরদভরা ভালবাসা। গরীবদেরকে তাদের দারিদ্র্যের কারণে যেরূপ হেয় ও অবজ্ঞেয় মনে করতেন না, তদ্রূপ আমীর-উমারা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদেরও তাদের ক্ষমতা ও ধন-সম্পদের কারণে সম্মান করতেন না। সাহাবা এবং সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের এতখানি খাতির-যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করতেন যে, সাহাবীদের কখনো শক্ত জবাব দিতেন না এবং সাক্ষাৎ-প্রার্থী-দের কথাও অত্যন্ত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে শুনতেন---আর যতক্ষণ না তারা উঠত নিজে উঠবার ইচ্ছাও করতেন না। একইভাবে কেউ করমর্দন করলে তিনি নিজের হাত কখনই প্রথমে টেনে নিতেন না। যখন কোন ব্যক্তি কোন ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করত তখনও তাঁর এই অভ্যাস ছিল যে, তিনি নিজে আগে-ভাগে আলাদা হতেন না। অধিকাংশ সময় স্বীয় সাহাবীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য নিজেই গমন করতেন এবং তাঁদের খোঁজ-খবর নিতেন। নিজের বকরীগুলোর দুধ নিজেই দোহাতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করে পরিধান করতেন। মিসকীনদের জায়গা দিতেন। এঁরা আহলে সুফফাঃ নামে ইতিহাসে খ্যাত। এঁরা ছিলেন নিঃস্ব গৃহহীন আরব যাঁদের নিজের বলতে কিছুই ছিল না। রাতের বেলায় এঁরা মসজিদে নববীতে শুতেন এবং দিনের বেলায়ও সেখানেই উঠা-বসা করতেন। মসজিদের খোলা প্রাঙ্গণ ছিল তাঁদের উঠা-বসার স্থান। তিনি খাওয়ার সময় তাঁদের দু'একজনকে সঙ্গে নিয়ে খেতেন এবং বাকীজনদের সাহাবীদের ভেতর বন্টন করে দিতেন যেন সেখান থেকে তাঁদেরও রিযিক মেলে।

"আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন যে, হযরত (সা) এই নশ্বর দুনিয়া থেকে এভাবে বিদায় নেন যে, একবারও পেট ভরে যবের রুটি খাননি। অধিকাংশ সময় এমন হ'ত যে, দু' দুই মাস চুলো জ্বলত না এবং এসময়কার খাবার ছিল শুধু পানি এবং খোরমা। কখনও কোন সময় ক্ষুধার জ্বালা পেটে পাথর বেঁধে সইতে হয়েছে।"

এই বর্ণনায় অপরাপর আরব ঐতিহাসিকদের বর্ণনা থেকে এতটুকু আরও বর্ধিত হওয়ার দরকার যে, হযরতের নিজের নফসের উপর অসীম

নিয়ন্ত্রণ ছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উন্নত চিন্তাবিদ। খুবই স্বল্প ও সংযত বাক এবং সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। অনাড়ম্বরতা ছিল আশ্চর্য ধরনের। শরীর মুবারক অত্যন্ত পাক-সাফ রাখতেন। যখন তিনি বিপুল বিত্ত-সম্পদের অধিকারী তখনও কারও দ্বারা নিজের ব্যক্তিগত কাজ করান নি। কঠোর মেহনত ও পরিশ্রমের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি যে পরিমাণে কার্যক্ষম ছিলেন, সেই পরিমাণে ধৈর্যশীল ও শোকরগুযারও ছিলেন। আঠার বছর যাবত তাঁর খিদমতে নিয়োজিত ছিল যে গোলাম, তার বর্ণনা হ'ল, 'এই সময়ের ভেতর আঁ-হযরত (সা) কখনো তার উপর একবারও রাগ করেন নি।' যুদ্ধে ছিলেন সাহসী ও নির্ভীক। বিপদ থেকে কখনও পিছু হটেন নি, আবার বিনা কারণে বিপদের মুখেও নিক্ষেপ করতেন না নিজেকে। অতিমাত্রায় বীরত্ব ও সাহসিকতা মানুষকে অপরিণামদর্শী করে তোলে। তিনি কিন্তু তা ছিলেন না, বরং ছিলেন অতি মাত্রায় দূরদর্শী।

আঁ-হযরত (সা)-এর সারা জীবনের চেষ্টা ও সাধনার ফলশ্রুতি এই ছিল যে, তাঁর ওফাতের পর সমগ্র আরব জাতি ছিল ঐক্যবদ্ধ ও সংহত; তারা একই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং একই খলীফার অনুগত ও ফরমাবঁরদার ছিল। আঁ-হযরত (সা) যা হাসিল করতে চেয়েছিলেন এসব কি তারই ফলশ্রুতি ছিল?—এরূপ কিছু প্রমাণের প্রয়াস একেবারেই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে যেসব কার্যকারণ থেকে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে সব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই কম। ফলে সাধারণ ঐতিহাসিকরা এটাই ধরে নিয়েছেন যে, মহান ব্যক্তিদের চেষ্টা ও সাধনায় যে যোগফল অর্জিত হয়েছে—তা সবই তাঁদের দৃষ্টির আওতাধীন। কিন্তু এটা সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, এই সাধারণ নিয়ম একেবারেই গলদ ও ভ্রান্তিপূর্ণ।

যা-ই হোক, এ ব্যাপারে তো কারো কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আঁ-হযরত (সা) আরবের বুকে যে শুভ ফলাফল ও পরিণতি সৃষ্টি করে-ছিলেন ইসলামের পূর্বে অপর কোন ধর্ম ও মযহাব (যার ভেতর য়াহূদী ও নাসারাও শামিল) তা সৃষ্টি করতে পারেনি। হযরত (সা) আরববাসীর সঙ্গে সেই ব্যবহার ও আচরণ করেছিলেন যার পরিমাপ নিম্নোক্ত জওয়াব থেকে খুব ভালভাবেই করা যেতে পারে যা হযরত ওমর (রা)-এর দূত ইরান

সম্রাটের সম্মুখে আঁ-হযরত (সা)-এর মহানুভবতা ও বদান্যতা সম্পর্কে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ

"হে বাদশাহ! আমরা এমন হেয় অবস্থায় ছিলাম যে, আমাদের ভেতর কতক তাদের পেট পোকা-মাকড় ও সাপ-বিচ্ছু খেয়ে ভরত। কতক লোক নিজেদের কন্যা সন্তানকে এ কারণে মেরে ফেলত যেন তাদেরকে খানাপিনায় শরীক করতে না হয়। অজ্ঞতা, মূর্খতা ও মূর্তি-পূজার অন্ধকারে ফেঁসে বেআইনী ও লাগামহীন অবস্থায় সর্বদাই একে অপরের দুশমনীতে কোমর বেঁধে প্রস্তুত থাকত। লুট-মার এবং পরস্পরে একে অন্যকে ধ্বংস সাধন আমাদের নিত্যকার কর্ম ছিল। এটি ছিল আমাদের প্রথম দিককার চিত্র। কিন্তু এখন আমরা একটি নতুন জাতি। আল্লাহ্ পাক আমাদের মধ্যে এমন এক-জনকে সৃষ্টি করেন যিনি বংশীয় আভিজাত্য, মর্যাদাবোধ ও উপলব্ধি শক্তিতে সমগ্র আরবের ভেতর ছিলেন অগ্রগামী। আল্লাহ্ তাঁকে স্বীয় নবী ও রসূল মনোনীত করেন এবং তাঁর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দেন,—'আমি আল্লাহ্ একমাত্র ইলাহ্, পরমুখাপেক্ষীহীন, সমগ্র দুনিয়া ও আখেরাতের স্রষ্টা। আমার করুণা-সিন্ধু তোমাদের জন্য একজন পথ-প্রদর্শক পাঠিয়েছেন তোমা-দেরকে সঠিক ও সরলপথে আনয়ন করবার জন্য। যে রাস্তায় তিনি হেদা-য়েত করেন—তা তোমাদেরকে সেই 'আযাব থেকে বাঁচাবে যা আখেরাতে কাফির ও গোনাহ্গারদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যা তোমাদেরকে আমার 'আরশের সামনে আরাম-আয়েশের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।' এ শিক্ষা আমাদের অন্তরে পর্যায়ক্রমে প্রভাব ফেলে এবং আমরা আমাদের পয়গম্বরের হেদায়েত কবুল করি। আমরা মানি যে, আমাদের পয়গম্বরের মুখ-নিঃসৃত বাণী আল্লাহ্র কালাম এবং তৎকর্তৃক প্রদত্ত হুকুম-আহকাম আল্লাহ্রই আহকাম ও বিধান; যে মযহাব ও ধর্মের তা'লীম তিনি দিয়ে-ছেন তাই সত্য মযহাব ও সাচ্চা ধর্ম। তিনি আমাদের বিবেককে আলোকিত করেন এবং আমাদের জন্য আল্লাহ্-প্রদত্ত উপলব্ধি থেকে কানূন নির্ধারণ করেন।"

ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার পরিমাপ যদি তার কর্মের দ্বারা করা যায় তবে আমরা বলব যে, হযরত (সা) মানুষের ইতিহাসে বিরাট বড় ব্যক্তিত্ব হিসাবে অতিক্রান্ত হয়েছেন। প্রাচীন ঐতিহাসিকদের ধর্মীয় পক্ষ-পাতিত্বের কারণে তাঁর সকল কর্মের প্রতি পূর্ণ সুবিচার তারা করেন নি।

কিন্তু আধুনিককালের ঐতিহাসিকগণ ন্যায়বিচারে আগ্রহভরে এগিয়ে এসেছেন। মোঁসিয়ে বার্দ থলেমী সেন্ট হিলিয়ার—যিনি এ যুগের একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক—আঁ-হযরত (সা) সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"হযরত মুহাম্মদ স্বীয় যুগের আরবদের ভেতর সর্বাধিক বোধশক্তি-সম্পন্ন, সর্বাধিক আল্লাহ্ওয়ালা এবং সবচেয়ে বেশী রহমদিল মানুষ ছিলেন। তিনি যা কিছু ক্ষমতা লাভ করেন---নিজস্ব ফযীলতের ভিত্তিতে করেন এবং তিনি যে ধর্ম ও মযহাব প্রচার করেন তা—সেসব জাতিগোষ্ঠীর জন্য যারা এটাকে মনেপ্রাণে কবুল করেছে---একটি মহানেয়ামতে পরিণত হয়েছে।"

এসব গুণ যা অন্যেরাও স্বীকার করেছেন---প্রতিটি শব্দসহ উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল এজন্য যেন তার তুলনা করা যায় সেসব গুণ ও আচার-আচরণের সঙ্গে যা দুনিয়ার বড় বড় সামরিক পর্যবেক্ষকের মতে—একজন জেনারেলের ভেতর থাকা উচিত। আঁ-হযরত (সা)-এর প্রশংসনীয় গুণাবলীর আরও অধিক বর্ণনা সামনে অগ্রসর হয়ে করা হবে। কেননা এ ছাড়া তাঁর পরিচালিত যুদ্ধসমূহের গুরুত্ব এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যাবে না, আত্মস্থ করা যাবে না।

আঁ-হযরত (সা) একজন পয়গম্বর হিসাবে যে ধর্মও মযহাব প্রচার করেন তা অত্যন্ত সাদাসিধে ও আড়ম্বরহীন,---কিন্তু অত্যন্ত শানদার মযহাব এবং তা দু'টি ছোট্ট বাক্যে বলা যায় যা সামগ্রিকতা ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে অর্থের একটি বিশাল দুনিয়ার সমাহার অর্থাৎ لا اله الا الله محمد رسول الله (আল্লাহ্ ভিন্ন কোন ইলাহ্ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল)। এটাই সংক্ষিপ্ত ও সহজ সরলভাবে ইসলামের প্রাণস্বরূপ এবং একত্ববাদের নিশানা। এটাই ইসলাম ও মুসলমানদের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের উৎস। এ থেকে সাংস্কৃতিক কল্যাণের যে স্রোতধারা প্রবাহিত হয় তা মানব জীবনের গোটা জগতকে প্লাবিত ও সবুজ শ্যামল করতে করতে পথ চলে।

তকদীর

কর্ম ও উপর্যুপরি কর্মের নাম হচ্ছে জীবন। আর ইসলাম এর সর্বোত্তম বিধান পেশ করে। কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি, সংকীর্ণতা এবং ভুল দর্শনের আবেগ-উৎসাহে তকদীর সংক্রান্ত 'আকীদাকে খৃস্টানদের আঙ্গিকে পেশ করা

হয়ে থাকে। এ কথার বৈধতার প্রমাণ হিসাবে আমরা প্রথমে মশহূর 'ঈসায়ী রাহেব ও সংস্কারক লুথারের গ্রন্থ 'ঈসায়ী মযহাবের সংস্কার'-এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি। তিনি লিখেছেনঃ

'দুনিয়ার সমগ্র জাতিগোষ্ঠীর সকল মযহাবী গ্রন্থে তকদীরের বিধান রয়েছে। প্রাচীন রোমান ও গ্রীকরা এর নাম রেখেছিল কিসমত বা ভাগ্য। এর ক্ষমতা এত বেশী বলে তারা ধরে নিয়েছিল যে, এ হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার শাহী মুকুট যার অনুসরণ মানুষ ও দেবতা উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। যে সব ঘটনাকে কিসমত ঠিক করে দিত তা হামেশাই সংঘটিত হ'ত। ইসলাম ধর্ম তকদীরকে এর চেয়ে অধিক সম্মান দেয়নি যা সে অন্য ধর্মে পেয়েছে। আমি বরং এভাবে বলি যে, ইসলাম এতটুকু সম্মানও দেয়নি যতখানি অন্য জ্ঞানী-পণ্ডিতমণ্ডলীর ধর্ম আজকাল দিয়ে রেখেছে।"

লুথারের এই সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ উল্লিখিত অভিযোগের একটা সীমা পর্যন্ত জবাব অবশ্যই বলা যেতে পারে। কিন্তু এর দ্বারা ইসলামের 'আকীদা এবং তকদীরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হয় না।

লুথারের কথায়, তকদীর অথবা কিসমত-এর 'আকীদা দুনিয়ার সমস্ত মযহাবেই বিদ্যমান এবং একে স্থবিরতা, অসহায়তা এবং নিষ্ক্রিয়তার সাফাই বানিয়ে পেশ করা হয়। কিন্তু ইসলামে এমত ধারণা ও এই 'আকীদার কোন সুযোগ বা অবকাশ নেই। সে গোড়া থেকেই একে অস্বীকার করে ঘোষণা করে ليس للانسان الا ما سعى "মানুষের ভাগ্যে তাই মিলে থাকে যার জন্য সে চেষ্টা করে।" সমর্থন ও সম্মতির শর্তসাপেক্ষ সাধনা ও কর্ম ইসলামের সকল শিক্ষার মূল কথা। ব্যষ্টি থেকে নিয়ে সমষ্টি পর্যন্ত সব কিছুর উপর একই কানুন ক্রিয়াশীল ও ব্যাপ্ত। যদি স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তা হয় তার আদর্শ তবে তার নতীজাও হবে সেই মুতাবিক; আর যদি চেষ্টা-সাধনা ও সক্রিয়তা হয় তার আদর্শ, তবে তার পরিণতিও সেই মুতাবিক হবে। এটা হতে পারে না যে, চেষ্টা ও সাধনা করা হবে না, অথচ অবস্থা ও ফলাফল ইচ্ছামাফিক বাস্তবায়িত হবে অথবা নিজের অবস্থা বদলাবার কিংবা উন্নতির শীর্ষে পৌঁছুবার জন্য নিজে চেষ্টা করবে না, বিপদ ও সমস্যা -সংকটের পথ থেকে ভয়ে নিরাপদ অবস্থানে গিয়ে বসে থাকবে আর আমাদের অবস্থা বদলে যাবে। ইসলাম বলে, আল্লাহ্ সে জাতির অবস্থার

পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরাই পরিবর্তন করে। অতঃপর এখানেই শেষ নয়। নিরাশ হওয়া, হিম্মত হারিয়ে বসে থাকা---তার মতে কুফরী। ব্যর্থতা, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের পাহাড়ই নেমে আসুক না কেন সর্বাবস্থায় সে শোকরগুযার ও ধৈর্যশীল থাকতে উপদেশ দেয়। আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হতে সে বারণ করে এবং বলে لا تقنطوا من رحمة الله (আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না)। যদি তকদীরের অর্থ তাই হয় যা সাধারণভাবে মনে করা হয়ে থাকে---অথবা ভুল দর্শনের আবেগে পেশ করা হয়ে থাকে তাহলে আঁ-হযরত (সা)-এর জীবনে তার নমুনা মেলা উচিত ছিল। কেননা রসূল করীম (সা)-ই ইসলামের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, আইন-রচয়িতা এবং এর সর্বাপেক্ষা বড় জ্ঞানী ও আদর্শ পুরুষ ছিলেন। প্রতিটি লোক তাঁর পবিত্র জীবনের বড় বড় ঘটনাবলীর উপর সাধারণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও দেখে নিতে পারে যে, তাঁকে কেমন সব কঠিন কঠোর বিপদ-সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়েছে---কেমন সব দুশমনের মুকাবিলা করতে হয়েছে, ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথে কি ধরনের বাধা ও প্রতিবন্ধকতা এসে সামনে দেখা দিয়েছে, অতঃপর তিনি কি কি উপায়ে সে সবের উপর কামিয়াবী হাসিল করেছেন, করেছেন সাফল্য অর্জন; কিরূপ ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করেছেন এবং কেমন সব কঠিন অবস্থা কাটিয়ে আল্লাহ্‌র কলেমাকে বুলন্দ করেছেন। যদি তকদীরের মর্ম তাই হ'ত যা পেশ করা হয়ে থাকে তাহলে আঁ-হযরত (সা)-এর কী প্রয়োজন ছিল সে সব মুসীবত ও কঠিন অবস্থা বরদাশ্‌ত করবার, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের, পরিচিত ও অপরিচিতের শত্রুতা ক্রয়ের? জীবনকে বিপদের মুখে নিক্ষেপেরই বা কী প্রয়োজন ছিল? অনিবার্য তকদীর মুতাবিক যা হবার তা তো হ'তই! আর যদি জরুরত দেখা দিত তবে পয়গম্বর হিসেবে, রাসূল হিসেবে তিনি আল্লাহ্ পাক থেকে 'তকদীর' বদলিয়ে নিতেন, কন্টকাকীর্ণ তকলীফ বহন করতে হ'ত না তাঁকে, দুশমন হ'ত না কেউ, প্রয়োজন পড়ত না হিজরতের এবং পরিণতিও যুদ্ধ ও জিহাদ পর্যন্ত গড়াত না।

কিন্তু এর অর্থ এও নয় যে, চেষ্টা-সাধনা ও তদবীরই সকল কর্মের একমাত্র নিয়ন্তা এবং সকল কামিয়াবী ও সাফল্যের অপরিহার্য অঙ্গ। যেই চেষ্টা করবে, হাত-পা নাড়া-চাড়া করবে, চেষ্টা ও সাধনাকে কর্মে রূপান্তরিত করবে, সেই হবে কামিয়াব এবং পৌঁছুবে স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্যে। ইসলামে

চেষ্টা ও সাধনা এবং বিশুদ্ধ কর্মের শিক্ষা সমর্থন ও সম্মতির (তসলীম ও রেযার) সঙ্গে শর্তযুক্ত। প্রয়াস ও আমল (কর্ম)-এর মূল উৎস মানুষের হাতেই রাখা হয়েছে এবং ফলাফল রাখা হয়েছে আল্লাহ্‌র হাতে। ইসলাম বলেঃ তোমরা পরিশ্রম কর, চেষ্টা ও সাধনা চালিয়ে যাও আর ফলাফলের ভার আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ কর। এরই নাম 'তসলীম ও রেযা' বা সমর্থন ও সম্মতি এবং একেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তোমরা কার্যকারণ বিশ্বে রয়েছো। তাকে দিয়ে কাজ নেওয়া এবং চেষ্টা-তদবীর করা তোমাদেরই কাজ। তাকে ফলিত রূপ দেওয়া ও ফলাফল দান আল্লাহ্‌র কাজ। তা আল্লাহ্‌র উপরই ছেড়ে দাও। এটা জীবনের সৌন্দর্য ও কর্ম-দর্শনের কত বড় গোপন রহস্য! যদি পরিশ্রম ও কর্মেরই নাম হয় জীবন তবে ইসলাম তাকে উত্তম ও উৎকৃষ্ট বানাবার কেমন সূক্ষ্ম রহস্য শিখিয়েছে এবং তার তিক্ততা ও ব্যর্থতার বোঝা হালকা করে তাকে কত সুন্দর বানিয়েছে! যদি এ না হ'ত তাহলে হুযূর আকরাম (সা) যুদ্ধের ময়দানে সমরশাস্ত্র ও রণকৌশলের নিপুণ কলা-কৌশল অবলম্বন করার পরও শেষে আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত হয়ে দু'আ করতেন না এবং তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করে প্রার্থনা জানাতেন না। এরপর মুসলমানরা যখন ঘাবড়িয়ে গিয়ে বলা শুরু করল متى نصر الله "আল্লাহ্‌র সাহায্য কখন আসবে"---তখন সান্ত্বনাসূচক আল্লাহ্‌র ফরমান আসত না وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين "তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা মু'মিন হও।"

গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক দিয়ে তকদীরের এই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্ভবত যথেষ্ট হবে এবং এটুকুও আমরা এজন্য জরুরী মনে করেছি যে, আঁ-হযরত (সা) ও তাঁর খলীফা চতুষ্টয়ের স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বের কামিয়াবী ও সাফল্য এবং বিভিন্ন যুদ্ধে মুষ্টিমেয় মুসলমানের পক্ষে বিপুল সংখ্যক কাফির ও মুশরিকদের উপর বিজয়লাভ ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকে আজও বহু লোক তকদীরের কারসাজি ভেবে থাকে এবং মুসলিম মিল্লাতের অবনতি ও পশ্চাদপদতাকে তকদীরের শূন্য আঁচলের সঙ্গে জুড়ে দেয়। অথচ আঁ-হযরত (সা) ও তাঁর খলীফাগণের পবিত্র গোটা জিন্দেগীই ছিল আপাদমস্তক কর্মমুখর এবং চিন্তা ও কর্মের গোটা অবয়ব ছিল দৃঢ় ও মযবুত, তাঁর দিল ছিল নিষ্ঠা ও আল্লাহ্‌র প্রতি সমর্পিত-চিত্ততা দ্বারা ভরপুর। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যও তাঁদের কর্মের অন্তর্বর্তী ছিল। দেশ জয় করেছেন রাসূলের পদাংক অনুসারীরাই

এবং তাঁরাই করেছেন যারা ছিলেন বোধশক্তি ও দূরদর্শিতা, কৌশল ও জ্ঞানবত্তা, দূরদৃষ্টি ও আত্মদর্শিতা, মিষ্টি ব্যবহার ও অনাড়ম্বরতা, সহমর্মিতা ও ন্যায়পরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ব ও সৌজন্যবোধ, ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত এবং যারা যুদ্ধের ময়দানে রণকুশলতা, রাষ্ট্রনীতি, সুযোগ-সন্ধানী প্রভৃতি অব্যর্থ অস্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কানুন ও বিধান সর্বদাই একইরূপ আর কখনোই তা বদলায় না। অগ্রবর্তীদের জন্য যেমন বদলায়নি, তেমনি পশ্চাদ্বর্তীদের জন্যও বদলাবে না। তিনি তাঁর পরিপূর্ণ রহমত দ্বারা আঁ-হযরত (সা)-এর জীবনোপকরণ, তাঁর কর্ম এবং তাঁর সাফল্যের সর্বোত্তম নমুনা পেশ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর তকলীদ তথা অনুকরণ, জীবনের সর্বস্তরে সকল শাখায় দিল ও দিমাগ দু'টোরই চোখ খুলে করা আমাদের কাজ।

নিজের যুগেরই দৃষ্টান্ত নিন না। অতীতের কোন বড় ও বিখ্যাত ব্যক্তির জীবনচরিতের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। তাঁদের খ্যাতি, নাম ও মাহাত্ম্যের কারণ কি? কেন তারা অন্যদের থেকে বিশিষ্ট হয়ে রইলেন? কেন অন্যেরা তাঁকে তাদের অনুসরণযোগ্য ও নেতা বানাল? এজন্য যে, তিনি নিজের ভেতর কতিপয় গুণ সৃষ্টি করে তার উন্নতি ঘটিয়েছেন, দিল-দিমাগের যোগ্যতাগুলোকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়েছেন; আর এজন্যই তিনি অন্যদের তুলনায় সমুন্নতি লাভ করেছেন। লোকেরা তাঁর কথা মেনে নিয়েছে। যদি না মেনেছে, তবে আপন শক্তির সাহায্যে মানিয়েছেন। সকল কিছুর একচ্ছত্র মালিক হয়ে বসেছেন। সম্মান ও মার্যদা হাতজোড় করে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে গেছে, উত্থান ও ক্ষমতার মসনদ পদতলে এসেছে এবং সব কিছুই যা হবার হয়ে গেছে। কায়েদে আজম, লেনিন, হিটলার, মুসোলিনী, গান্ধী প্রমুখ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের কর্মধারা এই তো সেদিন শেষ হ'ল। তাঁরা তাঁদের তকদীর নিজ হাতে গড়েছেন এবং জাতির পরোপকারী বন্ধু ও অনুসরণীয় ইমাম বনে গেছেন। উত্থানের চরম শীর্ষে পৌছে জগৎ সভায় নিজেদের স্থায়ী ছাপ রেখেছেন। এঁদের হুযূর আকরাম (সা)-এর সঙ্গে এতটুকু সম্পর্কও নেই যতটুকু আছে আসমানের সঙ্গে যমীনের। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সমগ্র মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পবিত্র জীবন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি আদর্শ নমুনা ও সবকস্বরূপ। তাঁর হেদায়েতের ফয়েয ও তরবিয়ত থেকে আরবের মরু সিংহাসন দুনিয়ার

জন্য রহমত ও বরকতে পরিণত হয়; বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা এবং 'ইলম ও 'আমলের এমনই ঝর্ণাধারা উৎসারিত হয় যে, সমগ্র দুনিয়া প্লাবিত হয়ে যায়। কিন্তু মিল্লাতের কাফেলা এখন হারিয়ে যাওয়ার পথে এবং মঙ্গল ও কল্যাণের একমাত্র রাস্তা পরিত্যাগ করে পথভ্রষ্ট হয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। হায়! এ কাফেলা যদি তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করত! হায়! সকল রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এবং দুনিয়ার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পুনরায় সেই করুণা-সিন্ধুর গুণাবলী থেকে যদি ফয়েয হাসিল করত যাঁর ফয়েয থেকে মানবতা নিরাপত্তা পেয়েছে, মুসলিম কওম নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছে, দেশজয় যাদের মীরাছ হয় আর সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি হয় তাদের সম্মানসূচক উপাধি।

হিজরত: প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে

গত অধ্যায়ে আঁ-হযরত (সা)-এর জন্ম সন থেকে হিজরত পর্যন্ত ঘটনাবলী বিভিন্ন ইতিহাস ও সীরত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করে সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হয়েছে। এখন তাঁর পবিত্র জীবনের সেই অংশের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে যা সাধারণত অন্ধকারে থেকেছে। যদিও আমাদের অবস্থা স্বর্ণকারের দোকানের ছাইয়ের মত যা এজন্য পরিষ্কার করা হয় যে, তার ভেতর থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের সামান্য কিছু হলেও যদি পাওয়া যায়। এতে কখনো সে সফল হয় আবার কখনো তাকে ব্যর্থতাও স্বীকার করতে হয়। ঠিক এভাবেই অবস্থা ও ঘটনাবলীর স্তূপের মধ্য থেকে আমরাও কাজের মণিমুক্তা বের করবার কোশেশ করেছি। কিন্তু আসল কাজ এই যে, বাজে, বেহুদা ও বাহুল্য বিষয়াবলী এবং কল্প-কাহিনী থেকে পবিত্র করে সেগুলোকে কার্য-কারণের যৌক্তিক সম্বন্ধের সাথে পেশ করা যেন হুযূর আকরাম (সা)-এর জীবনের সেই দিক সামগ্রিকভাবে সামনে এসে যায় যা ব্যক্তিবিশেষ ও সর্বসাধারণ সবার নজরেই লুকায়িত রয়ে গেছে এবং যার উপর চিন্তা ও গবেষণা করা এবং যাকে দিবালোকে নিয়ে আসার ব্যাপারে সম্ভবত কেউই চেষ্টা করে নি।

গযওয়া এবং সাধারণ যুদ্ধের ভেতর অর্থগত কোন পার্থক্য নেই—শুধুমাত্র পারিভাষিক পার্থক্য রয়েছে। গযওয়া সেই যুদ্ধকে বলা হয় যে যুদ্ধে

নবী করীম (সা) অংশগ্রহণ করেছেন এবং যে যুদ্ধে স্বয়ং তিনি নেতা ও সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে শরীক হয়েছেন। এতদ্ভিন্ন আরও একটি পার্থক্য প্রভাব ও ফলাফলের দিক দিয়েও রয়েছে এবং তা এই যে, গযওয়ার পর লোকজনের জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা, আরাম ও প্রশান্তি এবং খোশহাল ও প্রাচুর্য নেমে এসেছে। আর সাধারণ লড়াই সর্বদাই ধ্বংস ও বদহাল, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন এবং দারিদ্র্য ও পেরেশানী এনে থাকে।

অনন্তর গযওয়ার এও একটি বৈশিষ্ট্য যে, এতে আঁ-হযরত (সা)-এর হামেশাই জয়লাভ ঘটেছে এবং কাফির ও মুশিরকদের ঘটেছে পরাজয়। এদিকে সৈন্যাধিক্য, সমরোপকরণ ও আঘাত হানার মত অস্ত্রের প্লাবন এবং ধন-দৌলতের প্রাচুর্য, আর ওদিকে সৈন্যের সংখ্যাল্পতা, ফৌজ ও জরুরী সাজ-সামানের ঘাটতি, শুধুমাত্র আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল। অধিকাংশ রসদপত্রই নেহাত মা'মুলী ধরনের। দুশমন ডংকা বাজাচ্ছে, বছরের পর বছর ধরে প্রস্তুতি চালাচ্ছে, বড় বড় সমাবেশ করছে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ব্যর্থতা বরণ করছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, পরিণতি ও ফলাফলের এই যে পার্থক্য ও বৈপরিত্য, তা কোনরূপ গুরুত্ব রাখে কিনা। রূপকথা ও গল্প-কাহিনীর মত সেগুলোও কি পাঠ করে উপেক্ষা করতে হবে? ইসলামের প্রচার ও প্রসার পথের প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীভূত করা এবং দুশমনের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির মুকাবিলা করার জন্য যুদ্ধবিগ্রহের এই সংগ্রামগুলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মিশনে কি মাইলস্টোনের মর্যাদা রাখে না? এসব যুদ্ধে অস্বাভাবিক সাফল্য তাঁর বীরত্ব, দৃঢ় মনোবল, কৌশলী রাষ্ট্রনীতি ও সমরশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার কি দলীল নয়? কিন্তু ঠিকই বলুন অথবা গাফলতি, অসাবধানতা কিংবা উপলব্ধি-হীনতাই বলুন, অন্যেরা তো দূরের কথা, খোদ মুসলিম ঐতিহাসিক ও জীবন-চরিতকারগণও হযরতের পবিত্র জীবনের এই দিকটিকে রূপকথা ও গল্প-কাহিনী বানিয়ে এভাবে পয়গম্বরসুলভ অধিকার ও অলৌকিকতা বলে অভিহিত করেছেন যে, এর উপর গভীর চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশ করার কখনো প্রয়োজনই অনুভব করা হয়নি। এমনিতে তো তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজকে অবশ্যই পালনীয় বলা হবে, কিন্তু হিজরত-পরবর্তী গোটা জীবন এবং সে জীবনের চেষ্টা-সাধনার খণ্ড খণ্ড দিকগুলো, তাঁর দূরদর্শিতার ব্যাপারগুলো দেখুন—দেখতে পাবেন ময়দান সাফ, সেখানে পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা ও বেখবের অবস্থা বিরাজ করছে। এগুলো না হাদীছের মধ্যে শামিল করা হয়েছে আর

না করা হয়েছে ওয়া'জ-নসীহত কিংবা হিকমতের মধ্যে শামিল। এমন কি সীরাত ও ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোও খালি দৃষ্টিগোচর হয়। এটাই কারণ যে, কারুরই খেয়াল নেই যে, হুযূর আকরাম (সা)-এর জীবনের এই শেষ ও গুরুত্বপূর্ণ 'আমল যা কাফির ও মুশরিক এবং ইসলামের দুশমনদের ষড়যন্ত্র ও শত্রুতামূলক কার্যকলাপের মুকাবিলা করা, রাষ্ট্রীয় কার্যাদির ব্যবস্থাপনা ও নির্বাহকরণ এবং যুদ্ধের ময়দানে কাফির সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করতেই অতিবাহিত হয়েছে---তা হিকমত, রাষ্ট্রনীতি ও সমরশাস্ত্রে অভিজ্ঞ নেতৃত্বের দিক দিয়ে এতটা গুরুত্বপূর্ণ যতটা গুরুত্বপূর্ণ তাঁর পবিত্র বাণী ও কর্মের অন্যান্য সমষ্টি ধর্মীয় ও জাগতিক কল্যাণের জন্য। এর থেকে যেমন উত্তম কোন বিধান নেই, ঠিক তেমনি দুনিয়ার ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোন নজীরও নেই। এই গাফিলতি ও অসতর্কতা প্রকাশের উদ্দেশ্য সমালোচনা কিংবা খুঁত ধরা নয়। আমার নিজের অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতা সম্পর্কে আমি পুরোপুরি ওয়াকিফহাল এবং এও জানি যে, নতুন কোন কথা আমি পেশ করছি না। কিন্তু আপনি যদি আঁ-হযরত (সা)-কে হাদীয়ে বরহক ও সাধারণের অনুসরণীয় মনে করেন তাহলে নবী জীবনের একটি বড় বরং সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কর্মবহুল দিককে বিস্মৃত হয়ে আপনি ভক্তি ও আনুগত্যের দাবি করতে পারেন না। নবী জীবনের এই দিকটি আগাগোড়া কর্ম ও সাধনার দিক। এতে মূলনীতি থেকে খুঁটিনাটি পর্যন্ত প্রতিটি জিনিস স্ব-স্থানে পরিপূর্ণ ও আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত ও বিদ্যমান রয়েছে। আপনার কোন দিক দেখবার এবং কারো নেতৃত্ব ও অভিজ্ঞতার খাঞ্চা থেকে কিছু খুঁজে নেবার দরকার নেই। হুযূর আকরাম (সা)-এর ব্যক্তিসত্তা ও প্রশংসনীয় গুণাবলী ভিন্ন দুনিয়ার কোথাও সঠিক ও বিশুদ্ধ নেতৃত্ব এবং নিপুণতা মিলবে না, মিলতে পারে না। এখানে আপনি প্রতারিত হবেন না। মূলনীতি, কর্মনীতি, কর্ম-পদ্ধতি এবং খুঁটিনাটি কর্মকাণ্ড সব তাই আছে যা প্রথমেও ছিল; শুধুমাত্র উপকরণ, শব্দরাজি ও নাম বদলে গেছে।

হিজরতের ঘটনা ও ঐতিহাসিকদের নীরবতা

অবস্থা যা-ই হোক এ পর্যায়ে আমরা হিজরতের এই দিকটি সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করব। এতে ভুল-ভ্রান্তি, অসতর্কতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি

হওয়া অবাস্তব কিছু নয়। বহু ঘটনা এমনও হতে পারে যা আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি। কিন্তু এই প্রচেষ্টা দ্বারা এটা সম্ভব যে বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধানের আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং সৌভাগ্য যুগের ঘটনাবলীর মণি-মুক্তাগুলো এক একটি করে সাধারণের দর্শনীয় স্থানে এসে যাবে। মুসলিম ঐতিহাসিকদের এই অসাবধানতার অভিযোগ অধ্যাপক কে. হিট্টিও করেছেন। তিনি লিখছেনঃ

'হযরতের প্রাথমিক বয়স, সাবালকত্ব লাভ এবং ইসলামের দা'ওয়াত জানাবার ক্ষেত্রে চেষ্টা ও সাধনার বিস্তারিত ও সুগ্রথিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। যদিও কুরআন মজীদে বিভিন্ন ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু এর উপর মুসলিম ঐতিহাসিকবৃন্দের পর্যালোচনা থেকে আমরা মাহরূম। আজও আমাদের সামনে এ প্রশ্ন উপস্থাপিত যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর মত দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন মানুষ—যাঁকে আল্লাহ্ পাক নবূওত দ্বারা ধন্য করেছেন—মক্কা থেকে মদীনা কেন গেলেন!'

অধ্যাপক মহোদয়ের শব্দসমষ্টি অত্যন্ত মার্জিত এবং তা থেকে সন্দেহ ও খটকার সেই ব্যাখ্যার সন্ধান মেলে যা কোন ন্যায়পরায়ণ ও ভদ্র অমুস-লিমের অন্তরে সৃষ্টি হতে পারে। অন্যথায় প্রতিপক্ষের বিদ্রূপ তো এমন হবে যে, হযরত সাহস ও হিম্মত হারিয়ে চলে যান এবং একে প্রকাশ্যভাবে বলতে গেলে Flight অর্থাৎ ফেরার হওয়া বা পালিয়ে যাওয়া বলে। এই অভিযোগ কি ঠিক? এ পর্যন্ত এর যে জবাব দেওয়া হয়েছে তা হ'ল, এটা ফেরার নয় বরং হিজরত যা আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক হয়েছে এবং তার সুফল ও উপকারিতা সাধিত হয়েছে অনেক। কিন্তু প্রতিপক্ষ ঈমান ও 'আকীদা-বিশ্বাস দ্বারা কিংবা হিজরত-পরবর্তী অবস্থা দ্বারা নয়, বরং হিজরতের পূর্বেকার পরিষ্কার ঘটনাবলী ও যুক্তিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ দ্বারা এর জবাব চায়। যদিও কতক অমুসলিম ঐতিহাসিক সুবিচারের পথ প্রশস্ত করাতে পক্ষপাতিত্ব ও শত্রুতার উর্ধ্বে উঠবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাদের থেকে কোন সঠিক ওকালতী কিংবা যুক্তিপূর্ণ দলীল-প্রমাণ আশা করা যায় না। সুতরাং অধ্যাপক হিট্টি সামনে অগ্রসর হয়ে লিখেছেন যে, হিজরতের পরিকল্পনা শুধু মক্কা থেকে পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং দু'বছর যাবত অবিরাম চিন্তা-ভাবনারই ফলশ্রুতি ছিল। মহানুভব অধ্যাপক এর চাইতে সামনে অগ্রসর হয়ে কিছু লিখতেও পারেন না। এজন্য

আমরা তাঁকে কোন প্রকার দোষও দিই না। আমাদের অভিযোগ হচ্ছে মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে। তাঁরা এ ব্যাপারে একেবারে নীরব। তাঁদের মধ্যে একজনও এর উপর ইতিহাস ও ঘটনাবলীর সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

হিজরতের কারণ

হিজরতের কারণসমূহ বুঝবার জন্য রসূল করীম (সা)-এর জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রাখা প্রয়োজন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য একটি স্রেফ একটিই ছিল আর তা হ'ল—'কলেমায়ে হক'-এর সমুন্নতি এবং ইসলামের দা'ওয়াত।

এই কাজে প্রথম প্রথম যে সব কঠিন ও শক্ত বাধা-বিপত্তি সামনে এসে দেখা দেয় এবং দিন দিন যে গতিতে তা বর্ধিত হতে থাকে তার সংক্ষিপ্ত অবস্থা আপনারা বিগত অধ্যায়ে পড়েছেন। এখানে আমরা বলতে চাচ্ছি যে, কাফির ও মুশরিকগণ তাঁর বিরোধিতায় যে এতটা কাঠোরতা অবলম্বন করেছিল, তার প্রকৃত ও মূল কারণ কি ছিল এবং কেন একজন মাত্র মানুষের মুকাবিলায় গোটা জাতি কোমর বেঁধে খাঁড়া হয়ে গেল। আর যতই তাঁর আওয়াজ বুলন্দ হতে থাকল তাদের পেরেশানীও বাড়তে থাকল। এমন কি তারা শক্তি প্রয়োগ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির যাবতীয় উপায়-উপকরণ কাজে লাগিয়ে হযরতের জীবন পর্যন্ত দুর্বিষহ করে তুলল।

এর জবাবের জন্য যদি আপনি ইসলামের ভাসাভাসা তারিফ অতিক্রম করে একটু গভীরতার দিকে অবতরণ করতে চেষ্টা করেন তবে আপনি জানতে পারবেন যে, ইসলাম এসেছিল মানব জীবনের প্রতিটি দিকের আমূল পরিবর্তন করে তার অগ্রগতি সাধনের জন্য। খানাপিনা, ওঠা-বসা, কথা-বার্তা, লেন-দেন, জায়েয-নাজায়েয, হারাম ও হালাল, মোটকথা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক, নৈতিক ও ব্যবহারিক জীবন থেকে শুরু করে 'ইবাদত পর্যন্ত প্রতিটি বস্তুতে ইসলাম তাকে পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছুতে চায়। সে তার সহজাত প্রবৃত্তিকে ভারসাম্যের ছাঁচে ঢালাই করে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে এসেছে যাতে করে আল্লাহ্র ইচ্ছা ও মর্জি

তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রচলিত ও প্রবাহিত হয়; তার অস্তিত্ব ও অস্তি-ত্বের সকল আকর্ষণ যেন আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ সমূহের অনু-সরণে নিবেদিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ইসলামী শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১. মানুষ পশু থেকে ইনসান হয়েছে।
২. ইনসান থেকে চরিত্রবান ইনসান হয়েছে।
৩. চরিত্রবান ইনসান থেকে আল্লাহ্ওয়ালা ইনসান হয়েছে।

কিন্তু এসব লক্ষ্য ছিল আরববাসীদের জীবনের রীতি-পদ্ধতি, উত্তরা-ধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রসম-রেওয়াজের একদম বিপরীত। আরববাসীরা এটা মেনে নিতে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না যে, তারা বিনা আপত্তিতে ও কোন-রূপ টু শব্দটিও না করে তা পরিত্যাগ করবে। তারা তাদের প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনাকে দুনিয়ার সমস্ত নৈতিক বাধ্য-বাধকতার উপর অগ্রাধিকার দিত। এতে যে সব বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দেখা দিত সেগুলোকে তারা কট্টর বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করত। প্রবৃত্তিজাত কামনা-বাসনার বাস্তবায়ন ছিল তাদের নিকট জীবন-মরণের প্রশ্ন।

আযাদী ছিল আরবদের জীবনের সব চাইতে মূল্যবান সম্পদ। নিজে-দেরই কোন লোকের আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত 'আকীদা- বিশ্বাস ও উপাস্য দেবতাসমূহকে পরিত্যাগ করে তাঁকে ধর্মীয় ও মাযহাবী নেতা এবং জাগতিক কর্তা-ব্যক্তি হিসাবে মেনে নেওয়া ছিল তাদের নিকট সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। সর্দার হতেন বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আর উপাস্য ও পূজনীয় হ'ত কাঠ কিংবা পাথরের মূর্তি। বষীয়ান লোক ছাড়া কোন অল্পবয়স্ক বালককে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করা ছিল যেমন অসম্ভব, আর মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করাও ছিল তেমনি অসম্ভব ব্যাপার। আর তাই ইসলামের দা'ওয়াত এমন একটি ব্যাপার হিসাবে পরিগণিত হয় যার বিরো-ধিতা করা বংশীয় সর্দার এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্যও ছিল অপরিহার্য।

অতঃপর এই দা'ওয়াত প্রাচীন প্রথা-পদ্ধতি এবং মাযহাবী 'আকীদার উপরই হামলা ছিল না,—নৈতিক সংস্কৃতি ও তমদ্দুনের গোটা উত্তরাধিকারের জন্য চ্যালেঞ্জও ছিল। অথচ এটা ছিল আরবদের সর্বাপেক্ষা গর্বের ধন।

মাযহাব ও 'আকীদা-বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ তাদের সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তিই শুধু কায়েম ছিল না, জীবিকার উপায়-উপকরণও এর সঙ্গে ছিল জড়িত। মক্কার পূজামণ্ডপ এবং সে সব পূজামণ্ডপের প্রথা-পদ্ধতি শুধু মক্কাবাসীদের বিভিন্ন বংশ ও খান্দানের সম্মান ও মর্যাদার মাধ্যমই ছিল না, জীবিকার আয়-আমদানীরও উৎস ছিল। যে সব লোক-জন যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দেশের দূর-দরাজ এলাকা থেকে আগমন করত তাদের মেহমানদারী, দেখাশোনা ও খাতির-যত্নের বিনিময়ে মক্কাবাসী বিপুল টাকা-পয়সা উপার্জন করত। বার্ষিক যিয়ারত উপলক্ষে মক্কায় একটি বড় মেলা বসত যা থেকে মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিই শুধু ঘটত না, ঘরে বসেই খাওয়া-পরার সকল সাজ-সামানও মিলে যেত। মক্কায় না ছিল ক্ষেত-খামার, না ছিল কোন শিল্প। মূর্তিঘরের খ্যাতি ও তার কেন্দ্রীয় মর্যাদা লাভের কারণে এশিয়ার দেশগুলোর বণিকেরা দূর-দরাজ দেশ থেকে মালমাত্তা নিয়ে আসত এবং মক্কার ব্যবসায়ীরা সেগুলো খরিদ করে য়ূরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলোতে নিয়ে যেত। এটাই ছিল প্রধান রহস্য যাকে মক্কাবাসীরা অত্যন্ত হুঁশিয়ারীর সঙ্গে নিরাপদ রেখেছিল। য়ূরোপ ও আফ্রিকাবাসী দীর্ঘ দিন ধরে এটাই মনে করে আস-ছিল যে, গরম মসলা, হাতীর দাঁত ও চা ইত্যাদি খাস আরবের উৎপন্ন-জাত দ্রব্য। এ রহস্য সেই সময় পর্যন্তও রহস্য ছিল যতদিন পর্যন্ত য়ূরোপীয়রা সমুদ্র পার হয়ে হিন্দুস্তান, চীন প্রভৃতি দেশে না পৌঁছতে পেরেছে।

মক্কার বণিকদের বিশ্বাস ছিল যে, এই নতুন মাযহাব দ্বারা কা'বার পূজামণ্ডপের কেন্দ্রীয় মর্যাদা ও গুরুত্ব বিপদের সম্মুখীন হবে এবং তার অস্তিত্ব বিপন্ন হলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হবে; এই সঙ্গে কুরায়শদের সর্দারী ও মান-মর্যাদাও যাবে খতম হয়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য গেলে শুধু ধন-দৌলতের মুখ দেখাই বন্ধ হয়ে যাবে না, তাদের আহার্য এবং খোরাকও সহজে মেলা মুশকিল হয়ে পড়বে।

ফলে মক্কাবাসীদের অবস্থা একেবারে উল্টে যাবার আশংকা ছিল এবং এই বিপ্লবের ভেতর তাদের আপাদমস্তক ক্ষতি ও ধ্বংসই কেবল দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। তারা মনে করছিল যে, এর দ্বারা শুধু সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও মাযহাবী ভিত্তিই অন্তঃসারশূন্যে পরিণত হবে না, বংশীয়

মর্যাদা ও খান্দানী অধিকার এবং বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যও যাবে নিঃশেষ হয়ে। বংশীয় গৌরব ছিল তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য; ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য ছিল তাদের নিকট অর্থহীন শব্দ সমষ্টিমাত্র। উচ্চ ও নীচের পার্থক্য বিলুপ্ত হওয়া অবমাননাকর মৃত্যুর সমার্থক ছিল। মক্‌কাবাসীদের জীবিকার্জনের একমাত্র ভিত্তি ছিল পুতুলঘরের তথা পূজামণ্ডপের সেবায়েতগিরি অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা সূদী কারবারের উপর। অথচ এদিকে ইসলাম সুদকে হারাম ঘোষণা করেছিল। এর ফলে তাদের অনাহারে ও ক্ষুধায় মারা যাবার এবং জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে বিপর্যয় ও ধ্বংস নেমে আসার আশংকা ছিল। ইসলাম নারীদের অধিকার প্রদান করছিল, অথচ তারা ভেবে হয়রান হচ্ছিল এ পন্থা অবলম্বন করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এবং খান্দানের জীবিকা সংক্রান্ত মেরুদণ্ড কিভাবে কায়েম রাখা যাবে। বেশ্যাবৃত্তির অবসান এবং গোলাম-বাঁদীর অধিকার স্বীকার করে নেওয়া মানে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা। বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী আরবদের মত গরীব ও দরিদ্র এলাকার জন্য আশ্চর্য ও অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, যদিও তারা ইসলামের সকল বিধি-বিধান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল না। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর জীবন, তাঁর পবিত্র ব্যবহার ও আচার-অভ্যাস, তাঁর সত্যপ্রীতি ও আমানতদারী, তাঁর স্নেহ-মমতা ও আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সদ্ব্যবহার তাদের নিজেদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আচার-অভ্যাস ও চাল-চলন এবং নৈতিক ও চারিত্রিক রীতি-পদ্ধতির একেবারে বিপরীত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

মোটকথা, এ ধরনের আরো অনেক আশংকা ছিল তাদের যার কারণে মক্‌কাবাসীরা আঁ-হযরত (সা)-এর ভীষণ বিরোধী ও দুশমনে পরিণত হয়। নবী করীম (সা) এই বিরোধিতার জবাব দেন ধৈর্য ও দৃঢ়তার দ্বারা। তিনি এবং তাঁর সঙ্গী-সাথী ও উৎসর্গিত-প্রাণ কর্মীবৃন্দ মানসিক ও আধ্যাত্মিক তকলীফ সহ্য করেন—শারীরিক নিপীড়ন ও কষ্ট বরদাশ্‌ত করেন, গালি-গালাজ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের শানিত অস্ত্রের তীব্র আঘাত বরদাশ্‌ত করেন; বয়কটের মুসীবত মাথা পেতে নেন। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও তিনি মনোবল ভেঙে পড়তে দেননি। মক্‌কায় অবস্থান যখন অসম্ভব হয়ে উঠল এবং কাফিররা তাঁকে হত্যা করার আর মুসলমানদের জড়ে-মূলে উৎখাত করার ফয়সালা করল, তখন তিনি পুরো চিন্তা-ভাবনার পর মক্‌কা থেকে হিজরত করে য়াছরিব গমনের কর্মসূচী তৈরি করেন। প্রথমে তিনি সাহাবীদের

হিজরতের নির্দেশ প্রদান করেন যেন তাঁদের মাধ্যমে ইসলামের বিপ্লবী পয়গাম বহির্জগতে পৌঁছে। কিন্তু তিনি স্বয়ং তশরীফ নেবার ফয়সালা করেন নি। এতে যখন সাফল্য দৃষ্টিগোচর হ'ল না, তখন বাধ্য হয়েই আখেরী কদম উঠাবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এ ব্যাপারে তিনি দীর্ঘকাল থেকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে আসছিলেন; কিন্তু একে কার্যকর করার ব্যাপারটা মুলতবী করতে থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি আল্লাহ্র তরফ থেকে অনুমতি প্রাপ্ত হন। গোটা কর্মকেন্দ্র মক্কা থেকে মদীনায় সরিয়ে নেওয়াই ছিল আঁ-হযরত (সা)-এর উদ্দেশ্য। আর এরই নাম রাখা হয়েছিল হিজরত। শব্দটি যদিও সাদাসিধে ধরনের, কিন্তু প্রতিরক্ষা কৌশলের দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ববহ। ভেবে দেখুন, দৃঢ় মনোবলের অধিকারী একজন পয়গম্বর যাঁর পেছনে রয়েছে আল্লাহ্র মদদ, যাঁকে সত্যের দা'ওয়াত দেবার জন্যই নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, তিনি কি ঐশী আদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং ময়দান দুশমনের হাতে তুলে দিয়ে পালাবার পথ এখতিয়ার করতে পারেন? জ্ঞান-বুদ্ধি তা মেনে নেয় না। তাহলে কি করে হিজরতের অর্থ ফেরার হওয়া ও পরাজয় বরণ হতে পারে? আর কাফিরদের আপত্তি ও প্রশ্নগুলোই-বা কী? এটাই যে, হযরত যে কাজ নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করে-ছিলেন, নিজেকে তার যোগ্য না পেয়ে ময়দান দুশমনের হাতে সোপর্দ করে চলে যান অথবা তিনি যখন নবূওত লাভে ধন্য ও গৌরবান্বিত তখন তিনি কা'বাঘরকে মূর্তিপূজকদের কব্জায় ছেড়ে যাওয়াকে কিভাবে মেনে নিতে পারলেন আর কেন মেনে নিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কেন এ ব্যাপারে সাহায্য করেন নি? এটা এবং এ ধরনের আরও আরও বহু প্রশ্ন রয়েছে যা প্রতিটি মানুষ তার উপলব্ধি মাফিক ছিন্তা করে দেখার অধিকার রাখে। এজন্য যদি কাফিররা বিদ্রূপ করতে চায় কিংবা বিরুদ্ধবাদীরা যদি হিজরতের ঘটনা বুঝতে সক্ষম না হয় তবে তাদের বুঝানো আমাদের জন্য ফরয এবং এর সঙ্গে এটাও ফরয যে, তাদের সঙ্গে এমন কথাবার্তা যেন না বলি যা বুঝতে তারা অসমর্থ অথবা যা বিশ্বাস করতে তারা চেষ্টা করে না। কেননা যদি করত অথবা করতে পারত তবে এটা নিশ্চিত ছিল যে, অতঃ-পর সন্দেহ ও সংশয়ের কোন অবকাশই থাকত না। তারা আমাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী হ'ত। এজন্য আমাদের উচিত, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বর্ণনার আলোকের সঙ্গে সেই কার্যকারণ পেশ করা যা তাদের উপলব্ধিতে এসে যায়। এভাবেই চিত্রের অপরদিক তারা নিজেরাই দেখতে পারবে।

হিজরতের প্রতিরক্ষা গুরুত্ব

প্রথমে আমরা হিজরতের প্রতিরক্ষা গুরুত্বের উপর আলোকপাত করব। জার্মানীর প্রথিতযশা সমর বিশেষজ্ঞ জেনারেল ক্লজ উইজ এবং লিউডাগুর্ফ-এর উক্তি ঃ 'লাথির ভূত কথায় যায় না, সেজন্য জাতিকে স্বীয় স্বার্থ অথবা স্বীয় দৃষ্টিভঙ্গী যুদ্ধ করে মানাতে হয়।' সমরশাস্ত্রের ফরাসী নায়ক নেপোলিয়ন, ইংরেজ বিশেষজ্ঞ লিড্‌ল হার্ট এবং জেনারেল ফুলার, ফরাসী জেনারেল নও-য়াদির ডেগোর এবং আমেরিকান বিশেষজ্ঞ জেনারেল আইজেনহাওয়ার প্রমুখ সবাই এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। আমেরিকার জেনারেল পীটন ১৯৩৯---৪৫ 'ঈসায়ীর যুদ্ধে অত্যন্ত দর্শনীয় ভূমিকা পালন করেন। যখন তিনি যুদ্ধের ব্যাপারে আমেরিকা থেকে আফ্রিকা আসেন এবং আমেরিকা থেকে ফ্রান্সে লড়াই করতে যান তখন তিনি যুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থাদির সঙ্গে কুরআনও অধ্যয়ন করতেন এবং বলতেন যে, এই অধ্যয়ন অত্যন্ত উপকারী ও শিক্ষা-প্রদ। আঁ-হযরত (সা) কুরআন মজীদের শিক্ষক ছিলেন যা তাঁরই উপর নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্তা ব্যতিরেকে তাঁর থেকে কুরআন মজীদের উত্তম সমঝদার আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছানো তাঁর দায়িত্ব এবং এর উপর 'আমল করে দুনিয়ার সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তাঁর কর্তব্য ছিল। তিনি মক্কাকে স্থায়ী আবাস বানিয়ে ইসলা-মের রৌশনী ছড়িয়ে দিতে চেষ্টার কোন কসূর করেন নি। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, স্থৈর্য ও দৃঢ়তার এমন সব প্রমাণ তিনি পেশ করেন যে, হতবুদ্ধি হয়ে পড়তে হয়। তিনি মানসিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক সর্বপ্রকারের চূড়ান্ত কষ্ট ও তকলীফ সহ্য করেন। কাফিরদের নির্যাতনের হাত থেকে এক লমহার জন্যও তাঁর নিষ্কৃতি মেলে নি। কিন্তু যখন আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাফল্যের কোন পথই তাঁর দৃষ্টিগোচর হ'ল না—তখন তিনি স্বীয় আবাস-ভূমি পরিবর্তন করে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথে বাধাবিঘ্ন দূর করারও ফয়সালা করেন।

প্রতিরক্ষা কেন্দ্র

বিভিন্ন জাতি ও সরকার যখন তাদের কুকর্মের ক্ষেত্রে সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং জুলুম ও নির্যাতন তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন তাদের

সঠিক পথে আনবার জন্য প্রতিরক্ষা কৌশলের সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অন্য কথায় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়। কিন্তু মজলুম জাতি কিংবা মজলুম নেতা প্রতিরক্ষা কৌশলের সাহায্য নেবার পূর্বে অনেক কথাই চিন্তা করেন এবং এসবের ভেতর সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে থাকে একটি সুদৃঢ় ও মযবুত প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের। প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের গুরুত্বের পরিমাপ ব্রিটিশ জেনারেল টুকার-এর পর্যালোচনা থেকে করুন যা তিনি তাঁর 'প্যাটার্ন অব ওয়ার' নামক গ্রন্থে যুসেড ক্রুদ্ধের উপর করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

'যদি ক্রুসেডের নাইটগণ দামেশকের প্রতিরক্ষা গুরুত্বকে বুঝতে পারত এবং উক্ত শহরকে প্রতিরক্ষা কেন্দ্র বানিয়ে সালাহুদ্দীন গাযীকে একে ব্যবহার করা থেকে মাহরূম করে দিত তবে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সালাহুদ্দীন ক্রুসেড বাহিনীকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিতে পারতেন না এবং এভাবে দুনিয়ার বুকে ইসলামের নিশানাও আর অবশিষ্ট থাকত না। দুর্ভাগ্য যে, ক্রুসেড বাহিনীর অধিনায়কগণ দামেশকের গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। এ কারণেই ইসলামী ঝাণ্ডা পুনরায় দুনিয়ার দেশে দেশে পত্‌পত্‌ শব্দে উড়তে শুরু করেছে।'

বৃটেনের মশহূর প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ জেনারেল হ্যামলে এবং জেনারেল কীগেল (Kiggell) স্বীয় 'অপারেশন অব ওয়ার' নামক গ্রন্থে প্রতিরক্ষা কেন্দ্রের গুরুত্ব এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

'যদিও সুশৃংখল, সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেনাবাহিনী শত্রুর উপর সাফল্য লাভের জন্য খুবই জরুরী হাতিয়ার, তবু শক্তিশালী ফৌজ সেই ইঞ্জিন কিংবা মেশিনের মত যাকে সাফল্যের সঙ্গে চালাবার জন্য কয়েকটি মূলনীতির উপর সক্রিয়ভাবে আমল করতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, দুশমনের সঙ্গে লড়তে অগ্রসর হ'তে, হামলা করতে, কোন শহর জয় করতে অথবা আত্মরক্ষামূলক লড়াই লড়ার জন্য জরুরী হ'ল---ফৌজ একত্রিত হয়ে কিংবা সংঘবদ্ধভাবে যেন লড়তে পারে অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন অংশ একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের জন্য একইরূপ পরিকল্পনার অধীনে লড়বে। এজন্য তাঁর কাছে সব ধরনের রসদ-সম্ভার অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র ও পরিবহনের উপকরণ-গুলো সব সময়ই মওজুদ থাকা জরুরী এবং যেমনি সামান ব্যয় হতে থাকবে —সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে ঘাটতিও পূরণ হতে থাকবে। এর জন্য প্রথম

থেকেই এমন প্রতিরক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন করা অপরিহার্য যেখান থেকে এসব সামান প্রয়োজন মুহূর্তে লাভ করা যেতে পারে। এই কেন্দ্র এমনই সুরক্ষিত ও নিরাপদ হবে যে, দুশমন কোন প্রকারেই যেন তার ক্ষতি সাধন না করতে পারে। এমনিভাবে একজন যোগ্য জেনারেল এটাও গভীরভাবে ভেবে নেন যে, তাঁর প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেল এ সামান কোথা থেকে হাসিল করবেন এবং কিভাবে করবেন। ইতিহাস সাধারণত এ জাতীয় অবস্থার উপর পর্যালোচনা পেশ করে না, কিন্তু এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী দিক।'

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি নেহাত গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীরভাবে ভেবে দেখার মত। এটা বোঝবার পরই হিজরতের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার সঠিক গুরুত্ব অনুভূত হতে পারে।

এ পর্যায়ে আরো কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা যাচ্ছে।

মশহূর ব্রিটিশ জেনারেল বার্ড তাঁর 'Direction of War' নামক গ্রন্থে প্রতিরক্ষা কৌশলের উপর পর্যালোচনা করতে গিয়ে লিখছেনঃ

'যে জাতি স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে চায় তাকে স্বীয় প্রতিরক্ষা ও হেফাজতের জন্য সব সময় এবং প্রতি মুহূর্তে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। যদি সে প্রস্তুত না থাকে তবে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন সে করতে পারে না, সত্বরই তাকে গোলামীর জিঞ্জীর পরিধান করতে হবে। প্রকৃত সত্য এই যে, এমন জাতির বেঁচে থাকার কোন অধিকারই নেই।---

'আজকাল রাজনৈতিক আযাদী এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের ভিত্তি শুধু এর উপর যে, জাতির নিকট যথেষ্ট সংখ্যক মযবুত, সুশৃংখল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী মওজুদ আছে কি নেই---।'

তিনি অন্যত্র লিখেছেনঃ

দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিম্নরূপ হতে পারেঃ

১. তাকে পর্যুদস্ত করে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা।
২. এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা যেন দুশমন নিজের দাবিদাওয়া ও অধিকার তার প্রতিপক্ষের অনুকূলে পরিত্যাগ করে।

৮—

৩. জাতীয় প্রতিরক্ষা কিংবা জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ;
৪. অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের সাহায্য;
৫. নিজের দেশ অথবা তার কোন অঞ্চলের হেফাজত।

এ সব অবস্থায় শত্রুকে পরাজিত করার প্রভাব সে দেশের অধিবাসীদের উপর বিস্তার লাভ করে। তাতে শত্রুপক্ষ ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, সমঝোতা করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে সন্ধির শর্তাবলী সেই মুহূর্তে মেনে নেয় যখন—

ক. তার ফৌজ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যায়;
খ. তার বাণিজ্যিক অবস্থা খারাপ ও বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে;
গ. অথবা তার জাতীয় জীবনের অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো, যেমন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, রসদ, সামান ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

এজন্য দুশমনের সমর শক্তি খতম করে দেওয়া আবশ্যক, যাতে দুশমনকে নিজের দেশের অভ্যন্তর ভাগে লড়াই করতে বাধ্য করা যায়। এর ফলে শত্রুরাষ্ট্রের বাসিন্দাদের উপর দ্বিগুণ বোঝার চাপ পড়বে অর্থাৎ প্রথমত, নিজেদের সৈন্যবাহিনীর জন্য সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় সামান যোগান দেওয়া; দ্বিতীয়ত, আমাদের সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান; কেননা আমাদের সৈন্যবাহিনী বিজিত এলাকা থেকে অনেক সাজ-সামানই নিতে পারবে।

এরপর আরও অগ্রসর হয়ে লিখছেন:

শান্তির সময় প্রতিরক্ষা কৌশলের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এই হয় যে, যখন আমরা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করব তখন যতদূর সম্ভব যুদ্ধে আমাদের বিজয় হবে সুনিশ্চিত। এতদুদ্দেশ্যে সমরোপকরণ, রসদ এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জরুরী। অতঃপর এসব উপকরণ এমন একটি স্থানে জমা করতে হবে যেখানে দুশমন সেগুলোর কোন ক্ষতি করতে না পারে এবং সেগুলো যেন দখলও না করে নিতে পারে। এ জায়গা কিংবা প্রতিরক্ষা কেন্দ্র এমন একটি স্থানে হওয়া উচিত যেখান থেকে লড়াই করে দুশমনকে চূড়ান্তভাবে ঘায়েল ও পর্যুদস্ত

করা যাবে। অন্য কথায়, প্রতিরক্ষা কেন্দ্র দ্বারা আমরা তেমন স্থান কিংবা স্থানসমূহ বুঝে থাকি যেখান থেকে লড়াই করবার জন্য সমরোপকরণ সরবরাহ করা যেতে পারে। এই স্থানগুলো নিজ দেশের যে কোন অংশে অথবা সাহায্যকারী দেশেও হতে পারে। দু'টি বিশ্বযুদ্ধেই বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ য়ুরোপে মিত্রশক্তির প্রতিরক্ষা কেন্দ্র ছিল। কিন্তু এ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় রসদ ও উপকরণ আসত দুনিয়ার বিভিন্ন কোণ থেকে। এজন্য মিত্রবাহিনীর পক্ষে তার হেফাজতও ছিল অপরিহার্য। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা কেন্দ্র হিসাবে সেই সব জায়গা নির্ধারিত হয়ে থাকে যা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিকটবর্তী এবং যেখানে সকল প্রকারের সমরোপকরণ জমা করে লড়াই ক্ষেত্রে সৈন্যদের পাঠানো যায়। উদাহরণত, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিত্র-বাহিনীর প্রথম প্রতিরক্ষা কেন্দ্র ছিল সিঙ্গাপুর, অতঃপর বর্মা এবং আরও পরে ভারতবর্ষ। এরপর জাপানের পরাজয় ঘটে এবং জাপানের পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরক্ষাকেন্দ্রও ক্রমাগত সামনে বাড়তে থাকে যাতে করে যুদ্ধক্ষেত্র সৈন্যবাহিনীর নিকটবর্তী থাকে।

এই কেন্দ্র থেকে রসদ-সম্ভার ও যুদ্ধাস্ত্র পরিবহনের উপকরণ ও মাধ্যম ব্যতিরেকেও সৈন্যবাহিনীর প্লাটুন ও কোম্পানীর শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্যকারী সৈন্য পাঠানো যায়; তাতে করে এদের দ্বারা আহত ও নিহত জওয়ানদের ঘাটতি পূরণ করা যায়।

য়াছরিবের প্রতিরক্ষাগত গুরুত্ব

এখন গভীরভাবে ভেবে দেখুন যে, য়াছরিবে (মদীনায়) এ ধরনের প্রতিরক্ষাগত বৈশিষ্ট্য ছিল কিনা? এর বিস্তারিত জবাব হেজায ভূখণ্ডের ভৌগোলিক পর্যালোচনার অধ্যায়ে রয়েছে। এখানে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে সেগুলো এভাবে বর্ণনা করতে পারিঃ

১. সে যুগে কাফেলার সর্বাপেক্ষা মশহূর ও বৃহৎ রাস্তা ছিল তিনটি। এদের ভেতর একটি এসেছে ভূমধ্যসাগর থেকে, দ্বিতীয়টি সিরিয়া থেকে এবং তৃতীয়টি মিসর থেকে। এভাবে একটি রাস্তা সিরিয়া থেকে দাওমাতু'ল-জান্দাল এবং সেখান থেকে ইরাক যায়। দ্বিতীয়টি দাওমাতু'ল-জান্দাল থেকে

য়াছরিব হয়ে মক্কা যেত এবং তৃতীয়টি দাওমাতু'ল—জান্দাল থেকে য়ামবূ' এবং সেখান থেকে সমুদ্রোপকূল বরাবর মক্কা গেছে। মক্কা থেকে পুন-রায় এই রাস্তা ইরাক ও পারস্যোপসাগরের দিকে গেছে অথবা চলে গেছে লোহিত সাগরের উপকূলীয় সমভূমি পর্যন্ত। এসব রাস্তা দিয়ে এশিয়া, য়ূরোপ এবং মিসরের তেজারতী কাফেলা যাতায়াত করত। দেশের বাকী অংশ ছিল বিরান ও দুরতিক্রম্য। এ সবের ভেতর বিস্তৃত মরু প্রান্তর এবং গভীর উপত্যকাগুলো ছিল আড়াল হয়ে। পানির নাম-নিশানাও ছিল না। মানুষ ও জীবজন্তু উভয়ের জন্যই খোরাক ও আহার্যদ্রব্য ছিল কল্পনার সামগ্রী। অধিকন্তু এর উপর ছিল সাইমূমের গযবসদৃশ লূ হাওয়া আর বালির ঝড়। এজন্য কাফেলা নির্ধারিত রাস্তা ধরে চলত এবং নির্দিষ্ট মনযিলে গিয়ে ডেরা ফেলত। এসব রাস্তার আশেপাশের এলাকাগুলোর বেদুঈনদের দিন গুজরান হত কাফেলার যাতায়াতের মাধ্যমে। এরা তাদের হেফাজত ও মাল পরিবহন ইত্যাদি খিদমত আনজাম দিত এবং পশম, চামড়া, উট ও ভেড়া-বকরী বিক্রি করে জীবন যাপন করত। এটা ছিল য়াছরিবের ভৌগো-লিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব।

২. য়াছরিবে পানির প্রাচুর্য ছিল। রৌদ্র তাপ থেকে বাঁচার জন্য ছিল খেজুর বাগানের ছায়া। আবহাওয়ার দিক দিয়ে সর্বোত্তম স্থান। কাফেলা দুরতিক্রম্য রাস্তা দিয়ে সপ্তাহ ও মাসাধিক কালের কষ্ট-তকলীফ ও সফ-রের যন্ত্রণা বহন করে যখন সেখানে পৌঁছত এস্থান তখন তাদের নিকট দুনিয়ার বেহেশ্ত মনে হ'ত। য়ামবূ' থেকে উপকূলবর্তী রাস্তা ছিল দুস্তর পারাবার। এজন্য কাফেলা সে রাস্তায় খুব কমই গমন করত। যে সমস্ত লোক মিসর থেকে নৌকার সাহায্যে আসত তারাও য়াছরিব হয়েই মক্কায় যেত। রোমান হুকূমত হযরত 'ঈসা মসীহ (আ)-এর জন্মের ২৪ বছর পূর্বে উক্ত রাস্তাগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস চালায়। কিন্তু তারা সফল হয় নি এবং আরব জয়েও সফল হতে পারেনি।

৩. য়াছরিবের উপরিউক্ত খাদ্যদ্রব্য স্থানীয় অধিবাসীদের পক্ষেই শুধু যথেষ্ট ছিল না, বরং কাফেলার লোকেরাও এখান থেকে নিজেদের জন্য খেজুর, আটা ও অন্যান্য দ্রব্য রাস্তার সম্বল হিসাবে নিয়ে যেত।

৪. মক্কার অদূরে 'আকাবা নামক স্থানে য়াছরিবের কবিলা আওস ও খাযরাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা আঁ-হযরত (সা)-এর হাতে বায়'আত করে তাঁকে য়াছরিবে তশরীফ নেবার জন্য দা'ওয়াত দিয়েছিল। তিনিও এ দা'ওয়াত কবুল করেছিলেন। যখন এ সমস্ত লোক মক্‌কা থেকে রওয়ানা হতে থাকে---তখন মক্‌কার মুশরিকরা তাদের ঈমান আনয়ন এবং রসূল করীম (সা)-কে য়াছরিবে দা'ওয়াত জানাবার কারণে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয় এবং তাদের ভেতরকার কিছু লোক এই চিন্তা করে তাদের (য়াছরিববাসীদের) ডেরার দিকে গমন করে যেন তাদেরকে ইসলাম থেকে পুনরায় নিজেদের মাযহাবে ফিরিয়ে আনা যায়। সেখানে গিয়ে তারা জানতে পারে যে, কাফেলা চলে গেছে। তারা যথাসম্ভব সত্বর একটি বাহিনী প্রস্তুত করে যেন য়াছরিব পৌঁছুবার পূর্বেই তাদেরকে থামিয়ে তাদের মাযহাব (ধর্ম) পরিবর্তনে বাধ্য করা যায়। আর তাতে যদি এসব লোক স্বীকৃত না হয় তবে শক্তি প্রয়োগে তাদেরকে নিজেদের ধর্মে ফিরিয়ে আনবে। অতঃপর এই বাহিনী অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এক একটি মনযিল অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসর হয় এবং য়াছরিব পৌঁছুবার পূর্বেই তাদেরকে রাস্তায় ধরে ফেলে। য়াছরিববাসীরা সংখ্যায় ছিল অল্প। এজন্য তারা সংঘবদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে লড়াই করেনি। তারা য়াছরিবের দিকে পালিয়ে যায়। মক্কাবাসীরা ইচ্ছাকৃতভাবেই তাদের পশচাদ্ধবন করেনি যাতে য়াছরিববাসীদের সঙ্গে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে।

মক্কাবাসীদের এই কার্যকলাপে মদীনার কতিপয় বড় গোত্র কুরায়শ-দের বিরোধী হয়ে যায়। নবী করীম (সা)-এর জন্য এটা ছিল সর্বোত্তম মওকা। তিনি এসব গোত্রকে কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে পারতেন। ঐসব গোত্র আরবের প্রাচীন রেওয়াজ মুতাবিক বদলা নেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিল। আঁ-হযরত (সা) আরববাসীদের উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত দুর্বলতা ও কমযোরীকে উপেক্ষা করেন নি। এটা ছিল হিজরতের রাজনৈতিক দিক।

৫. য়াছরিবে বড় কবিলা ছিল আওস ও খাযরাজ। বহুদিন থেকে এদের মধ্যে শত্রুতা চলে আসছিল এবং কয়েকবার তা খুনোখুনিতে পর্যন্ত গড়িয়েছিল। সিরিয়া থেকে যে সমস্ত য়াহূদী এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল তারা এদের পারস্পরিক দুশমনী থেকে ফায়দা লুটতো এবং আর্থিক

প্রাধান্যের জাল বিস্তার করে তাদের ভেতর লড়াই লাগিয়ে দিত আর নিজে-দের অস্তিত্ব নিরাপদ ও সুদৃঢ় করত। যদিও এরা নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করে ক্লান্ত ও অসন্ন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তথাপি একে অপরের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব কবুল করার জন্য তারা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তিনি শৈশবে ও যৌবনের প্রারম্ভে যে সফরগুলো করেছিলেন তা থেকে স্থানীয় সকল অবস্থা তাঁর নিকট দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এসব ঝগড়া-বিবাদের একটা বড় চিকিৎসা ছিল এই যে, কোন যোগ্য ও সমর্থ পুরুষ এসে দেখা দেবেন যিনি য়াছরিবের কেউ হবেন না এবং তারা তাঁর নেতৃত্বে একমত হবেন। আঁ-হযরত (সা) তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের ভেতরও সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হিসাবে মশহূর ছিলেন। অতএব তাঁর জন্য এই মর্যাদা সকল দিক দিয়েই উপযোগী ছিল। অতঃপর এমতাবস্থায় যখন দু'টো কবিলার বারটি খান্দানের সর্দারবৃন্দ তাঁর হাতে বায়‘আত করে তাঁকে নিজেদের জন্য অনুসরণীয় ইমাম মেনে নিয়েছে তখন কোনরূপ মতভেদের আর আশংকা ছিল না। হিজরতের মত পদক্ষেপ গ্রহণে এটিও ছিল একটি রাজনৈতিক দিক।

৬. পিতার পিতামহীর দিক দিয়ে য়াছরিববাসীদের সঙ্গে আঁ-হযরত (সা)-এর আত্মীয়তা ছিল। সে কারণে স্বীয় পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে তিনি আশাবাদী ছিলেন।

৭, য়াছরিবের য়াহূদীরা বাকী কবিলাগুলোর বিরোধী ছিল এবং তাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই গৃহযুদ্ধ চলে আসছিল। প্রথম দিকে য়াহূদীরাই জয়ী হয়ে-ছিল। কিন্তু এখন তাদের অবস্থা ছিল বিজিতের ন্যায়ই। এজন্য তারা যখন হুযূর আকরাম (সা)-এর তাওহীদের দা'ওয়াতের অবস্থা সম্পর্কে শুনল তখন তাদের আশা হ'ল তিনি কিতাবধারীদের পক্ষাবলম্বন করবেন এবং মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে আমাদের সহযোগী ও মদদগার হবেন। সেজন্য তারা আঁ-হযরত (সা)-এর সমর্থনে উৎসাহিত হয়। তাদের বড় বড় খান্দান য়াছরিবের পার্শ্ববর্তী, যেমন খায়বার প্রভৃতি স্থানে থাকত। য়াছরিবের য়াহূদী-দের সঙ্গে পারস্পরিক একটা বোঝাপড়া ও সমঝোতা হবার পর কমপক্ষে ঐ সব খান্দানের নিরপেক্ষতা অনিবার্যরূপেই নিশ্চিত ছিল।

৮. এসব সুবিধা ছাড়াও য়াছরিবকে কেন্দ্র বানানোর ফলে শত্রুপক্ষের নিম্নবর্ণিত ক্ষতি হতে পারত:

ক. মক্কাবাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অপর কোন দীর্ঘ রাস্তা অবলম্বন করতে হবে, খোরাক ও পানির স্বল্পতার সম্মুখীন হতে হবে; চলাচলের ক্ষেত্রে বিবিধ অসুবিধা বৃদ্ধি পাবে।

খ. মক্কাবাসীদের য়াছরিবের খেজুর ও খাদ্যশস্য মিলবে না। আর এসব জিনিষের মূল্য য়াছরিবের তুলনায় অন্য জায়গায় অনেক বেশী ছিল।

গ. কুরায়শরা যদি য়াছরিববাসীদের সঙ্গে শত্রুতায় লিপ্ত হয় তাহলে তাদের দুস্তর ও দুরূহ রাস্তা দিয়ে আসতে হবে এবং রসদ-সম্ভার, পানি ও পরিবহনের উপায়-উপরকণ প্রভৃতি সঙ্গে আনতে হবে। এমতাবস্থায় তারা য়াছরিবের উপর আকস্মিক হামলা করতে পারবে না। তাদের যথেষ্ট প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং এতে টাকাকড়ি ব্যয়ের পরিমাণও হবে বেশী। আর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অর্থের পূজারী হয়ে থাকে। সেজন্য মক্কাবাসীদের যথেষ্ট অসুবিধার মুকাবিলা করতে হবে।

ঘ. পরাজিত হবার ক্ষেত্রে তাদের ফৌজ ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে, কুরায়শ যাবে চিরদিনের জন্য খতম হয়ে এবং তাদের জিদ ও বিদ্বেষের উপর কায়েম থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

আমাদের উদ্দেশ্যের স্বপক্ষে এই কারণগুলোই যথেষ্ট। এগুলো আমরা এ কথার দলীল হিসাবে পেশ করছি যে, আঁ-হযরত (সা) স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার নাম 'হিজরত' রেখেছিলেন এবং এর পশ্চাতে সুবিধা ছিল এই যে, শত্রুপক্ষ এতে বিভ্রান্তির শিকার হবে। তারা মনে করবে, হযরত ময়দান ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন। হ'লও তাই। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এটা জানতেন। এটাই কারণ যে, তাঁরা ইসলামী বর্ষপঞ্জীকে হিজরতের ঘটনা থেকে শুরু করে এর গুরুত্ব ঘোষণা করেন। দুনিয়ার কোন জাতি-গোষ্ঠী আজ পর্যন্ত তাদের পর্যুদস্ত হওয়া ও কমযোরীকে চিরন্তন স্মৃতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেনি। এটা মানবীয় প্রকৃতির খেলাফ ও পরিপন্থী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জীবন্ত উদাহরণ নিন। হিটলারের ব্যক্তিগত কমযোরী ও দুর্বলতার কারণে পরাজিত ও বন্দী মিত্রবাহিনী ডানকার্ক থেকে জানে বেঁচে ইংলণ্ডে পৌঁছুতে সক্ষম হয়ছিল। বৃটিশ সরকার তাদের এই সাফল্যের প্রশংসাও করেন। কিন্তু উযীরে আজম মিঃ চার্চিলকে যখন ডানকার্কের সেই স্মরণীয় ঘটনাকে

জীবন্ত করে রাখবার জন্য 'তমঘা' (পদক) প্রদানের জন্য বলা হ'ল, তখন তিনি তা করতে পরিষ্কার অস্বীকার করেন। যদি মুনাফিকদের হাতে আমাদের ইতিহাস অনেকাংশে বরবাদ না হয়ে যেত তবে এটা নিশ্চিত ছিল যে, হিজরতের ঘটনা সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা)-এর পরিকল্পনার কোন সাক্ষ্য অবশ্যই মিলত।

যা-ই হোক, আমরা আমাদের বর্ণনার সমর্থনে আধুনিক কালের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের চিন্তাধারা ও মতামত পেশ করেছি যেন তা সম্মুখে রেখে রসূল আকরাম (সা)-এর যোগ্যতার আন্দায করা যায় এবং এটাও অবগত হওয়া যায় যে, আঁ-হযরত (সা) প্রতিরক্ষা-নীতি ও কৌশলের ক্ষেত্রে কত বড় অভিজ্ঞ ও নিপুণ কুশলী ছিলেন! হিজরত প্রকৃতপক্ষে মক্কা অবরোধ করার জন্য। আজকালকার পরিভাষায় তাকে Blocked বা ঘেরাও বলা হয়। এর সমর্থন হিজরতের পর মদীনার জিন্দেগীর একটি ঘটনা থেকে পাওয়া যায় এবং এই সমগ্র ঘটনাবলী এর সুস্পষ্ট দলীল যে, হিজরতের পরিকল্পনা অত্যন্ত সতর্কতা ও গভীর চিন্তা-ভাবনার পর তৈরী করা হয়েছিল। যেহেতু তারপর তিনি কাফির ও মুশরিকদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেজন্য এই প্রস্তুতি ও পরিকল্পনার নাম প্রতিরক্ষা কৌশল বা প্রতিরক্ষা নীতি রাখা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল যে সব অংশ ও মৌলিক উপাদান সমন্বয়ে প্রণীত হয় তার কিছু অবস্থা বর্তমান যুগের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে পেশ করা হয়েছে। আরও একটি উদ্ধৃতি দেখুনঃ অতঃপর কর্ম (আমল) ও পরিণতি তথা ফলাফলের দিক দিয়ে সেগুলো ঐ সব অবস্থা ও ঘটনাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করুন যা হিজরত পরবর্তীতে সংঘটিত হয়েছে। জেনারেল বার্ড "Direction of War" নামক গ্রন্থে লেখেন ঃ

"যখন কোন সরকার যুদ্ধ করার ফয়সালা করে তখন তার উচিত আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার রীতি-পদ্ধতি এমনভাবে কায়েম করা যেন স্বীয় রাষ্ট্রের জীবিকা-সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা খুবই উত্তম ও সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত থাকে, কিন্তু দুশমনের রাজনৈতিক মর্যাদা কমযোর এবং বাণিজ্যিক ক্ষমতা খতম হয়ে যায়।

হিজরত-পরবর্তী কতিপয় ঘটনা নমুনা হিসেবে এখানে দেওয়া গেল।

অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা ও মযবূতী

১. য়াছরিব তশরীফ নেবার পর আঁ-হযরত মসজিদে নববী নির্মাণ করেন যেন সমস্ত মুসলমান এক জায়গায় একত্র হয়ে প্রকাশ্যভাবে সালাত আদায় করতে পারে, পরস্পরের মাঝে চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণার আদান-প্রদান করতে পারে এবং হুযূর আকরাম (সা)-এর ওয়া'জ-নসীহত দ্বারা উপকৃত হতে পারে। বস্তুত মসজিদে নববীর এই সব ওয়া'জ-নসীহত ও খোৎবার মাধ্যমেই আঁ-হযরত (সা) স্বাধীনভাবে খোলাখুলি ওয়াহদানিয়াত (আল্লাহ্‌র একত্ববাদ) ও রিসালতের ঘোষণা দেন, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সা)-এর আনুগত্য ও অনুসরণকে ফরয হিসেবে অভিহিত করেন। মুসলমানদেরকে তাদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং সামাজিক জীবনের ভিত্তি পূর্ণরূপে সুসংহত করা হয়।

২. তিনি আনসার ও মুহাজিরদের ভেতর ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য কায়েম করেন, মুহাজিরদের পুরোপুরি পূনর্বাসিত করেন এবং মিলে-মিশে থাকার মূলনীতি ও বিধান প্রণয়ন করেন।

৩. তিনি নিজের এবং নিজের সকল অনুসারীদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করতে সেগুলো লিপিবদ্ধাকারে রূপদান করেন যেন পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর কোন আশংকা না থাকে।

৪. হিজরতের দ্বিতীয় বছরে শা'বান মাসে বায়তু'ল-মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বাকে কেবলা নির্ধারণ করেন। বস্তুত এটা এ কথারই ঘোষণা ছিল যে, ইসলামের মারকায (কেন্দ্র) কা'বা ঘর। মক্কা থেকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এখানে তশরীফ এনেছিলেন তা সেই সময় প্রকাশ করলেন প্রতিরক্ষা কেন্দ্র যখন মযবুত ও সুদৃঢ় হ'ল। কেননা এখন তিনি তাঁর উপর আরোপিত যিম্মাদারী সম্পূর্ণ করার যোগ্য হয়ে গিয়েছিলেন।

হারাম শরীফ

আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার গুরুত্বের পরিমাপ এর থেকেও করা যায় যে, তিনি মদীনা (য়াছরিব)-এর সীমারেখা কায়েম করে

তাকে হারাম (পবিত্র) ঘোষণা দেন। আজকালকার পরিভাষায় একে উন্মুক্ত শহর (Open city) বলা হয়। এর দ্বারা বোঝান হয় যে, এই শহরের অভ্যন্তরে এবং আশেপাশে শহরবাসীরা বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ও বৃটেন সরকার বায়তু'ল-মুকাদ্দাসকে "উন্মুক্ত শহর" তথা হারাম ঘোষণা দিয়েছিল। অবশ্য ১৯৩৯-৪৫ ঈসায়ীর বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধের আন্তর্জাতিক মূলনীতি ও নিয়ম-বিধিকে তাকে উঠিয়ে রেখে দেওয়া হয়েছিল। শুধু-মাত্র একবার এমন হয়েছিল যে, জার্মানী ফ্রান্সের অনুরোধে ও আবেদনক্রমে তার রাজধানী ও কেন্দ্রীয় শহর প্যারিসের উপর গোলাবর্ষণ করেনি।

'হারাম'-এর মূলনীতি ইসলাম পূর্ব যুগেও প্রচলিত ছিল এবং তা শুধু আরবেই নয় বরং গ্রীস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানেও এর উপর আমল করা হ'ত। এ মূলনীতি ছিল আধা-ধর্মীয় ও আধা-রাজনৈতিক। ধর্মীয় এজন্য যে, ঐ সমস্ত স্থান থেকে পবিত্রতা ও ভক্তি-শ্রদ্ধার কোন কথা বা বিষয় প্রকাশ পেয়েছে। ফলে সেখানকার প্রতিটি বস্তুকে পবিত্র মনে করা হ'ত। বৃক্ষ ছেদন ও কর্তন থেকে সে স্থান নিরাপদ ও মুক্ত থাকত। জীব-জানোয়ারকে কষ্ট দেওয়া এবং শিকার নিষিদ্ধ হ'ত। প্রতিটি লোকের জন্য তা হতে নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এখানে আগমন ও বহির্গমনকারী ব্যক্তি হেফাজত, নিরাপত্তা ও আশ্রয়ের ভেতর থাকত—তা সে যত বড় পাপী ও অপরাধীই হোক না কেন। যুদ্ধ ও রক্তপাত হ'ত না। এমতাবস্থায় হারাম-এর রাজনৈতিক গুরুত্ব কোনরূপ ব্যাখ্যা-বিশ্লেশণের মুখাপেক্ষী নয়। 'হারাম' আপন সীমারেখার ভেতর যেন একটি রাজত্ব যার প্রথা-প্রদ্ধতি ও বিধান ছিল একান্তভাবেই নিজস্ব। বর্তমান যুগে এর উদাহরণ রোম শহর যা রোমের পোপের শাসনাধীন 'হারাম'-এর মর্যাদা রাখে। আজকের রোমের যে মর্যাদা ও অবস্থান সেই মর্যাদা ছিল মক্কার এবং এর উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল কুরায়শ-দের। কুরায়শরাই এর পবিত্রতা ও ভক্তিশ্রদ্ধার রাজনৈতিক ফায়দা লুটত আঁ-হযরত (সা) মক্কায় হারাম-শরীফের সমপর্যায়ে মদীনাকেও হারাম ঘোষণা করে মদীনাবাসীদেরও সেই মর্যাদা দিয়ে দেন যা ছিল এতদিন মক্কাবাসীদের। ফলে মদীনাবাসীরাও নিজেদেরকে সমস্ত আপদ-বিপদ থেকে নিরাপদ ভাবতে থাকে যেমন এতদিন নিরাপদ ভাবত মক্কাবাসীরা। অন্য কথায় এর মর্মার্থ ছিল এই যে, যদি মক্কাবাসীরা মদীনার 'হারাম'-এর

পবিত্রতা, সম্মান ও শ্রদ্ধার বিরোধিতা করে তবে মদীনাবাসীরাও মক্কার 'হারাম'-এর সম্মান ও শ্রদ্ধার বাধ্যবাধকতা থেকে আযাদ হবে। মক্কাবাসীরা যদি মদীনার উপর হামলা করে তবে মদীনাবাসীরাও মক্কার উপর হামলা করতে পারবে। এটা এমনই দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ কাজ ছিল যে, তা ঘটনার গতিকে পরিবর্তন করে মুসলমানদের এবং তাদের ছোট্ট রাষ্ট্র মদীনাকে মক্কার সমপর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। হযরত রসূল করীম (সা) যদি এমন বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পন্থায় কাজ না করতেন তাহলে নিম্নবর্ণিত অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন তাঁকে হ'তে হ'তঃ

প্রথমত, আঁ-হযরত (সা)-কে মদীনার হেফাজতের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক ফৌজ রাখতে হ'ত। এছাড়া তিনি দুশমনের মুকাবিলা করার জন্য বাইরে যেতে পারতেন না। এজন্য প্রতিরক্ষা শক্তি কমযোর হ'ত আর অনুরূপ হারেই অসুবিধা বাড়ত।

দ্বিতীয়ত, মক্কাকে কোনকালেই এবং কোন সময়ই জয় করা যেত না। কেননা 'হারাম' হবার কারণে তা থাকতো মাহফুজ ও নিরাপদ। আর তা করা হ'লে তামাম আরব কবিলা তাঁর বিরোধী হয়ে যেত এবং নিরপেক্ষতার অঙ্গীকার ভেঙে ফেলত। মদীনাকে 'হারাম' ঘোষণা করে আঁ-হযরত (সা) মক্কাবাসীদের অত্যন্ত কমযোর করে দেন। হিজরতের প্রথম দিককার ইতিহাসের অধ্যায় চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। কুরায়শদের সেই আযাদী ও নির্ভীকতা যদ্দ্বারা সে মুসলমানদের এবং আঁ-হযরত (সা)-এর উপর জুলুম-নির্যাতনের পাহাড় টেনে নামাত, হঠাৎ করেই গেল বন্ধ হয়ে। এখন যদি মক্কাবাসীরা মদীনার চতুঃসীমার ভেতর তার 'হুরমত' (পবিত্রতা) নষ্ট করে, তবে তিনিও তার জবাবে যে কোন কার্যক্রম গ্রহণের ব্যাপারে স্বাধীন হবেন। তিনি 'হারাম'-এর পরিষ্কার সীমারেখা নির্ধারণ করেন যার চিহ্ন অদ্যাবধি বিদ্যমান।

আঁ-হযরত (সা)-এর এই প্রচেষ্টার একটা বড় ফল এই হ'ল যে, সিরিয়াগামী কাফেলার জন্য তাঁর অনুমতি গ্রহণ করা জরুরী হয়ে দেখা দিল। 'হারাম'-এর সীমারেখা নির্ধারণের পর কোন কাফেলাই হযরতের অনুমতি ভিন্ন মদীনা হয়ে যেতে পারত না। এই বিধিনিষেধ কাফির ও মুশরিকদের কাফেলার পক্ষে বিরাট মর্মপীড়ার কারণ ছিল। এজন্য তারা অন্য

পথ অবলম্বন করে। তাদের রুখবার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র সেনা-প্লাটুন প্রেরণ করেন এবং এ ধরনের অভিযানে তিনি নিজেও গমন করেন। এ পর্যায়ে তাঁর প্রেরিত একটি প্লাটুনের সঙ্গে কাফিরদের ছোট-খাটো একটা সংঘর্ষও ঘটে।

অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ

এখন এটা দেখুন যে, প্রতিরক্ষা নীতি ও প্রতিরক্ষা কৌশলের জগতে এই সকল কার্যাকলাপের গুরুত্ব কি এবং অতীত ও বর্তমানের বড় বড় প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ বিষয়ে কি মতামত পোষণ করেন।

ক্লজ উইজ ও মলিটিকে জার্মানীর সর্বজনস্বীকৃত ও প্রথিতযশা প্রতিরক্ষা পর্যালোচক। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি গোটা দুনিয়া-ব্যাপী। ক্লজ উইজ লিখেছেন ঃ

"দুশমনের সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য লক্ষ্য হাসিল করা। প্রতিরক্ষা নীতি ও কৌশল বিভিন্ন লড়াইয়ের পরিকল্পনা তৈরী করে। এসব লড়াইয়ের ময়দানও যথাসম্ভব এই দৃষ্টিকোণ থেকে নির্বাচিত হয়ে থাকে যেন বিভিন্ন লড়াই থেকে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে। অন্য কথায়, এ লড়াইগুলো যেন একই শেকলের বিভিন্ন কড়া।"

মলিটিকে বলেন ঃ

"প্রতিরক্ষা কৌশল-পরিকল্পনার লক্ষ্য এই হয় যে, সরকার সিপাহ্সালারের উপর যে সব উপকরণ সোপর্দ করেন সরকারের প্রতিরক্ষা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তিনি তা কার্যকর করে থাকেন।"

উইলসনের মতে,

"প্রতিরক্ষা নীতির অর্থ দুশমনের সম্পদ ও উপকরণ, তার চলাচল ও গতিবিধি সঠিক এবং গভীরভাবে নিরীক্ষণ করা।"

নেপোলিয়ন এই দৃষ্টিভঙ্গীকেই অন্যভাবে পেশ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হ'ল, "প্রতিরক্ষা নীতিতে সাফল্যের রহস্য এই যে, সিপাহসালার বিপক্ষীয় ফৌজের গতিবিধি এবং তার উপকরণ ও মাধ্যমগুলো কব্জা করে তাকে বেকার করে দেবেন।"

মদীনাকে 'হারাম' বানিয়ে মক্কাবাসীদের বাণিজ্যিক পথগুলো কব্জায় আনা এবং তাদের কাফেলাগুলোর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এর দ্বারা তিনি মক্কাবাসীদের জীবনোপায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। বস্তুত ব্যবসা--বাণিজ্য এবং যাতায়াতের ধারা ধ্বংস ও বরবাদ করা যেন তাদেরই বরবাদ করা।

প্রতিরক্ষা কৌশল ও সমরনীতির একটি স্বীকৃত মূলনীতি হ'ল এই যে, দুশমনকে কখনই খাটো ও অসহায় মনে না করা । এর সঙ্গে এটাও জরুরী যে, তার জীবনের মূলনীতি, চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে তাকে এমনভাবে পরীক্ষা করে নিতে হবে যে, সময়ে তার নিক্ষিপ্ত ষড়যন্ত্রকে যেন যথাযথভাবে ব্যর্থ করে দেওয়া যায়। নির্জীবতা ও অসহায়তা থেকে হতাশা সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং হতাশ ও মন-ভাঙা জাতি-গোষ্ঠী দুর্বল মনোবলের কারণে সত্বর হাতিয়ার ফেলে দেয়। সত্য বলতে কি, যুদ্ধের ফয়সালা জীবনহানির আধিক্যে কিংবা স্বল্পতায় খুব কমই হয়ে থাকে। সাধারণত হতাশা এবং নিরাশাই জাতিকে পর্যুদস্ত করে। এই বাস্তবতাকে হিজরতের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার সাথে মিলিয়ে দেখুন, জানতে পাবেন যে, হিজরতের তিন বছরের ভেতরেই উত্তুঙ্গ গর্দান মক্কার উপর মজবুরী, অসহায়তা ও ভগ্ন হৃদয়ের প্রভাব ফেলা শুরু হয়ে গেছে এবং তাদের সংহতিতে বিপর্যয় ও দুর্বলতার চিহ্ন পরিস্ফুট হতে শুরু করেছে।

তিনটি নিয়ামত

এই কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ঈমানদারগণ একদিকে হয়ে যান এবং কাফির ও সত্যদ্রোহী থাকে অপর দিকে। মুসলমানদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য কিংবা কোন প্রকার আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল না। সবাই এক ভাই

ভাই এবং সবাই একই বরাবর,---আর সবার লাভ -ক্ষতিও এক হয়ে যায়। এক হয়ে যায় সকলের চিন্তা ও কর্মের রীতি-পদ্ধতিও। ঐক্যবদ্ধ, সংঘবদ্ধ এবং সুসংহত হবার ফলে তাদের ভেতর শক্তির সঞ্চার হ'ল আর শক্তি খুলে দিল কর্মের রাস্তা। এখন মুসলমানরা আলাদা কওম এবং কাফির ও মুশরিকগণও আলাদা। রক্ত, গোত্র এবং বংশের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। অবস্থা যে গতিতে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তাতে করে তাদের ভেতর সংঘর্ষ ছিল অনিবার্য। কাফিররা মুসলমানদের আযাদী ও উন্নতি খামুশ হয়ে দেখতে পারে না। তাদের অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিল। অতএব সামনে আগত অবস্থার মুকাবিলা করার জন্য আঁ-হযরত (সা) হিজরতের প্রথম বছরেই "Nations at War"-এর সেই মূলনীতির বাস্তব শিক্ষা দেন যার হিকমত ও ফলপ্রসূতা য়ূরোপের সামনে প্রথমবার ১৯১৪-১৮ 'ঈসায়ীর যুদ্ধে প্রকাশিত হয়। Nations at War এবং জিহাদ একই মূলনীতি এবং একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দু'টি ভিন্ন নাম।

যা-ই হোক সে সময় মুসলমানদের তিনটি বড় নিয়ামত অর্জিত হয়েছিল। (১) কুরআন মজীদ অর্থাৎ ইসলামী তা'লীম যা পারলৌকিক জীবন ছাড়াও দুনিয়ার সকল সাফল্য ও সৌভাগ্য লাভের ছিল একমাত্র নিয়ামক; (২) ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য; (৩) জিহাদ (Nations at War)।

প্রস্তুতি এবং যুদ্ধের মূলনীতি

এই তিনটি নিয়ামতের বরকতে মদীনার ছোট্ট রাষ্ট্রটি সকল দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও সুসংহত হয়ে গেল। তখন আঁ-হযরত (সা) মদীনার পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলোর দিকে মনোনিবেশ করেন এবং তাদেরকে পরীক্ষা করতে শুরু করেন। এরপর মুজাহিদদের সামরিক প্রশিক্ষণও দিতে থাকেন। একটি অভিনব ও সভ্য জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা বাস্তবে রূপ দেবার পর তাকে মুজাহিদ কওম বানাতে শুরু করেন। আরবরা পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্বে এবং নীতি-নৈতিকতা ও চরিত্রহীনতা থেকে নৈতিক ও চরিত্রবান মানুষে পরিণত হয়েছিল। এখন তিনি তাদের আল্লাহ-ওয়ালা মানুষ বানাচ্ছিলেন। কুরআনুল করীম তাদের জন্য যে সমরনীতি প্রণয়ন করেছে মুসলমানরা সর্বদা গর্বের সঙ্গে তা সভ্য দুনিয়ার সামনে পেশ করতে পারে। যুদ্ধের অনুমতি রয়েছে ঐশী

নির্দেশের অধীন, আর তা হ'লঃ সে সমস্ত লোকের যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল; কেননা তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে (কুরআন) অর্থাৎ যুদ্ধ নিজেদের হিফাজত এবং জুলুম প্রতিরোধ ও অবসানের জন্য করো যেন জালিমের জুলুম বৃদ্ধি না পেতে পারে এবং অপর কোন কওমকে জুলুমের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না করে দিতে পারে। মুসলমানদের যুদ্ধ করা শুধু মজলুম মানুষের সাহায্য ও সমর্থনে সমীচীন বলে অভিহিত করা হয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও নির্দেশ এসেছে যে, লক্ষ্য রেখ, যুদ্ধ করতে গিয়ে অপরাপর ধর্মের 'ইবাদতখানা ও উপাসনালয় যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এমনিভাবে অন্য ধর্মের বুযুর্গ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শনের জন্যও তাকীদ এসেছে যাতে করে মুজাহিদ বাহিনী জুলুম অবসানের জোশে সীমা অতিক্রম না করে।

মালে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে নির্দেশ এসেছে ঃ হে নবী! লোকেরা আপনাকে মালে গনীমত সম্পর্কে প্রশ্ন করছে। আপনি বলে দিন, তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের। তোমাদের প্রবৃত্তির কোন অধিকার সেখানে নেই। তোমাদের কাজ শুধু আল্লাহ্কে ভয় করা, পরস্পরে সদ্ব্যবহার করা ও তাঁর রসূলের হুকুম-আহকাম তামিল করা।

যুদ্ধে সাহস ও মনোবল অটুট রাখার তাকীদ দেওয়া হয়েছে ঃ

"যখন তোমরা যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের মুকাবিলা করবে তখন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। যে কেউ লড়াইয়ের ময়দানে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে তাঁর উপর আল্লাহ্র গযব পতিত হবে আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।"

জুলুম প্রতিরোধ ও অবসানের লক্ষ্যে লড়াইকে অর্থাৎ জিহাদ করাকে জীবন বলা হয়েছে এবং তার গুরুত্ব এভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঃ

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ্ এবং রসূলের হুকুম মেনে চলো, যে সময় তোমাদের সেই কর্মের দিকে আহবান জানানো হয় যার ভেতর রয়েছে তোমাদের জীবন।"

বিজয় ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ্র ইচ্ছা ও মর্জিকে অপরিহার্য বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক তবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের ফয়সালার বস্তু প্রদান করবেন এবং তোমাদের পাপরাশি দূরীভূত করবেন আর দেবেন মাফ করে।"

জিহাদ কতদিন পর্যন্ত করা হবে সে সম্পর্কে নির্দেশ হ'ল ঃ

"আর তোমরা সেই সময়-সীমা পর্যন্ত লড়তে থাকো যতদিন প্রাধান্য লুপ্ত না হয় শিরক্ ও ফেৎনা-ফাসাদের এবং সমগ্র দীন একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই না হয়ে যায়।"

গনীমত বন্টন সম্পর্কে হেদায়েত প্রদান করা হ'ল ঃ "তার এক-পঞ্চমাংশ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের; বাকী অংশ আত্মীয়-স্বজন, এতিম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।" এমনিভাবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য সুরা আনফালে নিম্নোক্ত আহকাম নাযিল হয়েছে ঃ

"আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ মান্য করো, পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদ করো না; অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে আর তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি যাবে বিনষ্ট হয়ে।"

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে ঃ

"শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্য যথাসাধ্য সমরাস্ত্র ও সিপাহীসুলভ শক্তি সদা-সর্বদা প্রস্তুত রেখো যেন দুশমনের উপর তোমাদের ভীতিকর প্রভাব কায়েম থাকে।"

জিহাদের উদ্দেশ্য শুধু জুলুমের অবসান। এক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করা কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার পয়গামবাহী এবং সমগ্র বিশ্বের জন্য আপাদমস্তক রহমতস্বরূপ। কুরআনুল করীম হিদায়েত প্রদান করছে ঃ

"যদি দুশমন সন্ধির প্রস্তাব করে তবে তোমরা তাতে সাড়া দেবে এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করবে। এমনটি যেন না হয় যে, তোমরা শক্তির মোহে সীমা অতিক্রম করো এবং দুশমনের আগ্রহ সত্ত্বেও তোমরা সন্ধি স্থাপনে এগিয়ে না যাও।"

এগুলো কুরআনুল করীমের সরাসরি ও প্রকাশ্য আহকাম, মর্ম উদ্ধারের জন্য শাব্দিক অনুবাদের অনুসরণ করা হয়নি। বস্তুত এটাই হ'ল মূল বুনিয়াদ যার উপর ইসলাম তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় এবং যার ভিতর জায়েয ও না-জায়েয, নিষিদ্ধ ও উত্তমের সীমারেখা পরিষ্কাররূপে নির্ধারণ করে দিয়েছে। আঁ-হযরত (সা) এই প্রতিরক্ষা বিধানের সঙ্গে মুজাহিদ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেন। এই প্রশিক্ষণই মুষ্টিমেয় মরুচারী আরবদের শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে এবং অপরাপর সকল শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিবেদিতপ্রাণ একেকজন মুজাহিদ আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূল (সা)-এর অগণিত দুশমনের বিরুদ্ধে অধিকতর কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

যুদ্ধরত বাহিনীর জন্য সমরোপকরণ ও মারণাস্ত্র নিঃসন্দেহে অত্যন্ত জরুরী। এ সব ছাড়া যুদ্ধের কল্পনা খুবই হাস্যকর। কিন্তু উত্তম কর্ম এবং চারিত্রিক সৌন্দর্য ব্যতিরেকে সমরোপকরণের আধিক্যও ফলপ্রসূ হয় না। যুদ্ধের এই নিয়ম-বিধি, আল্লাহ্‌র সাহায্যের এই সুস্পষ্ট খোশ-খবর এবং রসূল আকরাম (সা)-এর কমাণ্ড, সত্যের বিজয় ও উন্নত মস্তক হওয়া এবং বাতিলপন্থীদের ক্ষতি ও ব্যর্থতার এর থেকে বড় বড় দলীল -প্রমাণ আর কী হতে পারে? অতএব দুনিয়া তার বিস্ময়কর প্রদর্শনী দেখলো এবং শুধু নবী যুগেই দেখেনি বরং মুসলমানরা তাদের আসল ও মৌলিকত্বের দিকে যখনই প্রত্যাবর্তন করেছে এবং কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে যখনই কর্ম-নির্দেশিকা বানিয়েছে, ফলাফল তখন এমনি বিস্ময়করই হয়েছে।

সিপাহসালার হিসাবে রসূলে করীম (সা)

আপনারা দেখেছেন বাস্তবতা কখনোও বদলায় না। যুদ্ধ ও সংঘর্ষ মানব সৃষ্টির পর থেকেই বরাবর চলে আসছে। এর থেকে কোন যুগ এবং সময়ের কোন আবর্তনই মুক্ত ছিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সহজাত প্রবৃত্তির একটি বৈশিষ্ট্য। বরং যদি বলা হয় যে, মানবেতিহাস এই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও সংগ্রাম-সাধনার ধারাবাহিক কাহিনীর নামে তাহলে সম্ভবত অত্যুক্তি করা হবে না। ইসলাম তার ফিতরতের এই বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা করে এক গণ্ডে চপেটাঘাত করলে অপর গণ্ডটিও সামনে এগিয়ে দেবার শিক্ষা দেয়নি; বরং তার

পরিপূর্ণ তাহযীব এবং তার এখতিয়ারসমূহকে সীমাবদ্ধ করে 'কল্লার পরিবর্তে কল্লা' নেওয়ার মত পাল্টা জবাব দেবার অনুমতি প্রদান করেছে এবং এই অনুমতির কুরআনী বিধান এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে পেশ করা হয়েছে। যুদ্ধ ও সংঘর্ষের এটাই নিয়ম-বিধি যার থেকে উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধতর এবং যার থেকে অধিক উপকারী ও ফলপ্রসূ নিয়ম-বিধান দুনিয়ার সামনে কখনো আসেনি এবং কখনো আসতে পারে না।

এর সঙ্গে সমরশাস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা কৌশলের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ ও পর্যালোচকদের চিন্তা-ভাবনা ও মতামতও বর্ণিত হয়েছে। তাতে কামিয়াবীর প্রয়োজনীর উপকরণ থেকে শুরু করে বাহিনীর অধিনায়কের ব্যক্তিগত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যাবলীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এ পর্যায়েই আঁ-হযরত (সা) প্রশংসনীয় আচার-অভ্যাস, তাঁর প্রখর ধীর-শক্তি ও মেধা, দূরদর্শিতা, কুশলতা, আদত্মদর্শন, ধৈর্য ও দৃঢ়তা, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতা, সৎকর্ম-শীলতা ও ন্যায়পরায়ণতা, স্নেহ-মমতা ও নিষ্ঠা এবং মানবীয় প্রেম ও সহা-নুভূতির উন্নত গুণাবলীর উত্তুঙ্গ ও পরিপূর্ণতার বর্ণনাও এসে গেছে। এখন এটা বলা আবশ্যক যে, আঁ-হযরত মুজাহিদদের কতখানি উন্নত পর্যায়ের শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং এই শিক্ষায় তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী কতটা রাসায়-নিক ক্রিয়ার ন্যায় প্রমাণিত হয়েছিল। কিন্তু এর পূর্বে সেই বর্ণনার সম-র্থনে বিশ্বের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞের অত্যাবশ্যকীয় পর্যা-লোচনার সংক্ষিপ্তসার পেশ করা সমীচীন মনে হচ্ছে। তাতে এটা জানা যাবে যে, শত শত বর্ষব্যাপী সঞ্চিত অভিজ্ঞতা লাভের পর দুনিয়া প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির যে মূলনীতি প্রণয়ন করেছে তা কি এবং য়ূরোপ ও আমেরিকা, যারা নিজে-দেরকে উন্নতির চরম শীর্ষে অধিষ্ঠিত মনে করেন, নিজেদের ফৌজের প্রশি-ক্ষণ কোন্ মূলনীতির উপর দিয়ে থাকেন। তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপঃ

১. ফৌজের সামরিক যোগ্যতা কতিপয় নেহায়েত প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর নির্ভরণীল এবং তা এই যে, "সিপাহসালারকে উন্নত স্বভাব-বৈশিষ্টের অধিকারী, ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধেয় এবং সরকারী যোগ্যতার মালিক হওয়া উচিত। দিল ও দেমাগ, সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও বিশ্বাস, জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা, স্থৈর্য ও শান্তি-কামিতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং সাম্য-প্রিয়তার ন্যায় গুণাবলী তাঁর মধ্যে থাকতে হবে। তাঁকে প্রাণবন্ত, পরিশ্রমী, নির্ভীক এবং সাহসী হতে হবে। এমনিভাবে

বিপদ-মুসীবতের মুকাবিলায় দৃঢ়পদ থাকা, গভীর চিন্তা-ভাবনায় অভ্যস্ত এবং মানুষ চিনবার মত ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক যেন তিনি আপন-পর ও দোস্ত-দুশমন সঠিকভাবে বুঝে নিতে পারেন।"

২. সৈন্যবাহিনীর প্রশিক্ষণ উন্নতমানের হওয়া দরকার। ফৌজী প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য শুধুই একটি, এবং তা এই যে, ফৌজ যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে যেন লড়তে পারে। এই প্রশিক্ষণ সিপাহসালার থেকে সাধারণ সিপাইটি পর্যন্ত সবার জন্যই বাধ্যতামূলক যেন শান্তিকালীন সময়ে অফিসার অধীনস্থদের শেখাতে পারেন এবং যুদ্ধের সময়ে সিপাহ্সালারী করতে পারেন, আর সিপাই তাঁর নির্দেশাবলী খুবই সহজভাবে বুঝতে পারে।

ফৌজী প্রশিক্ষণের প্রাথমিক ও বাধ্যতামূলক মূলনীতি হ'ল শৃংখলা। এর সঙ্গেই শারীরিক ও মানসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। শারীরিক প্রশিক্ষণের ফলে সিপাহী কঠোরপ্রাণা হয়ে থাকে এবং মানসিক প্রশিক্ষণের ফলে প্রদত্ত নির্দেশাবলী পালন বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে করতে পারে। এভাবে তার ভিতর আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। শৃংখলা ব্যতিরেকে ফৌজ ভেড়ার পালের মত।

৩. শৃংখলা ও প্রশিক্ষণের ফলে ফৌজ উন্নত শ্রেণীর হাতিয়ারে পরিণত হয় যা সিপাহসালার দুশমনের বিরুদ্ধে সফলতার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেন। বিন্যস্ত করার অর্থ ফৌজকে ক্ষুদ্র প্লাটুনে বিভক্ত করা এবং বিভিন্ন প্লাটুনের বিভিন্ন দায়িত্ব নির্ধারণ করে তাদেরকে বুঝিয়ে ও শিখিয়ে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, অশ্বারোহী বাহিনীকে তাদের যিম্মাদারী সম্পর্কে পুরোপুরি সজাগ ও সতর্ক করা এবং তাদের সক্রিয় করে তোলা, পদাতিক বাহিনীকে তাদের লড়াই করবার পদ্ধতি শেখানো এবং পরিবহন প্লাটুনকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যে অনুগত করা ইত্যাদি। অতঃপর সবাইকে সংহত ও সমন্বিত করে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে যুদ্ধ করা।

৪. সমরাস্ত্র উন্নতমানের হওয়া এবং সেগুলোর সঠিক ব্যবহার। সফল যুদ্ধের জন্য জরুরী হ'ল ফৌজের নিকট যুগ মাফিক আধুনিক ধরনের অস্ত্র-শস্ত্র থাকবে এবং সে সব অস্ত্রশস্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ সঠিক পন্থায় করা হবে।

এ পর্যায়ে জেনারেল বার্ড-এর পর্যালোচনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"যে দেশ—যে জাতি ও যে সরকার নিজ স্বার্থের হেফাজত যুদ্ধের মাধ্যমে করতে চায় তাকে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে যে, কোন কার্যক্রম যেন প্রতিবেশী সরকারগুলোর চিন্তাধারার পরিপন্থী না হয় যার দরুন তারা খামাখা নারাজ হয়ে শত্রুর পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়। এই বহিঃসংক্রান্ত কৌশল তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল ঃ

ক. স্বীয় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান,

খ. আপন জাতীয় স্বার্থ,

গ. নিজেদের অধিকার ও স্বার্থের হেফাজতে জাতির সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি।

"প্রথম দুটি বিষয় নির্ধারণ করে যে, কোন্ কোন্ রাষ্ট্রের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক ও আচরণ হওয়া উচিত। তৃতীয়টি দ্বারা দুশমনের বিরুদ্ধে নিজের নরম-গরম, কঠোর ও বেপরোয়া ভূমিকা অথবা আপোষ ও সমঝোতামূলক কর্মপন্থা নির্ধারিত হয়। আর সামগ্রিক ভাবে এই তিনটি বিষয়ের নিরিখে ফৌজ মযবুত অথবা কমযোর হবে।

১. রাজনৈতিক

"অতএব যুদ্ধ প্রস্তুতি তিন রকমের হয়ে থাকে ঃ

"রাজনৈতিক প্রস্তুতির সময় সরকারের উপর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের পূর্ণ আস্থা থাকা আবশ্যক। তেমনী দরকার প্রতিবেশী সরকারগুলোর সাথে বন্ধুত্ব সহযোগিতা ও পারস্পরিক আস্থামূলক সম্পর্ক। যাতে করে পরিষ্কার ধারণা থাকে যে, বিপদের ঘোষণা কোন্ দিক থেকে হবে এবং তার মুকা-বিলা করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

২. নৈতিক ও বস্তুগত

"রাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থা যখন সুদৃঢ় হয়, আইন-শৃংখলা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা উন্নত হয় তখন সফলতা লাভ স্থির নিশ্চিত হয়। নেপোলিয়নের অভিমত হ'ল, নৈতিক শক্তি দৈহিক শক্তির চেয়ে কমপক্ষে তিন গুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সৈন্যবাহিনী সার্বিকভাবে নিজ দেশ ও জাতির পতাকাবাহী হয়ে থাকে। সুতরাং যে সৈন্যবাহিনীতে সত্যবাদিতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা,

ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ, যোগ্যতা ও দক্ষতা বেশী থাকে এবং বিলাসিতার পরিবর্তে আত্মত্যাগের গুণাবলী থাকবে তারা প্রতিটি সংগ্রামে কামিয়াব হবে।

৩. সমরাস্ত্র

"সৈন্যবাহিনীর আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত হওয়া অবশ্যক। ফলে আপন সেনাবাহিনীর উপর নিজ দেশের বাসিন্দাদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। এই আস্থার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। অপরাপর জাতিসমষ্টি এই বিরাট বাহিনীর কারণে সেই রাষ্ট্রের অধিকার ও স্বার্থ, তার সরকার ও তার ব্যবসা-বাণিজ্যকে সম্মান করে। সরকারের পক্ষে ফরয যে, যুদ্ধ ঘোষণার সময় সে রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে সম্মুখে রেখে সেনাবাহিনীকে নিজেদের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিষ্কার ও খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেবে।"

এবার চিত্রের অপর দিকের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

জেনারেল হ্যামলে এবং জেনারেল কীগেল তাঁদের "Operation of War" নামক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে এটা জেনে নেওয়া আবশ্যক যে, লড়াই কোন্ কোন্ অবস্থায় ও কোন্ কোন প্রভাব বলয়ের অধীনে লড়া হবে এবং সমরক্ষেত্র কী ধরনের।"

সেনাবাহিনীর হাতিয়ার যা-ই হোক না কেন তা পরিবর্তিত হতে থাকবে। সমরক্ষেত্রে সফলতা লাভের দৃঢ় ইচ্ছা ও নৈতিক মনোবল, শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ, জ্ঞান ও উপলব্ধি, দৈহিক শক্তি এবং বিপদ-মুসীবত সহ্য করার মত সহনশীলতা শক্তি থাকা অপরিহার্য। লড়াইয়ের ময়দানে নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তির বিশেষ পরীক্ষা হয়ে থাকে। কামিয়াবীর জন্য যুদ্ধের সূচনা ভাল হতে হবে এবং সূচনা সে সময়ই ভাল হতে পারে যখন যুদ্ধের সূচনা-পর্বের পূর্বে শান্তির সময় লড়াইয়ের পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে। কিন্তু এ প্রস্তুতিও বেকার ও অর্থহীন হবে যদি না সৈন্যহিনীকে সে সময়ে উত্তম প্রশিক্ষণ দিয়ে কঠোরমনা বানিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুত মুসীবতকে হাসি মুখে বরদাশ্‌ত করাটা দৈহিক শক্তির চেয়ে নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তির উপর বেশী নির্ভর করে। আর তাই সিপাহ্‌সালারের জন্য অপরিহার্য হ'ল, তিনি ফৌজের নৈতিক

ও চারিত্রিক শিক্ষার ব্যাপারে খুব বেশী খেয়াল রাখবেন। কেননা প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার সাফল্যের ভিত্তি নৈতিক ও চারিত্রিক গুণাবলীর উপর নির্ভরশীল।

নীতি ও চিন্তাধারার দুনিয়া থেকে এখন কর্ম ও অভিজ্ঞতার দুনিয়ায় আসুন। আর এ সবের বিশুদ্ধতা ও যথার্থতাকে ঘটনাবলী ও পর্য-বেক্ষণের সাথে মিলিয়ে পরীক্ষা করুন। অধিকাংশ প্রতিরক্ষা পর্যালোচকের অভিমত হ'ল, ১৯৩৯-৪৫ 'ঈসায়ীর মহাযুদ্ধে ফ্রান্সের অতি দ্রুত পরাজিত হওয়ার কারণ ফরাসী সৈন্য আরামপ্রিয়, বিলাসপরায়ণ ও হীন মনোবলের ছিল এবং আত্মবিশ্বাসের মহামূল্য রত্ন থেকে ছিল শত সহস্র মাইল দূরে। মুসোলিনী যদিও ইটালীয়দের দৈহিক এবং শিক্ষাগত দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে-ছিলেন, কিন্তু তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতির দিকে আদৌ মনোনিবেশ করেন নি। এজন্য তারাও খুব দ্রুত যুদ্ধের ময়দানে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে। ক্রুসেডে সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর মুকাবিলায় ক্রুসেডের হামলাকারীদের অবস্থাও একই রকম হয়েছিল। এই যুদ্ধবাজদের যেসব ভুল-ভ্রান্তি জেনারেল টুকার তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সেসব ছাড়াও আমাদের মতে ক্রুসেডীয় লুটেরাদের সব চাইতে বড় দুর্বলতা ছিল তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃ-পতন। এর সমর্থনে টি. এ. আর্চার এবং চার্লস লিভার্জ কিংসফের্ড তাঁদের "জাতিসমষ্টির ইতিহাসে ক্রুসেড" শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

"প্রথম ক্রুসেডের সূচনাকারীদের সামনে দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমটি, ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আর তা হ'ল পবিত্র স্থানসমূহের উপর 'ঈসায়ী সরকারগুলোর দখল কায়েম করা এবং দ্বিতীয়টি হল, পূর্ব য়ুরোপকে তুর্কীদের হামলা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা।

"প্রথম উদ্দেশ্য প্রায় হাসিল হবে ঠিক সেই সময় ক্রুসেড বাহিনীতে অধঃপতন দেখা দেয়। তাতে করে অর্জিত উদ্দেশ্যও হাতছাড়া হয়ে যায়। এর বহু কারণ ছিল। তার মধ্যে কয়েকটি এই ঃ

"প্রথমত, বিস্তৃতির দিক দিয়ে বিজিত এলাকা খুবই কম ছিল। ফলে তার সীমান্ত ছিল বিপদের সম্মুখীন। দ্বিতীয়ত, ফৌজের ভেতর ঈর্ষা ও ও বিদ্বেষের কারণে পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা বিরাজ করছিল। তৃতীয়ত, ক্রুসেডীয় খ্রীস্টান এবং সিরীয় খ্রীস্টানদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা

ছিল না। চতুর্থত, কর্মকর্তারা একে অপরের প্রতি ছিল মারমুখো। যে সব ফৌজ পূর্বে এসে অবস্থান নিয়েছিল তারা বিশৃংখল, আরাম ও বিলাসিতার শিকার হয়ে যায় এবং পশ্চিমা অধিবাসীদের আবেগ ও উৎসাহ যায় ঠাণ্ডা হয়ে।

"দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটির ব্যাপারে দু'টো চিন্তাধারা বিরাজ করছিল। প্রথমত, পূর্ব য়ূরোপের খ্রীস্টান রাষ্ট্রগুলো তুর্কীদের কারণে ভীতসন্ত্রস্ত ছিল এবং তারা নিজেদের নিরাপত্তা কামনা করছিল। ক্রুসেড সে সব রাষ্ট্রের ধ্বংস অবশ্যই ঠেকিয়ে রাখে। কিন্তু আমরা এ কথা না বলে পারছি না যে, ক্রুসেড বাহিনীর জন্যেই সেসব রাষ্ট্রের মধ্যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয় এবং পরিণতিতে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা তুর্কীদের ফিরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে প্রথম ক্রুসেডের যে ফলপ্রসূ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল—চতুর্থ যুদ্ধ তা ম্লান করে দেয় এবং এরপর পূর্ব য়ূরোপে ইসলামী ফৌজকে রুখবার জন্য আর কোন শক্তিই থাকে না। এসব ক্রুসেডের কারণে প্রাচ্য দুনিয়া এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিভেদ খুবই গভীর হয়ে পড়ে এবং খ্রীস্টান রাষ্ট্রগুলোর শক্তিও অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়।

"দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল য়ূরোপে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে স্তব্ধ করে দেওয়া।"

এর পর তিনি লিখছেনঃ

"য়ূরোপ সীমান্তের বাইরে পা রাখার পর ক্রুসেড নাইটগণ রাজনৈতিক বিবাহ করেন, যার নজীর অথো ২য় (OTHO) ব্যতীত আর কোথাও মেলে না। শুধু তাই নয়, সম্রাট এডওয়ার্ড ১মকে অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে, য়ূরোপের সুন্দরী শাহযাদীদেরকে প্রাচ্য ভাষায় জ্ঞান দান করে প্রেরণ করা হোক যাতে তাদের তুর্কী ও আরব রাষ্ট্রগুলোর শাসন-কর্তাদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যায়। আশা করা যায়, তারা খোদার কৃপায় ও নিজেদের সৌন্দর্যের কমনীয় আকর্ষণে তাদের স্বামীদের খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবে।"

নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা এবং কৃতকর্মের অধঃপতন যুদ্ধের ময়দানেই শুধু পরাজয় ও ব্যর্থতার কারণ হয়নি বরং চিন্তা ও কর্মের গোটা দুনিয়ার উপরও মাস্তুলের মত বিরাজ করছিল। অতএব সে সবের পরিণাম ফলও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত ও ধ্বংসরূপেই দেখা দেয়।

এসব উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্ত বেশ দীর্ঘ হয়ে গেল। এবার সক্রেটিসের ধ্যান-ধারণাও একটু প্রত্যক্ষ করুন। প্রাচীনকালে জ্ঞানী ও দার্শনিকমণ্ডলীর মধ্যে তিনি অত্যন্ত উঁচু মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এমন একটি যুগের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এমন একটি সভ্যতার তিনি স্রষ্টা ও প্রতিনিধি ছিলেন, যাকে গুণগত যোগ্যতার দিক দিয়ে সব সময় সম্মান ও ভক্তির চোখে দেখা হয়। সিপাহসালায়ের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়কের জন্য অপরিহার্য হ'ল, তার ফৌজের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ-সম্ভার এবং অন্যান্য মালামাল কোত্থেকে মিলবে সে সম্বন্ধে তাকে পুরোপরি ওয়াকিফহাল থাকতে হবে যাতে সৈন্যরা কোন সময় অভাব অনুভব না করে। তার ভেতর এ সামর্থ্য থাকতে হবে যেন তিনি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারেন। শুধু প্রস্তুত করতে পারবেন তাই নয় বরং তা কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও সামর্থ্যও তাঁর থাকতে হবে। তাঁকে সূক্ষ্মদর্শী, উদার, পরিশ্রমী, দয়ার্দ্রচিত্ত, আবার কখনো রক্ত-পিয়াসী হতে হবে। কখনো চৌকিদারের মত হুঁশিয়ার—আবার কখনো চোরের মত সুযোগ-সন্ধানী, কখনো দাতা ও দানশীল, কখনো কৃপণ ও বখীল, কখনো নির্ভীক, আবার কখনো সংযত-বাক, কখনো দৃঢ়চিত্ত ও সহনশীল, আবার কখনো তাঁকে ধূর্ত ও চালাক হতে হবে। এসব এমন বৈশিষ্ট্য যার ভেতর কতকগুলো জন্মগতভাবে প্রাপ্ত, আবার কতকগুলো অভিজ্ঞতাজাত এবং চিন্তা-ভাবনা থেকেও অর্জিত হতে পারে। এতদ্‌ভিন্ন সিপাহসালারকে সমরশাস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়াও অপরিহার্য। ফৌজের জন্য শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ জরুরী। শৃংখলা ব্যতিরেকে ফৌজ শুধুমাত্র মানুষের সমাবেশ ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন ইট, চুনা, বালি এবং অন্যান্য সামগ্রী-সম্ভারকে ইমারত বলা যায় না, তদ্রূপ এই সমাবেশকেও ফৌজ বলা যায় না।"

এই বর্ণনার ভেতর সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ অংশ হ'ল তাতে সিপাহসালারের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। এতে সিপাহসালারের সর্বাপেক্ষা বড় যিম্মাদারী এই বলা হয়েছে যে, "তাঁর রসদসম্ভার ও সমরোপকরণের বিদ্যমানতা এবং দরকারী উপকরণ যোগানোর জ্ঞান ও পূর্ণ পরিতৃপ্তি থাকবে।"

নেপোলিয়ন এরই একটা অংশকে বর্ণনা করেছেন এভাবে---"ফৌজ খালি পেটে লড়াই করতে পারে না।"

শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সক্রেটিস সর্বপ্রকারের ফৌজী-শৃংখলার কথাই বুঝিয়েছেন। কেননা শৃংখলা দ্বারাই ফৌজ ফৌজ হয় এবং সঠিক পন্থায় চলাচল করতে পারে এবং সঠিক চলাচল ও গতিবিধির উপরই প্রতিরক্ষা কৌশল ও সমরশাস্ত্র নির্ভরশীল। সাধারণভাবে দেখা গেছে যে, আজকাল কতক তরুণ ফৌজী অফিসার সমরশাস্ত্রের মূলনীতি বুঝে নেওয়াটাই সমরশাস্ত্রের কামালিয়াত হাসিল মনে করেন। অথচ এটা ভুল। দুনিয়ার বড় বড় প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞগণ বারবার জোর দিয়ে বলছেন যে, মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন শক্তিশালী হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে, গাড়ীর একটি চাকায়ও যেন কোন ত্রুটি না থাকে। যদি তা থাকে তবে ইঞ্জিন চললেও গাড়ী চলবে না।

যা-ই হোক, সক্রেটিসের মতামতও প্রায় তাই, যা আপনি বর্তমান ও নিকট অতীতের অপরাপর প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের পর্যালোচনায় পড়েছেন। কিন্তু সক্রেটিস কিছু পয়েন্ট ও গুণাবলী বিস্মৃত হয়ে গেছেন। এগুলো আমাদের আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে ও অধিনায়কত্বে পূর্ণভাবে উজ্জ্বলতররূপে দৃষ্টিগোচর হয়। সেগুলো হ'ল সহ্য শক্তি, দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ ও শরীরকে আরামপ্রিয়তার হাত থেকে দূরে রাখা। বস্তুত সিপাহসালারকে কঠোরমনা, পরিশ্রমী এবং স্থির মস্তিষ্কের হতে হবে। গত দু'টি বিশ্বযুদ্ধে বহু বড় ফ্রন্টে শুধুমাত্র এ কারণেই ব্যর্থতা বরণ করতে হয়েছে যে, জেনারেলদের ইচ্ছাশক্তি ছিল দোদুল্যমান এবং তাঁদের ধৈর্য ও স্থৈর্যের মাত্রা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্যথায় তাঁদের সৈন্যদের লড়াই করবার মত মনোবল তখনও বাকী ছিল।

ইসলামী সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ

এখন আসুন এবং দেখুন যে, আঁ-হযরত (সা) মুসলিম সৈন্যবাহিনীর প্রশিক্ষণ কেমনভাবে দিয়েছিলেন এবং পরিপূর্ণতার অপরিহার্য অঙ্গনে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

রসূল আকরাম (সা) জীবনের শুরু থেকেই এই বাস্তবতা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন যে, যুদ্ধ একটি ভয়ানক প্রতিযোগিতা এবং এই প্রতিযোগিতামূলক বাজীতে খেলোয়াড়কে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বিপদাপদ ও মুসীবতের মুকাবিলার জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল ছাড়াও কঠিনতর প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। অক্ষম ও অল্প-বয়স্কদের ছেড়ে দিলে মুসলমানরা কোনরূপ পার্থক্য ও বৈষম্য নির্বিশেষে ইসলামের এক একজন সিপাহী। সুতরাং তারা ছাড়া এই প্রশিক্ষণের হাত থেকে কেউ মুক্ত হতে পারে না। আঁ-হযরত (সা) সিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন যেন মুসলিম মুজাহিদ ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট অত্যন্ত সহজভাবে বরদাশ্‌ত করতে পারে এবং এতে সে অভ্যস্ত হয়। তিনি জানতেন যে, অধিনায়ককে তার বাহিনীর জীবনের বাজী ধরতে হয়। এটাও বিরাট যিম্মাদারী এবং এটা সে সময় পর্যন্ত পুরোপুরি ও সুচারু-রূপে পালন করা সম্ভব হতে পারে না যে পর্যন্ত আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের আলোড়নকারী বিষয় অত্যন্ত শক্তিশালী হয়, ফৌজ ও তার অধিনায়কের ভেতর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে একাত্মতা, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও যোগসূত্র স্থাপিত হয়, আস্থা ও আনুগত্যের আবেগের ভেতর হয় জীবন এবং ফৌজ এ ব্যাপারে যে পর্যন্ত পূর্ণ তৃপ্ত না হয় যে, সেনাপতির ব্যক্তিগত আচরণ ও উদ্দেশ্য, এমন কি প্রতিটি বস্তু চিত্তাকর্ষক ও উন্নতমানের যা অপরকে অনুপ্রাণিত করে এবং যা সম্মান ও অনুকরণযোগ্য। এখানে এটা বলা দরকার নেই যে, আঁ-হযরত (সা)-এর অভ্যাস ও চালচলন এবং কার্যাবলী ও কর্মকাণ্ডের প্রভাব মু'মিনদের উপর কতখানি ছিল এবং কর্ম-নৈপুণ্যের দিক দিয়ে কাফির ও মুশরিকেরাও তাঁকে কী পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতো। একজন উচ্চ শ্রেণীর অধিনায়কের যে সব উত্তম গুণ থাকা উচিত আঁ-হযরত (সা)-এর ভেতর তা পূর্ণরূপেই বিদ্যমান ছিল। মুসলমানদের নৈতিক ও চারিত্রিক প্রশিক্ষণের নমুনাও ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ।

থাকল শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপার। এটাও ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ। বিশ্বাসী সম্প্রদায় ছিল আঁ-হযরতের জন্যে উৎসর্গীকৃত। তাদের জীবন ও মরণ সবই ছিল আল্লাহ্‌র জন্যে। রক্তগত, খান্দানী, বংশীয়, ঐতিহ্যিক, অর্থনৈতিক ও সম্পদের দিক দিয়ে যাবতীয় অসাম্য পুরোপুরি দূর হয়ে গিয়ে-ছিল। সাম্য ও ভ্রাতৃত্বও এমন ছিল যে, দুনিয়া ও আসমান এর নজীর দেখে নি। জীবন বাজী ও আত্মোৎসর্গের আবেগ-উৎসাহে প্রতিটি মুজাহিদ

ছিল বিহবল। অধিনায়কত্ব ও নেতৃত্ব ছিল আল্লাহ্‌র রসূল (সা)-এর আনুগত্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হবার জন্যে, অধীনতা ও অনুসরণ ছিল শাহাদতের উদগ্র কামনা চরিতার্থ করার জন্যে। প্রভাব-প্রতিপ্রত্তিশালীদের উপর গোলাম ও গোলামপুত্রদের নেতা ও রাহবর নিযুক্ত করা হচ্ছে আর সবাই খুশী মনে তার হুকুম তা'মিল করছে। তাকওয়া ও পরহেযগারি ছিল মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি আর রসূল (সা)-এর আনুগত্য ছিল গর্বের বিষয় ও কল্যাণ লাভের ওসীলা।

এত সব সত্ত্বেও আঁ-হযরত (সা) সব ক'টি যুদ্ধই অত্যন্ত সতর্কতা, বুদ্ধিমত্তা ও সমর-নৈপুণ্যের সঙ্গে লড়েছেন। তাতে মুসলিম বাহিনীর জীবন হানি সব সময়ই খুব কম হয়েছে। এটি এমন একটি অনুপম বৈশিষ্ট্য যা প্রতিরক্ষা কৌশল পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে। সার-কথা এই যে, আঁ-হযরত (সা) স্বীয় নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তি এবং মুজাহিদসুলভ প্রশিক্ষণ দ্বারা আরবদের বিশ্ব বিজয়ী বানিয়েছেন। আর এই প্রশিক্ষণের প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাঁর ওফাতের পরও কাফিরদের সুদক্ষ ও সাহসী ফৌজ মুজাহিদদের সামনে আসতে ভয়ে কেঁপে উঠতো।

জিহাদের ইতিহাসের একটি ঘটনা দলীল হিসেবে প্রণিধানযোগ্য। পেছনের কোন এক অধ্যায়ে এটা বর্ণনা হয়েছে যে, রোমের সালতানাত আরব ভূ-খণ্ডের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। তার শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির খ্যাতি সমগ্র দুনিয়ায় পরিব্যাপ্ত ছিল। স্থানীয় সাফল্যের পর যখন ইসলামী শাসনের পরিধি বর্ধিত হয়, তখন রোমীয়রা নিজেদের অসীম ক্ষমতা ও শক্তির দাপট প্রদর্শন দ্বারা মুজাহিদদের ভীত ও সন্ত্রস্ত এবং তাদের অগ্রগতির পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দিতে চাইল। রোম সালতানাত ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী সাম্রাজ্য এবং তার দুর্ধর্ষ বাহিনীর খ্যাতি দুনিয়াভর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উভয় পক্ষের মুকাবিলা হ'ল। রোমানদের বিশ্বাস ছিল যে, তাদের ফৌজ নিরস্ত্র আরবদের পর্যুদস্ত করে মরু প্রান্তরে ঠেলে দেবে যেখানে তারা রসদ-সম্ভারের ঘাটতি ও স্বল্পতার কারণে শোচনীয়ভাবে খতম হয়ে যাবে। কিন্তু যখন পরপর কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হওয়া ছাড়া আর কোন লাভ হ'ল না তখন সম্রাট হেরাক্লিয়াস স্বীয় সমর ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের ডেকে ব্যর্থতার

করণ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেনঃ আরব সৈন্য সংখ্যায় কম। তাদের হাতিয়ার তোমাদের হাতিয়ার ও সমরাস্ত্রের মুকাবিলায় অত্যন্ত নিকৃষ্ট, ত্রুটিপূর্ণ ও সেকেলে ধরনের। এর পর কি কারণ যে, আমাদের বিশাল বাহিনী তাদের মুকাবিলায় তিষ্ঠাতে পারছে না। সবাই চুপ করে ভাবতে থাকে। কারও কোন উত্তর জোগাল না। অবশেষে কিছুক্ষণ পর একজন বর্ষীয়ান বাহাদুর সিপাহী উঠে দাঁড়ান এবং সম্রাটকে সম্বোধন করে বলেনঃ আলীজাহ্! আরবদের বিজয়ের রহস্য তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তির মধ্যে নিহিত। তারা রাত্রের কিছু অংশ আল্লাহ্‌র 'ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করে। দিনের বেলায় প্রয়োজন মাফিক সিয়াম পালন করে। কোন মনুষের উপর জুলুম করে না। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ভেতর বাস করে। এ সব কারণেই তারা এত সাহসী ও নির্ভীক এবং এজন্যেই তারা শত্রুর উপর জয়ী হয়। তাদের সুদৃঢ় ইচ্ছা শক্তি পাহাড়ের মত অটল ও মযবুত। কিন্তু সলজ্জভাবে বলছি, রোমের সিপাহীরা অত্যন্ত অহংকারী, বিভিন্ন রকমের অন্যায় ও কুকর্মে লিপ্ত। তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী এবং গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের উপর তারা জুলুম ও নির্যাতন করে থাকে। এরই কারণে আরবীয়দের তুলনায় সাহসিকতায় ও জানবাযীতে রোমীয়রা দুর্বলতর।

একটি ভ্রান্তি

আমরা আঁ-হযরত (সা)-এর "শৈশব ও যৌবন" অধ্যায়ে 'তকদীর' শীর্ষক অনুচ্ছেদে লিখেছি, কোন কোন মুসলমানের এ ধারণা সঠিক নয় যে, আঁ-হযরত (সা)-এর সফলতার তামামতর কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র নবী ও রসূল ছিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সহায়তা তিনি লাভ করেছিলেন। এর উপর কোনরূপ মতামত পেশ করা এবং এর সঙ্গে চেষ্টা-তদবীর ও কৌশল উদ্ভাবনকে যুক্ত ও অংশী করা ঠিক নয়। নবুওতের মহান মর্যাদা এবং আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য ও সহায়তাকে অস্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের এ ব্যাপারেও অটুট শ্রদ্ধা রয়েছে যে, হযরতের স্বভাবজাত যোগ্যতা এবং খোদাদাদ শক্তি ছিল অনন্যসাধারণ। কোন মানুষকে তাঁর মুকাবিলায় দাঁড় করাবার ধৃষ্টতা করা চলে না, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে তিনি যা কিছু করেছেন তা একজন মানুষ হিসেবেই করেছেন।

আর তা বিশ্বচরাচরের পরিবেশগত নিয়ম-কানুন ও কার্য-কারণের প্রভাব-মুক্ত হতে পারে না। নবুওত লাভের পর তিনি অত্যন্ত মুসীবত ও কঠিন অবস্থার মুকাবিলা করেন। কিন্তু তা করেন হিম্মত, ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে। আর এর ফলশ্রুতি হ'ল এই যে, সৎ স্বভাব ও ধীর-স্থির প্রকৃতির লোকেরা তাঁর পয়গামকে কবুল করে। বস্তুত যেখানে হক ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, সেখানে এ কথারও ঘোষণা রয়েছে যে, হক-এর পশ্চাতে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য অবশ্যই থাকে। অধিকন্তু সংগ্রাম ও সাধনা, সবর ও দৃঢ়তা সফলতা লাভের বিশেষ অপরিহার্য অঙ্গ। আল্লাহ্ তা'আলার জলীলু'ল-কদ্‌র পয়গম্বরদেরকেও জীবন-যন্ত্রণাদানকারী অবস্থা অতিক্রম করতে হয়েছে এবং কৌশল ও উপায়-মাধ্যমের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। এরপরই কোন মনযিলে মকসুদে তাঁরা পৌঁছেছেন। বস্তুত বাস্তব সত্য এটাই, এটা কারও অস্বীকার করবারও উপায় নেই এবং এর সঙ্গেই পয়গম্বরদের প্রতিটি উক্তি, কোন 'আমলকে উত্তম আদর্শ অভিহিত করে তার অনুকরণের তাকীদ করা হয়েছে। সুতরাং উচ্চ সম্মান ও নিরাপত্তার আসনে উপবেশন করে তকদীরের অস্বীকৃতি এবং অনৈসলামী দর্শন পেশ করা কখনো শোভনীয় হতে পারে না।

মক্কী জীবনের বিপদাপদ ও মুসীবত এবং কষ্টকর অভিজ্ঞতার পর হিজরতের মনযিল, এরপর দারুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে অভিজ্ঞ নেতৃত্ব, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন গোত্রের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি এবং এ ধরনের অন্যান্য সব কর্ম এভাবেই কি আঞ্জাম দেওয়া হয়নি, যেভাবে একজন মানুষকে দেওয়া দরকার এবং সেগুলোর পরিপূর্ণতায় হযরত (সা)-কে সেই সব অবস্থা ও ঘটনার সম্মুখীন কি হতে হয়নি, যার সম্মুখীন হতে হয় অন্য মানুষকে? অতঃপর এসব ঘটনা ও অবস্থা, তদুপরি আঁ-হযরত (সা)-এর সমগ্র জীবন মুসলমানদের জন্য কি অনুকরণযোগ্য নমুনা নয়? হাদীছ, সীরাত ও ইতিহাসের কোন কোন গ্রন্থে হুযুর আকরাম (সা)-এর দু'টি সত্তা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং একটি অপরটি থেকে পৃথক করে মানবীয় ও অতি মানবীয় এই দুই ভাগে কি বিভক্ত করা হয়েছে?

এখন আমরা আঁ-হযরত (সা)-এর জীবনের একটি দিকের আলোচনায় আসছি। আর এটাই তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থাৎ

মুজাহিদ বাহিনীর অধিনায়ক ও রাষ্ট্রের আমীর হিসাবে তাঁর অবস্থান। আমরা স্বীকার করি যে আঁ-হযরত (সা)-কে আল্লাহ্ তা'আলা প্রকৃতিগত-ভাবে প্রখর ধী-শক্তি ও মেধাসম্পন্ন, সদা-সর্তক, যোগ্য ও উৎকৃষ্টতম করে পাঠিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি কি এসব প্রকৃতিগত যোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে নিজের ভেতর ফৌজের অধিনায়কের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম এবং গুণাবলী যোগ্যতা সৃষ্টি করেননি? মেহনত ও কঠোর পরিশ্রমের সে সব স্তরকে কি অতিক্রম করেন নি যা তার পরিপূর্ণতা সাধনের জন্য আবশ্যক? মরুভূমির কঠিন ও কষ্টকর জীবনে তিনি আবাস ও সফর, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কায়-কারবার, যুদ্ধ ও সন্ধি সব কিছুরই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। প্রকৃতিদত্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার এটাই ছিল সমন্বয় যে, তিনি দুনিয়ার সবচেয়ে ও সর্বাধিক সফল জেনারেল এবং সর্বোত্তম শাসক প্রমাণিত হন। প্রতিরক্ষা রাজনীতিতে তিনি যে সব কৌশলের মাধ্যমে কাজ করেছেন এবং কর্মক্ষেত্রে তিনি যে রণনৈপুণ্যের প্রমাণ দেন সাড়ে তেরো শতাব্দী কালের সকল উন্নতি ও অগ্রগতি সত্ত্বেও দুনিয়া এর চেয়ে আগে বাড়তে পারেনি। এ সম্পর্কে সম্মুখে আলোকপাত করা হবে।

সৈন্য সমাবেশ ও আক্রমণ পরিচালনা

আঁ-হযরত (সা) যুদ্ধের প্রাক্কালে ও যুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন সাহাবার নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনীর ছোট ছোট প্লাটুন ও কোম্পানী বিভিন্ন স্থানে পাঠা-তেন। এ সবকে সারিয়া বলা হয়েছে। এ সব অভিযান কেন পাঠানো হ'ত, এ ধরনের হামলা ও সৈন্যদলের গুরুত্বই বা কি এবং তাদের প্রশি-ক্ষণই বা কিভাবে হ'ত সেটা পুরোপুরি উপলব্ধি ও অনুভব করানোর জন্যে আমরা নিম্নে পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতামত পেশ করছি:

যখন কোন সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এটা ফয়সালা করবেন যে, তার ফৌজ দুশমনের উপর হামলা চালাবে তখন তাকে এ বাস্তব সত্য স্মরণ রাখতে হবে যে, বিজয় সেই ফৌজের পদচুম্বন করে, যারা নিজেরাই অগ্রসর হয়ে স্বয়ং হামলা পরিচালনা করে। সৈন্য দলের আগে বেড়ে আক্রমণ থেকেই তার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে। এর দ্বারাই সিপাহসালার দুশমনের উপর

প্রাধান্য হাসিল করতে পারেন। আর দুশমনের উপর একবার যখন আগে ভাগে আক্রমণের মাধ্যমে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন তা আর হাত ছাড়া করা ঠিক হবে না। কেননা এর দ্বারাই দুশমনকে পর্যুদস্ত করে তাকে অনুকূল শর্ত মেনে নিতে বাধ্য করা যেতে পারে। শত্রুর উপর হামলা পরিচালনা করে তাকে পরাজিত করবার দৃঢ় ইচ্ছা ফৌজের প্রতিটি সদস্যের অন্তরমানসে বদ্ধমূল হয়ে যাওয়া দরকার, যাতে করে অধীনস্থ অফিসার মওকা মাফিক শত্রুর উপর হামলা করে স্বয়ং সম্মুখে অগ্রসর হতে পারেন এবং তাদেরকে সাহসিকতায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভূত না হয়। সাধারণ সেপাই থেকে শুরু করে সিপাহসালার পর্যন্ত এই বাস্তব সত্য সবার মন-মগজেই গেঁথে রাখা উচিত যে, হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা, বিশেষ করে যুদ্ধের ময়দানে, মারাত্মক অপরাধ। বিপদ-আপদ ও মুসীবতে ঘাবড়িয়ে যাওয়া কিংবা তাকে উপেক্ষা করা বা এড়িয়ে যাওয়া কাপুরুষতার লক্ষণ আর কাপুরুষতা ফৌজের জন্যে পরাজয় এবং জাতির জন্যে লজ্জা ও কলংকের কারণ হয়ে থাকে। সফলতা লাভের জন্যে হামলাকারী ফৌজকে ঐ সব বুনিয়াদী মূলনীতি মেনে চলা উচিত।

১. আকস্মিক হামলা

এটা এত বড় সাংঘাতিক অস্ত্র যে, হামলাকারী একে কাজে লাগিয়ে লড়াইয়ের অত্যন্ত নাযুক পর্যায়ে দুশমনকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারে। আক্রমণকারী হবার জন্যে কতিপয় জরুরী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আকস্মিক হামলার উদ্দেশ্য থাকে দুশমনকে বিব্রত ও হতবুদ্ধিকর অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করা। সেজন্যে প্রথমেই এমন প্রভাব সৃষ্টি করা দরকার যদ্দারা শত্রুবাহিনীর অধিনায়কের মন-মগজ প্রভাবিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি তার মনে স্বীয় বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে অহেতুক অহংকার সৃষ্টি করে দেওয়া যায় এবং শ্রেষ্ঠত্বের মোহ ও গর্বে অভিভূত করে তোলা যায়, তবে সে হামলাকারীদের আসল অভিপ্রায় সম্পর্কে অনবধান থাকবে এবং সে জানতেও পারবে না যে, তার বিরুদ্ধে কোথায় এবং কি ধরনের হামলা হতে পারে। যেহেতু আচানক হামলার মওকা মাঝে মধ্যে পাওয়া যায় আর এ থেকে যদি তাৎক্ষণিকভাবে কোন ফায়দা না লাভ করা যায় তবে

আর কখনোই সে মওকা ফিরে আসে না। অতএব হামলাকারীর জন্য এটা অত্যন্ত জরুরী যে, তিনি এটাকে কাজে লাগাবার জন্য নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পূর্ণ সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা তৈরী করবেন এবং তাকে কার্যকর করার জন্য পুরোপুরি সজাগ ও তৈরী থাকবেন। অধিকন্তু এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখবেন যে, যদি কোন কারণে এই হামলা কামিয়াব না হয়, যেমন শত্রু পক্ষ পরিকল্পনার গোপন রহস্য জেনে গেছে, তখন যেন এর তদারক করা যেতে পারে। পরিকল্পনা গোপন রাখাও নেহায়েত জরুরী। বিশেষ করে যে মুহূর্তে পরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি জোরেশোরে চলতে থাকে, তখন আসল রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করা যাবে না। আর যদি আশংকা দেখা দেয় যে, এসব প্রস্তুতিতে শত্রু হামলার ধরন পরিমাপ করে ফেলবে তাহলে এমতাবস্থায় তাকে গোপন রাখার উপায়ও পূর্বেই চিন্তা করে নেওয়া উচিত। আচানক হামলার পরিকল্পনা কয়েকজন লোককেই বলা উচিত যেন গোপনীয়তা ফাঁস না হয়।

এইক্ষণে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, আচানক হামলার পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো খুব কম সংখ্যক অধীনস্থের জানা থাকবে। গত মহাযুদ্ধে (১৯৩৯—৪৫ 'ঈসায়ী) যখনই কখনো আচানক হামলার গুপ্ত খবর ফাঁস হয়ে গেছে, তখনই ভীষণ রকম সম্পদ ও জীবন হানি হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বৃটিশ সরকার বর্মার উপর হামলা পরিচালনা করে একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দখল করতে চেয়েছিল। সর্বপ্রকার সতর্কতা এতে অবলম্বন করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। এই সঙ্গে একজন যুবক পাদ্রী যাচ্ছিলেন। পাদ্রী এ সংবাদে এত বেশী খুশী হয়েছিলেন যে, আনন্দের আতিশয্যে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে খানা খেতে যান এবং প্রচুর পরিমাণে শরাব পান করেন। শরাবের নেশায় তিনি বুঁদ হয়ে পড়েন। তিনি নেশার ঘোরে স্বীয় বন্ধুদের বলেনঃ আমার অত্যন্ত খোশনসীব যে, বিলেত থেকে আসার পরপরই আমার এই ফৌজের সঙ্গে যাবার মওকা মিলে গেল, যারা জাপানীদের উপর সমুদ্রের দিক দিয়ে শীঘ্রই হামলা করতে যাচ্ছে। পরদিন ভোর না হতেই সৈন্যদল উল্লিখিত অভিযানে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু যখন উক্ত বন্দরে (আকিয়াব) পৌঁছুল, তখন দেখতে পেল দুশমন লড়বার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত—যার জন্য এ সৈন্যদল ভীষণভাবে ক্ষতি স্বীকার করে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। পরে কারণ অনুসন্ধান

করতে গিয়ে দেখা গেল, এই বিরাট ক্ষতি স্বীকারের কারণ হামলার গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। একজন গুপ্তচর সেই হোটেল থেকে জাপানীদেরকে উক্ত অভিযানের তথ্য প্রদান করেছিল। অতএব তারা লড়বার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যায়।

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে এটাই দেখান হবে যে, আঁ-হযরত (সা) এ সব মূলনীতির উপর কিভাবে 'আমল করেছিলেন এবং কোন্ কোন্ ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

যা-ই হোক এটা স্বীকৃত সত্য যে, আকস্মিক হামলা যুদ্ধের নেহায়েত কার্যকর অস্ত্র। কিন্তু সকল প্রকার সতর্কতা ও প্রস্তুতির সঙ্গে এর সাফল্যের জন্যে প্রয়োজন হ'ল আচানক হামলার প্রভাব, নতুন আবিষ্কৃত অস্ত্র, সমর-শাস্ত্রের অভিনব ও নিত্য-নতুন তরীকা-পদ্ধতি এবং আক্রমণের পরিকল্পনাকে অত্যন্ত গোপন রাখতে হবে। কেবলমাত্র এই পথেই কামিয়াবী হাসিল করা যেতে পারে। কিন্তু আকস্মিক কিংবা আচানক হামলা সহজ কাজ নয়। এতে যে পরিমাণ সতর্কতা, প্রস্তুতি ও গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়, শত্রুপক্ষও ঠিক সে পরিমাণ সতর্কতা, প্রস্তুতি এবং গোপনীয়তার সঙ্গে সর্বপ্রকার চালবাজী ও চেষ্টা-তদবীরের উপর গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন ও সে সব তদারকের পথ করতে থাকে। এজন্য আচানক হামলা অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি তার প্রস্তুতিকে গোপনীয়তার সঙ্গে বাস্তবায়নের জন্যে নেহায়েত জরুরী হ'ল, সকল অধীনস্থ অফিসার এবং অন্যান্য সৈন্য তাদের সিপাহসালারকে পূর্ণ সহযোগিতা দান করবে।

২. দুশমনের উপর বিজয় লাভের জন্যে জরুরী হ'ল—প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নে এবং একে কার্যকরী করতে সময় নষ্ট না করা, প্রতিটি কাজ অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে এবং কোনরূপ সময় নষ্ট ব্যতিরেকে সম্পন্ন করা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, খামাখা ঘাবড়িয়ে গিয়ে ও তাড়াহুড়ো করে তা করা হবে। শত্রুর উপর অগ্রাভিযানের এখতিয়ার যখন হাতে মুঠোয় এসে যাবে তখন মওকা হেলায় হারানো আদৌ ঠিক হবে না। এ কাজকে পরিপূর্ণ রূপ দান ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্যে জরুরী হ'ল—সিপাহসালার মোক্ষম মুহূর্তে পরিষ্কার নির্দেশ জারী করবেন যাতে কারো কোনরূপ সন্দেহ থাকবে না এবং অধীনস্থ অফিসার অত্যন্ত চটপট নির্দেশ

তামিল করবেন। যদি এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে দায়িত্বশীলতার ট্রেনিং শান্তি ও নিরাপদকালীন অতি উত্তম উপায়ে দেওয়া হয়, তাহলে যুদ্ধকালীন লড়াইয়ের হাঙ্গামা সত্ত্বেও সকল কাজই অত্যন্ত সুন্দর ও সুচারুরূপে এবং নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতায় পৌঁছুতে পারে।

এর সঙ্গে অপরাপর জরুরী কথা হ'ল এই যে, অধীনস্থ অফিসার ও সৈন্যদের মাঝে আত্মবিশ্বাস এবং শত্রুর উপর হামলা করার মত জোশ ও আবেগ ক্রিয়াশীল থাকবে যেন তারা বুঝেসুঝে প্রদত্ত নির্দেশ পূর্ণ যিম্মাদারীর সঙ্গে পালন করতে থাকে, বিলকুল তেমনি যেমনি কোন মেশিন চালু অবস্থায় তার প্রতিটি যন্ত্রাংশ নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে থাকে। এরূপ সুবিন্যস্ত ও নিয়মতান্ত্রিকতার সব চেয়ে বড় ফায়দা হ'ল এই যে, এতে অধিনায়ক দুশমনের কূট চাল বুঝতে পারেন এবং স্বীয় পরিকল্পনার উপর আরও অধিক চিন্তা-ভাবনা ও মনোনিবেশের সুযোগ পেয়ে থাকেন এবং অন্য কোন বিষয় এ সব বিষয়ের ভেতর বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে না।

অনন্তর যেভাবে এটা প্রয়োজন যে, নির্দেশ সময়মত জারী করতে হবে—ঠিক তেমনি এটাও জরুরী যে, ফৌজের সকল সদস্য সেগুলো সময়মত এবং তাৎক্ষণিকভাবে তামিল করবে। যখন সুদৃঢ় ও অটুট ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে নির্দেশ পালনেও বিদ্যুতগতি শামিল হয়, তখন দুশমনের পদস্খলন ঘটে। আর পদস্খলন যখন ঘটে যায় তখন দৃঢ় ইচ্ছা ও মনোবল নিয়ে বিদ্যুতবেগে চূড়ান্ত হামলা করে তাদেরকে পরাজিত করা যেতে পারে।

৩. তৃতীয় মূলনীতি হ'ল অনাড়ম্বর ও সহজ-সরলতা। যদি যুদ্ধে বিবদমান পক্ষদ্বয়ের প্রতিরক্ষা -পরিকল্পনা দু'পক্ষের খেয়াল মাফিক চলে তা হলে এতে কারও জয় যেমন নিশ্চিত হবে না, তেমনি পরাজয়ও নির্ধারিত হবে না। লড়াইয়ে কিন্তু অবস্থার সতত পরিবর্তন ঘটে। সে জন্যে খুব কমই এমন ঘটে থাকে যে, সিপাহসালার স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার উপর পুরোপুরি কাজ করতে পারেন। এজন্যই জরুরী যে, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এমন সাদা-সিধে ও সহজ-সরল খাড়া করতে হবে, যার ভেতর প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন সাধন করতে যেন বেগ পেতে না হয়। সিপাহসালার পরিবর্তিত অবস্থার দাবী ও চাহিদা মুতাবিক অজটিল, সহজ-সরল পরিকল্পনাকে আসানীর সঙ্গে বিন্যস্ত করতে পারেন।

কিন্তু পরিকল্পনা সহজ-সরলতার অর্থ এই নয় যে, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরীতে অলসতার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে অথবা যেহেতু এর পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে, সেহেতু তাকে পরিপূর্ণতা লাভের মুখাপেক্ষী করে রাখা হবে। পক্ষান্তরে এর অর্থ এই যে, প্রতিটি দিকের উপর পুরোপুরি সতর্কতা এবং গভীর মনোযোগের সাথে চিন্তা-ভাবনা করে অনুকূল ও প্রতিকূল সকল অবস্থাকে সামনে রেখে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তৈরী করা হবে। কেননা লড়াইয়ের হাঙ্গামায় সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে কাজ নেবার মওকা খুব কমই মিলে থাকে।

৪. সমাবেশের মূলনীতিঃ এ পর্যায়ে সর্বাগ্রে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, আক্রমণকারী বাহিনীর সিপাহসালার আক্রান্ত ও আত্মরক্ষাকারী বাহিনীর অধিনায়কের উপর প্রাধান্য লাভ করে থাকেন। কারণ আত্মরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বাহিনীর অধিনায়ক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানতে পারেন না যে, আক্রমণকারী বাহিনী তার ফৌজের উপর কখন কিভাবে কোথায় হামলা করবে। অতএব আত্মরক্ষায় নিয়োজিত অধিনায়ক স্বীয় বাহিনীকে একই জায়গায় একত্রিত করতে পারেন না। তাকে বিভিন্ন ফ্রন্টের হেফাজতের জন্যে স্বীয় বাহিনীকে এদিকে ওদিকে বিভক্ত করে রাখতে হয়। অপর দিকে আক্রমণকারী বাহিনীর অধিনায়ক তার বাহিনীর বিরাট বিরাট অংশকে এক স্থানে একত্রিত করে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াতে পারেন। অবশ্য এটা ঠিক যে, যখন হামলা হয় তখন আত্মরক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর অধিনায়ক নতুন অবস্থা মুতাবিক স্বীয় বাহিনীকে সুবিন্যস্ত করতে পারেন। এজন্যে অপরিহার্য হ'ল, আক্রমণকারী ফৌজের অধিনায়ককে স্বীয় পরিকল্পনার পূর্ণতা সাধনে সত্বর ও দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাতে করে আক্রমণকারী হিসেবে তার যে প্রাধান্য থাকার কথা তা তিনি পুরোপুরি ফায়দা গ্রহণ করতে পারেন। অতএব সমাবেশের নীতি দ্বারা এটাই বোঝা যায় যে, আক্রমণকারী বাহিনীর সকল উপাদান নিজের মন-মস্তিষ্ক, শারীরিক ও বস্তুগত চেষ্টা-সাধনাকে এভাবে একই রঙ ও একই তালের সঙ্গে কেন্দ্রীভূত ও একত্র করবেন যেন পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও সংহতি সৃষ্টি হয়। কিন্তু এরূপ দৃশ্য সে সময়ই সৃষ্টি হতে পারে, যখন আক্রমণকারী বাহিনীর অধিনায়ক স্বীয় উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রকাশ বিস্তারিত ও খোলাখুলিভাবে করে দেন এবং তা হাসিলের জন্যে পূর্ণ একাগ্রতা দ্বারা নিজেদের শক্তিকে কাজে লাগান।

তাকে কার্যকর করার সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফৌজের কোন অংশের মনেই যেন কোন প্রকারের সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি না হয়।

সঠিক রকমের সমাবেশ তখনই বুঝতে পারা যায়, যখন বিভিন্ন ধরনের ফৌজী-দল বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতিকে সঠিক জায়গায় এবং সঠিক মুহূর্তে যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে। অন্য কথায়, সঠিক সমাবেশ সে সময় হয়ে থাকে, যখন পদাতিক বাহিনীর ওপর তেমন কাজের ভার অর্পিত হয় যার জন্যে তারা উপযুক্ত, গোলন্দাজ বাহিনীকে সেই কাজ করতে দেওয়া হয় যে কাজ তারা করতে পারে। আধুনিক সৈন্য-বাহিনীর ট্যাংক ও গোলন্দাজ ইউনিটের যিম্মায় সেইরূপ দায়িত্ব অর্পিত হয় যেজন্যে তাদের গঠন ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৫. যুদ্ধে ফৌজ ও হাতিয়ারের শক্তিই কেবল পরীক্ষার সম্মুখীন হয় না, এর থেকেও অধিকতর বিভিন্ন সেনানায়কের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও স্থৈর্য, সজাগ ও স্থির মস্তিষ্ক-প্রসূত যোগ্যতারও মুকাবিলা হয়ে থাকে। যে সিপাহ-সালার প্রতিপক্ষের উপর স্বীয় ব্যক্তিত্বের ভীতিকর প্রভাব ফেলায় কামিয়াব হন তিনি এর ভিত্তিতে অগ্রাভিযান করতে পারেন। এর পরিণতিতে প্রতি-দ্বন্দ্বীকে বাধ্য হয়ে তার পরিকল্পনা মুতাবিক স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় রদবদল করতে হয়। বরং জয়পরাজয়ের অনেকটা নির্ভর করে আক্রমণ-কারী বাহিনীর অধিনায়কের ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার উপর। কেননা তাঁর ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতার প্রভাব তাঁর অধীনস্থ বাহিনী ও শত্রুপক্ষের উপর সমান-ভাবে দেখা দিয়ে থাকে।

এরপর লড়াইয়ের পরিণতি ও ফলাফল নির্ভর করে সিপাহসালারের পরিকল্পনা প্রণয়নের উপর। কেননা উক্ত পরিকল্পনায় তিনিই সিদ্ধান্ত নেন যুদ্ধ কোন্ প্রতিরক্ষা নীতির অধীনে চালিয়ে যাওয়া হবে এবং তার জন্য কত ফৌজ দরকার পড়বে, সমরশাস্ত্রের কোন মূলনীতি কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পরিকল্পনার পূর্ণতা সাধনে কি কি প্রস্তুতির দরকার। প্রতিরক্ষা প্রস্তুতির জন্য সময়ের প্রয়োজন। আর তাই সিপাহ-সালারকে পূর্ণ দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও সতর্কতার সঙ্গে চিন্তা করতে হয় যে, তাকে এই হামলার প্রস্তুতির জন্য কত সময়ের দরকার হবে। এই সময় তিনি পেতে পারেন কিনা? এমন তো হবে না যে, এদিকে প্রস্তুতি সম্পন্ন

হ'ল আর ওদিকে মওকা গেল চিরদিনের জন্য হারিয়ে। ইতিহাসে এ ধরনের অসর্তকতা, কর্তব্যকর্মে অবহেলা এবং ভুল-ভ্রান্তির বহু দৃষ্টান্তই মিলবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইটালীয় ফৌজের কামাণ্ডার ইংরেজ বাহিনীর উপর হামলা করার প্রস্তুতিতে এত বেশী মগ্ন ও ব্যস্ত থাকেন যে, বৃটিশ ফৌজের কমাণ্ডার জেনারেল ওয়াভেল তার উপর আচানক হামলা করে তাদের সকল সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, ইটালীয় ফৌজকে এভাবে ধ্বংস ও বরবাদ করে দেন যে, পুরো যুদ্ধকালীন সময় তারা মনোবল হারিয়ে ভীত শৃগালের ন্যায় হয়ে পড়ে। ইটালীয় জেনারেল বৃটিশ জেনারেল ওয়াভেলের ভয়ে এত বেশী ভীত থাকতেন যে, তিনি সরকারকে প্রতিপক্ষের উপর হামলা করতে খুব বেশী করে অস্ত্রশস্ত্র এবং সাহায্যকারী বাহিনীর জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। গযওয়া বা মহানবী (সা)-এর আমলের যুদ্ধগুলোতেও এ শিক্ষাই মিলে থাকে। এ ধরনের বহু প্রতিরক্ষা কৌশল আঁ-হযরত (সা) কাফিরদের বড় বড় সশস্ত্র লশকরের বিরুদ্ধে অবলম্বন করে তাদেরকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। তিনি অল্প সংখ্যক সাজ-সরঞ্জামহীন সৈন্য নিয়েও বিস্ময়কর বিজয় লাভ করে উম্মতের জন্য প্রতিরক্ষা বিষয়ক নীতিমালা রেখে গেছেন।

আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি

আঁ-হযরত (সা) মুসলমানদের নৈতিক, চারিত্রিক এবং সামরিক সংগঠন ও প্রশিক্ষণ থেকে পরিপূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়ার পর তিনি নিজেই মুজাহিদদের একটি ক্ষুদ্র বাহিনীসহ তবলীগের উদ্দেশ্যে বাইরে বেরিয়ে পড়েন। এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল তবলীগ ও ইশা'আতের সাথে সাথে এও অবগত হওয়া যে, মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে সব গোত্রের বসতি রয়েছে তাদের মধ্যে কারা মুসলমানদের বিরোধী, কাদের কাছ থেকে সাহায্য-সহায়তা লাভের আশা করা যায় এবং কারা এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে।

এই পর্যায়ে সর্বাগ্রে আঁ-হযরত (সা) দাওয়ান পৌঁছেন। দাওয়ান মক্কা যাবার পথে আবওয়া থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে কবিলা বনী হামসা ইব্‌ন বকর ইব্‌ন 'আবদে মনাফ ইব্‌ন কিনানা কুরায়শ বংশোদ্ভূত ছিল। তিনি তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, তারা

যুদ্ধের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। চুক্তির বিস্তারিত শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. উক্ত গোত্র কুরায়শদের কোনরূপ সাহায্য-সহায়তা প্রদান করবে না এবং লড়াই শুরু হয়ে গেলে নিরপেক্ষ থাকবে।

২. স্বীয় এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম রাখবে।

৩. ভবিষ্যতে কোন ঝগড়া-বিবাদে তারা কুরায়শ কাফিরদের সহযোগী যেমন হবে না, তেমনি হবে না মুসলমানদের সহযোগীও।

ফৌজী প্লাটুন প্রেরণ

এরপর আঁ-হযরত (সা) স্বয়ং মদীনায় তশরীফ আনেন এবং দু'জন সেনানায়কের অধীনে শ্বেত পতাকাসহ বাহিনী প্রেরণ করেন। এদের ভেতর একটিকে 'উবায়েদ ইব্ন হারিছ ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিবের অধীনে পাঠান। এঁরা সবাই ছিলেন মুহাজির। আনসারদের কেউ তাতে ছিলেননা। বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল সত্তর থেকে আশি জনের মত। তারা যখন হুযাফার দিকে অবস্থিত তীনাতু'ল-মাররাহ পৌঁছেন, সেখানে এহ্য়া নাযক ঝর্ণার ধারে তাদের মুশরিকদের সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু কোন প্রকার লড়াই সংঘটিত হয় নি। উভয় বাহিনীই নিজ নিজ বাহু বাঁচিয়ে বেরিয়ে যায়।

এ অভিযানের উদ্দেশ্যে ছিল শুধুমাত্র কুরায়শ কাফেলাগুলোর অন্তরে ভীতি সঞ্চার করা।

এরূপ দ্বিতীয় প্লাটুন সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। এর সংখ্যা ছিল বিশ-বাইশ জনের মতো। বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন মিকদাদ ইব্ন 'উমরাহ আর পতাকার রঙ ছিল শুভ্র। এই প্লাটুনেরও অধিকাংশই ছিলেন মুহাজির। এঁদের প্রতি আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশ ছিল যে, তারা খাররাত পর্যন্ত পায়দল চলবে, দিনের বেলায় কোথাও আত্মগোপন করে থাকবে, রাতের বেলায় পথ চলবে এবং এভাবেই সেখান-কার সকল অবস্থা জেনে নিয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তন করবে। এই প্লাটুন পাঁচ রাত্রে সফর সমাপ্ত করে ফিরে আসবার পর আঁ-হযরত (সা)-কে অবহিত

করেন যে, খাররাত পৌঁছবার একদিন পূর্বেই কুরায়শদের কাফেলা মক্‌কা রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল।

মুহাজিরদের আরও একটি প্লাটুন যার ভেতর প্রায় তিনজন ঘোড়সওয়ার শামিল ছিল---হামযা বিন 'আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে সায়ফুল বাহর্-এর দিকে পাঠানো হয়। তাদের পতাকাও ছিল শুভ্র। তাদের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল যে, ঈসের দিক দিয়ে যাবে এবং জুহায়না নামক এলাকায় পৌঁছে সেখানকার অবস্থা অবহিত হবে। এই প্লাটুন উপকূল বরাবর যাবার সময় আবু জেহেল বিন হিশাম (মক্‌কা)-এর বাহিনীর সম্মুখীন হয়। কিন্তু লড়াই এ কারণে হয়নি যে, মাজেদী ইব্‌ন 'আমর আল-জুহানী উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন করিয়ে দেন এবং উভয় প্লাটুনই ফিরে যায়। মুশরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় তিরিশ-চল্লিশ জনের মতো।

আঁ-হযরত (সা)-এর যাত্রা

এরপর আঁ-হযরত (সা) মুহাজির ও আনসারদের একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন। কোহে রিজভী হয়ে তিনি আবওয়াত নামক স্থানে পৌঁছেন। এ সফরে প্রায় এক মাস কাল অতিবাহিত হয় এবং কোনরূপ যুদ্ধ ও সংঘর্ষ ছাড়াই তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। এরূপ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল কুরায়শ কাফেলাগুলোর অন্তরে ভয় ও ত্রাস সৃষ্টি করা। কেননা সে সময়েই একটি কাফেলা উমায়া ইব্‌ন খল্‌ফের নেতৃত্বে---যার সঙ্গে ছিল কুরায়শদের এক শত ঘোড়সওয়ার এবং দু'হাজার পাঁচশত উট, এদিক দিয়ে অতিক্রম করার কথা ছিল। এসময় মুজাহিদ বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস (রা)। সা'দ ইব্‌ন মু'আয (রা) কে আঁ-হযরত (সা) মদীনার বুকে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন।

মদীনায় কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি পুনরায় একটি বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং বনী দীনার ইব্‌ন আল-হায়ার-এর সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে ফিকা আল-খিয়ার হয়ে যাত উ'স-সাক নামক স্থানে পৌঁছেন। সেখানে তিনি একটি গাছের তলায় অবস্থান করেন। এই স্থানে 'উশায়রাব নামে পানির একটি ঝর্ণা ছিল। উক্ত গাছের জায়গায় এখন একটি মসজিদ গড়ে

উঠেছে যা আজও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, আঁ-হযরত (সা) এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং এই ঝর্ণা থেকে পানি পান করেছিলেন। এখানে স্বল্পকালীন অবস্থান শেষে তিনি (আঁ-হযরত) পুনরায় রওয়ানা হন এবং খালায়েক নামক স্থান বাম দিকে রেখে "মাশ'আবা 'আবদুল্লাহ" নামীয় গিরিপথে এগিয়ে যান। এই গিরিপথ আজ পর্যন্ত এ নামেই মশহূর। এখান থেকে তিনি বাম দিক দিয়ে ইয়ালীল উপত্যকায় প্রবেশ করেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে আল-কুর'আ উপত্যকায় ইত্তিসাল নামক স্থানে একটি কূয়ার নিকট অবস্থান গ্রহণ করেন। এভাবেই তিনি স্বীয় ফৌজ নিয়ে এসব কণ্টকর ও দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করতে থাকেন যা কাফেলার লোকেরা ব্যবহার করত না। এটা ছিল যেন মুজাহিদ বাহিনীর সামরিক গতিবিধির একটা অনুশীলন। ক্রমশে মিল্লাল থেকে তিনি সগীরাত আল-য়ামাম-এর নিকটবর্তী যখন এলেন তখন কাফেলাবাসীদের সাধারণ রাস্তা এসে গেছে। এখন তিনি তার উপর দিয়ে চলতে শুরু করেন এবং বত্ন-ই-য়ামবু'-এর যি'ল-'আশারাহ নামক স্থানে তশরীফ রাখেন। এইখানে তিনি বনী মুদলিজ ও তাদের মিত্র বনী হাময়ার সঙ্গে নিরপেক্ষ থাকার চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মদীনায় আসার দশ দিনও হয় নি, আঁ-হযরত (সা) সংবাদ পান যে, কুরায়শদের এক ব্যক্তি কুর্য ইব্ন জাবির আল-ফিহরী আপন দলবলসহ গোপনে এসে মদীনার বাইরে চারণভূমিতে মদীনাবাসীদের যে সব পশুপাল ছিল সেগুলো পাকড়াও করে নিয়ে গেছে। সংবাদ পেতেই তিনি সাফওয়ান উপত্যকা পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে তারা নাগালের বাইরে অনেক দূর চলে গেছে। তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। সাফওয়ান বদর এলাকায় অবস্থিত। কোন কোন ঐতিহাসিক এ ঘটনাকে বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন।

নাখ্লার অভিযান

রজব মাসে আঁ-হযরত (সা) 'আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশকে কতিপয় মুসলমানের সঙ্গে নাখ্লা প্রেরণ করেন। নাখ্লা মক্কা থেকে এক মনযিল দূরে সবুজ-শ্যামল উর্বর ভূমি। 'আবদুল্লাহ ইব্ন জাহাশের ক্ষুদ্র দলে আটটি বিভিন্ন

খান্দানের মুহাজির শামিল ছিল। রওয়ানা হবার সময় আঁ-হযরত (সা) প্লাটুন কমাণ্ডারকে একটি চিঠি দিয়ে নির্দেশ দেন যে, বত্ন নামক স্থানে পৌঁছবার পূর্বে (অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা দু'দিনের পথ অতিক্রম করছে) এটা যেন খুলে পড়া না হয়। এর পর পড়ে লিখিত নির্দেশ মুতাবিক আমল করবে। বত্ন-এ পৌঁছে চিঠি খুলে পড়ে দেখা গেল তাতে লেখা রয়েছেঃ এই প্লাটুন সোজা নাখ্লা যাবে এবং জাহাশ কুরায়শদের অবস্থাদি জেনে মদীনায় এসে সে তথ্য জানিয়ে দেবে যাতে করে আঁ-হযরত (সা) কুরায়শদের গতিবিধি ও অন্যান্য পরিকল্পনা জানবার সুযোগ পান। অধিকন্তু মক্কার কাফেলার কোন লোক যদি খুশী মনে তোমাদের সঙ্গে আসতে চায় তবে তাকে নিয়ে আসবে। আর খবরদার! কারও উপর জোর-যবরদস্তি করবে না।

জাহাশ স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশ শুনিয়ে জিজ্ঞেস করলেন যে, কে আছেন যিনি তাঁর সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক এবং কে কে ফিরে যেতে চান। সকলেই সামনে অগ্রসর হবার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। এরা ফারা' নামক স্থানের নিকটবর্তী হ'লে সা'দ ইব্ন ওয়াক্কাস এবং উতবাহ ইব্ন গযওয়ান (রা)-এর উট হারিয়ে যায়। তারা হারান উটের তালাশে বের হন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ তাদের অপেক্ষা করেন। কিন্তু তারা ফিরে না আসায় প্লাটুন সম্মুখে অগ্রসর হয়। এখানে হঠাৎ তারা ফিরে কুরায়শদের একটি কাফেলা দেখতে পায়। তারা তায়েফ থেকে ফলমূল উটের পিঠে করে নিয়ে আসছিল। কাফেলা দেখতেই তাদের কুর্য ইব্ন জাবিরের পশুপাল চুরির ঘটনা মনে পড়ে। দিনটি ছিল রজব মাসের শেষ দিন। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, পবিত্র মাস শুরু হবার পূর্বে এই রাত্রেই ওদের উপর হামলা করে মাল-আসবাব লুটে নিতে হবে। সে মতেই কাজ করা হ'ল। ওয়াকিদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ কাফেলার সর্দার 'উমর ইব্ন আল-হাদরামীকে তীরের লক্ষ্য-বস্তুতে পরিণত করেন এবং প্লাটুনের লোকেরা তার দু'জন বাহাদুর সঙ্গী 'উছমান ইব্ন 'আবদুল্লাহ এবং হাকাম ইব্ন কীসানকে গ্রেফতার করে মদীনা নিয়ে আসে।

আঁ-হযরত (সা) তাদের আগমনের সংবাদ শুনতেই সেখানেই তাদের থামিয়ে দেন। গনীমতের মালও বণ্টন করতে দিলেন না। মক্কাবাসীরা গ্রেফতারকৃত লোকদের ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য মুক্তিপণ নিয়ে পৌঁছুলে হুযুর

(সা) তাদের থামিয়ে দেন এবং 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহাশ ও তার সঙ্গী-সাথীদের কঠোরভাবে সতর্ক করে বলেনঃ তোমাদের লড়াই করবার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্‌কাস ও 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন গযওয়ান (রা) উটের সন্ধানে বাহরান্‌ পেঁাছেন। সেখান থেকে তারা মদীনা ফিরলে আঁ-হযরত (সা) নিজের থেকে কুরায়শ কাফেলার সর্দার 'উমর ইব্‌ন আল-হাদরামীর রক্তপণ আদায় করেন এবং দু'জন বন্দীকেই মুক্ত করে দেন।

এই অভিযান থেকে এটা ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুজাহিদ বাহিনী কি পরিমাণ ফরমাঁবরদার, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সাহসী হয়ে গিয়েছিল এবং জিহাদী জোশ কিভাবে তাঁদের বক্ষমূলে শিকড় গেড়ে বসেছিল।

ফৌজ রওয়ানা করা এবং আঁ-হযরত (সা)-এর স্বয়ং এ ধরনের অভিযানে গমন করার পর কতিপয় ঘটনার বর্ণনা এজন্যই করা হ'ল যাতে এটা বোঝা যায় যে, রসূলে আকরাম (সা) স্বীয় সৈন্যবাহিনীর সংগঠন ও প্রশিক্ষণ কোন মূলনীতির উপর করেছিলেন এবং এই মূলনীতি সাড়ে তেরো শত বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আজও তা সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব রয়েছে কিনা। সমরশাস্ত্রে এবং আধুনিক সমর বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকদের নিকট এর চেয়ে বেশী আর কী আছে? আর যে সব মূলনীতি যুদ্ধ প্রয়াসের নতুন কিংবা আধুনিকতার ছাঁচে ঢালাই করা বলে মনে করা হয় সেগুলোতে আসলে আধুনিকতার কোন সামান্যতম মিশ্রণ কিংবা সংস্কারের কোনও দিক আছে কি? এ অধ্যায়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশে পাশ্চাত্য সমর ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের চিন্তাধারা ও মতামতের দীর্ঘ উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। সেগুলো সামনে রাখুন এবং দেখুন আঁ-হযরত (সা)-এর সামরিক সংগঠন ও প্রশিক্ষণ, তাঁর সুনিপুণ রণনীতি ও রণকৌশল এবং চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির কোন অংশে কোন দিক থেকে অসম্পূর্ণ মনে হয় কিনা। যখন আঁ-হযরত (সা)-এর মূলনীতি অটল ও অনড়, সাড়ে তেরো শত বছরের অধিককালের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ যখন এর ভেতর একটি বিন্দু পরিমাণও বাড়াতে পারেনি, তখন কী কারণ রয়েছে যে, আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা নীতিকে পেছনে ঠেলে দিয়ে সে সব লোকের প্রতিরক্ষা কৌশলকে আসমানের চাঁদ-সিতারার মত দুর্লভ ও মূল্যবান মনে করা হবে যারা হতাশা আর ব্যর্থতা বরণ করে মারা গেছেন, যাদের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব সামান্যতম গুরুত্বও বহন করে না? এ ব্যাপারে আঁ-হযরতের সমগ্র উম্মতেরই এক অবস্থা। এখানে

ছোট বড়, 'আলিম ও জাহিল এবং ক্ষমতাহীন ও ক্ষমতাবান সবাই একই কাতারে শামিল। নেপোলিয়নের নাম সর্বাগ্রে তাদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। ওয়াভেল, হিণ্ডেনবুর্গ, ক্লজউইজ, আইজেনহাওয়ার এবং এ ধরনের জীবিত ও মৃত অনেক পাশ্চাত্যবাসীর নাম তাদের মুখস্থ রয়েছে। তাঁদের অনেক অবাস্তব ও কাল্পনিক কীর্তিকাহিনী সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল, কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর গৌরবময় কর্মকাণ্ড, তাঁর উদ্‌ভাবিত নীতিমালা, তাঁর সাংগঠনিক ও প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য এবং তাঁর অস্বাভাবিক ও অসাধারণ সামরিক নেতৃত্ব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। শুধু অজ্ঞই নয়, তাদের ধারণা ও কল্পনার প্রান্তসীমায় আঁ-হযরত (সা)-এর নবুওত ও রিসালতের যে চিত্র ভেসে ওঠে তার ভেতর হযরতের সামরিক যোগ্যতা ও প্রতিরক্ষা কৌশলের একটা হালকা রেখাও দেখা যায় না। প্রতিরক্ষা সংগঠন ও কৌশল এবং যুদ্ধ ও আঘাত হানার পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার গুরুত্ব স্বীকৃত বিষয়। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা সংগঠন ও নীতি প্রাথমিক গুরুত্বের বিষয় হওয়া উচিত। তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিককে অন্য দিকগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে না। যখন মাদানী যিন্দেগীর বিস্ময়কর সাফল্যসমূহ এবং ইসলাম ও মুসলমানদের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সকল গৌরবময় কৃতিত্বের মূল উৎস হচ্ছে তাঁর প্রতিরক্ষা নীতি, তখন এই বিষয়টি বিস্মৃতির অতলে ডুবিয়ে দিয়ে জাতীয় কল্যাণ ও সংস্কারের ব্যাখ্যা কিভাবে হতে পারে? তাদের মু'মিন ও মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর নেতৃত্বের আসনে কিভাবে অধিষ্ঠিত করা যেতে পারে?

যা-ই হোক, আঁ-হযরত (সা)-এর সেই সব প্রতিরক্ষা নীতির উপর একটু দ্রুত নজর বুলানো যাচ্ছে যা তিনি হিজরতের প্রথম দু'বছরে অবলম্বন করেছিলেন এবং উম্মতের জন্য প্রতিরক্ষা নীতি হিসাবে রেখে গেছেন।

১. ব্যক্তিগত চরিত্র ও কৃতিত্বের যে সব গুণ ও সৌন্দর্য একজন সিপাহসালারের মধ্যে বিদ্যমান থাকা জরুরী এবং যেগুলোকে আধুনিক যুগের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞগণ তার ব্যক্তিত্বের মানসিক পরিপূর্ণতার সর্বশেষ পর্যায় মনে করেন---আঁ-হযরত (সা)-এর ব্যক্তিসত্তায় সেগুলো পরিপূর্ণরূপেই সন্নিবেশিত ছিল।

২. আঁ-হযরত (সা) স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মুসলমানদের ভেতর উন্নত শ্রেণীর সামরিক নিয়ম-শৃংখলা, সর্বোত্তম মানের সমরযোগ্যতা, সুদৃঢ় ইচ্ছা-শক্তি ও মনোবল, নিঃস্বার্থপরতা ও আত্মবিশ্বাস, পরিশ্রমী ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণা, আনুগত্য ও ফরমাঁবরদারী এবং ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের নজীরবিহীন শ্রেষ্ঠ গুণরাজি সৃষ্টি করে তাদের সুশৃংখল, সুগঠিত ও সুবিন্যস্ত সেনাবাহিনীতে পরিণত করেছিলেন।

৩. আঁ-হযরত (সা) অনাগত ভবিষ্যতের সকল অবস্থা পরিমাপ করে মদীনা থেকে য়ামবু' এবং য়ামবু' থেকে মক্কা পর্যন্ত সেনাবাহিনী চলাচল করিয়ে মুজাহিদদের এই পথের প্রতিটি উঁচু-নীচু স্থান পর্যবেক্ষণ করান যেন তারা এর দুর্গমতা, পায়ে হাঁটার পথ, ঝর্ণা এবং গুহা-গহবর ইত্যাদি সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হয়ে যায় এবং লড়াইয়ের মুহূর্ত এসে গেলে তাদের চলাচলে কোনরূপ অসুবিধা যেন না হয়।

ফিল্ড মার্শাল ফন হিণ্ডেনবুর্গ (জার্মানী) এবং জেনারেল শেরম্যানের (আমেরিকা) কৃতিত্বপূর্ণ কার্যাবলী প্রতিটি লোকের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। তার কারণ শুধু এই যে, তারা তাদের সৈন্যবিভাগে চাকুরি কালে সেসব এলাকার আনাচে-কানাচে গভীরভাবে ঘুরে ফিরে দেখেন যেসব এলাকায় তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হিণ্ডেনবুর্গ টিমবার্গের জলাভূমি এবং সে এলাকার পথ-ঘাট বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। অতঃপর রুশ বাহিনীর সঙ্গে যখন মুকাবিলা হ'ল তখন সোভিয়েট সৈন্যদের সেখানে টেনে এনে এমনভাবে ফাসিয়ে দিলেন যে, সমগ্র ফৌজ সেখানেই খতম হয়ে যায়। অনুরূপভাবে জেনারেল শেরম্যান প্রতিপক্ষের সমরক্ষেত্র অতি উত্তম-ভাবে জানার কারণে অল্প সংখ্যাক সৈন্য দ্বারা শত্রুপক্ষকে এমনভাবে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলেন যে, তারা অস্ত্রসংবরণ করে।

আঁ-হযরত (সা)-এর ফৌজী গতিবিধির এই অবস্থা আমাদের পর্যন্ত অস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্তভাবেই পৌঁছেছে। হায়! যদি এগুলো বিস্তারিতভাবে জানা যেত এবং ঐতিহাসিকরা যদি সেগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্বের পরিমাপ করতেন তবে কতই না ভাল হ'ত।

৪. আঁ-হযরত (সা) মুজাহিদ্দেরকে অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার ব্যবহারে পারদর্শী করে তোলেন। তাদেরকে বিনা ক্লান্তি ও অবসাদে রাতের বেলায়

কিংবা দিনে মনযিলে মকসুদে পৌঁছবার অভ্যাস গড়ে তোলেন এবং তাদের ভেতর ফৌজী গোপনীয়তা গোপন রাখবার মত যোগ্যতা সৃষ্টি করেন।

৫. সৈন্যবাহিনীকে পতাকা প্রদান করে তিনি সমগ্র আরবে স্বীয় প্রতিরক্ষা বিষয়কে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ঘোষণা দেন। রাজনৈতিকভাবে মুনাফিকদের উপর এটা ছিল কার্যকর আঘাত। ফৌজীদের ভেতর কাতারবন্দী এবং অভিযানে রওয়ানা হবার প্রাক্কালে তাদের পরিদর্শন করা তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল যা রাজনৈতিক ও ফৌজী শৃংখলা ও স্থায়িত্ব রক্ষার্থে সহায়ক হয়।

৬. মক্কায় তিনি সংবাদদাতা নিযুক্ত করেন। তারা আঁ-হযরত (সা)-কে গোপনে সেখানকার সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করত। এক দিকে তিনি ফৌজী প্লাটুন এবং গুপ্তচরের মাধ্যমে শত্রুর অবস্থান জেনে নিতেন অপরদিকে সংবাদ আদান-প্রদানের এই ব্যবস্থাপনাও করে রেখেছিলেন।

৭. এর সঙ্গে স্বীয় শহরের বাসিন্দা এবং ফৌজী লোকদের নিজেদের চলাচল ও গতিবিধির গোপনীয়তা রক্ষার প্রতি অনুগত করে তোলেন। ফৌজী প্লাটুন নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কখনো জানতে পারত না যে, কতদিনের জন্য কোথায় তারা যাচ্ছে।

৮. ফৌজের পরিপূর্ণতা ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে তিনি রাজনৈতিক দিকগুলোর পরিপূর্ণতারও পুরো বন্দোবস্ত করেন। মদীনার নাগরিকদের সুসংহত ও সুশৃংখলভাবে সংগঠিত করেন। যেসব গোত্র একে অপরের দুশমন ও খুন পিয়াসী ছিল এবং ধর্মীয় ও মযহাবী মতভেদ, ব্যক্তিগত শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে ছোট ছোট গ্রুপ ও দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, আঁ-হযরত (সা) তাদের সবাইকে একত্র করেন এবং শান্তিকালীন সময়ের জন্য তাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মবিশ্বাসের সম্পর্কই শুধু কায়েম করেন নি, যুদ্ধকালীন সময়ের জন্যও অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করান। তাতে তমদ্দুন ও সামাজিকতার মানদণ্ড যায় বদলে। অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্যের এমনি বিধান রচনা করেন যে, একতা ও সম্প্রীতির রাজত্ব শুরু হয়ে যায়। নিরাপত্তা ও বিশ্বাসের আবহাওয়ার কারণে বাণিজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা উন্নত হয়। অভ্যন্তরীণ মতভেদ ও বৈষম্য দূরীভূত করার পর তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রতি মনোনিবেশ করেন। তবলীগের

জন্য প্রথমে পার্শ্ববর্তী এলাকায়, অতঃপর হেজাযের দূর-দূরান্তরের এলাকার বিভিন্ন গোত্রের নিকট গমন করেন। তাদেরকে এমনই উত্তম উপায়ে স্বীয় মিশনের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দেন যে, তারাও সহমর্মী বনে যায় এবং মুসলমান না হ'লেও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে। তবলীগের ক্ষেত্রে সকল প্রতিকূলতা এতে দূরীভূত হয়ে অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এর উপর তাঁর মহান চরিত্রের অনেক বেশী প্রভাব পড়ে।

মদীনার ভেতর এত উত্তম ব্যবস্থাপনা কায়েম হয়ে যায় যে, তাঁর এবং সৈন্যবাহিনীর অনুপস্থিতেতেও পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করত এবং সমস্ত লোক তাঁর প্রতিনিধির নির্দেশাদি মেনে চলত।

৯. সামাজিক ও নাগরিক ব্যবস্থাপনার পূর্ণতা সাধনের পর তিনি আন্ত-র্জাতিক রাষ্ট্রনীতির অস্ত্র প্রয়োগ করেন এবং মক্কাবাসীদের তেজারত খতম করার উপায়-উপকরণ কাজে লাগান। প্রথম দিকে কুরায়শরা এই বিপদ থেকে নিরাপদ থাকবার জন্য উপকূলের সমান্তরাল রাস্তা অবলম্বন করে। কিন্তু এর উপর চলতে গিয়ে তাদের মুনাফার পরিমাণ বহুত কমে যায় এবং আহার্য-দ্রব্য অত্যন্ত কষ্টে ও উচ্চ মূল্যে মিলতে থাকে। অবশেষে এজন্য তারা যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এভাবে আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে এমন একটি স্থানে লড়বার জন্য উৎসাহিত করেন যা সমরশাস্ত্রের দিক দিয়ে মুশরিকদের সৈন্যসামন্তের চলাচলের জন্য মোটেই অনুকূল ছিল না। আর এটাই ছিল সেই কারণ যার ভিত্তিতে তিনি কাফির ও মুশরিকদের কয়েক গুণ বড় বাহিনীকে পরাভূত ও পর্যুদস্ত করেন। মুশরিকদেরও বার বার যুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয় এবং প্রতিবারই পরাজয় বরণ করে অস্ত্র সংবরণ করতে হয়।

বিভিন্ন যুদ্ধ

বদর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা

এক্ষেত্রে এই মূলনীতি ও কার্যপদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হ'ল। এর বিস্তারিত আপনারা গযওয়ার অধ্যায়গুলোতে পাবেন।

'হেজাযের প্রাকৃতিক অবস্থা' শিরোনামে ইতিপূর্বে লেখা হয়েছে যে, এর পশ্চিম এলাকায় পর্বতের কারণে যাতায়াতের রাস্তা খুবই কম এবং যা-ও আছে তা বিভিন্ন উপত্যকা অর্থাৎ বর্ষাকালীন নালাগুলোর নিম্নভূমিতে আছে, আর সাধারণত সেই সব নিম্নভূমি কাফেলার লোকেরা ব্যবহার করে থাকে। উপকূল বরাবর রাস্তা বালির আধিক্যে এবং পানির স্বল্পতার কারণে দুরতিক্রম্য। সবগুলো রাস্তার মধ্যে সর্বোত্তম রাস্তা হ'ল যে'টি দূমাতু'ল-জন্দল থেকে মদীনা হয়ে মক্কা চলে গেছে। এই রাস্তায় কাফেলার অবস্থানগুলোতে পানিরও কোন ঘাটতি নেই। তুর্কীরা তাদের শাসনাধীনে নবী যুগের রাস্তার বড় অংশে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। সামুদ্রিক সফর সহজ হওয়ার দরুন মিসরের অধিকাংশ হাজী জাহাজযোগে আসতেন। উপকূলের যে সব স্থানে বন্দর নির্মিত হতে পারে তাদের জাহাজ সেখানে এসে নোঙর ফেলত এবং সেখান থেকে হাজীরা উপত্যকাগুলোর ভেতর দিয়ে মদীনা পৌঁছতেন অথবা মক্কা মু'আজ্জমার পথ ধরতেন। তুর্কীরা তাদের যুগে 'সুলতানী' রাস্তা নামে একটি আলাদা ও স্বতন্ত্র রাস্তা তৈরী করেছিল। এই রাস্তার কিছু অংশে রেল লাইন বসানো হয়েছিল। অধুনা উক্ত লাইনকে উন্নত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বদর এবং মদীনার মাঝে কোথাও কোথাও বড় খেজুর বাগান আছে। অতএব এই রাস্তা বেশ শ্যামল সবুজ। বদর এবং হামরার মাঝখানটা জঙ্গলাকীর্ণ। এই পথের কোন কোন স্থানে মিষ্টি পানিও পাওয়া যায়। উট, ভেড়া ও বকরীর চারণক্ষেত্র আছে। বদরের নিকটবর্তী যেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেখানে কোথাও কোথাও গিরিপথও রয়েছে এবং তার নিম্নভূমিতে নদী থেকে খাল খনন করে পানি সরবরাহ করা হয়। বেশ কিছু খেজুর বাগান রয়েছে। কিন্তু উক্ত পাহাড়ের পাদদেশের বালি অত্যন্ত চিকন এবং কয়েকটি জায়গায় বালি কর্দমাক্ত যাকে ইংরেজীতে Qicksand বলা হয়। লড়াইয়ে এই কাদা বড় ভয়ংকর ও বিপদজনক হয়ে থাকে। ঘোড়া এরকম স্থানে আদৌ চলাচল করতে পারে না। অবশ্য মানুষ এবং উট কষ্টে চলা-ফেরা করতে পারে। কিন্তু আধা মাইলও যদি চলতে হয় তবে ক্লান্ত হয়ে থেমে পড়তে হয় এবং তার হিম্মত ও দৃঢ়তা জবাব দিয়ে বসে।

বদরে যুদ্ধকালীন সময় আঁ-হযরত (সা) যেখানে খেজুর পাতার নির্মিত ঝুপড়িতে অবস্থান করেছিলেন সে স্থানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

আরিশ ছোট একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখান থেকে বদরের পুরো ময়দানটাই দৃষ্টিগোচর হয়। আজকাল ঘরবাড়ী এবং বাগিচার কারণে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। এখানে একটি ঝর্ণা রয়েছে যেটাকে খাল কেটে ময়দান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সমস্ত বাগ-বাগিচা এর পানি দ্বারাই প্লাবিত হয়। অতঃপর আরও অনেকগুলো ছোট ছোট খাল এর থেকে কেটে বের করা হয়েছে। এসব খাল হুযুর আকরাম (সা)-এর যামানা থেকেই আছে। বদর যুদ্ধের সময়ও উক্ত ঝর্ণা ও খালগুলোর পানি এখানকার খেজুর বাগানগুলোতে পৌঁছত। আঁ-হযরত আরিশে পেঁ ছেই ঝর্ণা মুখে পুকুর খনন করে কাফিরদের নিকট পানি যাওয়া বন্ধ করে দেন।

ইসলামের পুর্বে বদর ময়দানে বাৎসরিক মেলা বসতো। এই মেলায় শরীক হবার জন্য দূর-দূরান্তর থেকে লোক আসত। এখানে বিরাট একটি মূর্তিঘরও ছিল। এটি ছিল মূর্তিপুজক ও মুশরিকদের মিলন কেন্দ্র। কিন্তু মেলার কারণেই এর গুরুত্ব ছিল বেশী। মানুষ তেজারতী পণ্য নিয়ে আসত এবং ভেড়া ও বকরীর পশমে নির্মিত বিছানা, কাপড় ইত্যাদির বিনিময়ে আহার্য সামগ্রী ও জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য জরুরী মাল-আসবাব নিয়ে যেত। এ সব কারণে এ মেলা খুবই জমজমাট ও জৌলুসপূর্ণ হয়ে উঠত।

বদর প্রান্তর চতুর্দিক দিয়ে পাহাড় ঘেরা। দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাঁচ মাইল এবং প্রস্থেও প্রায় ততখানিই হবে। অধিকাংশ স্থানই বালুকাময় এবং বাকী অংশ বালুকাময় ও প্রস্তরাকীর্ণ। উপকূলের দিকে পাহাড়ের পশ্চাতে প্রায় দশ মাইল দূরে লোহিত সাগর উত্তাল তরংগে আছড়ে পড়ছে। কোথাও এর দূরত্ব আরো কম এবং কোথাও এর থেকেও বেশী। এই উপকূলীয় পরিধিতে কাফেলার রাস্তা। কিন্তু সে যুগের কাফেলাগুলোর জন্য শুধুমাত্র একটি রাস্তাই তারা ব্যবহার করত ব'লে যে বলা হয় সে কথা ঠিক নয়। জঙ্গল এবং পাহাড়গুলোতে বহু সংখ্যক পায়ে হাঁটা পথ ছিল---সেগুলোও ব্যবহৃত হ'ত। প্রান্তরের রাস্তা মরু সাইমূমের কারণে প্রায়ই পরিবর্তিত হ'ত। সাইমূম বালির টিলাগুলোকে এক জায়গা থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় নিয়ে যেত। ফলে রাস্তাও অল্প-বিস্তার পাল্টাত। তথাপিও এর গতি একইরূপ থাকত। এজন্য মানচিত্রে যে প্রান্তর-রাস্তা ও পায়ে চলার পথ দেখা যায়, বাস্তবে তা প্রায়ই ভিন্নতর পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু পায়ে চলার পথ সংখ্যায় বেশী

হয়ে থাকে সেহেতু উটের কাফেলা সেগুলোর কোন একটিকে ইচ্ছা মাফিক ব্যবহার করতে পারে। তাদের একেবারে থামিয়ে দেওয়া হেজাযের মত দেশে অত্যন্ত কঠিন। অবশ্য সাধারণের ব্যবহৃত বড় রাস্তা বন্ধ করা যায়। অতএব আঁ-হযরত (সা)-ও সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ তিনি কুরায়শদের চলাফেরার বড় রাস্তাটি বন্ধ করে দেন। হাওয়া মুসলমানদের অনুকূলে বইতে শুরু করেছিল আর কুরায়শদের ব্যবসা-বাণিজ্য তখন বিপদ-জনক অবস্থার সম্মুখীন। এরূপ পরিস্থিতিতে সংঘর্ষের আশংকাও উত্তরোত্তর বর্ধিত হতে লাগল। দু'বছরও অতিক্রান্ত হয়নি কুরায়শ ছিল বিজয়ী শক্তি এবং পরাক্রমশালী। তারা রসূল আকরাম (সা) এবং ঈমানদারদের মুসীবত ও কষ্টকর অবস্থায় নিক্ষিপ্ত করে রেখেছিল। তারা আঁ-হযরতের বাস-ভবন ঘেরাও করে রেখেছিল। তাদের কারণেই মক্কায় সকল মুসলমানের জীবন ছিল দুর্বিষহ। তারা হাতে গোনা কয়েকজন মুহাজিরকে আবিসিনিয়া পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করেছিল। দিবারাত্রির এমন একটি মুহূর্তও অতিক্রান্ত হয়নি যখন মুসলমানদের শাস্তি দেবার মানসে নিত্য-নতুন কৌশল ও উপায় অব-লম্বন করা হ'ত না। এসব কারণে নিতান্ত বাধ্য হয়েই আঁ-হযরত (সা)-কে হিজরতের পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হয়েছিল। 'বাধ্য হয়ে' লিখতে হ'ল এজন্য যে, বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থার গতি-প্রকৃতি থেকে এটা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, যতদূর সম্ভব আঁ-হযরত (সা) এই পরিকল্পনাকে মুল-তবী রেখেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি একে বাস্তব রূপদান করেন নি। এটা এ কথার স্পষ্ট দলীল যে, ইসলাম তলো-য়ারের শক্তিতে বিস্তার লাভ করেনি বরং নেহায়েত মজবুর অবস্থায় তাকে তলোয়ার বের করতে হয়েছিল। এরপর অবস্থা পাল্টে যায়। কুরায়শরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মদীনার পথ ধরতে পারছে না। তাকে লুকিয়ে দূরদরাজ এলাকা দিয়ে বহু রাস্তা ঘুরে যেতে হয় অথবা আঁ-হযরত (সা) থেকে সফরের জন্য অনুমতি নিতে বাধ্য হয়। কায়-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, চলাফেরার স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও সুখী জীবন সব বিপদের সম্মুখীন। মুনাফা কমে গেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হবার পন্থা বেড়ে গেছে, সফর হয়েছে দীর্ঘ, কাফেলা লুট হবার আশংকা দেখা দিয়েছে, আহার্য দ্রব্যের সংগ্রহ কষ্টকর হয়ে পড়েছে, কুরায়শদের মর্যাদা ও প্রভাব এবং নিরাপত্তা গেছে খতম হয়ে। আর এ সব তাঁরই বদৌলতে যিনি সেদিন পর্যন্ত ছিলেন ভর্ৎসনা ও ক্রোধের

পাত্র। অতএব যুদ্ধ ও সংঘর্ষ ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর ছিল না। কুরায়শ-দের আশংকা ছিল, যদি যুদ্ধ না করা হয়, আর এই উঠতি বিপদকে প্রতিরোধ না করা যায়, তাহলে ছিটেফোঁটা স্বাধীনতা যেটুকু আছে—তাও হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, আঁ-হযরত (সা) প্রতিশোধ গ্রহণে এগিয়ে আসতে পারেন। তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার গণ্ডী মদীনা থেকে য়ামবূ 'ও নাখলা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। আশেপাশের সকল গোত্র তাঁর মিত্র বনে গেছে। যদি আরও অবকাশ মিলে তবে পানি মাথা ডিঙিয়ে যাবে, কুফর ও শিরক-এর কোন আশ্রয় মিলবে না। অতএব আর কাল বিলম্ব না করে মুসলমানদের অস্তিত্ব ভূপৃষ্ঠ থেকে মিটিয়ে দেওয়া হোক। কুরায়শদের নিকট ধন-দৌলতের কোন কমতি নেই। সমরোপকরণ ও মারণাস্ত্রেরও স্বল্পতা নেই, কুফর ও শির্ক-এর সাহায্যকারী মদদগারও কম নয়। এমতাবস্থায় মুসলমানদের অধিক-তর শক্তি অর্জনের মওকা কেন দেওয়া হবে এবং জেনে শুনে নিজেদের ধ্বংস ও বরবাদির পথ কেন প্রশস্ত করা হবে?

আঁ-হযরত (সা) কুরায়শদের সব আবেগ, প্রেরণা ও প্রস্তুতি বেশ ভাল-ভাবেই জানতেন। কিন্তু সাধারণ কল্যাণ চিন্তায় কিংবা অতিরিক্ত সতকর্তা ও সাবধানতার কারণে তিনি নিজ সৈন্যবাহিনীকে লড়াইয়ের ময়দানে অগ্রাভি-যানের অনুমতি দেন নি। তিনি যতগুলো অভিযান প্রেরণ করেন কিংবা যে সব সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে স্বয়ং নিজেই গমন করেন সে সবের একটিই উদ্দেশ্য ছিল; আর তা হ'ল---প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার পূর্ণতা সাধন। আঁ-হযরত (সা) যুদ্ধ ও সংঘর্ষে অগ্রগামী হতে চাইতেন না। কিন্তু এই সঙ্গে সামরিক প্রশিক্ষণ এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির কোন দিক অসম্পূর্ণও রাখতে চাইতেন না।

এই বিজ্ঞ কৌশলের একটি রাজনৈতিক দিক সম্ভবত এও ছিল যে, মদীনা আগমনের পূর্বে এবং পরে তিনি মদীনার কবিলাগুলোর সঙ্গে যে সব চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন সে সবের প্রেক্ষিতে কাফিরদের হামলার অবস্থায় তাঁর উপর তাদের হেফাজত ফরয ছিল। অতএব নৈতিক দিক দিয়ে তিনি মুশ-রিকদের উপর হামলা করবার হুকুম দিতে পারেন না। সম্ভবত এ কারণেই তিনি প্রথম দিকে যে সব অভিযান প্রেরণ করেছিলেন সে সবে একমাত্র মুহাজিরদের শামিল করেছিলেন। পরে যখন মুহাজির ও আনসারদের মিলিত বাহিনী মদীনার বাইরে গেল তখন তার অধিনায়কত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ

করেন। কিন্তু আনসারদের অন্তর্ভুক্তির স্বল্পতা বদর যুদ্ধের পূর্বেই পুরো হয়ে গিয়েছিল এবং এর কারণ ছিল এই যে, আনসারগণ আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট নিজেরাই জিহাদে শরীক হবার দরখাস্ত পেশ করেছিল। এই অনুমতি প্রার্থনা এবং আঁ-হযরতের মঞ্জুরী রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বদর যুদ্ধের কারণ

বদর যুদ্ধের সাধারণ কারণগুলোর সমস্তটাই ছিল অর্থনৈতিক। এ সবের বিশ্লেষণ পেছেনের পৃষ্ঠাগুলোতে করা হয়েছে। কিন্তু তাৎক্ষণিক এবং বিশেষ কারণসমূহ ছিল নিম্নরূপঃ

১. 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন জাহাশ-এর প্লাটুন নাখলায় কুরায়শদের তেজারতী কাফেলা লুটমার করে তাদের নেতা ইব্ন আল-হাদরামীকে নিহত করে। মক্কাবাসীরা এতে বেশ ক্ষিপ্ত হয়। কেননা এতে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও মর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। মদীনাবাসীরা মক্কার নিকটে এসে তাদের কাফেলার নেতাকেও মেরে গেল, আবার মালে গনীমতসহ দু'জন কয়েদীকেও নিজেদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

২. এ ঘটনার সংবাদ মক্কাবাসীদের নিকট সর্বত্রই পৌঁছে যায়। আবু সুফিয়ান ইব্ন হরব সে সময় সিরিয়া থেকে বহু সাজ-সামান নিয়ে মক্কা ফিরছিলেন। তার কাফেলায় প্রায় এক হাযার উট ছিল যার উপর তেজারতী পণ্য ছাড়াও নগদ টাকা-পয়সাও ছিল বিস্তর। কোন কোন ঐতি-হাসিক—যাদের মধ্যে ফিলিপ কে. হিট্টিও অন্তর্ভুক্ত—কাফেলার সব পণ্যের মূল্য সাকুল্যে ২০ হাযার পাউণ্ড বলেছেন। নাখলার হামলার খবর শুনতেই আবু সুফিয়ান সাধারণ রাস্তা ছেড়ে উপকূলীয় রাস্তা ধরেন এবং এই সঙ্গে দমদম ইব্ন 'আমরকে গাযা (সিরিয়া) থেকে মক্কা পাঠিয়ে দিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি এও বলে পাঠান যে, তারা যেন বদরের নিকটে তার সঙ্গে মিলিত হয়। অন্যথায় মুহাম্মাদ তাদের মালমাত্তা সব লুট করে নেবে। তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে গেছেন। কুর্য্ ইব্ন জাবির পশ্চাদ্ধাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর কয়েক দিনই মাত্র হয়েছিল

হুযূর আকরাম (সা) সিরিয়া থেকে উল্লিখিত কাফেলার ফিরে আসার খবর জানতে পান। এ খবরও পৌঁছে যে, আবু জেহেল সাড়ে ন'শো যুদ্ধবাজ কুরায়শ ও একশত অশ্ব সহকারে মক্কা থেকে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেছে। মুশরিকদের চড়াও হবার খবর শুনতেই আঁ-হযরত (সা) আল্লাহ তা'আলার দরবারে আরয করেন, "আয় আল্লাহ পাক! যদি ছোট্ট এ দলটি ধ্বংস হয়ে যায় তা হলে সমগ্র দুনিয়া জাহানে তোমার 'ইবাদতকারী আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।" এরপর মুসলমানদের তিনি প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। কায়স বিন সা'সা'কে, বনী নাযিল আল-নজ্জার-র সঙ্গে যার সম্পর্ক ছিল, হুযুর নিজ স্থলে নিযুক্ত করেন। ৩রা রমযান তিনশো তের জনের একটি বাহিনী নিয়ে, যাঁদের মধ্যে ৭০ জন ছিলেন মুহাজির এবং বাকী আনসার,--বদরের দিকে রওয়ানা হন। বাসবাস ইব্‌ন 'আমর আল-জুহানী বনী সায়েদার মিত্র এবং 'আদী ইব্‌ন আবী আযযাগা আল-জুহানী বনী নাজ্জারের মিত্রকে সফরার পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে তাড়াতাড়ি বদরে প্রেরণ করেন যেন তারা হুযুরকে কুরায়শদের কাফেলা সম্পর্কে দরকারী খবর দিতে পারেন। সফরা মুসলাহ্ ও দুযা নামক পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে অবস্থিত একটি গ্রাম। সে যুগে এখানে বনু আন্‌নার এবং বনু হিরাক ইব্‌ন গিফার নামক দু'টি খান্দানের বাস ছিল। তাদের সঙ্গে রসূল আক্‌রাম (সা)-এর কোন চুক্তি হয়নি। সেজন্য তিনি উক্ত গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়া সমীচীন মনে করেন নি। উক্ত রাস্তা পরিত্যাগ করে সফরা-কে বামে রেখে জাফরান নামক উপত্যকা হয়ে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হতে শুরু করেন। উক্ত এলাকার একটা অংশ সামনে থাকতেই তিনি রাত্রি যাপনের জন্য সেখানে অবস্থান নিলেন। এখানে পৌঁছেই তিনি খবর পেলেন যে, কুরায়শরা আবু সুফিয়ানের কাফেলার প্রতিরক্ষার জন্য নিকটেই এসে গেছে। তিনি তখন সাহাবাদের ডেকে পরামর্শ চাইলেন যেন আনসারদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে খোলাখুলি জানতে পারেন। কেননা বাহিনীতে তারাই ছিলেন বেশী। তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যে, এখন মদীনার উপর হামলার আশংকা পুরোপুরি বিদ্যমান, এমত অবস্থায় আনসাররা রসূল (সা)-কে সাহায্য-সহায়তা প্রদান অপরিহার্য মনে করে কিনা। আঁ-হযরত (সা) যখন সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ শেষ করলেন তখন সা'দ ইব্‌ন মা'আয পরামর্শের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আনসারদের পক্ষ থেকে বললেনঃ হযরতের ইচ্ছা আমাদের মতামত অবহিত হওয়া। আমাদের মতামত এই,

"আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি। আপনার রিসালতকে আমরা সত্য জেনেছি এবং দৃঢ়চিত্তে আপনার অনুসরণ ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। অতএব আপনি আপনার অভিপ্রায় বাস্তবায়িত করুন। আমরা সেই মহান সত্তার কসম খেয়ে বলছি যিনি আপনাকে নবীয়ে বরহক করে পাঠিয়েছেন, যদি আমাদের সমুদ্রের উত্তাল তরংগের মাঝে লাফিয়ে পড়তে বলেন তবে আমরা খুশী মনে লাফিয়ে পড়ব। লড়াইয়ের ময়দানে আমরা দৃঢ়পদ থাকব, কদম আমাদের কখনো পিছু হটবে না। আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় খাহেশ হ'ল, আমরা যেন এমন কোন কাজ করতে পারি যদ্দ্বারা আপনার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।"

মুহাজিরদের পক্ষে হযরত আবু বকর (রা) বিশ্বস্ততা ও আত্মোৎসর্গের নিশ্চয়তা প্রদান করলেন।

হযরত সা'দ ইব্ন মা'আয (রা) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ভাষণ শুনে আঁ-হযরত বললেন, "আল্লাহ তা'আলার সাহায্য নিয়ে দুশমনের মুকাবিলা করুন। ইনশাল্লাহ্ জয় আমাদেরই হবে।"

জাফরান থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি আসাফির নামক গিরিপথ ধরেন। সেখানে দুব্বা নামক কসবায় অবতরণ করেন। অতঃপর হান্নান নামীয় বালির বিরাট টিলা বাম দিক দিয়ে অতিক্রম করে বদরের নিকট পৌঁছুলেন। এখানে আঁ-হযরতের বাহিনী ছাউনী ফেলে। এরপর আঁ-হযরত (সা) একজন সাহাবী সঙ্গে নিয়ে অবস্থা জানবার জন্য এক শেখের নিকট উপস্থিত হন এবং তাকে প্রশ্ন করেন, "তুমি কি জান যে, মুহাম্মাদ এবং তাঁর সাথীরা কোথায়?" শেখ পাল্টা প্রশ্নে জানতে চায়, "তারা কে?" অতঃপর অনুরূপ কথাবার্তা বিনিময়ের পর সে বলল, "আমার নিকট তথ্য আছে যে, মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীরা অমুক দিন মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিল। অতএব সেই হিসাবে তার কাফেলা অমুক জায়গায় থাকা উচিত। শেখ আন্দায করে যে স্থানের কথা বলেছিল তা সঠিক ও অভ্রান্ত ছিল। কেননা আঁ-হযরতের ডেরা সেদিন সেইখানেই ছিল। পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'লঃ কুরায়শদের কাফেলা কোথায় হতে পারে? তখন উক্ত শেখ তার নিজস্ব হিসাবে তাদের অবস্থান বলে দেয়। এ জওয়াবও সঠিক ছিল। এরপর তিনি সেখান থেকে অন্যত্র তাশরীফ নিয়ে যান। মজার ব্যাপার হ'ল, শেখ জানতেও পারেনি লোক দু'জন কে।

শিবিরে পৌঁছে তিনি শেখ বর্ণিত খেজুর বাগানের দিকে শত্রুর খবর সংগ্রহের জন্য একটি প্লাটুন পাঠান। এখানে ঝর্ণার নিকট কুরায়শদের উট এবং তাদের ভিস্তি দৃষ্টিগোচর হয়। মুসলমানদের দেখা মাত্রই কয়েকজন ভিস্তি পালিয়ে যায়। কিন্তু দু'জন লোক এবং কতকগুলো পশু মুসলমানরা পাকড়াও করে নিজেদের শিবিরে নিয়ে আসে।

সাহাবীদের জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানায়ঃ আমরা কুরায়শদের ভিস্তি ছিলাম। তাদেরকে তেজারতী কাফেলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তারা অজ্ঞতা জাহির করে। অবশ্য সৈন্যবাহিনীর ঠিকানা বাতলে দেয়। ইসলামী বাহিনীর কেউ কেউ মনে করে যে, ভিস্তিওয়ালারা জেনে শুনেই কাফেলার সন্ধান দিচ্ছে না। যে মুহূর্তে তারা পৌঁছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন সালাতে মশগুল ছিলেন। সালাত শেষ করে তিনি তাদের নিকট বিস্তারিত জানতে চাইলেন। এর পর সাহাবীদের বললেনঃ ভিস্তিওয়ালারা ঠিকই বলছে। কাফিরদের লোক-লশকর 'আকানকাল নামীয় বালুকাময় পাহাড়ের পশ্চাদভূমিতে রয়েছে। আঁ-হযরত (সা)-এর এই বর্ণনায় ভিস্তিওয়ালাদের উপর গভীর প্রভাব পড়ে। তিনি তাদের কাছে ডেকে নিয়ে অত্যন্ত মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞেস করেনঃ আচ্ছা বলত কুরায়শ বাহিনীর সংখ্যা কত? প্রত্যুত্তরে তারা জানায়ঃ সংখ্যাতো আমাদের জানা নেই, তবে সংখ্যা যে বেশী হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ আচ্ছা, বলত দৈনিক কত উট খাবারের জন্য যবেহ করা হয়? তারা জানালঃ একদিন নয় উট, পরদিন দশ উট যবেহ করে। তিনি তখন একটা পরিমাপ করলেন যে, তাদের সংখ্যা ন'শো থেকে হাযারের কাছাকাছি হবে।

এরপর তিনি তাদের আবারও জিজ্ঞেস করলেনঃ কুরায়শ বাহিনীতে কোন্ কোন্ সর্দার আছে? তারা বললঃ 'উৎবা বিন রবী'আ, শায়বা বিন রবী'আ, আবুল বখতারী বিন হিযাম, হাকীম বিন হিযাম, নওফেল বিন খুওয়ায়লিদ, হারিছ বিন 'আরিফ বিন নওফেল, 'আদী বিন নওফেল, নসর বিন আল-হারিছ বিন কালদাহ্, যম'আ বিন আল-আসওয়াদ, আবু জেহেল বিন হিশাম, উমায়্যা বিন খল্ফ বিন হুর বিন আল-হাজ্জাজ, সুহায়ল বিন 'আমর এবং 'আমর বিন 'আবদুদ। আমাদের মাত্র এই নামগুলিই স্মরণ আছে। এর উপর আঁ-হযরত (সা) সাহাবীদের বললেনঃ মক্কা তোমাদের সামনে তার হৃৎপিণ্ড এনে দিয়েছে।

বাসবাস ইব্‌ন ওমর এবং ‘আদী ইব্‌ন আবী আযযাগার বদরের ঝর্ণা থেকে নিজেদের মশক ভরে উটগুলোকে টিলার নিকট বসিয়ে গেল। সেখানে তারা দু'টি বালিকাকে এই বলতে শোনে যে, কাল অথবা পরশু কুরায়শ কাফেলা এই ঝর্ণার নিকট ডেরা ফেলবে। দু’জনেই কাফেলাবাসীদের খাতির-যত্নের ব্যাপারে পরস্পরে তর্কবিতর্ক করছিল। মাজেদী ইব্‌ন ‘আমরও তাদের সঙ্গে কথা বলছিল। সে বালিকাদ্বয়কে বলল: ইন্তেজাম যদি ঠিকঠাক ও ভালমত হয় তবে তার বিনিময়ে তোমাদের বহুত ইনাম মিলবে। ওমর ও ‘আদী তৎক্ষণাৎ এ সংবাদ রসূল আকরাম (সা)-কে পৌঁছিয়ে দেন।

এদিকে কুরায়শ কাফেলার দলপতি আবু সুফিয়ান কাফেলাকে উপ-কূলের রাস্তায় নিয়ে গিয়ে স্বয়ং নিজে বদরের দিকে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন যাতে ইসলামী লশকরের গতিবিধি সম্পর্কে কিছুটা অবগত হতে পারেন। তিনি বদরের ঝর্ণাধারার নিকট পৌঁছে মাজেদী ইব্‌ন ‘আমরকে দুশমন সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। মাজেদী বলল: আমি শুধু দু’জন সন্দেহজনক উষ্ট্রারোহীকে দূর থেকে দেখেছি। মাত্র তারাই টিলার উপর উট বসিয়ে নিজেদের মশকে পানি ভর্তি করে চলে গেছে। একথা শুনে আবু সুফিয়ান সে স্থানে যান, যেখানে উট বসেছিল। সেখানে উটের মল ভেঙে দেখেন এবং বলেন: এর থেকে খেজুরের আঁটি বের হয়েছে। অতএব এটা নিশ্চিত যে, এরা মুসলিম ফৌজের উষ্ট্রারোহী। কেননা শুধু মদীনাবাসীরাই একমাত্র তাদের উটকে এ ধরনের খাবার খেতে দিতে পারে। সেখান থেকে তিনি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে নিজের সঙ্গী-সাথীদের নিকট ফিরে আসেন এবং স্বীয় কাফেলাকে অত্যন্ত দ্রুত চলার তাকীদ দেন।

এই কাফেলা হুযফা গিয়ে পৌঁছুলে তিনি নিশ্চিত হন যে, তিনি কাফেলাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। আর ভয়ের কোন কারণ নেই। অতএব তিনি কুরায়শ বাহিনীর নিকট দূত পাঠিয়ে বলে পাঠান: যে মালমাত্তা এবং যে সব আত্মীয়-বান্ধবের নিরাপত্তার জন্য আপনারা মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে আসছিলেন, এখন তারা নিরাপদ হেফাজতে রয়েছে। অতএব আপনারা সবাই মক্কায় ফিরে যান।

আবু জেহেল কিন্তু এই পরামর্শ গ্রহণ করল না। সে বলল, “আমরা বদরে কিছু দিন অবস্থানের পর ফিরে যাব যেন বদরের মেলাও দেখতে

পারি এবং পূজামণ্ডপে কিছু পশু নযরানাস্বরূপ উৎসর্গ করে উৎসবও পালন করতে পারি।" তার ধারণা ছিল যে, এর ফলে এই এলাকার আরব কবিলা-গুলো তাদের শক্তি ও শান-শওকতের বহর দেখে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের মিত্রে পরিণত হবে। সে কুরায়শ বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হবার হুকুম দেয়।

হুযফায় কুরায়শদের মিত্র ধনী যুহ্‌রা ও বনী 'আদী ইব্‌ন কা'ব-এর খান্দানের যে সব লোক তাদের সাহায্যার্থে এসেছিল তারা আখনাস ইব্‌ন শরীক ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন ওহাবের কথায় নিজেদের বাড়ী-ঘরে ফিরে যায়। তারা বলল, "আমরা যে কাজের জন্য এসেছিলাম তা পূর্ণ হয়ে গেছে। এজন্য আবু জেহেলের কথায় কান দেওয়া বেকার।" এভাবে কুরায়শ বাহিনী একাকীই বদরের পানে রওয়ানা হয় এবং উপত্যকার অপর পার্শ্বে 'আকান-কালের পেছনে তাঁবু স্থাপন করে।

বদর য়ালীল উপত্যকা ও 'আকানকাল নামক উপত্যকার মাঝখানে অবস্থিত এবং বদরের কুয়া বতনে য়ালীলে মদীনার দিকের কিনারের নিকটে ছিল। যে রাতে কুরায়শ বাহিনী 'আকানকালের টিলার পেছনে তাঁবু স্থাপন করে সে রাতে কিছু বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য উপত্যকা অত্যন্ত কর্দমাক্ত হয়ে পড়ে। এতে কুরায়শদের সামনে অগ্রসর হবার পথে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ফলে তারা আঁ-হযরতের পূর্বে পৌঁছে ঝর্ণার উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারেনি। মুসলিম বাহিনী তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। মুজাহিদ বাহিনী ঝর্ণা মুখে পৌঁছে আঁ-হযরত (সা)-এর হুকুমে ছোট-খাট খালগুলো বন্ধ করে দেয় এবং ঝর্ণার উৎসমুখের সন্নিকটে পুকুর বানিয়ে কুরায়শদের নিকট পানি পৌঁছা বন্ধ করে ফেলে। আঁ-হযরত (সা)-এর বাহিনী উঁচুতে অবস্থান করছিল এবং সেখানকার যমীন ছিল কংকরময়। সেজন্য বৃষ্টির কারণে তাঁদের চলাফেরায় কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি।

পাহাড়ী এলাকার যুদ্ধ

পাহাড়ী এলাকাতে যুদ্ধের অনুপম মূলনীতি হ'ল নিম্নরূপঃ

গোটা দুনিয়ার প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, সেনাবাহিনীর কখনো

উপত্যকাভূমি ও নালায় ছাউনী ফেলা উচিত নয়। কেননা এরূপ স্থানে যদি হঠাৎ করে প্রবল ও মুষলধারায় বর্ষণ শুরু হয়ে যায় তাহলে সব সয়লাব হয়ে যায়। এর ফলে জানমাল উভয়েরই প্রচুর ক্ষতি হয়। আর যদি মামুলি বৃষ্টি হয় তাহলে খুব খারাপ রকমের কর্দমাক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয় যা পার হওয়া মানুষ ও জীব-জানোয়ার উভয়ের জন্যই মুশকিল হয়ে পড়ে। মোটর গাড়ী যায় ফেঁসে এবং ট্যাংকও খুব কষ্টেই এ থেকে বের হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ওয়াযিরিস্তানে বৃটিশ ফৌজের অভিযানের কথাই ধরা যাক।

১৯৩৭ 'ঈসায়ীতে বৃটিশ ফৌজ ইপি, ফকীরের বিরুদ্ধে ঝটিকা আক্রমণে অগ্রসর হতে গিয়ে গিরয়াওম পর্যন্ত পেঁাছে যায়। গিরয়াওম শাম ময়দানে অবস্থিত। এই ময়দান প্রকৃতপক্ষে শাম নালার ভাটি ভূমিতে ছিল। মে মাস; কারুর খেয়ালেও ছিল না যে, এ সময় বৃষ্টি হতে পারে। আমি নিজেই উক্ত ফৌজের সঙ্গে ছিলাম। ফৌজ ছাউনী ফেলার জন্য এই জায়গা-টিকে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে নির্বাচন করেছিল। প্রথমত, এখানে ফৌজের জন্য যথেষ্ট জায়গা ছিল। এই অভিযানের পূর্বে উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে এত বড় সৈন্য সমাবেশ আর কখনও ঘটানো হয়নি। অতএব বিস্তৃত ও প্রশস্ত জায়গার প্রয়োজন ছিল এবং নালায় অবস্থান না করার নীতিকে একেবারে গোড়াতেই উপেক্ষা করা হয়েছিল। কারণ এ এলাকাতে বর্ষা মৌসুম সাধারণত জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে কিংবা আগষ্ট মাস থেকেই শুরু হয়। এর পূর্বে বৃষ্টি হয় না। ফলে বিপদের কোন আশংকাই ছিল না। দ্বিতীয়ত, সেখানে উপজাতীয়দের রাত্রিকালীন অতর্কিত হামলা থেকে আত্মরক্ষা সহজ ও নিরাপদ ছিল।

ছাউনী ফেলার পর ফৌজের বৃটিশ কমাণ্ডার ভারত সরকারের রাজনৈতিক প্রতিনিধিকে ইপি, ফকীরের নিকট এই পয়গাম দিয়ে পাঠান: এখনও সুযোগ আছে, তুমি অস্ত্র সমর্পণ কর। নইলে তোমার পাহাড়ী গুহার বাসস্থান পাসাল (Pasal) ধ্বংস ও বরবাদ করে দেওয়া হবে। ইপি, ফকীরকে সাহায্য করছিল মস'উদ কওমের একটি বাহিনী যার সংখ্যা ছিল চারশো'রও কম। ওদিকে বৃটিশ সরকারের বাহিনী ছিল চল্লিশ হাযারেরও বেশী এবং সর্বপ্রকারের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। মস'উদ কওমের কাছে একটি করে মাত্র রাইফেল ছিল। এছাড়া আর কিছু ছিল না।

ফকীর বৃটিশ-ফৌজের কমাণ্ডারকে বলে পাঠানঃ আমার মদদগার একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। শেষ নিঃশ্বাস থাকা পর্যন্ত আমি মুকাবিলা করব। আক্রমণের নির্দেশ শোনার জন্য আয়োজিত সামরিক অফিসারদের সম্মেলনে রাজনৈতিক প্রতিনিধি ইপি, ফকীরের জওয়াব পড়ে শোনালেন। সবাই সমস্বরেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসতে লাগল। সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধি-বৃন্দ যখন দরকারী নির্দেশ লাভ করে নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরছিলেন তখন আসমানের কোণে অকস্মাৎ একখণ্ড মেঘ দেখা দেয়। এর পর যখন মেঘের গর্জন শোনা যেতে লাগল তখন সবাই এই ভেবে খুশী হ'ল যে, যাক—গরমের প্রচণ্ডতা এখন কমে যাবে আর মৌসুমও হয়ে উঠবে আনন্দদায়ক। দেখতে না দেখতেই শিল পড়তে থাকল। লোকজন সেগুলো উঠাবার জন্য দৌড়ে অগ্রসর হ'ল যেন তা দিয়ে গলা মুখ ভেজাতে পারে। এমনি সময়ে শুরু হ'ল প্রচণ্ড শিলা-বৃষ্টি এবং অল্পক্ষণের ভেতরেই সমস্ত পাহাড় সাদা চাদরে ঢেকে গেল। অতঃপর এল বৃষ্টি এবং এমন প্রবল বর্ষণ শুরু হ'ল যে, সমস্ত শিলারাশি প্রবাহিত হয়ে একটি টিলার আকারে আমাদের ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হ'ল এবং যে সব তাঁবু নিম্নভূমিতে ছিল সেগুলো স্রোতের তোড় এসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মোটকথা, এই শিলা-বৃষ্টি ও প্রবল বর্ষণে এমন ভীষণ ক্ষতি হ'ল যে, বৃটিশ কমাণ্ডারকে বাধ্য হয়ে আক্রমণ পরি-চালনা মুলতবী করে দিতে হয়। শুধু তাই নয়, এই তুফান ও সয়লাবে ফৌজেরই ক্ষতি হয়েছিল এবং সমর ও মারণাস্ত্র থেকে শুরু করে রসদ-সম্ভার পর্যন্ত সবই বিনষ্ট হয়েছিল। বহু সামান বয়ে ইপি, ফকীরের ক্যাম্পের দিকে চলে যায়। ফকীরের ক্যাম্পটি নদীর ভাটিতে ছিল। পরি-শেষে তা উপজাতীয়দের হাতে গিয়ে পড়ে।

এ ধরনের অসুবিধাই কুরায়শদের সামনে দেখা দেয়। তাদের বোঝা বহনকারী উটগুলো কাদায় আটকে পড়ে। চলাচল হয়ে পড়ে ভীষণ কষ্ট-কর। ফলে তারা দ্রুত চলাফেরা করতে পারে নি। এর বিপরীতে আঁ-হযরত-এর ছাউনী ছিল নিরাপদ ও সুদৃঢ়রূপে মযবুত। এজন্য বৃষ্টিতে তাঁর ক্ষতি হয় নি। এর ফলে তাঁর ফৌজী মোর্চাগুলো অধিকতর মযবুত বানাবার সুযোগ মিলে গেল। সেখানেই রসূল করীম (সা)-এর জন্য খেজুরের ডালপালা সহ-যোগে একটি ঝুপড়ী বানানো হ'ল যেন তিনি গরমের তাপ থেকে নিরাপদ হতে পারেন। ঝুপড়ীর আড়ালে তাঁর সওয়ারীর জন্য জায়গা ছিল এবং

এটা এমন সুবিধাজনক স্থানে ছিল যে, যুদ্ধের তামাম মোর্চাগুলো তিনি অনায়াসেই দেখতে পাচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন কুরায়শ বাহিনী উপত্যকার কর্দমাক্ত ভূমি থেকে বের হয়ে বালুকাময় এলাকায় আসে। একটি ছোট্ট খেজুর বাগানে এসে তারা অবস্থান নেয়। এই বালুকাময় এলাকা ছিল প্রকৃতপক্ষে বালির পাঁক যার পৃষ্ঠদেশ বৃষ্টির পানিতে জমে গিয়েছিল। কুরায়শরা এটা জানত না। বাহিনী যখন ছাউনী ফেলল তখন 'উৎবা বিন রবী'আ পুনরায় এ ব্যাপারে চেষ্টা ও দৌড়ঝাপ শুরু করল যাতে করে কুরায়শরা যুদ্ধ ব্যতিরেকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কামিয়াব হতে পারল না। এর পূর্বে সে কুরায়শদের ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েছিল যখন মুসলমানদের একটি প্লাটুন কলীব নামক স্থানে কুরায়শদের দু'জন ভিস্তিওয়ালাকে এবং একটি উট পাকড়াও করেছিল। 'উৎবা যুদ্ধের মুকাবিলায় সন্ধির উপর প্রাধান্য দিচ্ছিল আর আবু জেহেল দিচ্ছিল যুদ্ধের উপর। সে 'উৎবাকে বুযদিল বা কাপুরুষ বলছিল। আসলে ঘটনা ছিল এই যে, নাখলায় 'আব-দুল্লাহ্ ইব্‌ন জাহাশের হামলা এবং কলীব-এ দু'জন ভিস্তিওয়ালা ও উট ধৃত হবার ফলে কাফিরদের অন্তরে মুসলমানদের বীরত্ব ও বাহাদুরীর ভয়াবহ আতংক ছেয়ে গিয়েছিল এবং আঁ-হযরত (সা) যুদ্ধের প্রথমেই শত্রুর উপর আপন ফৌজের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বেরও প্রভাব কায়েম করে দিয়েছিলেন। এর স্পষ্টতর প্রমাণ এই যে, যখন কুরায়শরা 'উমায়র ইব্‌ন ওহাবকে ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা ও অন্যান্য অবস্থাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠায় তখন সে এসে জবাব দেয়ঃ মুসলমানদের সংখ্যা কম-বেশী তিনশোর মত। আর আমি যতদূর দেখতে পেরেছি অন্য কোন সাহায্যকারী বাহিনী তাদের আশে-পাশে নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে আত্মোৎসর্গের প্রেরণা সীমাতিরিক্ত। তাদের মনে মরণ সম্পর্কে ভয়-ভীতির লেশমাত্রও নেই। তারা তোমাদের শক্ত রকমের এবং ভীষণভাবে মুকাবিলা করবে, আর তাদের মুকাবিলায় আমাদের ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশী হবে। এমতাবস্থায় আমরা যদি জয়যুক্তও হই তবুও লাভ বেশী হবে না। কেননা তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া আমাদের লোকদের এবং অন্যান্য কবিলার উপর খুব ভাল হবে না। অতএব যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে এ কথাগুলো গভীরভাবে ভেবে নেওয়া প্রয়োজন।

'উমায়রের এই বর্ণনা শুনে হাকীম বিন হিযাম 'উৎবা বিন রবী'আর নিকট যায়। সে ছিল শীর্ষস্থানীয় কুরায়শ সর্দারদের অন্যতম। হাকীম বিন হিযাম তাকে পরামর্শ দেয় যে, তিনি যেন কুরায়শদের বুঝিয়ে সুজিয়ে ফিরে যেতে উৎসাহিত করেন এবং 'আমর ইব্ন আল-হাদরামীর খুনের বদলা নিতে বাধা দেন। এতে সে বলেঃ আমি তো রাযী আছি। পারলে তুমি আবু জেহেলকে বুঝিয়ে রাযী করাও।

এরপর হাকীম বিন হিযাম মারওয়ান ইব্ন হাকামের নিকট আসে এবং বলেঃ হুযফা থেকে কুরায়শদের একজন বড় মিত্র আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। আমি 'উৎবার সঙ্গে 'আমর ইব্ন আল-হাদরামীর খুনের বদলা নিতে বাহানা করে এড়িয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছি। সে এ ব্যাপারে রাযী আছে এবং আমার সঙ্গে এ ব্যাপারে একমতও বটে যে, মুহাম্মদ-এর সঙ্গে যুদ্ধ না করাই ভাল। অতএব আমি এজন্য এসেছি যে, তুমি আবু জেহেলকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার সৎ পরামর্শ দিয়ে গোটা কওমকে নিজের প্রতি কৃতজ্ঞ ও সদয় বানিয়ে নেবে। মারওয়ানও রাযী হ'ল। কিন্তু আবু জেহেল এর কড়া জবাব দেয় এবং বলে ঃ তুমি 'উৎবার মত কাপুরুষের বার্তাবহ কেন হ'লে? এরপর 'উৎবা আবু জেহেলের নিকট আসে। সে সময় আবু জেহেল আয়মা ইব্ন রুখসত আল-গিফারীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। আয়মা স্বীয় মিত্র কুরায়শদের খাবার জন্য দশটি উটও সঙ্গে এনেছিল। সে আবু জেহেলকে নিজের উটের সঙ্গে তার পিতার পক্ষ থেকে পয়গামও পেশ করে যে, যদি অস্ত্রশস্ত্র কিংবা সেপাই-সৈন্যের দরকার দেখা দেয় তবে আবু জেহেল তাও লাভ করতে পারেন। আবু জেহেল এর প্রত্যুত্তরে বলেঃ আত্মীয় সম্পর্কের হক যতখানি ছিল তা তো তুমি আদায় করেছ, আমার কোন সাহায্যের দরকার নেই। কেননা আমাদের শক্তি বড়—বিরাট। এরপর 'উৎবাকে লক্ষ্য করে বলল এবং বেশ মিঠে-কড়া ভাষায় ব'লে তার ঘোড়ার পেটে তলোয়ারের আঘাত হানল যার অর্থ ছিল—তুমি বড় বুযদিল ও ভীরু কাপুরুষ। ভালো চাও তো মানে মানে এখান থেকে কেটে পড়। অতঃপর সে 'আমর ইব্ন আল-হাদরামীর ভাই 'আমের ইব্ন আল-হাদ-রামীকে খুনের বদলা নেবার জন্য উত্তেজিত করে তোলে। সে আবু জেহেলের বাগাড়ম্বরে ফেঁসে যায় এবং 'উৎবার প্রভাব কেটে যায় যার জন্য সে স্বীয় লোক-লশকর নিয়ে কুরায়শদের থেকে আলাদা হতে পারে নি। ফলে নিতান্ত

বাধ্য হয়েই সে লড়াইয়ের ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করে। যেহেতু হাকীম এবং 'উৎবার সমঝোতামূলক উদ্যোগে সাধারণ লোকজনের প্রভাবিত হবার আশংকা দেখা দিয়েছিল সেজন্য আবু জেহেল বেশী বিলম্ব করা আর সমীচীন মনে করেনি এবং তাৎক্ষণিকভাবে লড়াই শুরু করে দেয়।

যুদ্ধের সূচনা

দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য আবু জেহেল সর্বাগ্রে 'উৎবা, তৎপুত্র ওয়ালীদ এবং তার ভাই শায়বাকে পাঠায়। এদের জবাবে আনসারদের পক্ষ থেকে তিন জন যুবক এগিয়ে আসে। এদের দু'জন হারিছ পুত্র 'আওয এবং মু'আওয়ায এবং তৃতীয় জন 'আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা। কুরায়শরা এদের সঙ্গে লড়তে অস্বীকার করে এবং বলেঃ আমাদের মুকাবিলায় আমাদের সমগোত্রীয় দের পাঠাও। এর পর হামযা (রা) ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব, 'উবায়দা (রা) ইব্ন আল-হারিছ এবং 'আলী (রা) ইব্ন আবু তালিব এগিয়ে আসেন। মুকাবিলা হ'ল এবং তিনজন মুশরিকই চিরশয্যায় শায়িত হ'ল। মুসলমানদের মধ্যে 'উবায়দা (রা) ভীষণ রকমে আহত হন। হামযা (রা) এবং 'আলী (রা) ইব্ন আবু তালিব তাঁকে ময়দান থেকে উঠিয়ে নিজেদের শিবিরে নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি শাহাদাত লাভ করেন। তিন জন মুশরিকেরই এই পতন দেখে আবু জেহেলের বাহিনী একযোগে হামলা করে বসে। আঁ-হযরত (সা) এ ধরনের হামলার আশংকার প্রেক্ষিতে স্বীয় বাহিনীকে হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন যে, যদি কাফিরগণ একযোগে আক্রমণ করে বসে তবে তাদের সামনে অগ্রসর হতে দেবে এবং দ্রুততার সঙ্গে সঠিক লক্ষ্যে ও নিশানায় তীর বর্ষণ করবে। মুজাহিদ বাহিনীর কাতারবন্দী এভাবে করেছিলেন যে, মুজাহিদ বাহিনী ইস্পাত কঠিন দুর্ভেদ্য প্রাচীরে রূপ নেয়। সেখানে এমন কোন ফাঁক কিংবা ফাটল ছিল না যে, দুশমন ভেতরে ঢুকতে পারে অথবা পারে ব্যূহ ভেদ করতে। এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র একটি দল হামলার জন্য সদা প্রস্তুত ছিল।

আঁ-হযরত (সা) যুদ্ধের পূর্ব রাতেই মুসলিম বাহিনীকে কয়েকটি কাতারে ভাগ করে যথানিয়মে লাইনবন্দী করেন। এরপর তার তদারকী করেন এবং যেখানেই কাউকে অগ্রপশ্চাৎ দেখতে পেয়েছেন তাকে ছড়ির ইশারায়

ঠিক করে দিয়েছেন। এই সাথেই তিনি ফৌজের বিভিন্ন অংশের উপর একজন করে (অফিসার) সেনানায়ক নিযুক্ত করে দেন এবং তাদের জন্য আলাদা আলাদা পতাকাবাহীও নির্ধারণ করেন। অতঃপর ফৌজের প্রতি নির্দেশমালা জারী করেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কাতার ভাঙবে না, লড়াইয়ের সূচনা করবে না। দুশমন যদি দূরে হয় তবে তীর চালিয়ে তা বিনষ্ট করবে না। আওতায় এলে তীর বর্ষণ করবে আর নিকটবর্তী হলে পাথর ছুঁড়ে মারবে, অধিকতর নিকটবর্তী হলে বল্লমের সাহায্যে প্রতিরোধ করবে এবং সবশেষেই কেবল তলোয়ার বের করবে।

মুহাদ্দিছ ও ঐতিহাসিকদের বর্ণনা মুতাবিক আঁ-হযরত (সা) বিশিষ্ট সাহাবীদের সমভিব্যাহারে যুদ্ধের ময়দান পরিদর্শন করেন এবং স্থানে স্থানে বলতে যান যে, শত্রু পক্ষের অমুক অফিসার অমুক জায়গায় হবে। আঁ-হযরত (সা)-এর কঠিনতম বিপদের মুহূর্তেও এমনিতরো নিরুদ্বেগ প্রশান্তির প্রকাশে সৈন্যদের মধ্যে কি পরিমাণ উদ্যম ও আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হতে পারে তার পরিমাপ করা দুঃসাধ্য নয়।

আঁ-হযরত (সা) তাঁর ছোট জামাতটির জন্য স্বেচ্ছাসেবী মহিলা দলও নিযুক্ত করেছিলেন। বুখারী শরীফের বর্ণনা মুতাবিক তারা আহতদের ব্যাণ্ডেজ ও পট্টি বাঁধত, সেপাইদের পানি পান করাত এবং ময়দান থেকে শত্রুর নিক্ষিপ্ত তীর কুড়িয়ে এনে মুসলিম তীরন্দাযদের হাতে তুলে দিত।

সৈন্যদল পরিদর্শন শেষে তিনি প্রয়োজনীয় হেদায়েত (নির্দেশ) জারী করেন এবং অতঃপর কয়েকজন সাহাবী (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে সেই পাহাড়ের উপর তশরীফ রাখেন যেখানে তাঁর জন্য খেজুরের ডালপালা সহযোগে ঝুপড়ী নির্মাণ করা হয়েছিল। এখানে থেকে যুদ্ধের ময়দান পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হ'ত। এখানে কতিপয় দ্রুতগামী উষ্ট্রী রাখা হয়েছিল যেন ফৌজীদের জরুরী হেদায়েত পৌঁছানো যায়। অধিকন্ত হেফাজতের জন্য একটি রক্ষীদল নিযুক্ত করা হয়েছিল।

শত্রুর হামলা দেখে আসমানের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করেন এবং এক মুঠো মাটি উঠিয়ে দুশমনের দিকে নিক্ষেপ করেন। এর প্রতিক্রিয়া দেখে

তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায় করেন। এরপর মুহূর্তে পাহাড়ের দিক থেকে বাতাসের একটা প্রবল আলোড়ন উত্থিত হয় যার ফলশ্রুতিতে কুরায়শদের দিকে বালির তুফান অগ্রসর হয় এবং তাদের ক্যাম্পে বিশৃংখলা ও বিপর্যস্ত অবস্থা ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে মুসলমানদের বৃষ্টিধারার মতো অজস্র তীর বর্ষণ, অপর দিকে বালির তুফান এবং তৃতীয় দিকে আঁ-হযরত (সা) হামলাকারী বাহিনীকে দুশমনের ডান পার্শ্বের উপর আক্রমণের নির্দেশ দেন। এই বাহিনীতে হযরত 'আলী (রা), হামযা (রা) ও আবু দুজানা (রা) প্রমুখের ন্যায় নামকরা বীর যোদ্ধাগণ ছিলেন। কুরায়শদের ঘোড়-সওয়ার ও উষ্ট্রারোহী সৈন্যদল দলদলে বালিতে আটকে কাহিল হয়ে গিয়েছিল। ফলে শত্রুর বুদ্ধি ও বীরত্বে ভাটা পড়তে থাকে। আবু জেহেল পূর্ণ শক্তিতে হামলা করে। কিন্তু ফলোদয় হ'ল না কিছুই। এমন কি নিজেও সে এই হামলায় মারা পড়ল এবং অন্যান্য সঙ্গী-সাথীও একই পথের যাত্রী হ'ল। কুরায়শদের পদস্খলন ঘটল এবং বিশৃংখল অবস্থায় তারা পালাতে লাগল। সত্তর জন গ্রেফতার এবং অনুরূপ সংখ্যায় মারা পড়ল। দুশমনকে পালাতে দেখে আঁ-হযরত (সা) একটি প্লাটুনকে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে এবং তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখবার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি আরও নির্দেশ দেনঃ আল্লাহ না করুন, তারা ফিরে আসার অভিপ্রায় নিক অথবা অন্য কোন রাস্তা এখতিয়ার করুক—তাৎক্ষণিকভাবে যেন তাঁকে অবহিত করা হয়।

যুদ্ধের পর আঁ-হযরত (সা) বদর প্রান্তরে তিনদিন অবস্থান করেন। এরপর বদরের শহীদবর্গের দাফনের ব্যবস্থা করেন এবং মুশরিকদের লাশ মাটির আড়ালে ঢেকে দেন। এরপর সফরা উপত্যকায় তাশরীফ নেন। সেখানে তিনি মালে গনীমত বন্টন করেন, কিন্তু কয়েদীদের নিজের কাছেই রেখে দেন। তাদের সঙ্গে অত্যন্ত কোমল ব্যবহার করেন। যাদের কাছে পরিধেয় বস্ত্র ছিল না তাদের তিনি কাপড় দেন। সবাইকে ভাল খাবার খাওয়ান। শেষে হযরত আবুবকর (রা)-এর পরামর্শক্রমে কুরায়শদের থেকে মুক্তিপণ নিয়ে সবাইকে মুক্ত করে দেন।

এখানে আমরা সেই প্রতিরক্ষা নীতির দিকে অধিক মনোযোগ দেওয়া জরুরী মনে করি যার আওতায় তিনি কুরায়শ বাহিনীর মুকাবিলা মদীনার নিকটবর্তী স্থানে না করে বরং মদীনা থেকে কয়েক মনযিল দূরে বদর

প্রান্তরে করেন। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার সর্বোত্তম দিক হ'ল, দুশমন আমাদের গতিবিধি ও চলাচলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানবে না বরং সব সময় এই সন্দেহের দোলায় ঘুরপাক খেতে থাকবে যে, আল্লাহ্ই জানেন, আমরা কি করতে যাচ্ছি। অতঃপর ফৌজকে এমনভাবে সুবিন্যস্ত করতে হবে যেন দুশমনের চালবাজী রুখবার জন্য ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অধিকতর সংখ্যক দলকে বিপদের জায়গায় খুব স্বল্পায়াসে সমাবেশ ঘটানো যায়। আঁ-হযরত (সা) দুশমনের শক্তিকে ধ্বংস করতে চাইতেন। এইজন্য বদর নামক স্থানটি ছিল সর্বাংশে উপযুক্ত ও উত্তম। য়ূরোপের একজন মশহূর প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকের উক্তিঃ যে সিপাহসালার নানা স্থানে মযবুত ও সুদৃঢ় থাকতে চান এবং একই সময় অনেকগুলো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল করতে চান তিনি সর্বত্রই ব্যর্থতার শিকার হন এবং সকল স্থানেই তিনি পরাজয় বরণে বাধ্য হন। আঁ-হযরত (সা) স্বীয় উপলব্ধি ও দূরদৃষ্টির দ্বারা একমাত্র বদর স্থানটি নির্বাচিত করে নিজের ছোট্ট ফৌজের সাহায্যে দুশমনকে পর্যুদস্ত করে স্বীয় অভীষ্ট লাভ করেন।

সিপাহসালারের জন্য জরুরী হ'ল, প্রতিরক্ষা ও আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা যতই উত্তম হোক না কেন—ফৌজের একটি অংশ দরকারী মুহূর্তের কাজের জন্য সব সময় নিরাপদে রেখে দেবে। এর ফলে আচানক ও আকস্মিক হামলাগুলো প্রতিরোধ করা যায়। কখনো দুশমন ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করলে তাদের পশ্চাদ্ধাবনও করা যায়। সেভাবে হযূর আকরাম (সা)-ও মুহূর্তে তাদেরকে হামলার নির্দেশ দিয়ে দুশমনের মনোবল ভেঙে দেন।

ফৌজের সকল অংশের জন্যই অপরিহার্য যে, তারা লড়াইয়ের হালহকিকত ও অবস্থাদি সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদ সিপাহসালারকে পৌঁছুতে থাকবে যেন তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তিনি 'আরীশ নামক টিলা থেকে যুদ্ধের যাবতীয় অবস্থা শুধু নিজ চোখেই দেখেন নি---বরং সেখান থেকে যাবতীয় নির্দেশও পাঠাতে থাকেন। এভাবে তিনি যুদ্ধের পূর্বে তেজারতী কাফেলা এবং কুরায়শ বাহিনীর খবরাখবর নিতে থাকেন। যুদ্ধকালীন খবর সংগ্রহের এই ব্যবস্থাপনা সেই মুহূর্তেই কেবল ফলপ্রসূ হতে পারে যখন রিজার্ভ ফৌজের অবস্থান এমন জায়গায় রাখা হবে যা খুব সামনেও হবে না এবং বেশী পেছনেও হবে না। আঁ-হযরত (সা) স্বয়ী

অবস্থান এবং রিজার্ভ ফৌজের জায়গা এমন স্থানে রেখেছিলেন যা আক্র-মণসীমার আওতায় ছিল না এবং খুব পেছনেও ছিল না। গোটা যুদ্ধটাই তিনি নিজের চোখের সামনে সংঘটিত হতে দেখেন এবং যখন রিজার্ভ ফোর্স ব্যবহারের সময় এলো তখন তাদেরকে শত্রুর দুর্বলতম স্থানে আঘাত হানার হুকুম দিয়ে পর্যুদস্ত করে দিলেন।

এই পরাজয়ের ফলে কুরায়শদের গর্বে ও অহমিকায় প্রচণ্ড আঘাত লাগে। কিন্তু তথাপি তারা ধৈর্য অবলম্বনকেই শ্রেয় মনে করে। তাদের যে সব লোক নিহত হয়েছিল তাদের জন্য তারা আহাজারী কিংবা কান্না-কাটি করেনি এই ভেবে যে, এতে মুসলমানেরা খুশী হবে এবং অন্যান্য কবিলার উপর এর প্রতিক্রিয়া হবে। কিন্তু প্রতিশোধের আগুন তাদের অন্তরে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ধিকি ধিকি তা জ্বলতে থাকে।

যুদ্ধের এসব ঘটনা আমরা বিভিন্ন ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করে লিখেছি। এখন সেগুলো প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে কয়েকটি প্রশ্ন জাগে। প্রথমত এই যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলার সঙ্গে মুকাবিলার কোন চেষ্টা আঁ-হযরত (সা) কেন করেন নি? কাফেলা রওয়ানা হবার সংবাদ যখন তিনি পেলেন তখন যদি তিনি এগিয়ে গিয়ে কাফেলাকে পাকড়াও করতেন তা হলে অনেক মালমাত্তা ও টাকা-পয়সা তাঁর হাতে আসতো। অতঃপর কাফেলা যখন হাত থেকে ফসকে গেল তখন তিনি বদরে কেন অবস্থান গ্রহণ করলেন? কেনই বা তৎক্ষণাৎ মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন না?

দ্বিতীয়ত, বদরের সন্নিকট তিনি এতদিন কেন অবস্থান করলেন? তাৎক্ষণিকভাবে কেন সে ছাউনীর স্থান দখল করলেন না যেখানে শেষ অবধি তাড়াহুড়ো করে শত্রুর কিছু আগেই যেতে হ'ল?

তৃতীয়ত, দুশমনের পরাজয় বরণ ও পর্যুদস্ত হবার পর তিনি তাদের পশ্চাদ্ধাবন কেন করলেন না?

চতুর্থত, বিজয় লাভের পর বদরে কেন তিনি অবস্থান করলেন যার কারণে মদীনাবাসীদের ভেতরে একটা আতংক ও দুশ্চিন্তা বিরাজ করছিল?

পঞ্চমত, যুদ্ধবন্দীদের থেকে প্রতিশোধ কেন গ্রহণ করলেন না এবং তাদের সঙ্গে কোমল ব্যবহার করে এবং মুক্তিপণ না নিয়েই কেন তাদেরকে ছেড়ে দিলেন?

কোন কোন ঐতিহাসিক কয়েদীদের ভাষায় লিখেছেন যে, মুসলিম ফৌজ নিজেরা পায়দল চলেছে আর বদরের যুদ্ধবন্দীদের তারা উটের পিঠে চড়িয়েছে। নিজেরা খোরমামাত্র খেয়ে দিন কাটিয়ে দিয়েছে, আর তাদেরকে রুটি খেতে দিয়েছে। এই অমায়িক ব্যবহারের পেছনে কোন্ কল্যাণ নিহিত ছিল?

ষষ্ঠত, বদর প্রান্তরের ছোট্ট এ লড়াইটি প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এ থেকে কোন্ কোন্ মূলনীতি বের করা যেতে পারে?

কাফেলা হাতছাড়া হবার পর আঁ-হযরত (সা) তাৎক্ষণিকভাবে মদীনায় কেন প্রত্যাবর্তন করলেন না এবং সপ্তাহকাল যাবত বদরের আশেপাশে থেকে দূর-দূরান্তর এলাকায় সমূহ বিপদের মুকাবিলা তিনি কেন করলেন? এ প্রশ্নের জবাব প্রতিরক্ষা কৌশলের ভাষায় এই যে, যোগ্য সিপাহসালার স্বীয় ফৌজী অভিযানকে এমন একটা মোড় দেন যে, কোন না কোন উপায়ে তার প্রতিরক্ষাগত উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যায়। এর ফলে দুশমন সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিপতিত হয় এবং সে জানতে পারে না যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষের অভিপ্রায় কি এবং তারা কোন্ পরিকল্পনার ভিত্তিতে অগ্রসর হচ্ছে। দুশমনকে এ ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ-সংশয়ের ভিতর নিক্ষেপ করে যোগ্য অধিনায়ক তাদের উপর এমন জায়গায় হামলা করেন যেখানে তার সাফল্য ও কামিয়াবী নিশ্চিত হয় অর্থাৎ এই মোড় এমন হয় যে, সেখানে তিনি ন্যূনতম ক্ষতি স্বীকার করে স্বীয় প্রতিরক্ষাগত উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারেন, যেহেতু প্রতিরক্ষা কৌশলের উদ্দেশ্য হ'ল---শত্রু বাহিনীকে পরাভূত করে তাকে ধ্বংস করে দেওয়া। অতএব আঁ-হযরত (সা)-এর উদ্দেশ্য ছিল মক্কাবাসীদের শক্তিকে খর্ব ও পরাভূত করে দেওয়া। শুধু-মাত্র ধনসম্পদ লুট করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না; উভয়টির ভেতর ফারাক বিস্তর এবং যতখানি ফারাক উভয়টির ভেতর ঠিক ততখানি ফারাকই তার গুরুত্বের ভেতরও।

আঁ-হযরত (সা) জানতেন যে, কুরায়শরা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস হওয়ার আগেই তার হেফাজত করার জন্য বের হবে। অতএব তাদের এমন একটি স্থানে লড়তে বাধ্য করা যেতে পারে যা তাদের জন্য কোন

কল্যাণ বয়ে আনবে না। যদি আঁ-হযরত (সা) কাফেলার উপর হামলা করে বসতেন তবে পুরোপুরি সম্ভব ছিল যে, ঠিক সেই সময় যখন তিনি এতে মশগুল হয়ে পড়তেন কুরায়শরা সে সুযোগের পুরো ফায়দা লুটত। প্রথমত, নিজেদের বাহিনীকে দুটো অংশে ভাগ করে একটি দ্বারা লুটের সময় মুসলমান-দের পেছন থেকে হামলা করাত এবং অপর অংশ দ্বারা মদীনার উপর চড়াও হয়ে তাদের পরিবার-পরিজনকে তলোয়ারের মুখে নিক্ষেপ করত। এমতাবস্থায় সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরায়শদের শক্তি দ্বিগুণ হ'ত, যে শক্তির মুকাবিলা মুসলমানদের বদর প্রান্তরে করতে হয়েছিল।

যেহেতু কুরায়শ বাহিনীর সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় অনেক বেশী ছিল, সেজন্য তাদেরকে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভেতর নিক্ষেপ করে যুদ্ধের ময়দানে এনেই ধ্বংস ও নাস্তানাবুদ করা দরকার ছিল। দুশমনের উপর কার্যকর হামলা তখনই শুরু করা যায় যখন তারা অজ্ঞতার ভেতর হাবুডুবু খায় অথবা প্রতিপক্ষের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে অনবহিত থাকার কারণে নিজেই নিজেকে প্রতিপক্ষের শিকারে পরিণত করে। এমতাবস্থায় তাদের থেকে যখনই কোন ত্রুটি প্রকাশ পাবে ঠিক তক্ষুণি সকল শক্তি সহযোগে আঘাত হানতে হবে। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় এমত মওকা এমন একটা চাল যা দুশমনকে...

ক. এ বিষয়ে নিজেদের ফ্রন্টের দিক পরিবর্তনে বাধ্য করবে এবং এর ফলে তার বাহিনীর শৃংখলা খারাব হয়ে পড়বে।

খ. শত্রু ফৌজের বিভিন্ন ইউনিট একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে যে, কেউ কাউকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না।

গ. তাদের রসদ ও খোরাকের ব্যবস্থাপনায় বাধা সৃষ্টি হবে।

ঘ. পরাজয়ের ক্ষেত্রে হেড কোয়ার্টারের দিকে পশ্চাদপসরণের রাস্তা বিচ্ছিন্ন দেখতে পাবে।

শত্রুর অন্তরে এ ধরনের ভয় কিংবা সকল ধরনের বিপদাপদের আশংকা একই সঙ্গে সৃষ্টি হতে পারে এবং যখন সৃষ্টি হয়ে যায় তখন তা ভয়-ভীতি ও অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটা আশংকা থেকে আর একটা আশংকা এবং একটা বিপদ থেকে আর একটা বিপদ পয়দা হতে থাকে।

বদর যুদ্ধের পূর্বে বিলকুল এটাই হয়েছিল। আঁ-হযরত (সা)-এর আক্রা-মণের পরিকল্পনা কাফেলাবাসী ও কুরায়শ বাহিনী উভয়কেই এই ভয়ে ভীত ও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, না জানি মুসলমানরা কী করে বসে। সন্দেহ-সংশয় এবং অনিশ্চয়তার কারণে তাদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ত্রুটিমুক্ত হতে পারেনি। তাদের রসদ বহনকারী অংশের উপর মুসলমানদের অতর্কিত হামলা, যেটুকু সাহস-ভরসা অবশিষ্ট ছিল, সেটুকুও নিঃশেষ করে দেয়। তারা যুদ্ধের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকার হয় এবং আঁ-হযরতের প্রতিরক্ষা কৌশল ও চাল মাফিক নিজেদের মোর্চা পরিবর্তন করতে থাকে। এমন কি তাদের অধিনায়ক আবু জেহেল তাদেরকে এমন একটি জায়গায় এনে খাড়া করে যেখানে না ছিল পানি—আর না ছিল পশুগুলোর জন্য ঘাস। সূর্য ছিল মুখের দিকে এবং বাতাস ছিল প্রতিকূল। যমীন ছিল বালুকাময় এবং কর্দমাক্ত। ফলে ঘোড়সওয়ার ও উষ্ট্রারোহী বেকার হয়ে পড়ে। তারা যখন মাটিতে নেমে পায়দল লড়তে শুরু করল, মুসলিম তীরন্দাযরা রসূল (সা)-এর নির্দেশে তাদের উপর মুষলধারে তীর বর্ষণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। বালুকাময় এবং কর্দমাক্ত যমীন হবার কারণে কুরায়শদের চলাচল করতে কষ্ট হচ্ছিল, সেজন্য মুসলমানদের অজস্র তীর বর্ষণের শিকার হয়ে তারা লুটিয়ে পড়ছিল। অতঃপর যখন মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে হাতাহাতি লড়াইয়ের নিকবর্তী হ'ল ততক্ষণে তারা ক্লান্তি ও অবসাদে এত-খানি ভেঙে পড়েছে এবং তৃষ্ণা ও পিপাসায় এতখানি কাতর হয়ে পড়েছে যে, তারা নিজেরাই আর নিজেদেরকে সামলাতে পারে নি। ফলে তাদের ব্যাপক জীবনহানির সম্মুখীন হতে হয়।

মুদ্রার যেমন দু'টো পিঠ থাকে তেমনি লড়াইয়ের প্রতিটি মূলনীতিরও দু'টো দিক থাকে। এক হাতে তলোয়ারের সাহায্যে আঘাত হানা হয়, অপর হাতে প্রতিরক্ষার জন্য ঢাল ব্যবহার করা হয়। কখনো তরবারি দ্বারা দুশ-মনকে ঠাণ্ডা করা হয়, আবার এ কাজে চাতুর্যও ব্যবহার করা হয়। কিন্তু দু'টোর উদ্দেশ্যই এই যে, দুশমনকে তার শরীরের এমন অংশ দেখাতে মজবুর করা হবে যেখানে কার্যকর আঘাত হানা যেতে পারে, দুশমনকে এ ব্যাপারে মজবুর করা হবে যেন সে স্বীয় ফৌজকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেলে। আর নিজের ফৌজকে একত্রে একই স্থানে সমবেত করে রাখবে যেন হামলার যথার্থ সন্ধিক্ষণে মযবুত ও সুদৃঢ়তর থাকে। আঁ-হযরত (সা) এ ব্যাপারে

নেহায়েত উত্তম ও সুচারুরূপে দায়িত্ব আন্‌জাম দেন। কাফিরদের কিছু ফৌজ তো কাফেলার হেফাজতের কারণে বদর যুদ্ধে অংশ নিতে পারেনি। অতঃপর রাজনৈতিক চালের কারণে কিছু গোত্র তাদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। তারা যখন এ অবস্থা দেখল যে, কাফেলা বিপদের আওতা থেকে বেরিয়ে গেছে তখন তারা পৃথক হয়ে নিজের নিজের ঘর-বাড়ীতে ফিরে যায়। তারা আবু জেহেলের কথায় বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করেনি। অতঃপর যখন কুরা-য়শদের বড় অংশ যুদ্ধক্ষেত্রে পৌছুল তখন তাদের দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের মদদ না পাবার কারণে বেকার হয়ে পড়ল অর্থাৎ অশ্বারোহী ও উষ্ট্রারোহী বাহিনী পদাতিক বাহিনীর কোন কাজে লাগে নি। অনন্তর আঁ-হযরত (সা)-এর অগ্রাভিযান কুরায়শ বাহিনীর মনে ভীতির সৃষ্টি করে। ফৌজের কয়েকজন সর্দারের আবু জেহেলের নেতৃত্বের প্রতি কোন আস্থা ছিল না। তারা খোলাখুলিভাবে লড়াইয়ের বিরোধিতা করছিল। এজন্য যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হবার পূর্বেই তারা নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে পরাজয়বরণ করে নিয়েছিল। এটা সর্বজনস্বীকৃত এবং এ ব্যাপারে অতীত ও বর্তমান সমস্ত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞের ঐকমত্য রয়েছে যে, নৈতিক ও মানসিক পরাজয় বিরাট থেকে বিরাটতর বাহিনীকেও বেকার ও নিষ্ক্রিয় বানিয়ে দেয়।

এসব অবস্থা ভালভাবে বুঝে নিয়ে এবং সামরিক অভিজ্ঞতার সহযো-গিতায় আঁ-হযরত (সা) যখন দুশমনের এক পার্শ্ব থেকে হামলা করেন তখন তা এমনই সফল প্রমাণিত হয় যে, দুশমনের মেরুদণ্ডই ভেঙে যায়। তিনি স্বীয় ছাউনীর অবস্থান এবং আসমানী ও মৌসুমী অবস্থা থেকে পুরো-পুরি ফায়দা লাভ করেন।

প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এ যুদ্ধ থেকে নিম্নোক্ত ফলাফল গ্রহণ করতে পারি ঃ

১. প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এমন হওয়া দরকার যেন তার উপর অতি সহজে আমল করা যায় অর্থাৎ পরিকল্পনা শত্রুশক্তির সঠিক পরিমাপ করে এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন অবস্থা মুতাবিক তাতে রদবদল করা যায়। এটা তখনই সম্ভব যখন পরিকল্পনা মুদ্রার মত দু'ধারি করে প্রণয়ন করা যায়, যেমনটি আঁ-হযরত (সা) করে রেখেছিলেন যে, দুশমন জানতেও পারে নি---তিনি কাফেলার উপর হামলা করতে চান, না কুরায়শ

বাহিনীর উপর। এ থেকে শত্রুর মন-মানসে দোটানা ও দ্যোদুল্যমানতার সৃষ্টি হয় এবং সে স্বীয় পরিকল্পনায় সুদৃঢ় মনোবল, পূর্ণ একাগ্রতা ও সংহত শক্তি সহকারে কাজ করতে পারে না। প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে এটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে শত্রুর উপর কার্যকর আঘাত হানার কোন না কোন দিক মিলেই যায়।

কিন্তু যেখানে যমীনের উঁচু-নীচু এবং প্রাকৃতিক বাধা উভয় বাহিনীর সর্বাধিনায়কের সামনেই থাকে সেখানকার অবস্থা হয় ভিন্ন। সমর বিশেষজ্ঞ-গণ খুব সহজভাবে এমন কোন পরিকল্পনা তৈরী করতে পারেন না যা দিয়ে দুশমন এমন চাল ও কূট-কৌশলের অনুসরণে রাযী হয়ে যায় যে, নিশ্চিতরূপেই তাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া যায়। অবশ্য এটা একে-বারে অসম্ভবও নয়। বদর প্রান্তরে এমনটিই হয়েছিল। টিমবুর্গ ফ্রন্টে ফিল্ড মার্শাল হিণ্ডেনবুর্গ রাশিয়ানদের এমন ফাঁদে ফেলেই মেরেছিলেন। ১৯৪০ 'ঈসায়ীতে হিটলারও মিত্র বাহিনীকে এমনই নাচ নাচিয়েছিলেন যে, তাদেরকে ডানকার্ক ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধক্ষেত্রের সর্বোত্তম মূলনীতি এটাই মনে করা হয়ে থাকে যে, দুশমন যেখা-নেই কোন ভুল চাল চালবে সেখানেই তাকে তাৎক্ষণিকভাবে তার সাজা দিয়ে দিতে হবে যাতে করে সে সাহস হারিয়ে ফেলে। সমর পরিকল্পনা ফলবান বৃক্ষের মত যাতে কয়েকটি শাখা-প্রশাখা হ'লে ফল ধরে। শাখা-প্রশাখা ভিন্ন ফল আসে না। এমনটি হ'লে তাকে পত্র-পুষ্প-পল্লবহীন ও শ্রীহীন বৃক্ষই বলা হয়।

বদর যুদ্ধে রসূল আকরাম (সা) এধরনের প্রতিরক্ষা কৌশলের সাহায্যই নিয়েছিলেন। তার মুদ্রার মতই দু'টো পিঠ ছিল এবং এর দ্বারা তিনি আমা-দের জন্য এই শিক্ষাই রেখে গিয়েছেন যে, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার দু'টো দিক রাখাটাই উপকারী যেন মওকা মত তার মধ্য থেকে যার দ্বারাই ইচ্ছা স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারি। এরূপ অবস্থায় দূরদর্শিতার সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে যেখানে অহরহ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির সঠিক পরিমাপ করা মুশকিল হয়ে পড়ে, প্রতিরক্ষাগত উদ্দেশ্য হাসিল একেবারে নিশ্চিত হয়ে পড়ে।

বৃটিশ প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক জেনারেল বার্ডউড লিখেছেন, "যখন কোন সরকার যুদ্ধের ইচ্ছা করে তখন তার উচিত এ ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা লাভ করা, রাষ্ট্রের ভেতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অধিবাসীদের বিভিন্ন গ্রুপ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি কতখানি বিদ্যমান আছে। এরপর শত্রুর অর্থনৈতিক উপকরণকে কমযোর ও দুর্বল করে তার গুরুত্বকে হ্রাস করার পরিকল্পনা তৈরী করা উচিত।

"অধিকন্তু এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত নয় যা বাহ্যিক ফলাফলের দিক দিয়ে তাদের জন্য উপকারী হবে, কিন্তু ভবিষ্যতে দুশমন তা থেকে শক্তি ও প্রেরণা পাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মানীর ইউবোটগুলো শত্রু মিত্র কোনরূপ বাছ-বিচার না করেই বাণিজ্য পোতগুলো ডুবিয়ে দিতে শুরু করল তখন শেষাবধি আমেরিকা ইংরেজের সঙ্গে মিলিত হয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধেই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফলে জার্মানীর মুকাবিলায় মিত্র বাহিনীর শক্তি বহু গুণে বেড়ে গেল।"

বলা হয় যে, ওয়েলিংটনকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিলঃ আপনার বিজয়লাভের অন্তর্নিহিত রহস্য কি? জওয়াবে তিনি বলেছিলেনঃ আমি দুশমনের পরিমাপ ও ধারণা থেকে সাধারণত পনর মিনিট পূর্বেই নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে যাই। এর অর্থ এই যে, তিনি শত্রুর উপর সাধারণত অতর্কিতে হামলা করতেন অর্থাৎ দুশমন যে সময় হামলার আশংকা করে তার পূর্বেই এমনি চলাচল ও গতিবিধি থেকে যে শত্রু সেনাপতি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়---হয়ে যায় পেরেশান, তার ফৌজের মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে,---মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তারা। আর অবস্থা যখন এই হয় তখন ভুলের আধিক্য ঘটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়; বরং সেটাই স্বাভাবিক। অনেক সময় সিপাহসালারদের এ ধরনের ভুল যে কোন সরকারের বিপর্যয় ডেকে আনে। এমন কি তার নিকট শত্রুর মুকাবিলায় অধিক ফৌজ ও অস্ত্র শস্ত্র থাকলেও কিছু করা সম্ভব নয়। সে সঠিকভাবে তা ব্যবহার করতে পারে না। এজন্য ফৌজ ও অস্ত্রশস্ত্রের এই সংখ্যাভিত্তিক প্রাধান্য বিলকুল বেকার প্রমাণিত হয়। এর বিপরীতে শত্রু সেনাপতির মানসিক ভারসাম্য যদি বজায় থাকে তাহলে তিনি প্রতিপক্ষের কূটচাল ও কূট-কৌশলের জবাব সাফল্যের সঙ্গে দিতে পারেন।

প্রতিরক্ষা কৌশলের দ্বিতীয় মূলনীতি যা আঁ-হযরত (সা) শিক্ষা দিয়েছেন তাহ'ল আকস্মিক হামলা। তিনি যখন মদীনা থেকে বের হন তখন দুশমনের গুপ্তচরেরা মনে করে যে. তিনি কাফেলা লুট করতে চলেছেন। সফরের প্রাথমিক পর্যায়ে গতিও সেদিকেই ছিল। কিন্তু এরপর তিনি এমন জটিল ও দুরতিক্রম্য রাস্তা এখতিয়ার করেন যে, দুশমন তাঁর চলাফেরা ও গতিবিধির উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। আঁ-হযরত (সা)-এর দূরদর্শিতা আঁচ করে নিয়েছিল যে, দুশমন স্বীয় কাফেলার হেফাজত ও নিরাপত্তা বিধানে সৈন্যদল নিয়ে আসবে। এজন্য তাদের শক্তি ভেঙে দিতে এবং তাদের অহমিকা খর্ব করার জন্য তিনি ফৌজী চাল ও সামরিক কৌশল দ্বারা তাদের বাহিনীকে এমন এক জায়গায় নিয়ে আসেন যেখানে সকল শক্তি সহযোগে আঘাত হানা সহজ ছিল। রসূল করীম (সা)-এর ফৌজী চাল সম্পর্কে দুশমন আদৌ জানতে পারেনি যে, তাঁর আসল উদ্দেশ্যটা কি। শত্রুকে এমনি ধোকা ও প্যাঁচ এবং এরূপ অজ্ঞতাবস্থার ভেতর নিক্ষেপ করাকে ফৌজী পরিভাষায় "সামরিক উদ্যোগ" (military initiative) বলে। এর অর্থ এই যে, দুশমন অজ্ঞতাবশত মজবুর অবস্থায় এমন চাল চালে যার কারণে শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই মৃত্যুর মুখে উপনীত হয়। কিন্তু সামরিক উদ্যোগ ও অগ্রভিযানের এই মওকা সেই সিপাহসালারের ভাগ্যেই জোটে যিনি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা অত্যন্ত সর্তকতা ও নেহায়েত হুশিয়ারীর সঙ্গে তৈরী করেন এবং তাকে সফল করে তুলবার জন্য দূরদশিতা, সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ় মনোবলের সাহায্যে কাজ করে থাকেন। অন্য কথায় বলা যায় যে, যুদ্ধারম্ভের সময় উদ্যোগ গ্রহণ ও অগ্রাভিযান শুধু সেই অধিনায়কই করতে পারেন যিনি যুদ্ধের জন্য সর্বপ্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিয়েছেন এবং বিজয় সেই ভাগ্যবানেরই কদমবুসী করে যিনি যুদ্ধে দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে স্বীয় পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে পারেন। তিনি শুধু সামরিক উদ্যোগ ও অগ্রাভিযানের দ্বারা অর্জিত প্রাধান্য হস্তচ্যুত হতে দেন না তাই নয়, এ থেকে তিনি পুরোপুরি ফায়দাও হাসিল করেন।

সামরিক উদ্যোগ ও অগ্রাভিযান (Initative) এমনই একটা অস্ত্র যা দ্বারা সিপাহসালার শত্রুর উপর মর্জি মাফিক হামলা করতে পারেন এবং তাদেরকে বিভ্রান্তির শিকার বানাতে পারেন। প্রতিদ্বন্দ্বী বা প্রতিপক্ষ এই দোদুল্যমানতার মধ্যে দুলতে থাকে যে, আল্লাহ্ জানেন, আক্রমণ কখন

কোন্ দিক দিয়ে আসবে এবং কিরূপ শক্তিতে তা দেখা দেবে। ফলে তারা প্রতিরোধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে পারে না। তারা যে অবস্থায় থাকুক না কেন তাদের হামলাও মুকাবিলা করতে হয় এবং যে পর্যন্ত সাহায্যকারী বাহিনী গিয়ে পৌঁছে ততক্ষণে সাধারণত যুদ্ধের ফয়সালা হয়ে যায়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সামরিক উদ্যোগ ও অগ্রাভিযান নীতি অবলম্বনকারী অনিবার্যভাবেই সফল হয়ে থাকেন। যদি তিনি তার প্রয়োজন মাফিক যথাযথভাবে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে না পারেন তবে প্রতিপক্ষ তার উপর কার্যকর হামলা করতে পারে। কেননা এমতাবস্থায় তারা জেনে ফেলে যে, শত্রু সেনাপতির ফৌজী চাল ও কূট-কৌশল কী।

আঁ-হযরত (সা)-এর কামিয়াবী ও সাফল্যের একটি বড় কারণ এও ছিল যে, তিনি শত্রু বাহিনীকে এমন একটি ময়দানে নিয়ে আসেন, সমর-শাস্ত্রের দিক দিয়ে যা তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ মাফিক ছিল না। তাদের সওয়ার বাহিনী একেবারে বেকার হয়ে পড়ে যার কারণে তাদের শক্তি যায় কমে। পানি না পাওয়ায় আঁ-হযরত (সা)-এর ফৌজী চাল মুতাবিক দুশমন বাধ্য হয়ে নিজেরাই মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা করে। তারা সাহায্যের জন্যে ফৌজের কোন অংশই আলাদা রাখে নি। ফলে আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশে যখন মুসলিম বাহিনী আক্রমণ করল তখন কুরায়শদের পদমূল উপড়ে গেল এবং মৃত ও আহতদের ময়দানে ফেলে পালিয়ে গেল।

যদি যুদ্ধে শত্রুর পরাজয় ঘটে তবে সেক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হ'ল এই যে, পরাজয়কে পরিপূর্ণতা দানের জন্য শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে যেন তাদের অবশিষ্ট শক্তিটুকুও নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) এই মূলনীতির উপর আমল করেন নি। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেন তিনি তা করলেন না। তিনি বদরে তিন দিন পর্যন্ত অবস্থান করলেন এবং ছোট্ট একটা প্লাটুন দুশমনের পশ্চাতে রওয়ানা করালেন। কিন্তু তাও শুধু এজন্য যে, যদি তারা পুনরায় ফিরে আসে কিংবা অন্য কোন রাস্তা এখতিয়ার করে তাহলে সে সম্পর্কে তারা আঁ-হযরত (সা)-কে অবহিত করবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, শত্রুকে পশ্চাদ্ধাবন করে তার শক্তি একেবারে খতম করে দেওয়া এবং তাদের উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য তিনি ফৌজ পাঠান নি। এর জবাব এতদ্ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না যে, তার নিকট সওয়ার তথা আরোহী ফৌজ মাত্র কয়েকজনই ছিল। উট এতই কম ছিল

যে, বদর পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য কয়েকজনের ভাগ্যে একটা করে উটমাত্র পড়েছিল। যদি তিনি পদাতিক দলকে পাঠিয়ে দিতেন তবে এর খুবই আশংকা ছিল যে, পরাজিত ও পর্যুদস্ত কুরায়শ বাহিনী পাল্টা আঘাত হানত এবং তাদের ধ্বংস ও বরবাদ করে দিত। অতএব আঁ-হযরত (সা) অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করেন। তিনি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের উপর হামলা করেন নি বরং নিজের শক্তিকে সংহত রাখেন। ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি নজীর মেলে। উদাহরণত, সালাহ্ উদ্দীন আইয়ূবীর আরোহী বাহিনীর হাতে ক্রুসেড নাইটদের ভয়াবহ পরিণতি দেখুন। সালাহ্উদ্দীন আইয়ূবীর সওয়ার বাহিনী ক্রুসেড নাইটদের বহু দূরে টেনে নিয়ে যায়। আরোহীরাও ছিল হালক পাতলা আর ক্রুসেড নাইটগণ আপাদমস্তক লৌহ বর্মে আচ্ছাদিত থাকায় তারা ছিল বেশ ভারী। অতএব মওকা মিলতেই মুসলিম অরোহী বাহিনী তাদের উপর পাল্টা আঘাত হানে। ক্রুসেডের পদাতিক বাহিনীর অবস্থা তখন অত্যন্ত নাযুক। খুব সহজ ও হাল্কাভাবে চলাফেরা করতে পারছিল না তারা। মুসলিম সওয়ার বাহিনী প্রথম তাদেরকে তীরের লক্ষ্যে পরিণত করে। অতঃপর বল্লম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের খতম করে দেয়। অবশিষ্ট ক্রুসেডারগণ যখন ফিরে এল তখন তারা পরাজিত এবং মুসলিম বাহিনী বিজয়ী। ওরা আসতেই তারা ক্রুসেডারদের হাতে হাতে সাফ করে দেয় এবং এভাবেই ত্রিত্ববাদীদের এই বিরাট লোক-লশ্কর হিত্তীন নামক স্থানে কচুকাটা ক'রে ইসলামী রাষ্ট্রকে পাক ও পবিত্র করা হয়।

যুদ্ধের পর বদরে অবস্থানের উপকারিতা পরিষ্কার হয়ে যাবার পরও এ প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, আঁ-হযরত (সা) মুশরিক কয়েদীদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ ও কোমল ব্যবহার কেন করলেন? এর জবাব স্বাভাবিকভাবেই এই হবে যে, তিনি উত্তম ও আদর্শ চরিত্রের নমুনা ছিলেন।

যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে রহমদিল ও ভদ্রতাপূর্ণ আচরণের বুনিয়াদ তিনিই রাখেন। এটাও তাঁর সর্বোত্তম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। গোটা বিশ্ব সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতির পরেও আজও এ ব্যাপারে সংকীর্ণ দৃষ্টি, পক্ষপাত ও অজ্ঞতার সেই গভীর আঁধারেই আছে যেখানে ছিল কয়েক শতাব্দীকাল আগে। ইসলাম এবং ইসলামের প্রাণপুরুষ (সা) একে দূরীভূত করার জন্যই

এসেছিলেন, তাকে চিরদিনের তবে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আসেন নি।

যদি সিপাহীদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, দুশমন তাকে জীবিত ছেড়ে দেবে না, তাহলে তারা জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত লড়তে বাধ্য হয় যাতে দুশমনের হাত কতল হবার আগে কাউকে মেরে মরতে পারে। যদি কোন ফৌজের ভেতর আত্মোৎসর্গের প্রেরণা কম থাকে অথবা শৃংখলাবোধ দুর্বল থাকে এবং তারা যদি জানতে পারে যে, দুশমন তাদের সঙ্গে জোর-যবরদস্তি নয়, নরম ও কোমলতাপূর্ণ ব্যবহার করবে তবে তারা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি নিয়ে লড়ে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কয়েকজন ইটালীয় সৈন্য লড়াই ব্যতিরেকেই মিত্র বাহিনীর সামনে হাতিয়ার ফেলে দিয়ে যুদ্ধবন্দী হিসাবে ধরা দেয়। তাদের উক্তি ছিল—জীবনে বাঁচলে সব কিছু পাওয়া যাবে। নিজেদের নিরাপত্তাই ছিল তাদের নিকট সবচেয়ে প্রিয়।

যা-ই হোক, বদর যুদ্ধের সকল ঘটনা ও নির্দশন এ কথার অকাট্য প্রমাণ দেয় যে, যুদ্ধের সাফল্য ও কামিয়াবী নির্ভর করে আক্রমণকারীদের পজিশনের উপর। এর অর্থ এই যে, প্রতিরক্ষার সর্বোত্তম ও সঠিক তরীকা হ'ল, যুদ্ধে প্রথমে শত্রুর উপর অগ্রবর্তিতা অর্জন করতে হবে। অতঃপর এর থেকে পরিপূর্ণ ফায়দা হাসিল করে তাদের উপর ব্যাপক ও সার্বিক আঘাত হানতে হবে, যেন তারা আর তা সামলে না উঠতে পারে। যুদ্ধক্ষেত্রে এই অগ্রবর্তিতা ও অতর্কিত হামলা তখনই সম্ভব হতে পারে যখন প্রতিরক্ষা কৌশলের পরিকল্পনায় সমরশাস্ত্রের মূলনীতিকে সম্মুখে রেখে কাজ করা যায়। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরীর সময় সর্বাপেক্ষা জরুরী কাজ হ'ল, দেশের সকল সম্পদ ও উপকরণ প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ওয়াক্ফ করতে হবে। অতঃপর এটা দেখতে হবে যে, তা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কত সৈন্যের প্রয়োজন হবে, কি পরিমাণ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সিপাহসালারের হাতে থাকবে আর কি পরিমাণ দেশের ভিতরে রাখা নিরাপদ হবে, কোন্ সমরক্ষেত্র নিজেদের অবস্থা মাফিক হবে এবং স্বীয় ফৌজের সমর ও মারণাস্ত্র এবং আহার্য দ্রব্যের কিভাবে সংস্থান করা যাবে। অনুরূপ সিপাহসালারের স্বীয় শক্তির সঠিক পরিমাপ করারও মওকা থাকা দরকার। অপর দিকে এটাও

দেখা দরকার যে, দুশমনের শক্তি ও উপায়-উপকরণ কী আছে। এসব অবস্থা সম্পর্কে তার সঠিকভাবে ওয়াকিফহাল থাকা অবশ্যক। আঁ-হযরত (সা) যুদ্ধের পূর্বে বদর নামক স্থানটি কয়েকবার দেখেছিলেন এবং মুসলিম বাহিনী সেখানে চলাফেরাও করেছিল।

এ থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় উল্লিখিত বিষয়সমূহের গুরুত্ব কত বিরাট এবং তার পরিপূর্ণতা সাধন ও আঞ্জাম দেওয়া লক্ষ্য হাসিলের জন্য কী পরিমাণ জরুরী!

এসব ছাড়াও প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় যতগুলো বিষয় বিবেচনা করে দেখা হয় সেগুলো এই যে, প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী কত বিষয়ে আমাদের তুলনায় এগিয়ে আছে, কত বিষয়ে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী এবং আমরা সে সবের কিভাবে এবং কোন্ পন্থায় মুকাবিলা করতে পারি, আমাদের প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ ব্যাপারে এবং তা কী ভাবে সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে?

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও পরিকল্পনা সহজ হওয়া আবশ্যক যেন তা অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী অধিকতর কল্যাণকর ও ফলপ্রসূ করা যায়।

বদর যুদ্ধের পর

কায়নুকা'র লড়াই

যে দিনগুলোতে মুসলিম বাহিনী বদরের লড়াইয়ে লিপ্ত ছিল, মদীনার য়াহূদীরা সে সময় নিজেদের ঘৃণ্য স্বভাবের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছিল। তাদের ধারণা ছিল, মুসলমানদের তুলনায় আবু জেহেলের বাহিনী বিশাল, অতএব তারাই কামিয়াব হবে। সেজন্য মুসলমানদের সঙ্গে মুনাফিকী এবং কুরায়শদের খয়েরখাঁগিরির জযবায় তারা দারুণ ধ্বংসাত্মক কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে, যদ্দ্বারা মুশরিকদের বিজয় লাভের ক্ষেত্রে তারা যেন বলতে পারেঃ আমরা তো তোমাদের হিতাকাংক্ষী। মুসলমানদের সঙ্গে হৃদ্যতা এবং আশ্রয় ও নিরাপত্তা চুক্তি শুধু অভিনয় বৈ কিছু নয়।

অতএব তারা আঁ-হযরত (সা) এবং মুসলিম বাহিনীর অনুপস্থিতিতে ঠিক জিহাদের মুহূর্তে অলিগলি ও বাজারে একাকী ও নিঃসঙ্গ চলাচলকারী মুসলিম মহিলাদের উত্যক্ত করা শুরু করে; এমন কি একজন য়াহূদী কোন এক মহিলার প্রতি হাত বাড়াবারও প্রয়াস পায়। তাতে মুসলমানেরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং তারা তাকে হত্যা করে। এর ফলে মুসলমান এবং য়াহূদীদের মাধ্য ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

আঁ-হযরত (সা) বদর থেকে প্রত্যাবর্তন করে য়াহূদীদের নিকট চুক্তি ভঙ্গের জন্য কৈফিয়ত তলব করেন। কিন্তু বনী কায়নুকা', দুষ্ট বুদ্ধিতে যারা ছিল সব সময় অগ্রগামী, অত্যন্ত অভদ্রোচিত জবাব দেয় এই বলেঃ মক্কাবাসীদের উপর জয়লাভ করে আপনি অহংকার করছেন। আমাদের সঙ্গে লাগলে বুঝতে পারবেন, যুদ্ধ কাকে বলে। এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তারা চুক্তিপত্র রসূলুল্লাহ (সা)-এর সম্মুখেই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

আঁ-হযরত (সা) এই বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের হুকুম দেন। তাদের ঘেরাও করা হয়। পনের রাত্রি অবরোধের পর মজবুর হয়ে অবশেষে তারা সন্ধির দরখাস্ত পেশ করে। আঁ-হযরত (সা) এই শর্তের উপর সন্ধি করেন যে, বনী কায়নুকা' মদীনা থেকে বেরিয়ে যাবে এবং অস্ত্রশস্ত্র ও কৃষি যন্ত্রপাতি মুসলমানদের নিকট হস্তান্তর করবে। অতঃপর অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হয়। বনী কায়নুকা' মদীনা থেকে বেরিয়ে খায়-বরে চলে যায়। এই লড়াইয়ে যে মালে গনীমত হস্তগত হয় তার মধ্য থেকে প্রথমবার রসূল (সা) নিজের অংশ নেন। এটাই তাঁর গৃহীত সর্ব-প্রথম এক-পঞ্চমাংশ মালে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি)।

আবু সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবন

বদর যুদ্ধে কুরায়শ বাহিনীকে যে অবমাননাকর পরাজয়ের সম্মুখীন হতে হয় তা কুরায়শ নেতৃবর্গের শক্তি ও প্রভাব বহুল পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করে এবং এই কারণে তারা বদরের নিহতদের জন্য শোক পালন করতে নিষেধ করে দেয়। আবু সুফিয়ান মক্কা ফিরে এসে নিজেদের নিহত আত্মীয়-

স্বজনের শোক পালন করতে নিষেধ করেন। তিনি একথা ঘোষণা করেন ঃ যতদিন পর্যন্ত নিজেদের ভাইদের বদলা নিতে না পারব, নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকব না এবং আরাম ও বিলাসিতার সকল বস্তুই আমার জন্য নিষিদ্ধ থাকবে।

এই শপথ বাস্তবায়িত করবার জন্য তিনি দু'শ উষ্ট্রারোহী নিয়ে মুসলিম এলাকায় লুটতরাজ করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তার ধারণা ছিল, মুসলমানদের পর্যাপ্ত সংখ্যক সওয়ার ফৌজ নেই। তাই তারা লুটমার হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ফিরে আসতে পারবেন।

অতঃপর সাধারণ ও প্রচলিত নিয়মের খেলাফ তিনি নজদ-এর রাস্তা ধরে মদীনা থেকে আনুমানিক এক মন্‌যিল দূরে অবস্থিত কোহে তিব্বতের উপর কানাত নামক শৃঙ্গে পৌঁছে উষ্ট্রারোহিগণসহ অবস্থান নেন এবং রাতের বেলায় গোপনে মদীনায় যান। সেখানে দুজন গোত্র সরদারের সাথে সাক্ষাত করে এবং অবস্থা অবহিত হয়ে শিবিরে ফিরে আসেন। এরপর তিনি কয়েকটি কবিলাকে আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেবার প্রয়াস চালান। কিন্তু এতে তিনি কামিয়াব হননি।

দ্বিতীয় দিন তিনি কয়েকজন লোককে মদীনার দিকে পাঠিয়ে দেন। মদীনা থেকে আনুমানিক তিন মাইল দূরে দু'জন মুসলমান কৃষিকাজ করছিল। তারা তাদের হত্যা করে এবং তাদের খেজুর বাগানে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যায়।

আঁ-হযরত (সা) এ ঘটনার খবর পেয়েই দুশমনের পশ্চাদ্ধাবনে বেরিয়ে পড়েন এবং কারকারাহ আল্‌-কদর পর্যন্ত আসেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান পালিয়ে যান এবং তড়িঘড়ি পালাতে গিয়ে ছাতুর বস্তা ফেলে যেতে বাধ্য হন।

কারকারাহ আল্‌-কদর মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত—এখানে য়াহূদীরা বসবাস করত। আঁ-হযরত (সা)-এর লোক-লশ্‌কর আসায় তারা কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু ফৌজের শক্তি দেখে চুপ থাকে। আঁ-হযরত (সা) এরপর মদীনায় তশরীফ নিয়ে আসেন।

নজদের রাস্তা অবরোধ

আবু সুফিয়ানের পশ্চাদ্ধাবনের কিছু দিন পর রবি'উ'ল-আওয়াল মাসে নজ্দ-এর পার্শ্ববর্তী কবিলা বনী ছা'লাবা শয়তানী শুরু করে এবং মদীনায় লুটতরাজ করে সেখানকার সকল ব্যবস্থাপনা ভেঙে-চুরে তছনছ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে।

আঁ-হযরত (সা) এ খবর পেয়ে সাড়ে চারশ' মুজাহিদ নিয়ে তাদের উপর আকস্মিক হামলা করেন। অতর্কিত হামলায় তারা অত্যন্ত ব্যাকুল ও স্তম্ভিত হয়ে পড়ে এবং নিজেদের এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের সর্দার আশুর লুকিয়ে থাকে। সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল। মুজাহিদ বাহিনী নিজেদের পরিধেয় কাপড়-চোপড় শুকাচ্ছিলেন। আশুর আঁ-হযরত (সা)-কে কতল করাবার মানসে বের হয়। এ সময় আঁ-হযরত (সা) বিশ্রাম করছিলেন। তিনি জেগে ওঠেন। তাঁর যবানীর ধ্বনিতে দুশমনের হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যায়। আশুর জীবন বাঁচাবার জন্য সে সময় ইসলাম গ্রহণের ভান করে। পরে সে সেখানে থেকে পালিয়ে যায়। ঐদিনগুলোতেই বনী গৎফান শয়তানী ও বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) পৌঁছুতেই সন্ধি করে নীরব হয়ে যায়। এসব অভিযানে তিনি নজ্দ থেকে আসার রাস্তাসমূহ এবং তার আশেপাশের এলাকাগুলো বেশ ভাল করে দেখেন এবং এই সঙ্গে এও পরিমাপ করেন যে, (ক) কতগুলো গোত্র যুদ্ধ-মুহূর্তে মিত্র অথবা প্রতিপক্ষ হতে পারে; (খ) এলাকার প্রাকৃতিক অবস্থা হামলাকারীদের অনুকূল, না প্রতিকূল; (গ) আক্রমণকারীদের কোন্ জায়গায় প্রতিরোধ করা উচিত ইত্যাদি।

বস্তুত তিনি অধিনায়ক হিসেবে নজদের পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো ব্যাপকভাবে ঘুরে ফিরে দেখেন। এ দিকে আবু সুফিয়ান এবং মক্কাবাসীরা উপকূল ও বদরের পুরোনো রাস্তা পরিত্যাগ করে ইরাক ও নজ্দ হয়ে সিরিয়া যাওয়া শুরু করে। আঁ-হযরত (সা) আগে থেকেই জানতেন যে, তারা মুসলমানদের প্রতিরোধের ভয়ে এ রাস্তাই এখতিয়ার করবে। অতএব তিনি এখন এ রাস্তা অবরোধের ব্যবস্থা করেন।

তিনি যায়দ ইবনে হারিছার অধীনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য পণ্যবাহী কাফেলা লুট করার জন্য হুযূর যায়দকে

নির্দেশ প্রদান করেন। আবু সুফিয়ান স্বয়ং উক্ত কাফেলার সঙ্গেই ছিলেন। তিনি উক্ত এলাকার সর্দার বকর বিন ওয়াইলের নিযুক্ত পথ-প্রর্দশক ফুরাত ইব্‌ন হাইয়ানকে পথ প্রদর্শন ও হেফাজতের জন্য সঙ্গে নিয়েছিলেন। মক্‌কা-বাসী উল্লিখিত কবিলার এই খিদমতের প্রতিদানে একটি বিরাট অংকের অর্থ দেবার ওয়াদা করেছিল। আবু সুফিয়ানের ধারণা ছিল যে, শীত মৌসুমে এই দুরতিক্রম্য রাস্তা পানির স্বল্পতা সত্ত্বেও অতিক্রম করা যেতে পারে।

ফুরাত ইবন হাইয়ান কাফেলাকে ইরাকের পথে গামরাহ নামক স্থানে নিয়ে উপনীত হয়। কাফেলা 'কারওয়া' নামক ঝর্ণাধারার নিকট পৌঁছুলে মুজাহিদ বাহিনী তাদেরকে ঘিরে ফেলে। হাইয়ান কবিলার বহু লোক পালিয়ে যায়। আবু সুফিয়ানও পলাতক হন। কিন্তু ফুরাত ইব্‌ন হাইয়ান গ্রেফতার হয়। মুসলমানদের হাতে মালে গনীমত হিসাবে একলাখ দিরহাম মূল্যের রৌপ্য আসে। ফুরাত ইব্‌ন হাইয়ান ঈমান আনে। ফলে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

এই ঘটনার ফলে মক্‌কাবাসীদের ভীতি সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। তারা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল যে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য খতম হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাদের সামনে দু'টো বিকল্পই কেবল খোলা ছিলঃ হয় তারা পরাজয় স্বীকার করে নেবে নতুবা আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে যুদ্ধের মাধ্যমে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করবে।

পরাজয় স্বীকার করা ছিল অসম্ভব। কেননা ধনদৌলত, প্রভাব-প্রতি-পত্তি এবং শক্তির অহমিকা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। অতএব য়াহূদীদের পরামর্শক্রমে তারা বিরোধিতার সহজ পরিকল্পনা তৈরী করে। আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা জোরদার করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাকায়দা যুদ্ধের পরিণতি আসে মিথ্যাচার ও পঙ্কিল ষড়যন্ত্র এবং কুৎসা ও অপবাদ ছড়ানোর মাধ্যমে তাঁর সম্মান ও মর্যাদা খর্ব করা এবং সম্ভব হলে আঁ-হযরত (সা)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়।

প্রথমোল্লেখিত পরিকল্পনার বাস্তবায়নে কুরায়শরা বিশিষ্ট কবিদের সমর্থন পারিশ্রমিকের মাধ্যমে হাসিল করে যাতে কাব্যের সাহায্যে মানুষের মন আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা যায়। কবিদের মধ্যে

কা'ব বিন আশরাফ ছিল উল্লেখযোগ্য। মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সে থাকত। প্রথমে মক্কা গমন করে এবং মুত্তালিব বিন উবাইয়ের মেহমান হয়। মুত্তালিব তাকে বেশ খাতির যত্ন করে। সেখানে সে বিভিন্ন শিরোনামে কবিতা পড়ে মক্কাবাসীদের একেবারে ক্ষেপিয়ে তোলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কখনো সে বদরের নিহতদের স্মরণে মর্সিয়া গাইত, আবার কখনো আঁ-হযরত (সা)-এর উপর নিন্দা ও অপবাদ প্রয়োগ এবং কুৎসা ও গালাগালি করত। মুসলমানরা তার এই ঘৃণ্য অপকর্মের কারণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। সে এ ধরনের কবিতা মদীনায় এসেও আবৃত্তি করে। অন্তর-মন আহত ও বেদনাহতের এ সিলসিলা খতম করতে এবং আঁ-হযরত (সা)-এর পবিত্র সত্তাকে এ-জাতীয় নাপাক হামলা থেকে নিরাপদ ও মুক্ত রাখার স্বার্থে মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) এবং অপরাপর সাহাবীরা রসূল (সা)-এর নিকট তাকে হত্যার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি তাদের অনুমতি প্রদান করেন। তাদের সঙ্গে আবূ নায়েলাও ছিলেন। একদিন তাঁরা রাতের বেলায় কা'বের সঙ্গে সাক্ষাত করতে যান এবং তার দুর্গে আগমনী সংবাদ (দস্তক) প্রদান করেন। আবূ নায়েলার আওয়াজ শুনে কা'ব নীচে নেমে আসে। দু'জনেই উপবেশন করে এবং একে অপরকে কবিতা শোনাতে থাকে। এরপর আবূ নায়েলা তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে তাকে দুর্গ থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে আসেন যেখানে মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা ও অন্য সব মুসলমান অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা কা'বকে দেখামাত্রই শেষ করে দেন।

য়াহূদী আবূ রাফে'ও সে সমস্ত লোকের অন্তর্গত ছিল যারা কটুভাষী হওয়া ভিন্ন মালদার আদমীও ছিল। আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াতে এবং জনগণকে গোমরাহ করতে সে অগ্রগামী থাকত। সাধারণভাবে তার পদ্ধতি ছিল এই যে, সে লোকজনকে রাতের বেলায় নিজের দুর্গে জড়ো করত এবং মনগড়া কিস্‌সা-কাহিনী ফেঁদে আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করত।

তাকে খতম করার উদ্দেশ্য 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উকবা ও কতিপয় আনসার সংকল্প নেন। একদিন তাঁরা সবাই মিলে অন্য লোকজনের সঙ্গে মিশে আবূ রাফে'এর বাড়ীতে প্রবেশ করেন এবং সেখানে পৌঁছে তাকে হত্যা করে ফেলেন।

সালাম বিন আবি'ল-হাকীকও দুশমনের উক্ত গ্রুপের সঙ্গেই জড়িত ছিল। তাকে কতল করার অনুমতি খাযরাজ গোত্রের আনসার মুজাহিদরা লাভ করেন। তার ব্যাপারটার নিষ্পত্তিও বেশ সুন্দরভাবেই ঘটে।

এভাবে কুরায়শদের এই পরিকল্পনা এবং এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ-দানকারী ব্যক্তিবর্গকে খতম করে দেওয়া হয় এবং এমনি উপায়ে খতম করা হয় যার পরিপূর্ণ রূপদান ও পরিকল্পনা প্রণয়নের যাবতীয় কৃতিত্ব বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানী, গুণী ও প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মাথায় তুলে দেওয়া হয়। আমাদের এ কথার অর্থ জানবায প্লাটুন (Commando), গুপ্তচরবৃত্তি বা গোয়েন্দা সার্ভিস (Intelligence Service), পঞ্চম বাহিনী (fifth Column) ইত্যাদি। আমরা এ সবকে এ যুগের বিশেষ ক'রে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবিষ্কার বলে মনে করি। অথচ এসব নতুন কিছু নয়। আঁ-হযরত (সা) এ সবেরই সাহায্য নিয়েছিলেন এবং মুজাহিদীনে ইসলামকে এগুলোর মধ্যকার সব ক'টি বিষয়েরই প্রশিক্ষণ দান করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে এতটুকু বলা জরুরী যে, যদি ১৯৩৯---৪৫ সনের যুদ্ধের উভয় পক্ষ এসব রণ-কৌশলের প্রয়োগ না ঘটাতো তবে যুদ্ধের ফলাফল ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অন্য কিছু হ'ত। এগুলোই জাতিসংঘ ফৌজকে কোরিয়ায় যুদ্ধে লিপ্ত রেখেছিল। এরই সাহায্যে মাও-সে-তুং চীনকে স্বাধীন করেছেন এবং এগুলো ব্যবহারের মধ্যেই অন্যদের কল্যাণ ও সাফল্যের গোপন রহস্য লুক্কায়িত। অবশ্য এ পদ্ধতি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করার মধ্যে আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রেরণা ও আবেগ সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হয়। ইয্যত ও আযাদীকে যে সব রাষ্ট্র সবচেয়ে বেশী ভালবাসে তাদেরকে এ সব ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। যে হুকূমত জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে এবং যেখানে পারস্পরিক আস্থা ও নির্ভরশীলতা, খেদমত ও একনিষ্ঠতার সম্পর্ক কায়েম থাকে—সেখানে একদিকে হুকূমত শান্তিকালীন সময়ে পরিকল্পনা তৈরী করে স্বীয় সক্ষম লোকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে, অপর দিকে জনসাধারণকে আস্থাশীল বানিয়ে রাষ্ট্রীয় আযাদী ও সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন স্থানে অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির গোপন ভাণ্ডার গড়ে তোলে যেন যুদ্ধের সময়ে উক্ত পরিকল্পনাকে সুন্দর ও সুচারুরূপে বাস্তবায়িত করা যায়। জার্মানী ১৯৪০ ঈসায়ীতে এই অস্ত্রকে তৈরীকৃত পরিকল্পনা মুতাবিক অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যবহার করেছিল এবং ফ্রান্সকে দেখতে না দেখতে মিত্রবাহিনী-মুক্ত করেছিল।

রাশিয়া এ অস্ত্রকেই জার্মানীর বিরুদ্ধে নতুন পন্থায় ব্যবহার করে। তারা শুধু মস্কো ও স্টালিনগ্রাড থেকেই জার্মানদের বের করে দেয়নি, বরং তাদের শক্তিকেও একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছিল। মিত্র বাহিনীও জার্মানীর বিরুদ্ধে য়ূরোপে এই অস্ত্রই ব্যবহার করেছিল এবং নাজীবাদের মূলোৎ-পাটন করে বিজয় লাভ করেছিল। একেই মাও-সে-তুঙ চীনে নবতরভাবে জন্ম দিয়ে প্রথমে চীন থেকে আমেরিকার দখল ও প্রভাব খতম করেন এবং এখন কোরিয়া একেই নতুন ঢঙে ও আবরণে ঢেলে সাজিয়ে সম্মিলিত বাহি-নীর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দিচ্ছে।[১] কেউ বলতে পারে না স্রোত কার অনুকূলে প্রবাহিত হবে।

এই সব ঘটনা থেকে জানা যায় যে, রাশিয়া ও চীনের গেরিলা ফৌজ যাদের 'গণবাহিনী' বলা হয়—তাদের সূচনা কিভাবে হয়েছিল। প্রথমে কমাণ্ডো বাহিনী এবং গোয়েন্দা বাহিনীকে কাজে লাগানো হয়। আঁ-হযরত (সা) এই দুইটি বাহিনীকেই পুরোপুরি কাজে লাগান। তাতারী নেতা চেঙ্গীয খান এতে কিছুটা রদবদল করেন এবং সম্ভবত এজন্য যে, তার যুদ্ধ ছিল বিশ্বব্যাপী ধরনের। চেঙ্গীয ইরান প্রভৃতি দেশ জয় করার জন্য মুহাম্মদ শাহ্‌র দেশের সমরখন্দ ও বোখারা প্রভৃতি বড় বড় শহরে পঞ্চম বাহিনী প্রেরণ করেন যারা কমাণ্ডো ও গোয়েন্দা বাহিনীর অতিরিক্ত ছিল। জার্মানী পঞ্চম বাহিনীর ব্যাপক ব্যবহার করে। রাশিয়া দেশের প্রতিরক্ষার জন্য গণবাহিনী গঠন করে। এই অস্ত্রকে বর্তমানে অনেক দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রয়োগ করছে। সুতরাং প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে আঁ-হযরত (সা)-এর কর্মাদর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে কিভাবে এর সদ্ব্যবহার করা যায়, এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করা দরকার।

ওহুদ যুদ্ধ

মদীনার অভ্যন্তরীণ অবস্থা

নবী করীম (সা)-এর যুগে মদীনার আবাদী (জনবসতি) বর্তমান

১. গ্রন্থকার যে সময় এই গ্রন্থ রচনা করেন তখন কোরিয়ায় যুদ্ধ চলছিল। আর যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফলাফল উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া নামে কোরিয়ার দ্বিধা-বিভক্তি। —অনুবাদক।

কালের আবাদী অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। সে সময় বর্তমানের আলীশান ঘর-বাড়ী যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না ঘনবসতিপূর্ণ মহল্লাও। বিভিন্ন মযহাব ও ধর্মের লোকজন একে অপরের থেকে এক দুই ফার্লং দূরত্বে ছোট ছোট বস্তিতে বসবাস করত। মদীনা ছিল কতকগুলো জনবসতির সমষ্টি মাত্র যার ভেতর মূর্তিপূজক, য়াহূদী ও মুসলমান সবাই বসবাস করত এবং মদীনার বিস্তৃতি ছিল প্রায় দশ মাইল লম্বা এবং দশ মাইল চওড়া। এর ময়দান ছিল চতুর্দিক দিয়ে পাহাড়-পর্বতবেষ্টিত। এর উত্তর চূড়াকে 'জাবালে ছওর' বা ছওর পর্বত বলা হয়। দক্ষিণে 'জাবালে আয়র' বা আয়র পর্বত। মদীনার গোটা আবাদী জাবালে ছওর থেকে জাবালে আয়র পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে।

আঁ-হযরত (সা) মদীনা আগমনের পূর্বে পাহাড়-ঘেরা এই ময়দানকে 'জওফ-এ মদীনা' বা মদীনার উদর বলা হ'ত। হিজরতের পর তিনি একে হারাম ঘোষণা করেন এবং তারপর থেকে তাকে 'হারাম-ই-মদীনা' বলা হতে থাকে। ময়দানের চতুর্দিকে পরস্পর সংলগ্ন বুলন্দ পর্বত শ্রেণী বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে যার কারণে আগমন-নির্গমনের রাস্তা সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে।

হারাম-ই-মদীনার ময়দানও সমতল নয়; বরং সেখানেও জায়গায় জায়গায় ছোট্ট ছোট্ট পাহাড় আছে। যুদ্ধের বেলায় আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে সে সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবিলাগুলোর বস্তিতে কাটা খালের সাহায্যে পানি সরবরাহ করা হয় অথবা নিকটস্থ উপত্যকাগুলোয় কুয়া খনন করা হয়। প্রতিটি বস্তিতে এক অথবা দু'টি পাথরের ঘর নির্মিত হ'ত। এ সব ঘরে যুদ্ধকালীন মুহূর্তে মহিলা ও শিশুরা আশ্রয় নিতে পারত। এ ধরনের আশ্রয় কেন্দ্রের রেওয়াজ আরব থেকে নিয়ে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছিল। সীমান্তের পাঠানদের মধ্যে এখনো তার প্রচলন রয়েছে। এগুলো অনেকটা মিনারসদৃশ হ'ত। এ সবের উপর চড়ে শত্রুর উপর গুলোলের সাহায্যে পাথর ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হ'ত। আরবে এ সব নিরাপদ স্থানকে 'আতাম' বলা হ'ত। যে কবিলার বস্তিতে আতাম-এর সংখ্যা যত বেশী হ'ত তাদেরকে তত বেশী শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ মনে করা হ'ত। 'আতাম'গুলো সাধারণত দোতলা নির্মিত হ'ত। আবার কোন কোন কবিলা তিনতলা চারতলাও নির্মাণ করত। মদীনার আশেপাশে লাভার কালো

পাথর অধিক পরিমাণেই পাওয়া যেত, সেজন্য আতামের নীচ তলা সাধারণত কালো পাথরের নির্মিত হ'ত। পাথর নির্মিত হবার কারণে দুশমন এতে আগুন লাগাতে পারে না। কবিলার বস্তিগুলো সাধারণভাবে উপত্যকার নিকটবর্তী হ'ত। এজন্য সহজেই পানি মিলে যেত। এই কারণেই বস্তির চতুষ্পার্শ্বেই বাগান হ'ত। আর এ সবের হেফাজতের জন্য পাথরের চার দেয়াল থাকত।

হিজরতের পর আঁ-হযরত (সা) যে বস্তিতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন তা ঐ সব বস্তিগুলোর মাঝখানে ছিল। নাম ছিল য়াছরিব এবং এ নামের কারণেই বস্তিগুলোকে সামগ্রিকভাবে য়াছরিব বলা হ'ত। বাগিচা ও ঘনবসতিপূর্ণ আবাদী এর পশ্চিমে, দক্ষিণে এবং উত্তর-পূর্বে অবস্থিত ছিল। পূর্ব দিক কোবা থেকে ওহুদের নিকট পর্যন্ত এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিক দিয়ে অধিকাংশই য়াহূদী বসবাস করত। তাদের মহল্লা ঘন এবং দূর অবধি ধারাবাহিকভাবে চলে গিয়েছিল।

য়াছরিবের উত্তর-পশ্চিমে 'বীর-ই-রুমা' পর্যন্ত আল-'আকীক উপত্যকার কিনারে বহু বাগিচা ছিল। বীর-ই-রুমার এই এলাকাও ছিল য়াহূদীদের অধিকারে। এলাকাটি ছিল খুবই উর্বর। ফলে এখানে সর্বপ্রকার ফলমূল ও তরিতরকারী অধিক পরিমাণেই উৎপন্ন হ'ত।

উত্তর এলাকা ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু উক্ত ময়দানের যমীন লবণাক্ত হবার কারণে সেখানে কৃষিকাজ করা সম্ভব হ'ত না। মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের উপর উক্ত রাস্তা দিয়ে হামলা চালাবার সিদ্ধান্ত নেয়। দক্ষিণ দিকের রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম গিরিপথের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। তারা তা ব্যবহার করে নি। সেখানে লাভার উৎক্ষিপ্ত প্রস্তর এভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে যে, কাফেলার লোকেরাও তা ব্যবহার করত না। পানির দুষ্প্রাপ্যতা এবং পাথর উত্তপ্ত হবার কারণে গরম অসহনীয় হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালে কাফেলা জাবালে 'আয়র-এর পশ্চিম থেকে আল-'আকীক-এর বালুকাময় রাস্তা বীর-ই-রুমার উত্তরে গাবার নিকবর্তী দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে কানাত উপত্যকায় আসত। সেখান থেকে বাতহা উপত্যকার বালুকাপূর্ণ নালা হয়ে মদীনায় প্রবেশ করত যাতে উটের পা জখম না হয়।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ওহুদ পর্বত মদীনার উত্তর-পূর্বে ও পশ্চিমে কয়েক মাইল অবধি বিস্তৃত এবং কানাত উপত্যকা তার পাদদেশে অবস্থিত। এই পাহাড় থেকে একটি মাত্র দুরতিক্রম্য পায়ে হাঁটার পথ জুতার আকৃতির উপত্যকা হয়ে এর সমুন্নত শৃঙ্গ পর্যন্ত চলে গেছে। এই উপত্যকা একটি সমতল ও সুউচ্চ ময়দান যেখানে দু'টি ঝর্ণাধারা প্রবহমান। এই উপত্যকায় একটি ছোট্ট পাহাড়ী টিলা আছে যাকে সম্ভবত উক্ত ঝর্ণাধারার কারণে 'জাবাল-ই-'আয়নায়ন' বলে। আঁ-হযরত (সা) এখানে তীরন্দায বাহিনী মোতায়েন করেছিলেন।

ওহুদ যুদ্ধের কারণ

বিগত অধ্যায়গুলোতে লেখা হয়েছে যে, হিজরতের পর আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল মক্কার কুরায়শদের গুরুতর সমস্যা ও সংকটের আবর্তে নিক্ষেপ করেছিল। একদিকে আর্থনৈতিক সংকট ও বাণিজ্যিক মন্দাভাব সৃষ্টি হচ্ছিল এবং চলাচলের রাস্তা হচ্ছিল বিপদজনক, অপরদিকে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার অহমিকা ধুলোয় মিশে যাচ্ছিল। বদর প্রান্তরে মুসলমানদের সঙ্গে শক্তি দেখাতে গিয়ে উলটো নিজেরাই পরাজিত হ'ল। দেখা গেল---সংঘর্ষ ও মুকাবিলার ক্ষেত্রেও তারা অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হ'ল। ফলে তাদের মধ্যে প্রতিশোধ-স্পৃহা আরো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তাদের অর্থ-সম্পদের অভাব ছিল না। তাৎক্ষণিকভাবেই আড়াই লক্ষ দিরহাম যুদ্ধ তহবিলে সংগৃহীত হয় এবং অনুরূপ অংকের দিরহাম সহযোগে বদর যুদ্ধের বন্দীদের ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। মক্কায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী তৈরী ছাড়াও কুরায়শ সর্দাররা নিজেদের নকীব ও প্রতিনিধি বিভিন্ন কবিলায় পাঠিয়ে তাদেরকেও মদীনার উপর হামলা করতে আহ্বান জানায়। এভাবে ইবনে হিশামের বর্ণনা মুতাবিক এক বছরের ভেতর তিন হাযার ফৌজের একটি দুর্ধর্ষ ও অমিততেজা বাহিনী খাড়া করা হয় যার মধ্যে সাত লৌহবর্মধারী এবং দু'শো অশ্বারোহী শামিল ছিল। মক্কাবাসীরা ইতিপূর্বে কোনদিন এত বড় বাহিনী চোখে দেখে নি। কুরায়শরা তাদের ক্রীতদাসদের এই লোভ দেখিয়ে সৈন্যবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল যে, যদি তারা বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে লড়তে পারে তবে বিনিময়ে তাদেরকে আযাদ করে

দেওয়া হবে। এসব ক্রীতদাসের ভেতর একজনের নাম ছিল ওয়াহ্‌শী। বর্শা নিক্ষেপে সে ছিল বড় উস্তাদ।

আঁ-হযরত (সা) কাফিরদের এই রণ-প্রস্তুতির ব্যাপারে একেবারে গাফিল ছিলেন না। তাঁর গুপ্তচরেরা তাঁকে আগাগোড়া কাফিরদের এই প্রস্তুতি সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমে অবহিত করে আসছিল। মুসলমানদের অবস্থা আল্লাহ্‌র ফযলে এবং আঁ-হযরত (সা)-এর দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণে বেশ ভাল হয়ে গিয়েছিল। কুরায়শ বাহিনীর সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর বদর যুদ্ধের নিহতদের বিধবা স্ত্রী ও নিকট-আত্মীয়দের নিয়ে অধিকন্তু বড় বড় সর্দারের স্ত্রীদের নিয়ে তারা রওয়ানা হয় যেন তারা উত্তে-জনাকর রণসংগীত গেয়ে যোদ্ধাদের মরণপণ সংগ্রামে ও শৌর্য-বীর্য প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কুরায়শ বাহিনী এ সফর বারো দিনে অতিক্রম করে এবং কঠিন ও বিপদসংকুল পথ পাড়ি দিয়ে জঙ্গলের নিকট ছাউনী স্থাপন করে। উদ্দেশ্য, ঘাস-পানি খেয়ে উট ও ঘোড়াগুলো যেন সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারে। এখানে ঘাস-পানি অধিক পরিমাণেই পাওয়া যেত। এখানে থেকে রওয়ানা হয়ে কাফির বাহিনী রুমাত পাহাড়ের নিকট গিয়ে শিবির স্থাপন করে।

আঁ-হযরত (সা)-এর গুপ্তচর বাহিনী কুরায়শ সৈন্যদলের চলাচল ও গতিবিধি সম্পর্কে বরাবর তাঁকে সংবাদ দিচ্ছিল। এসব সংবাদের ভিত্তিতে তিনি প্রতিরোধের সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। সৈন্যদল যখন যুল-হুলা-য়ফা নামক স্থানে পৌঁছে সে সময় জানবায মুসলিম প্লাটুন গোয়েন্দাগিরির উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে মিশে যায়। আঁ-হযরত (সা)-কে জরুরী ও প্রয়ো-জনীয় সংবাদ সময়মত পৌঁছানই ছিল তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কাফির বাহিনী ওহুদ পাহাড়ের নিকটে এসে হাযির হলে আঁ-হযরত (সা) সাহাবীদের সঙ্গে পরামর্শ বৈঠকে বসেন। 'আব্দুল্লাহ বিন উবায়্য ইবনে সলুল রসূল করীম (সা)-কে মুজাহিদ বাহিনীসহ মদীনার বাইরে লড়াই করার পরামর্শ দেয় এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্যকে এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে পেশ করে। আঁ-হযরত (সা) স্বীয় মতামত প্রকাশে বিরত থাকেন, অবশ্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার তিনি হুকুম দিয়ে দেন। তাঁর এই নীরবতায় কিছু লোক বিস্মিত হয়। তারা তাদের এই ধারণা প্রকাশও করে। কিন্তু পর

মুহূর্তে তারা তাদের এই বিস্ময়ের জন্য লজ্জিত হয়। মদীনা থেকে আঁ-হযরতের নেতৃত্বে এক হাযার মুজাহিদ রওয়ানা হয়। ইসলামী বাহিনী শওয়াত নামক স্থানে পৌঁছুলে 'আবদুল্লাহ্ বিন উবায়্য সলূল, যে দৃশ্যত মুসলমান হলেও ভেতরে মুনাফিক ছিল, স্বীয় স্বল্পবুদ্ধি অথবা মুনাফিকীর কারণে আঁ-হযরত (সা)-এর গতিবিধি আদৌ বুঝতে না পেরে বলতে শুরু করেঃ আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? আমরা এমন জায়গায় লড়ব না। তার এসব কথায় কেউ যখন তেমন আমল দিল না তখন সে বিদ্রোহী হয়ে যায় এবং স্বীয় তিন শ' অনুচরসহ মদীনায় ফিরে আসে। আবু জাবির আস-সালমা স্বীয় বন্ধু 'আবদুল্লাহ্ বিন উবায়কে ফিরিয়ে আনবার জন্য রওয়ানা হয়। কিন্তু 'আবদুল্লাহ্ বাহিনী তাকে পাকড়াও করে এবং নিজেদের সঙ্গে তাকেও মদীনায় নিয়ে যায়। বনূ সালমা ও বনূ হারিছাও 'আবদুল্লাহ্'র অনুগমনের রাস্তা এখতিয়ার করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তারা তাদের এ ইচ্ছা পরিত্যাগ করে। আঁ-হযরত (সা) অবশিষ্ট লোক-লশ্কর নিয়ে শায়খায়ন নামক স্থানে তশরীফ নেন এবং ফৌজ পরিদর্শন করেন। এখানে তিনি কিছু সংখ্যক লোককে যুদ্ধে শরীক হবার এজাযত দেন নি। তাদেরকে পৃথক করে তিনি বনূ হারিছা পল্লীতে পৌছেন। সেখান থেকে তিনি একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শককে সঙ্গে নেন যেন সে ইসলামী সৈন্যদলকে এমন একটি গোপন পথ দেখিয়ে নিতে পারে যাতে দুশমন কোনরূপ অবহিত হবার সুযোগ না পায়, আর তিনি নির্বিঘ্নে কাফিরদের পশ্চাতে গিয়ে ওহুদ পর্বতের গিরি পথে পৌঁছুতে পারেন। আবু হাশমা আল-হারিছী এই দুরূহ কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব নেয়। সে ইসলামী বাহিনীকে বনূ হারিছার প্রস্তরসংকুল ময়দান হয়ে মুরাববা বিন কায়নাতীর মালিকানাধীন ক্ষেত্রে এনে উপস্থিত করে। এই লোকটি ছিল অন্ধ। বাহিনীর সাড়া মিলতেই সে জোরেশোরে চেঁচামেচি শুরু করে। এতে কিছু মুজাহিদ তাকে কতল করতে অগ্রসর হয়। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে থামিয়ে দেন। মুজাহিদ বাহিনী তাকে অবশ্য এতটুকু আহত করে যাতে সে শত্রু ক্যাম্পে গিয়ে তাদের খবর দিতে না পারে। এমনি করে আঁ-হযরত (সা)-এর ফৌজ জাবালে 'আয়নায়ন-এর ঝর্ণার নিকট গিয়ে উপনীত হয়। এ স্থানে ওহুদ পর্বত ফৌজের পেছনে এবং জাবাল-ই-'আয়নায়ন সম্মুখে ছিল। এখানে পৌঁছে তিনি হুকুম দেন যতক্ষণ পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া না হবে লড়াইয়ের সূচনা যেন না করা হয়।

মোর্চা ও কাতারবন্দী

কাফিরকুল সৈন্যবাহিনীর কাতারবন্দী এভাবে করে যে, অশ্বারোহী বাহিনীর একাংশের নেতৃত্ব খালিদ বিন ওয়ালীদকে নিযুক্ত করে ডান দিকের পশ্চাতে মোতায়েন করে এবং 'ইকরামা বিন আবু জেহেলের নেতৃত্বে অবশিষ্ট বাহিনী বামে নিযুক্ত করে।

আঁ-হযরত (সা) 'আমর বিন 'আওফ গোত্রের সর্দার 'আবদুল্লাহ্ বিন জুবায়রকে একদল সুদক্ষ তীরন্দাযের নেতা নিযুক্ত করে জাবাল-ই-'আয়নায়ন-এর নিকটবর্তী স্থানে মোতায়েন করেন। মুস'আব বিন 'উমায়রকে পতাকা প্রদান করা হয়। ঘোড়সওয়ারদের যে ক্ষুদ্র প্লাটুন ছিল তা যুবায়রের নেতৃত্বে নিয়োগ করা হয় এবং তাদের হেফাজতের জন্যও কিছু সংখ্যক তীরন্দায নিযুক্ত করেন। অধিকন্তু তীরন্দাযদের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, যুদ্ধের অবস্থা অনুকূল প্রতিকূল যা-ই হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তারা যেন নিজেদের অবস্থান ত্যাগ না করে। তাদের এও বলা হয়ঃ তোমাদের এখানে এইজন্যই নিযুক্ত করা হ'ল যেন শত্রুর কোন কোম্পানী আমাদের বাহিনীর পেছন দিক দিয়ে এসে হামলা না করতে পারে। কাফির সৈন্যরা গিরিপথ থেকে বের হয়ে যেন ইসলামী ফৌজের উপর হামলা করতে না পারে এবং কোন লোক যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পালাতে চাইলে তাকেও পাকড়াও করতে পারে। ক্ষুদ্র একটি প্লাটুন আঁ-হযরত (সা) ওহুদ পর্বতের পশ্চাতে মোতায়েন করেন।

যুদ্ধের সূচনা

মুশরিকদের তরফ থেকে যুদ্ধের সূচনা হয় এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ ও 'ইকরামা বিন আবু জেহেল সামনে অগ্রসর হয়। আঁ-হযরত (সা) তৎক্ষণাৎ স্বীয় বাহিনীকে দু'টি অংশে বিভক্ত করেন এবং এক অংশ যুবায়রের নেতৃত্বে স্বীয় অবস্থানে অটল থাকবার নির্দেশ দান করে অপরাংশকে জাবাল-ই-'আয়নায়ন-এর দিকে অগ্রসর হবার আদেশ দেন। দুশমন যুদ্ধের এই চাল বুঝতে ব্যর্থ হয়। খালিদ বিন ওয়ালীদ 'ইকরামার অপেক্ষা না করেই সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যায়। 'ইকরামা সে সময় সম্ভবত মুসলিম বাহিনীর

গতিবিধি বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করছিল। ফলে সে হামলা করার জন্য অগ্রসর হবার পরিবর্তে স্বীয় স্থানেই স্থির থাকে। খালিদ স্বীয় প্লাটুনসহ একাকীই সামনে আগ্রসর হ'লে উভয়ে পক্ষের তীরন্দাযদের প্রবল তীর বর্ষণে অশ্বারোহী বাহিনী হতচকিত হয়ে যায়। ঠিক সে সময় আঁ-হযরত (সা) যুবায়রকে হামলা করার হুকুম দেন। এর সঙ্গেই দ্বিতীয় প্লাটুন গিরি-পথের দিকে দিয়ে খালিদের বাম পার্শ্বে আক্রমণোদ্যত হয়। অতএব খালি-দের কোম্পানী পরাজিত হয়ে পিছু হটে আসে। এর ফলে মুশরিক বাহিনী হিম্মত হারিয়ে বসে। এর প্রতিক্রিয়া সর্বাগ্রে মুশরিক মহিলাদের মধ্যে দেখা যায়। মুসলিম বাহিনী 'ইকরামার কোম্পানীর উপর হামলা করে তাদেরকেও তাড়িয়ে দেয়। যে সব সুদক্ষ তীরন্দায উঁচুতে মোতায়েন ছিল তারা দুশমনকে কানাত উপত্যকার পেছনের দিকে সরে যেতে বাধ্য করে। এরই সঙ্গে মুসলিম বাহিনী তাদের উপর প্রবল বন্যার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতা অবশেষে এরূপ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, কাফির-দের মহিলারা পালাতে শুরু করে। মুসলমানেরা একেই জয়লাভ মনে করে কোনরূপ অনুমতি ব্যতিরেকেই লুট-মার শুরু করে দেয়। তীরন্দাযগণ যখন এ দৃশ্য দেখতে পেল তখন তারাও তাদের অবস্থান ছেড়ে মহিলা-দের শিবির পানে ধাবিত হ'ল তারা উপর থেকে একটি কাফির কোম্পানী-কেই পালাতে দেখেনি বরং গোটা বাহিনীকেই পিছু হটতে দেখে। মুসল-মানরা তাদের কতল করার পরিবর্তে লুটতরাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

মুসলমানদের এই ভ্রান্তি ও দুর্বলতা খালিদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পক্ষে ধরতে বেগ পায়নি। তীরন্দাযদের মোর্চা ছেড়ে আসতে দেখে সে বিদ্যুৎ গতিতে স্বীয় ঘোড় সওয়ার বাহিনীসহ ঘুরে দাঁড়ায় এবং সমগ্র শক্তি নিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালায়। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানেরা বিশৃংখল অবস্থায় ময়দান ছেড়ে পালাতে শুরু করে। হযরত হামযা (রা) কয়েকজনকে নিয়ে পাল্টা হামলা করেন। কিন্তু ওয়াহ্শী নামক হাবশী গোলামের নেযার আঘাতে তিনি শহীদ হন।

অবশিষ্ট কাফিরেরা খালিদের হামলার সাফল্য দেখে ঘুরে দাঁড়ায়। তাদের আক্রমণ মুসলিম বাহিনীকে আরও বিশৃংখলা অবস্থার মাঝে নিক্ষেপ করে। সে সময় আঁ-হযরত (সা) নিজের আশেপাশের লোকজন নিয়ে

পাহাড়ের উচ্চতার দিকে অগ্রসর হন এবং এক জায়গায় মোর্চা বানিয়ে মুশরিকদের উপর বারিধারার মত পাথর ও তীর বর্ষণ অব্যাহত রেখে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করতে থাকেন। তারা আঁ-হযরত (সা)-কে কতল করবার নিমিত্তে উপর্যুপরি হামলা পরিচালনা করে; কিন্তু সফলতা লাভে সক্ষম হয়নি। পাথরের আঘাতে তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হয় এবং তিনি একটি গর্তে পতিত হন। তিনি আহত হতেই মুশরিকেরা জোর হৈ চৈ শুরু করে দেয় যে, মুহাম্মদ (সা) নিহত হয়েছেন। এই আওয়াজ শুনতেই মুসলমানদের যেটুকু সাহস-ভরসা অবশিষ্ট ছিল তাও লোপ পায়। যে সমস্ত লোক যুদ্ধের ময়দানে তখনও টিকে ছিল, তারা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে বেপরোয়াভাবেই লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। এই ধরনের বাহাদুরী ও বীরত্ব দেখে কাফিররা ভাবল, জয় তো আমাদের হয়েই গেছে; মুহাম্মদ (সা) মারা গেছেন। কাজেই তাঁর লোকদের সঙ্গে লড়াই করে জীবন হানি করা বেকার ও অর্থহীন। এজন্য আবু সুফিয়ানের বারংবার আহ্বান সত্ত্বেও সাধারণ সৈন্যরা ছোট্ট ছোট্ট দলে বিভক্ত হয়ে সেনা ছাউনীর দিকে ফিরে যেতে শুরু করে।

এদিকে মুজাহিদ বাহিনীর বাহাদুরী ও শৌর্য-বীর্যের সঙ্গে লড়াই করার প্রভাব বিক্ষিপ্ত মুসলমানদের উপর গিয়ে পড়ে। তারা পুনরায় একত্র হয়। তারা যখন দেখল যে, মুসলমান স্বেচ্ছাসেবী মহিলা যারা আহত মুজাহিদদের ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে ও পানি পান করাতে এসেছিল তারাও কাফিরদের সঙ্গে সিংহের ন্যায় লড়াই করছে, মুসলিম মহিলাদের একটি প্লাটুনও মদীনা থেকে এসে গেছে এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে তখন চিত্র পাল্টে যায় এবং মুসলমানরা তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়ে।

এই গোটা যুদ্ধে ইসলামী ঝাণ্ডা কোন সময়ই অবনমিত হয় নি। ঝাণ্ডা এবং আঁ-হযরত (সা)-এর জীবন হেফাজতের জন্য ওহুদ যুদ্ধে মুজাহিদ বাহিনী যেভাবে জীবন বাজী রেখে লড়েছিল এবং আত্মোৎসর্গের যে সব দুর্লভ দৃষ্টান্ত পেশ করেছিল তা চিরদিন অম্লান থাকবে। নিশ্চিতই এটা হযরত ইসমা'ঈল (আ)-এর আত্মোৎসর্গের চেয়ে কোন অংশে কম নয় যাঁর স্মরণ আমরা প্রতি বছর কুরবানীর 'ঈদরূপে পালন করে থাকি।

উদাহরণত, যে মুহূর্তে কাফির ও মুশরিকরা আঁ-হযরত (সা)-কে তীরের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে চেয়েছে তখনই তাঁর জীবন উৎসর্গকারী ভক্ত অনুসারীরা নিজেদের শরীরকে ঢাল হিসাবে পেতে দিয়েছে। তাতে করে একজন পতাকাবাহী শহীদ হওয়ার সাথেই সাথে আর একজন তাঁর স্থলবর্তী হয়েছেন। আঁ-হযরত (সা) অত্যন্ত ক্লান্ত ও জখমী হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর সাথে লড়াই অব্যাহত রাখেন। বর্শার সাহায্যে লড়াইয়ে তিনি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন তাতে মুসলমানদের সাহস ও হিম্মত দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। লুটমারের ক্ষেত্রে জলদী এবং তীরন্দাযদের মোর্চা থেকে সরে যাওয়ার কারণে ইসলামী লশ্‌কর ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও স্থির মস্তিষ্কে অবশিষ্ট লোকদের নিয়ে যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন।

'মুহাম্মদ (সা) মারা গেছেন' এই কথা মনে করে কুরায়শ কাফিররা তাদের ধারণায় যুদ্ধে জিতে নিয়েছিল। কিন্তু অবশিষ্ট মুজাহিদ বাহিনীকে জীবন বাজী রেখে লড়াই করে যেতে দেখে আবূ সুফিয়ানের মনে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তিনি একটি প্লাটুন নিয়ে মুহাম্মদ (সা) জীবিত কি মৃত এ সম্পর্কে সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পাহাড়ে আরোহণ করেন। সেখানে যখন তিনি জানতে পারলেন যে, তিনি শুধু জীবিতই নন, বরং পাল্টা আক্রমণও পরিচালনা করছেন এবং মুসলমানদের সমাবেশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তিনি ময়দান ছেড়ে যাওয়াই সমীচীন মনে করলেন—যেন তিনি বলতে পারেন যে, যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাদের হাতেই ছিল এবং তাদের অনুকূলেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যাওয়ার সময় তিনি পাহাড়ের উপর থেকে উচ্চৈ-স্বরে মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলে গেলেনঃ আগামী বছর বদর প্রান্তরে আবার তোমাদের সাথে মুকাবিলা হবে। জওয়াবে মুসলমানরা বলেনঃ অবশ্যই, আমরা তোমাদের সঙ্গে বদর প্রান্তরেই লড়াই করব। এমনি করেই ফৌজের অধিনায়ক হিসাবে আঁ-হযরত (সা) প্রতিপক্ষের অধিনায়কের কাছ থেকে নিজের সুদৃঢ় মনোবল ও বীরত্বের স্বীকৃতি আদায় করে নেন। তিনি সাহস, বীরত্ব, সুদৃঢ় ও অটুট মনোবল এবং স্থৈর্য ও শৌর্য-বীর্যের জ্যান্ত উদাহরণ হয়ে সাময়িক ক্ষয়ক্ষতি ও পরাজয়কে পুনরায় বিজয়ে পরিবর্তিত করেন। এটা তাঁর সর্বোত্তম সাফল্য ও কৃতিত্ব। একদিকে কাফিরকুল তাদের লাশ না উঠিয়েই ময়দান ছেড়ে নিজেদের ছাউনীর দিকে পালাচ্ছিল, অপর দিকে

ইসলামী লশ্‌কর তাদের সিপাহসালারের সুদৃঢ় মনোবল ও ইচ্ছাশক্তির বদৌলতে দ্বিতীয়বার ইসলামী ঝাণ্ডার পাশে সমবেত হচ্ছিল।

শত্রুর প্রতিরোধ যখন নিঃশেষ হয়ে গেল এবং আবু সুফিয়ানও ফিরে গেলেন, তখন আঁ-হযরত (সা) 'আলী ইব্‌ন আবী তালিবকে একটি প্লাটুন সঙ্গে দিয়ে শত্রুর দিকে এই উদ্দেশ্য পাঠিয়ে দেন, তিনি যেন জানার চেষ্টা করেন এখন তারা কি করতে চায়। কেননা তাদের দ্বারা মদীনার উপর হামলার পূর্ণ আশংকা তখনও বিদ্যমান ছিল।

হযরত 'আলী (রা) গিয়ে দেখতে পান যে, কাফির ও মুশরিকরা উটের পিঠে আরোহণ করেছে এবং ঘোড়ার পিঠে জিন কষে ফেলেছে। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, তারা প্রত্যাবর্তনের জন্য দীর্ঘ সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে যেন ঘোড়াগুলো কষ্টের হাত থেকে বেঁচে যায় এবং নিজেরাও বেশ আরামের সঙ্গে সফর করতে পারে। তারা যদি মদীনার উপর হামলা করতে চাইত তাহলে তাদের ব্যাটেলিয়ান ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত গতিতে রওয়ানা হয়ে পড়ত।

হযরত 'আলী (রা)-এর এই তথ্য অবগত হয়ে আঁ-হযরত (সা) নিহত ও আহতদের একত্র করার আদেশ দেন। মুশরিকেরা যদিও মুসলিম শহীদবর্গের লাশের অসম্মান করেছিল, কিন্তু তিনি তাদের লাশগুলোকে অসম্মান করতে নিষেধ করেন এবং বলেনঃ মুশরিকদের নাজায়েয ও গর্হিত কার্যকলাপ আমাদের মাফ করে দেওয়া এবং সবর করা উচিত। এর সঙ্গে তিনি তাদের মৃতদেহগুলোকেও সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করেন।

মুসলিম মহিলাদের আত্মত্যাগের প্রেরণা

ইসলামের মহান শহীদবর্গের শাহাদতের ব্যক্তিগত ঘটনাবলী এবং ইসলামের জন্য নিজ নিজ সত্তাকে উৎসর্গের জন্য পেশ করার কথা ছেড়ে দিয়ে এখানে মুসলিম মহিলাদের আত্মত্যাগের প্রবল আবেগ ও উৎসাহ এবং ধৈর্য ও স্থৈর্যের একটি উদাহরণ পেশ করা সমীচীন হবে। এতে জানা যাবে যে, ইসলামী লশ্‌করের ফেদাইনদের জীবন উৎসর্গ ছাড়াও সাধারণ মুসলিম মহিলাদের আবেগ ও প্রেরণার অবস্থা কিরূপ ছিল।

মুসলিম বাহিনীর পরাজয় এবং আঁ-হযরত (সা)-এর শাহাদতের খবর মদীনায় পৌঁছতেই অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে আনসারদের ভেতরকার একজন মহিলাও যুদ্ধের ময়দানে এসে উপস্থিত হন। এ মহিলার পিতা, স্বামী ও ভাই তিনজনই শাহাদত বরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এসেই জিজ্ঞেস করতে শুরু করেন, 'রসূলুল্লাহ্ (সা) কেমন আছেন?' তাঁকে বলা হ'ল, 'তোমার পিতা শহীদ হয়ে গেছেন।' মহিলা বলেলেন, 'এ ব্যাপারে আমার কোন ভাবনা নেই। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) কেমন আছেন তাই বলো।' কেউ তাঁকে বলল, 'তোমার স্বামী শহীদ হয়ে গেছেন। ' মহিলা বললেন, 'এ সম্পর্কেও জানার চিন্তা নেই।' তাঁকে বলা হ'ল, 'তোমার ভাইও শাহাদত বরণ করেছেন।' মহিলার জবাব ছিল, 'আল্লাহ্র রাস্তায় এটাও খুব বড় কিছু নয়।' তারপর তাঁকে জানানো হ'ল, 'রসূল (সা) নিরাপদ ও হেফাজতেই আছেন।' একথা শুনতেই মহিলা জবাব দিলেন, 'তিনি যখন বেঁচে আছেন তখন সকল বিপদ-মুসিবতই আমার কাছে তুচ্ছ।'

এমনিভাবে হযরত হামযা (রা)-এর লাশ দেখবার জন্য তাঁর বোন সফিয়্যা মদীনা থেকে এসে হাযির হন। আঁ-হযরত (সা) হযরত হামযার পুত্রকে বলেন তাঁকে থামিয়ে দিতে। হযরত যুবায়র রসূল করীম (সা)-এর ফরমান মুতাবিক তাঁকে থামিয়ে দেন। এতে হযরত সফিয়্যা (রা) বলেন, 'আমি শুনেছি আমার ভাইকে কেটে বিকৃত করা হয়েছে। আল্লাহ্র নিকটে তা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি রসূল (সা)-এর নির্দেশ মেনে সবর এখতিয়ার করব।' এতে আঁ-হযরত (সা) তাকে আপন ভাই-য়ের লাশ দেখার এজাযত দেন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হামযা (রা)-এর লাশ বিকৃত করা ছাড়াও পেট চিরে তাঁর কলিজা চিবিয়েছিল। সফিয়্যা (রা)-কে যখন তাঁর ভাইয়ের লাশের নিকট আনা হ'ল তখন হুযূর আকরাম (সা) তাঁকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেন। অতঃপর সফিয়্যা (রা) তাঁর জন্য দু'আ' করেন এবং কোনরূপ কান্নাকাটি থেকে বিরত থাকেন। এরপর লাশ দাফন করা হয়।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন ও দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন

দ্বিতীয় দিন ১৬ই শাওয়াল আঁ-হযরত (সা) মদীনায় তশরীফ নেন এবং প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে সমস্ত মুসলমানদের দুশমনের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ

দেন। অবশ্য যে সমস্ত লোককে যুদ্ধে শরীক হবার অনুমতি দেওয়া হয়নি, মদীনার হেফাজত ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্বে যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল। দেখতে না দেখতেই সমস্ত মুসলমান একত্র হ'ল। এখানে এটা বলে দেওয়া সমীচীন যে, মদীনায় এসেই পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত একজন মুসলিম বেদুঈনের একটি খবরের প্রেক্ষিতে নেওয়া হয়েছিল। খবরে সে বলেছিল, 'মুশরিককুল ওহুদ থেকে বের হয়ে অল্প কিছু দূর গিয়েই থেমে যায়। বস্তুত উৎবা বিন আবু জেহেল ও আবু সুফিয়ানের মত ছিলঃ আমরা মদীনার উপর হামলা না করে ভুল করেছি। এখন আমাদের ফিরে গিয়ে মদীনা আক্রমণ করা উচিত; এ ছাড়া মুসলমানদের পরাজয় সম্পূর্ণ হতে পারে না। অতএব আবু সুফিয়ান এ মুহূর্তে মদীনার উপর আক্রমণ পরিচালনার জন্য স্বীয় ফৌজ বিন্যস্ত করছে।'

এ খবর শুনতেই তিনি (রসূল) সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। আহত মুসলিম সেনারা তখনও ব্যাণ্ডেজ ও পট্টির হাত থেকে মুক্ত হতে পারে নি, এমনি সময় আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশে ইসলামের এই মুজাহিদ দল পুনরায় একত্র হলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে হামরাউ'ল-আসাদ গিয়ে পৌঁছেন। এখানে পৌঁছার পর তিনি বনী খুযা'আর সর্দার মা'-বাদ আল-খুযা'ঈকে ডেকে পাঠান। এই লোক তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ও পরম মিত্র ছিল। এমনিতেই তো বনূ খুযা'আর ভেতর মুশরিক ও মুসলমান দু'দলই শামিল ছিল, কিন্তু পুরো কবিলাটাই আঁ-হযরত (সা)-এর পরম মিত্র ছিল। তিনি তাকে মুশরিকদের সেনা ছাউনিতে পাঠান যেন সে তাঁর পরিকল্পনা মুতাবিক কাজ করতে পারে এবং মুশরিকদের অবস্থাদি সম্পর্কে খবরও দিতে পারে।

আবু সুফিয়ান তার মুশরিক বাহিনীসহ আসছিলেন! রাস্তায় তার মা'বাদ-এর সঙ্গে মোলাকাত হয়। আবু সুফিয়ান তার কাছ থেকে গোপন কথা জানতে চেষ্টা করেন। মা'বাদ বলল, "মুহাম্মদ (সা) আপন দল-বলসহ মদীনা থেকে কয়েক মাইল বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। আমি তাদের মত বিরাট শান-শওকত ও বীর্যবান আর কাউকে দেখিনি। তাদের মনোবল অত্যন্ত উন্নত। তারা তাদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত ও লজ্জিত এবং ওহুদ যুদ্ধে ইতিপূর্বে যারা শরীক হতে পারেনি, এবার তারাও প্রতিশোধ গ্রহণ-কারী এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। মুসলমানদের এ বাহিনী বিশাল এবং

তোমাদের উপর হামলা করার জন্য খুব দ্রুত ছুটে আসছে। তারা তাদের কতিপয় মিত্র বাহিনীর অপেক্ষা করছে মাত্র। আমি তোমাদেরকে খবর দিতে এসেছি এবং আমার ধারণা যে, তারা সত্বরই এখানে এসে পৌঁছুচ্ছে।”

আব সুফিয়ান বলেন, ‘আমরা তাদের উপর দ্বিতীয় দফা হামলা করার উদ্দেশ্যেই যাচ্ছি। এ ব্যাপারে তোমার মত কি?’ মা‘বাদ বলল, ‘মুসলিম বাহিনী প্রতিশোধ নেওয়ার যে সব রণসঙ্গীত তৈরী করেছে সে সবের কয়েকটি শ্লোক আমি তোমাকে শোনাচ্ছি। এ থেকেই তোমরা মুসলিম ফৌজের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফ হতে পারবে।’ এই বলে সে কয়েকটি শ্লোক শুনিয়ে বলতে থাকল, ‘এখনও পাল্টা আক্রমণের স্বপ্ন সাধ! পুনরায় হামলার ব্যাপারে আমি কখনই মত দেব না; বরং ওহুদে নিজেদের জয়ের কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে আগামী বছরে আরও অধিক প্রস্তুতি নিয়ে মুসলমানদের উপর হামলা করতে এস। সেটাই ভাল হবে।’

একদিকে মা‘বাদের গোপন পরামর্শ, অপরদিকে পর্যুদস্ত বাহিনীর জওয়াবী হামলা ও প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিকভাবে মদীনা থেকে রওয়ানার এই জোশ ও জযবা! এই সাহসী সৈনিকদের গতকালের যুদ্ধে বিপন্ন হওয়ার কথা যেমন মনে ছিল না, তেমনি হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্যে ছিল না অনুশোচনা। এই লোকগুলোর মনোবল ও মানসিকতাই বা কী অদ্ভুত! মুশরিকরা একেবারে হতভম্ব! আবু সুফিয়ান ভেবে দেখলেন: এখন পর্যন্ত তো আমাদেরই প্রাধান্য ও জয়লাভের জোর শোহ্‌রত রয়েছে। এবার যদি মুকাবিলা হয়, তবে আর আমাদের কল্যাণ নেই। মুসলিম তীরন্দায ও সেনাবাহিনী যে ভুল গতকাল করেছিল, ভবিষ্যতে তার কোনই সম্ভাবনা নেই বরং আজ তা শোধরাতে চাইবে। এসব চিন্তা করে তারা ফিরে যাবার প্রস্তুতিতে লেগে গেল। এ সময়ে আবু সুফিয়ান খবর পেলেন যে, মু‘আবিয়া বিন আল-মুগীরা বিন আবী আস এবং আবু উয্‌যাহ্‌ আল-জাহমী মুসলমানদের হাতে ধরা পড়েছে। এ খবর পেয়েই আবু সুফিয়ান আরো তাড়াহুড়ো শুরু করলেন। এ সময় ‘আবদুল কায়্‌স থেকে একটি কাফেলা মুশরিকদের পাশ কাটিয়ে মদীনার দিকে আসছিল। আবু সুফিয়ান তাকে বললেন, “তুমি আমার পয়গাম মুহাম্মদ (সা)-কে পৌঁছে দাও যে, আবু সুফিয়ানের বাহিনী মুসলমানদের উপর পুনরায় হামলা করার জন্য তৈরী

ছিল; কিন্তু এখন সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করেছে। ঘোষণা মুতাবিক আগামী বছরেই বদর প্রান্তরে তাদের সঙ্গে মুকাবিলা হবে। এই খবর পেঁৗছানোর পর ওকাজের মেলায় এলে এর বিনিময়ে তোমার উটগুলোকে উপহার-উপঢৌকনে ভর্তি করে দেব।”

আঁ-হযরত (সা) এসব বিষয় এবং গুপ্তচরদের প্রেরিত তথ্যের মাধ্যমে নিশ্চিত হন যে, মুশরিকরা মক্কার দিকে ফিরে গেছে। এরপর তিনি তিন দিন পর্যন্ত হামরাউ'ল-আসাদে অবস্থানের পর মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন এবং এভাবেই স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার উপর অটুট ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্যের সঙ্গে আমল করে ওহুদের জয়কে---যেখানে তীরন্দাযদের ভুলের কারণে পরাজয়ের চিহ্ন ফুটে উঠতে যাচ্ছিল, সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে মুসলিম বাহিনীর মনোবল আরও শক্তিশালী ও চাঙ্গা করে তোলেন। ঘোষণা ও প্রস্তুতি সত্ত্বেও মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে কুরায়শরা পালিয়ে যাওয়াতে মুসলমান-দের মধ্যে আরো আবেগ-উদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে।

নির্গত ফলাফল

এখন দেখা দরকার, কি সেই ফলাফল যা এই যুদ্ধ থেকে প্রতিরক্ষা নীতি হিসাবে আমাদের পথ প্রদর্শন করতে পারে।

সর্বপ্রথম আমরা যে সবক এ থেকে পাই তা হ'ল এই যে, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা স্বীয় উৎস ও উপায়-উপকরণ মুতাবিক বিন্যস্ত করা দরকার অর্থাৎ অত্যন্ত দূরদর্শিতা ও অটুট মনোবলের সাথে স্বীয় উপকরণগুলো সম্মুখে রেখে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যা সাধ্যের বাইরে হবে না। আপন সাধ্যের বাইরে অগ্রসর হওয়া এবং সাধ্যাতীত স্বপ্ন দেখা অধিকাংশ সময়ে বিপজ্জনক পরিণতির কারণ হয়। দূরদর্শিতা ও সতর্কতার দাবী এই যে, শুধুমাত্র সেই সব উপায়-উপকরণের ভিত্তিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে যা আয়ত্তাধীন রয়েছে কিংবা হতে পারে। কাল্পনিক আশা-ভরসার উপর বাতাসের কেল্লা নির্মাণ করা বিজ্ঞতার পরিপন্থী। তক-দীরের উপর ভরসা করার অর্থ এ নয় যে, তদবীর পরিত্যাগ করতে হবে। যদি এই ভরসার উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত আশার চৌমহলা ইমারত গড়া হয়

১৪—

তবে পরিণতিতে নিরাশা ও ব্যর্থতার মুখ দেখতেই হবে। উপায়-উপকরণ আজকের যান্ত্রিক দুনিয়ায় ইঞ্জিনের তেলের ন্যায় এবং তকদীর ও সাধ্যের বাইরে কিছুর উপর অধিকতর নির্ভর করাকে ব্যাটারী ও মোটরের পেট্রল বলতে পারেন। যদি আমরা এমন মোটর চালাতে চাই যার ইঞ্জিনের তেলের পরিমাণ নিতান্তই স্বল্প তাহলে মোটর ব্যাটারী ও পেট্রলের কারণে চলতে থাকবে, কিন্তু তার ইঞ্জিন সত্বরই বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা তার পিস্টন তেলের স্বল্পতার কারণে জ্বলে যাবে এবং মোটর পেট্রল ও নতুন হওয়া সত্ত্বেও চলবে না। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার মোটরে তেলের মর্যাদা রাখে তার উপায়-উপকরণ, তার অফিসার ও সেপাই-সান্ত্রী। যখন এদের ভেতর কোন একটির ঘাটতি দেখা দেয় তখন তার পরিণতি ভাল হয় না এবং পরিকল্পনার মোটর-ও আর অগ্রসর হয় না।

আঁ-হযরত (সা) এই যুদ্ধে শত্রুকে পরাজিত করাকে স্বীয় প্রতিরক্ষার লক্ষ্য নিরূপণ করেছিলেন। তিনি শত্রুর শক্তি এবং তাদের গোপন পরিকল্পনা সম্পর্কে গুপ্তচর মারফত পূর্বেই অবহিত হয়েছিলেন। অপর দিকে শত্রুপক্ষ আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার সঠিক পরিমাপ করে নি। মুশরিকেরা মনে করত যে, আঁ-হযরত (সা) 'আবদুল্লাহ বিন উবায়্য সলূল মুনাফিকের পরামর্শ মুতাবিক চলবেন। এই সংবাদের উপর নির্ভর করে তারা ওহুদ পাহাড়ের গিরিপথের দক্ষিণে একত্র হয় যেন মদীনা থেকে মুসলিম সেনাবাহিনী বের হয়ে আসতেই একটি কোম্পানী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে মুসলমানদের শক্তি নিঃশেষ করে দিতে পারে। মনে হয় আঁ-হযরত (সা গুপ্তচরের সাহায্যে সে সব পরিকল্পনার পূর্ণ তথ্য অবগত হয়েছি-লেন। অতএব তিনি রাত্রি বেলা মদীনা থেকে বের হয়ে অত্যন্ত আঁকা-বাঁকা ও দুর্গম পথ অবলম্বন করেন অর্থাৎ যে রাস্তায় গমন করা মুশরিকরা অস-ম্ভব ধরে রেখেছিল সেই রাস্তা ধরেই তিনি অগ্রসর হন। মুনাফিক 'আব-দুল্লাহ্ বিন উবায়্য সলূল যখন দেখল যে, তিনি মুশরিকদের পরিকল্পনার খেলাফ অন্য পথ ধরে চলেছেন, যা সে বুঝতে পারেনি এবং জানতেও পারেনি, তখন সে স্বীয় সঙ্গী-সাথীসহ আলাদা হয়ে যায়। তার উদ্দেশ্য হ'ল, মুশরিকদের সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা পালন করতে না পারলেও তাদের বিরুদ্ধে যেন লড়তে না হয়। সেখান থেকে তিনি বনূ হারিছার বস্তিতে তশরীফ নেন। এর দু'টি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। প্রথমত, দুশমনকে নিজেদের

চলাফেরা ও গতিবিধি সম্পর্কে অনবধান রাখা; দ্বিতীয়ত, বনূ হারিছার কিছু সংখ্যক দুর্বলমনা ও ভীরু লোকের মনোবলকে চাঙ্গা করে তোলা এবং ইস-লামের শেরদিল শক্তি ও মর্যাদার প্রভাব কায়েম করা। বস্তুত তাই হয়েছিল। এখান থেকে তিনি আরও গোপন রাস্তা ধরেন এবং এমন স্থানে মোর্চা কায়েম করেন যেখানে দুশমনের সওয়ার কোম্পানীর শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্য খতম হয়ে যায় এবং স্বীয় তীরন্দাযদের থেকে অত্যন্ত কার্যকর উপায়ে খেদমত নিতে পারেন। তিনি পূর্বেই আঁচ করে নিয়েছিলেন যে, হাওয়া পাহাড়ী উপত্যকার ওদিক দিয়ে ময়দানের দিকে প্রবাহিত হবে। আর তাই সেখানে মুসলিম তীরন্দাযদের তীর বহু দুর পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হবে। অন্য-দিকে দুশমন তীরন্দাযদের বায়ুর প্রতিকূলে তীর চালাতে হবে। এতদ্ভিন্নও তীরন্দাযদের উঁচু স্থানে মোতায়েন করার ফলে তাদের তীরের গতিবেগও দীর্ঘতর ও প্রসারিত হয়। এর পরও তিনি তাদের হেদায়েত দিয়ে দিলেন যে, দুশমনের উপর ৬০ ডিগ্রী কোণ থেকে তীর নিক্ষেপ করতে হবে যাতে করে শেষ সীমায় লক্ষ্য বস্তুতে ৯০ ডিগ্রী কোণে তা আঘাত হানে। এতে করে যে সব মুশরিক ছোট্ট ছোট্ট টিলার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল তারাও তীরের আওতায় এসে যায়। বাস্তবপক্ষে এটাই সেই মূলনীতি যার উপর অধুনা ট্রেঞ্চ মর্টার অর্থাৎ ট্রেঞ্চ ও ব্যাংকারে নিক্ষেপ করার জন্য তোপ তৈরী করা হয়েছে। তিনি তাঁর তীরন্দাযদের হেফাজতের এও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধের অবস্থা যা-ই হোক না কেন তাদের জায়গা থেকে তারা যেন না হটে। তীরন্দাযদের হেফাজতের জন্য তিনি একটি প্লাটুন ওহুদ পাহাড়ের অপর দিকের গিরিপথে পায়ে হাঁটা ছোট পথে মোতায়েন করেন। এটা যেন আধুনিক যুগের সমর নীতি মুতাবিক এমন মযবুত মোর্চা (Strong Points বা Pivots of Manoeuvre) কায়েম করেন যার উপর ভিত্তি করে আঁ-হযরত (সা)-এর ফৌজ হামলার সময় নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে। আর যদি পরাজয় ঘটে তবে পরাজিত ফৌজ সে সব মোর্চায় একত্র হয়ে দুশমনের উপর পুনরায় পাল্টা আঘাত হেনে তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারে।

অন্য কথায়, যেখানে আঁ-হযরত (সা) স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় নিজ সাধ্যকে সম্মুখে রেখে দূরদর্শিতার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করেন, সেখানে মুশরিকরা এর বিপরীতে শক্তির অহমিকায় সমরনীতি পেছনে নিক্ষেপ করে। মুসলিম তীরন্দাযরা যদি তাদের নিজ জায়গা ছেড়ে না

যেত তাহলে ওহুদের ময়দান মুশরিকদের জন্য বদরের চেয়েও অধিকতর খারাপ প্রমাণিত হ'ত।

ওহুদে যেহেতু আঁ-হযরত (সা)-এর ন্যায় যোগ্য জেনারেলের নেতৃত্ব ছিল, সেহেতু তিনি যুদ্ধের পাশা পরিবর্তিত হতে দেখা মাত্রই অত্যন্ত ধীর স্থির মস্তিষ্কে এবং দৃঢ় মনোবলের সঙ্গে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার অপরাংশের উপর আমল করতে শুরু করেন। তিনি সাধারণ অধিনায়কদের মত নিরাপত্তা লাভের জন্য গিরিপথের দিকে অগ্রসর হননি; বরং পাহাড়ের শৃঙ্গের দিকে গতি পরিবর্তন করেন যেন তার ফৌজ খালিদ বিন ওয়ালীদের কোম্পানীর হাত থেকে নিরাপদ হতে পারে এবং মুশরিকদের পদাতিক বাহিনী সেই শৃঙ্গের উচ্চতায় পৌঁছুবার পূর্বেই তিনি যেন সেখানে পৌঁছুতে পারেন, নিজেদের বিশৃংখল ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লোকদের একত্র করবার সুযোগ মিলে যায় এবং তারা নিজেদের মোর্চা সুদৃঢ় ও সংহত করতে পারে। বস্তুত তাই হ'ল এবং তিনি সফল হলেন। অর্থাৎ আঁ-হযরত (সা) পরিবর্তিত অবস্থা মুতাবিক স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় পরিবর্তন সাধন করেন এবং নেহায়েত নাযুক অবস্থাতেও এতে সফল হন, আর এজন্য সফল হন যে, পরিকল্পনা ছিল সাদাসিধে ও সহজবোধ্য। তিনি জানতেন যে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিলের পদ্ধতি একাধিক হয়ে থাকে। এর সঙ্গে তিনি সেগুলোর পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা করে গ্রহণ ও বর্জনের তাৎক্ষণিক ফয়সালা গ্রহণ করেন এবং মুশরিকদের মত এ ভুল করেন নি যে, যা-ই হোক না কেন যুদ্ধ অবশ্যই করব। এমনি করেই মুশরিকরা সেই প্রাধান্য খুইয়ে বসে যা তাদের হাসিল হয়ে গিয়েছিল। যদিও প্রথম দিকে তাদের পরিকল্পনা সঠিক ও অভ্রান্ত ছিল, কিন্তু যখন আঁ-হযরত (সা)-এর রণ-কৌশল তাদেরকে বিব্রতকর অবস্থার মাঝে নিক্ষেপ করল তখন তারা ঘাবড়ে গেল। আঁ-হযরত (সা) এমন রণ-কৌশল অবলম্বন করেন যা তাদের কল্পনায়ও স্থান পেত না অর্থাৎ নেপোলিয়ন-এর ভাষায়—'দুশমনকে প্রতারণা দিয়ে এমনি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ঘোর-প্যাঁচের মাঝে লিপ্ত করে দিতে হবে যেন সে বিব্রত অবস্থায় ভ্রান্তিপূর্ণ চাল চালে, আর এই ভুল চাল তাদেরকেই ধ্বংসের মাঝে ঠেলে দেবে।'

মনে হয়, দুশমন এমন একটি যুদ্ধের ময়দানকেই বাছাই করেছিল যা আরোহী (অশ্বারোহী কিংবা উষ্ট্রারোহী) বাহিনীর জন্য বেশ উপযোগী ছিল

(অধুনা ট্যাঙ্ক লড়াইয়ের জন্য উপযোগী মনে করা চলে)। অর্থাৎ কাফিররা মনে করেছিল যে, ওহুদ পর্বত মধ্যবর্তী এলাকার অসমতল যমীনে আরোহী-দের মুসলমানদের উপর আচানক হামলা করার মওকা মিলে যাবে। এমনি অবস্থায় তাদের সাফল্য ও কামিয়াবী নিশ্চিত ছিল। বিশেষ করে এজন্য যে, তাদের আরোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিল খালিদ-বিন ওয়ালীদ। অধিকন্তু তাদের 'আবদুল্লাহ্ বিন উবায়্য সলূল-এর মুনাফিকী ও গাদ্দারীর উপর পূর্ণ ভরসা ছিল। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) তাদের সমর কৌশলকে নিজস্ব প্রতিরক্ষা কৌশল দ্বারা একেবারে মাৎ করে দেন। অতঃপর উপত্যকার পানির ঝর্ণা মুখের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করে মুশরিকদের পানি থেকেও মাহরূম করে দেন যার কারণে তাদের নিজেদের জানোয়ারগুলোকে পান করাবার জন্য কয়েক মাইল দূরে গিয়ে পানি আনতে হ'ত। তিন হাযার ফৌজ, সেই সঙ্গে তাদের বোঝা বহনকারী এবং সওয়ারের পশুগুলোকে যদি একত্র করা যায় তাহলে সেগুলোর সংখ্যা চার-পাঁচ হাযারের কম হবে না। সে সবের জন্য প্রত্যহ ঘাস-পানি যোগাড় ছিল একটি বড় রকমের সমস্যা। এটাও ছিল আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার আরেকটি সাফল্য। সক্রেটিসের ভাষায়, 'তিনি শত্রু বাহিনীর ফৌজের রসদ-সম্ভারের ব্যবস্থাপনাকে সামনে রেখে এমনি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করেন এবং তাকে এমনিভাবে কার্যকর করেন যে, দুশমনের সংখ্যাধিক্য ধূলোয় মিশে যায়।'

যুদ্ধের সূচনা-পর্ব থেকেই তিনি শ্রেণী-বিভাগ ও বিন্যাস এমনভাবে করেন যে, দক্ষিণ ভাগ, বাম পার্শ্ব এবং পশ্চাদ্ভাগ সবই নিরাপদ হয়ে যায়। যদিও হুযূর আকরাম (সা)-এর নিকট সওয়ার কম ছিল, কিন্তু তিনি মৌসুম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে বেশ ভালভাবে অনুধাবন করে নিয়েছিলেন। সেজন্য আবহাওয়া থেকে তিনি পুরোপুরি ফায়দা ওঠান। পুরো কোম্পানীকে দু'টো অংশে বিভক্ত করে একাংশকে যুবায়রের নেতৃত্বাধীনে ঘাটিতে লুকিয়ে ফেলেন, অপরাংশের মরীচিকাবৎ বিভ্রম সৃষ্টি করে তা থেকে পুরো ফায়দা ওঠান। বিভ্রম সৃষ্টির কারণে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে দ্বিগুণ মনে হতে থাকে। এজন্য তিনি তাদের গতিবিধি ও চলাফেরা এভাবে রাখেন যে, দুশমন মনে করে তারা (মুসলমানেরা) তাদের বাম পার্শ্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অথচ তারা বর্ষাকালীন নালাগুলোর ভেতর হয়ে

দ্বিতীয় প্লাটুনের নিকটবর্তী শত্রুর একপার্শ্বের উপর হামলা করার জন্য তৈরী হচ্ছিল। এর পরিণাম এই হ'ল যে, আঁ-হযরত (সা)—যিনি সমর-শাস্ত্রের একজন অভিজ্ঞ ও কুশলী ব্যক্তি ছিলেন—তিনি খালিদ বিন ওয়ালীদ ও 'ইকরামা বিন আবু জেহেলকে গোলকধাঁধার মাঝে নিক্ষেপে সফল হন। খালিদ বিন ওয়ালীদ ময়দান সাফ মনে করে সঙ্গে সঙ্গে হামলা করে বসে। উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম পদাতিক ফৌজের বাম পার্শ্বকে বেকার ও নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। 'ইকরামা মুসলিম সেনাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য থেমে পড়ে। এটা ছিল তার চরম বোকামী। খালিদ বিন ওয়ালীদের কোম্পানী যারা মুসলমানদের বাম পার্শ্বের উপর হামলা করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল, তাদের উপর দু'তরফ থেকেই প্রথম বৃষ্টির মত তীর আসতে লাগল। এর পর যুবায়রের সওয়ারগণ খালিদের কোম্পানীর উভয় পার্শ্বে, বামে এবং ডানে আচানক হামলা করে বসে। কোম্পানীকে এরূপ সংকটে ফেসে যেতে দেখে খালিদ তার ভুল বুঝতেপারে। ফলে সে স্বীয় কোম্পানীকে কানাত উপত্যকার দিকে নিয়ে এসে ফিরে যায়। এই ঘেরাও ভীড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাওয়া খালিদের মত বীরপুরুষেরই কর্ম ছিল এবং সম্ভবত এই যুদ্ধের এসব তৎপরতাই আঁ-হযরত (সা)-কে খালিদের সমর-নৈপুণ্যের প্রশংসাকারীতে পরিণত করে। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁকে ইসলামী ফৌজের একটি বিরাট অংশের সিপাহসালার নিযুক্ত করা হয়।

এরপর যুবায়র (রা)-এর সওয়ারগণ 'ইকরামার কোম্পানীর উপর হামলা করে ও তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। অতঃপর তিনি পদাতিক বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এ লড়াই ট্যাংক যুদ্ধের সর্বোত্তম নমুনা এইজন্য যে, মুসলিম কোম্পানীর এই হামলা দুশমনের অশ্বারোহী ও পদাতিক ফৌজের সবার মধ্যেই একটা বিশৃংখল অবস্থার সৃষ্টি করে। মুসলিম পদাতিক বাহিনী—যারা নিজেদের আরোহী বাহিনীর পরিকল্পনা সম্পর্কে বেশ ভালো রকম ওয়াকিফহাল ছিল, এর সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ করে শত্রুকে পর্যুদস্ত করে দেয়।

এ পর্যন্ত তো আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশ ও পরিকল্পনা মুতাবিকই যুদ্ধ চলছিল। এর পর দু'টো মারাত্মক ভ্রম সংঘটিত হয়। একটি লুটমার, সে সম্পর্ক ইতিপূর্বে পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টি দুশমনের পশ্চাদপসরণের

মুহূর্তে তাদের পশ্চাদধাবন না করা। লুটতরাজের নেশায় তীরন্দাযগণ নিজেদের জায়গা ছেড়ে সরে আসে এবং এভাবেই শত্রুকে মুসলিম বাহিনীর উপর হামলা করবার সুযোগ এনে দেয়। আর ওদিকে পদাতিক বাহিনী শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন না করে প্রতিরক্ষা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি লঙ্ঘন করে। বিজয়ী ফৌজের জন্য অপরিহার্য হ'ল, যে মুহূর্তে ময়দান থেকে দুশমনের পদস্খলন ঘটবে সে মুহূর্তেই পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে নিঃশেষ করে দিতে হবে। এতে ক্ষণিকের বিলম্বও সমীচীন নয়। কিন্তু এতে তখনই সাফল্য লাভ ঘটে যখন শত্রুকে অটুট মনোবল, সাহসিকতা ও সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সহযোগে পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অন্যথায় বিন্দুমাত্র গাফলতি ও ভুলের কারণে দিশেহারা-প্রায় দুশমনেরও সামলে নেবার মওকা মিলে যায়। মুশরিকদেরও এই গলতিই ছিল যে, যুদ্ধের পাশা উল্টে যাওয়ার পর তারা মুসলিম ফৌজের পশ্চাদ্ধাবন করেনি। শেষাবধি এই গলতিই তাদের ধ্বংসের কারণ হিসেবে দেখা দেয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই গলতিই হিটলার করেছিলেন। তিনি মিত্রবাহিনীকে ডানকার্ক থেকে বহাল তবিয়তে জান নিয়ে বেরিয়ে যাবার মওকা দিয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঐ একই ভুল মিত্র বাহিনীও করেছিল। ১৯১৮ ঈসায়ীতে জার্মান ফৌজকে তারা হিণ্ডেন-বুর্গ লাইন্স থেকে বের করে দিয়েছিল। যদিও মিত্রবাহিনীর বিজয় অর্জিত হয়েছিল এবং জার্মানী সন্ধির দরখাস্ত করতেও বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তার ফৌজ বিদ্যমান এবং নিরাপদ ছিল। সে পরাজয় কবুল করেনি এবং এটাই ছিল কারণ যে, জার্মান ফৌজ অত্যন্ত শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হিটলারকে কোন কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান ফৌজের সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও মনোবলে ভাটা পড়েনি---বরং সমুন্নত ছিল। কেননা যেখানে তারা পরাজয় বরণ করেছিল সেখানেই মিত্রবাহিনীকে পর্যুদস্ত করা হয়েছিল এবং সুলেহনামায় দস্তখতের মুহূর্তে ফ্রান্সের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। মিত্রবাহিনীর কোন সিপাহীর পদচিহ্নও জার্মান ভূখণ্ডে পৌঁছে নি। ঠিক তেমনি ওহুদে মুসলিম ফৌজকে সাময়িকভাবে অবশ্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, কিন্তু আঘাতটা ছিল সমানে সমান। যেখানে মুশরিকদের অন্তরে এই প্রেরণা ক্রিয়াশীল ছিল যে, এই সব মুসলিম পাগলের সঙ্গে লড়াই করে অর্থহীনভাবে জীবন হারাচ্ছি; আর ওদিকে মুজাহিদদের অন্তর-মানস আদেশ লঙ্ঘনের অপরাধে লজ্জিত ও অনুতপ্ত

ছিল এবং তারা এই অপরাধ সত্বর স্খালনের জন্য উন্মুখ ছিল বিধায় তারা নিজের জীবন বাজী ধরে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল দ্বিধাহীন গতিতে। এমতাবস্থায় ফৌজের জীবন হানির কোন আশংকা কিংবা ভয় আর থাকে না এবং সেজন্যই তারা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সঙ্গে লড়তে থাকে।

এধরনের অবস্থা সম্পর্কে নেপোলিয়নের অভিমত হ'ল এই যে, তার অধীনস্থ সৈন্যেরা যুদ্ধের ভাগ্য কখনো কোন সময় অধিনায়কের চেষ্টা, তদবীর ও কৌশলকে মাৎ করে দেয়। কেননা যে ফৌজের সিপাহীরা মনোবল খুইয়ে বসে তাদের অধিনায়কের সকল কলাকৌশল ও চেষ্টা-তদবীর বেকার ও অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং এভাবে তকদীর তদবীরের উপর প্রভাবশীল হয়ে পড়ে।

এই সব ঘটনা ও সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, যুদ্ধের ময়দানে সেই ফৌজেরই শুধু বিজয় লাভ ঘটে থাকে, যে সুদৃঢ় মনোবল ও হিম্মতের সঙ্গে হামলা করে এবং কামিয়াব হওয়ার সাথে সাথে বিনা দ্বিধায় এতটুকু বিলম্ব না করে দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে নিঃশেষ করে দেয়।

আকস্মিক ও অতর্কিত হামলা যুদ্ধের অত্যন্ত কার্যকর একটি অস্ত্র। যে ফৌজ একে ব্যবহার করে, সাফল্য ও কামিয়াবী তার পদচুম্বন করে থাকে। অতর্কিত হামলা থেকে পুরোপুরি ফায়দা ওঠাতে চাইলে সুযোগ -সন্ধানী হবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আর সুযোগসন্ধানী কেবল সেই জেনারেলই হতে পারেন যিনি যুদ্ধের ময়দানে উপযোগী মুহূর্তে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। অতঃপর অধীনস্থ সেনানায়কদের তাদের প্রধান সেনাপতির উপর পরিপূর্ণ আস্থা থাকা দরকার। উদাহরণত, আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশ অমান্য করার ফলে মুসলিম ফৌজের যখন পরাজয় ঘটতে শুরু করল তখন আঁ-হযরত (সা) পাহাড়ের উচ্চতার দিকে অগ্রসর হন। হযরত হামযা (রা) পাল্টা হামলা করেন। হযরত 'আলী (রা) গিরিপথ দখল করে দুশমনের প্রবল বেগে তাড়িত সয়লাবকে থামিয়ে দেন এবং এভাবেই পরাজিত মুসলিম ফৌজের ভেতর পুনরায় দারুণ মনোবল সৃষ্টি হয়ে যায়। অন্য কথায়, সিপাহসালার এবং তাঁর অধীনস্থগণ নিজেদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। এমনি নাযুক ও বিপজ্জনক মুহূর্তে অবস্থা সামলে

নেওয়া শুধু এজন্যেই সম্ভব হয়েছিল যে, মুসলিম সিপাহসালারের ব্যক্তিত্ব, তাঁর সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, অটুট মনোবল, নিপুণ কলা-কৌশল ও উদ্ভাবনী শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ সেনাপতির তুলনায় অনেক উন্নত ছিল আর তিনি এগুলোর সাহায্য পুরোপুরিই গ্রহণ করেছিলেন।

পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক

এখন এ ধরনের সামরিক মোর্চা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকদের ধ্যান-ধারণা ও মতামত পেশ করা যাচ্ছে। এ থেকে পরিমাপ করা যাবে যে, আঁ-হযরতের সূক্ষ্ম দৃষ্টি মোর্চাবন্দীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়াবলীকে কিভাবে দেখতেন এবং তিনি এতে কতখানি পারদর্শিতা হাসিল করেছিলেন। সে সব ধ্যান-ধারণা ও মতামতের সার-কথা হ'ল ঃ

১. দুশমন যখন পাহাড়ের উচ্চতায় আরোহণ করে তখন তাদের হামলার গতি শ্লথ হয়ে থাকে। এজন্য তাদের উপর কার্যকরভাবে গোলা বর্ষণ করা যায়। এমন মোর্চার উপর দুশমন সহজেই আক্রমণ করতে পারে। এমতাবস্থায় তাদের ট্যাংক (আরোহী বাহিনী) তার পদাতিক বাহিনীকে সাহায্যে করতে পারে না।

২. পাহাড়ী মোর্চার অধিকারী দুশমনের চলাফেরা ও গতিবিধি অত্যন্ত সহজেই দেখতে পারে। আর এজন্য সময়মত প্রতিরোধ প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যায়।

৩. পাহাড়ের উপর অধিকাংশ স্থানেই ছোট-বড় নানা ধরনের অনেক গর্ত থাকে যার কারণে দুশমনের গোল বর্ষণ, সে যুগে তীরন্দাযী, থেকে নিরাপত্তা মিলে। এ ছাড়া সেগুলোকে মযবুত মোর্চায় রূপান্তরিত করা যায়।

৪. পাহাড়ী মোর্চাসমূহের উপর পাহাড়ের উঁচু-নীচু তথা সমতল ও অসমতল, হাওয়ার গতিবেগ ও দিকের কারণে লক্ষ্যবস্তুতে গুলী নিক্ষেপ করা মুশকিলের ব্যাপার। তীর নিক্ষেপ তো এতদঅপেক্ষাও কঠিন।

৫. পাহাড়ের উপর মোর্চা স্থাপনকারীদের জন্য আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ দু'টিই সহজ। পাহাড়ী মোর্চা থেকে শত্রুর উপর যমীনের অসমতলের কারণে পাল্টা আক্রমণ অত্যন্ত সহজেই করা যেতে পারে।

নিম্নলিখিত দিকগুলো অনুপযোগী ও ক্ষতির কারণঃ

১. এমন মোর্চা নির্বাচন যেখান থেকে শত্রুর উপর কার্যকরভাবে গুলি বর্ষণ করা যায়—খুব একটা সহজ নয়। সে সব নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

২. পাহাড়ী এলাকায় এমনও নীচু এলাকা থাকে যেখানে আক্রমণকারী দুশমনের গুলীর আওতা থেকে বাঁচতে পারে। সেটাকে সামনে রেখে দেখলে স্বীকার করতেই হয় যে, আঁ-হযরত (সা)-এর সমস্ত সামরিক কলা-কৌশল এমন ছিল যা আজ অবধি সঠিক ও নির্ভুল এবং সেগুলোর প্রয়োগ আজও ঘটান যায় এবং ভবিষ্যতেও সর্বদাই করা যাবে; শুধুমাত্র সম-রোপকরণই পাল্টে গেছে। প্রথমে তীর ও তলোয়ারের সাহায্যে যুদ্ধ করা হ'ত আর এখন হাওয়াই জাহাজ থেকে বোমা এবং কামান থেকে গোলা নিক্ষেপ করা হয় অথবা রাইফেল ইত্যাদি চালানো হয়ে থাকে। প্রথম যুগে আরোহীদের জন্য রিসালা হ'ত আর এখন ট্যাংক ও লৌহ নির্মিত দুর্ভেদ্য গাড়ী সেই স্থান দখল করেছে এবং আকাশ থেকে ছত্রী-সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র নামান যায়। কিন্তু তথাপিও এসবের ব্যবহারের মূলনীতি একই।

আধুনিক যুগের প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞগণ এখন এ বিষয়ে জোর দিচ্ছেন যে, অধীনস্থ সেনানায়কগণকে নিজেদের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে যুদ্ধের উপ-যোগী মওকাগুলোকে ফায়দা হাসিলের জন্য দুশমনের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক-ভাবে কাজে লাগাতে হবে যেন পাল্টা আক্রমণের সেই সুযোগ, যা শত্রুর ভুলের কারণে সৃষ্টি হতে পারে, দূরীভূত করা যায়। আঁ-হযরত (সা)-এর অধিনায়কদের জানা ছিল যে, তাঁদের সর্বাধিনায়ক তাঁদের গৃহীত কার্যক্রমকে সমর্থন দেবেন। অতএব তারা নিজেদের দায়িত্ব ও যিম্মাদারীতে দুশমনের উপর হামলা করেছে।

তিনি স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার পূর্ণতা সাধন এমন সময়ে এত গোপন পন্থায় করেন যে, তাঁর প্রতিরক্ষার চালের শিকার হওয়া ছাড়া শত্রুর আর কোন উপায় ছিল না। আঁ-হযরত (সা) সংবাদবাহক ও গুপ্তচর মার-ফত শত্রুর সমস্ত তথ্য বরাবর পেতে থাকতেন। শত্রুর উপর মুসলিম তীর-ন্দাযদের যাকে আজকের যুগের সামরিক পরিভাষায় 'ফায়ার প্লান' (Fire Plan) বলা উচিত—অত্যন্ত সময়োপযোগী ও সঠিক ছিল। তারা শত্রুর

আরোহী ও পদাতিক বাহিনীকে ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং পেরেশান করে দিয়েছিল। তীরন্দাযদের মোর্চা এমন জায়গায় ছিল যেখান থেকে তারা শত্রুর বিরুদ্ধে গোটা যুদ্ধক্ষেত্রে কার্যকর পন্থায় তীর বর্ষণ করতে পারত এবং আক্রমণের পূর্বে হামলাকালীন এবং এর পরবর্তীতে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রয়োজন মাফিক তাকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করতে পারত। তিনি ফৌজের একটা অংশ রিজার্ভ হিসাবে নিজের নিকট সংরক্ষিত রাখেন যাতে প্রয়োজনের মুহূর্তে এর দ্বারা ঝটিকা অভিযানের কাজ নেওয়া যায়। বস্তুত এই প্লাটুনই হযরত হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে পাল্টা হামলা করে পরাজয়ের ক্ষত-চিহ্নকে সাফল্যে রূপান্তরিত করেন। এ হামলা ছিল অত্যন্ত আকস্মিক ও অতর্কিত এবং সেই সঙ্গে চরম দুঃসাহসিকও বটে।

তীরন্দাযদের নির্ধারিত স্থান পরিত্যাগে যখন যুদ্ধের পাশা পাল্টাতে থাকল এবং ব্যর্থতার চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল তখন আঁ-হযরত (সা) অবস্থা পরীক্ষা করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশের উপর আমল করতে শুরু করেন। প্রতিরক্ষার মূলনীতি এই যে, পরাজয়ের মুহূর্তে ফৌজের প্রতিটি ছোট-বড় অফিসার এমন কি প্রতিটি সৈন্যের উপর এই দায়িত্ব এসে পড়ে যে, তারা যেখানেই মওকা পাবে শত্রুর উপর দ্রুত পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে তাদের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে এবং নিজেদের মোর্চা মযবুত বানিয়ে স্ব-স্ব লোকজনকে একত্র করতে চেষ্টা করবে। এ ছাড়া শ্রান্ত, ক্লান্ত, হতবল ও আহত লোকদের মনোবল চাঙ্গা করে তুলে দুশমনের সঙ্গে লড়বে।

পরাজিত ফৌজকে পুনরায় একত্র করে কাতারবন্দী করা বড়ই কঠিন কাজ, বিশেষ করে সেই সময় লড়াই যখন পার্বত্য এলাকায় চলতে থাকে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) এতেও যে বিরাট সাফল্য লাভ করেন তা যুদ্ধের ফলাফল থেকে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি স্বীয় ফৌজের মোর্চার জন্য এমন জায়গার পক্ষে মত দেন যেখানে দুশমনকে সর্ব-প্রকার কাঠিন্যের সম্মুখীন হতে হয়। অতঃপর তিনি তা আরও সুদৃঢ় করে তোলেন এবং এর জন্য যে সময় দরকার ছিল তা তাঁর অধীনস্থ সেনানায়কগণ শত্রুর উপর পাল্টা হামলা করে অর্জন করেন। এ ধরনের জবাবী হামলাকারী দলকে আধুনিক প্রতিরক্ষা কৌশলের পরিভাষায় 'রিয়ার গার্ড'

(Rear Guard) বা পশ্চাদরক্ষী দল এবং 'ফ্লাংক গার্ড' (Flank Guard) বা পার্শ্বরক্ষী দল বলে। এই দল হযরত 'আলী (রা) এবং হযরত হামযা (রা)-এর অধিনায়কত্বে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে।

এ ব্যাপারে প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় যে, পরাজিত ফৌজের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত না তাৎক্ষণিকভাবে একত্র হয়ে পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করা সমীচীন। কিন্তু সাধারণভাবে এটাই মনে করা হয় যে, পরাজিত ফৌজের বিক্ষিপ্ত হয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়াই উচিত যেন পুনরায় একত্র হয়ে লড়তে পারে। অপর একটি মত হ'ল, পরাজয়ের ক্ষেত্রে ফৌজ যদি ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে তবে দুশমন তাদের বিব্রত অবস্থার ফায়দা গ্রহণ করে তাদের উপর কাযকর আঘাত হানবার মওকা পায়।

আমাদের মতে এগুলোর ভেতর কোন একটিকেও সর্বাবস্থায় নীতি ও কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক নয়। পরাজয় যদি শোচনীয় ধরনের হয় তাহলে এটাই সমীচীন যে, ফৌজের কিছু অংশকে নিজেদের পশ্চাদ-ভাগের নিরাপত্তা-রক্ষী হিসাবে রেখে বাকী ফৌজকে পিছে সরিয়ে আনতে হবে। এতে পশ্চাদরক্ষী বাহিনী কুরবানীর পশুতে অবশ্যই পরিণত হবে, কিন্তু ফৌজের বিরাট অংশই পুনরায় সুসংগঠিত হয়ে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে। এ ধরনের ঘটনা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কয়েক দফা সংঘটিত হয়েছে। শোচনীয়রূপে পরাজিত ফৌজের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ ডান-কার্কের ঘটনা। এভাবেই রুশীয়দের উপর জার্মান আক্রমণকালীন রাশিয়ার অধিনায়কগণ কয়েক হাযার রাশিয়ান ফৌজকে ভেট চড়িয়ে নিজেদের ফৌজের বিরাট অংশকে রক্ষা করে। এর মর্মার্থ শুধু এতটুকু যে, সিপাহ-সালারকে হিম্মত ও দৃঢ়তার সঙ্গে এবং সময় ও পরিবর্তিত অবস্থাকে সামনে রেখে ফয়সালা করতে হবে।

পরবর্তী ঘটনাবলী এবং নৈতিক শিক্ষা

এখন আমাদের ওহুদ যুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা দরকার। ওহুদ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মুশরিকদের জন্য পরিপূর্ণ

বিজয় লাভ করা ব্যতিরেকেই ময়দান পরিত্যাগ নিঃসন্দেহে মারাত্মক ভুলই ছিল। এর একটা বড় কারণ ছিল সিপাহসালার আবু সুফিয়ানের নৈতিক দুর্বলতা। এই ঘাটতি সম্পর্কে অবশ্যই তার সচেতন অনুভূতি ছিল এবং তার প্রমাণ এই যে, তিনি পাহাড়ের উপর আঁ-হযরত (সা)-এর শেষ মোর্চায় আগমন করেন। কিন্তু তার সকল সাহস ভরসা উবে গিয়েছিল, পেছনে হটবার জন্য তিনি একটা বাহানা ও অজুহাত খুঁজছিলেন। তার অধীনস্থ সেনানায়কগণ যে তার হুকুম তা'মীল করবে, এ ব্যাপারে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। তিনি ফিরবার জন্য রওয়ানা হয়, কিন্তু নিজের সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে তার অনুভূতি থেকে যায়। অনন্তর তিনি যখন প্রথমে শিবিরে পৌঁছেন তখন মুসলমানদের এবং যুদ্ধক্ষেত্রের বিপদাপদ থেকে দূরে হবার কারণে নিজের ধ্যানধারণা ও কল্পনাকে বাগ মানাতে সমর্থ হন এবং পস্তাতে থাকেনঃ আমি বিরাট ভুল করেছি। অতএব শেষ অস্ত্র হিসাবে পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু সাহস সঙ্গী হতে অস্বীকার করে এবং অধিকতর হিলা ও বাহানাবাজীর আশ্রয় নিতে তাকে উৎসাহিত করে। তা ছাড়া মা'বাদ আল-খুযা'ঈর সঙ্গে পথিমধ্যে তার সাক্ষাত ঘটে। সে হামলা না করার পরামর্ম দেয় এবং আবু সুফিয়ানও এ পরামর্শ কবুল করে মক্কায় ফিরে যান।

অপর দিকে আঁ-হযরত (সা)-এর গোয়েন্দা দল শত্রুর যাত্রা বিরতি এবং মদীনার উপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি গ্রহণের তথ্য প্রদান করে। সংবাদ পেতেই যুদ্ধ ও সফরের ক্লান্তি এবং আহতদের যখমকে উপেক্ষা করে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ জারী করেন এবং শুধুমাত্র সে সমস্ত লোককেই সঙ্গী হিসাবে নেন যাদের ওহুদ যুদ্ধে শরীক হবার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল যেন নতুন লোকেরা বেশী লম্ফ-ঝম্প করার ও আত্মগর্বী হবার সুযোগ না পায়। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের অধি-নায়ক আবু সুফিয়ানের কমযোরী তিনি বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরে-ছিলেন। আবু সুফিয়ান হামলা করবে—এ বিশ্বাস যদিও তাঁর ছিল না, তবুও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সকল আয়োজন ও কৌশলই তিনি অবলম্বন করেন। অতঃপর তিনি এও জানতেন যে, এই সৈন্য চালনা করার ফলে মুসলমান-দের হিম্মত বেড়ে যাবে এবং কাফিরদের উপর এর গভীর প্রভাব পড়বে। এ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমেই তিনি কতিপয় লোকের মনের দুর্বলতাও দূরীভূত

করে দেন যা ওহুদের সংঘটিত ঘটনাবলী কোন না কোনভাবে প্রভাবিত করেছিল। নৈতিক বিজয় যুদ্ধক্ষেত্রের ক্ষয়ক্ষতিকেও ভুলিয়ে দেয় এবং নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তি শত্রুর মুকাবিলায় সংখ্যা-শক্তির স্বল্পতা ও সাজ-সরঞ্জামের ঘাটতির প্রভাবকে দূরীভূত করে দেয়। নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তির এই অভাব এবং হীনমন্যতার এই অনুভূতিরই পরিণামে দুনিয়ার কোটি কোটি মুসলমান আজ মজবুর ও অক্ষম হয়ে বসে আছে। অথচ প্রকৃত অবস্থা তো এই যে, এই শক্তিই বদর ও ওহুদ যুদ্ধে সহায়-সম্বল ও সাজ-সরঞ্জামহীন অল্প সংখ্যক মুসলমানকে শুধু কামিয়াব করেছিল তাই নয়, বরং দুনিয়ার এক বিরাট অংশকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষমও করেছিল। ওহুদ যুদ্ধে স্রেফ আঁ-হযরত (সা)-এর নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তিই পরাজয়কে জয়লাভে রূপান্তরিত করেছিল।

যুদ্ধের ময়দান থেকে যারা দূরে অবস্থান করে তারা অনেক সময় বড় বেশী লম্ফ-ঝম্প করে। আবু সুফিয়ানও তাই করেছিলেন। এটা নতুন কিছু নয়। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আমরা কি করছি? ওহুদের প্রাথমিক সাফল্যের পর তীরন্দাযদের মত আমরা এখন নিজেদের নৈতিক, চারিত্রিক ও ধর্মীয় মোর্চাকে পরিত্যাগ করেছি এবং নিকৃষ্টতম বৈষয়িক স্বার্থের লুট-তরাজের বিনিময়ে যিল্লতী ও অবমাননাকর 'আযাবে গ্রেফতার হয়েছি। নিজেদের এই ভ্রান্তি এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা-পুরুষের নির্দেশ লঙ্ঘন সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অনুভূতিও কি আমাদের আছে? আমরা আমাদের পরাজয় ও বিশৃংখল অবস্থাকে কামিয়াবী ও সাফল্যে পরিবর্তিত করার কোন প্রস্তুতি কি গ্রহণ করেছি? কোন মোর্চা কি মনোনীত ও নির্বাচিত করেছি? কোন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছি কি? তাকে কার্যকর করার জন্য কোন পন্থার কথাও কি চিন্তা করেছি? আমাদের কার্যকলাপ ও চরিত্রের মানদণ্ড শুদ্ধ করেছি কি? আর যদি না করে থাকি তবে কবে করব? আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা নীতির সাহায্য ও সহায়তা কখন গ্রহণ করা হবে আর কখনই-বা তাঁর বাস্তব জীবনাদর্শকে জীবিত করা হবে? পরাজয় ও হীনমন্যতার লজ্জাজনক যিল্লতীকে কামিয়াবী ও সাফল্যের আনন্দে কখন রূপান্তরিত করা হবে? রসূল আকরাম (সা) চোখের পলকে পরাজয়কে জয় এবং ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিণত করেছেন এবং এভাবে করেছেন যে, কাফির বাহিনী দিশেহারা অবস্থায় ময়দান ছেড়ে পালায়। বাহিনীর

অধিনায়ক মুকাবিলা করার হিম্মত নিয়ে এগিয়ে আসতে চায়, কিন্তু শেষাবধি সাহসে কুলায় না। আজ তাঁর সরল সঠিক পথে চলার দাবীদাররা, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর যখন তাদেরই হাতে, বাহিনী এবং বাহিনীর অধিনায়ক যখন তাদেরই হতে হবে, কয়েক শতাব্দীর পরও কি তারা পরাজয়ের লাঞ্ছনাকে জয় ও সাফল্যের মর্যাদায় পরিবর্তিত করার জন্য কোমর বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না?

উঠ, অন্যথায় আর কখনই হাশর হবে না ;
দৌড়াও, চালবাজীরূপী কালের কেয়ামত চলে গেছে।

যা-ই হোক, ওহুদের রক্তাক্ত যুদ্ধের পর আঁ-হযরত (সা) আপন নিরলস প্রচেষ্টা দ্বারা ব্যক্তিগত উদাহরণ এবং নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তি দ্বারা মদীনাকে দুশমনের হামলা থেকে নিরাপদ করেন, মুসলমানদের মধ্যে সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, বীরত্ব ও অটুট মনোবলের প্রাণস্পন্দন সৃষ্টি করেন এবং কাফির ও অন্যান্য বাতিল শক্তির অন্তরে তাদের মর্যাদা ও ভীতিকর প্রভাবের স্থায়ী ছাপ ফেলেন।

আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস যে, আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা নীতির সম্মুখে দুনিয়ার কোন শ্রেষ্ঠতর প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ ও বাহিনী অধিনায়কের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ এবং অনৈসলামী সমর ও মারণশাস্ত্রের কোন মূল কিংবা শাখা-প্রশাখার কোনই হাকীকত ও গুরুত্ব নেই এবং ইসলামী বিশ্বের জন্য আঁ-হযরত (সা) ব্যতিরেকে আর কারও নিকট থেকে সমরশাস্ত্রের শিক্ষা নেবার কোন প্রয়োজনও নেই। আঁ-হযরত (সা)-এর ব্যক্তিসত্তা ও তাঁর কর্মনীতি প্রতিটি দিক দিয়েই মহান, উন্নত এবং সর্বোত্তমও বটে। এবং এতখানি উত্তম যে, আধুনিক যুগের আবিষ্কার-উদ্ভাবনী, সবজান্তা ও সর্বাদর্শীর অহমিকা সত্ত্বেও তাঁর নিকট পৌঁছুতে অসমর্থ—তা সে প্রতিরক্ষা কৌশল ও পন্থা উদ্ভাবনেই হোক, কিংবা সামরিক কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়নেই হোক। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও জ্ঞান ও দূরদর্শিতার রেশমী পর্দার উপর ছুঁৎমার্গের পোশাক চড়িয়ে বসে থাকাও মুসলমানদের পক্ষে অভ্যাস ও নীতি হওয়া উচিত নয়। অপরের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে উপকারিতা লাভ এবং মন ও মস্তিষ্কের চোখ-কান খোলা রাখা এক কথা, আর আত্মভোলা ও অন্ধ আনুগত্য অন্য জিনিষ! যা-ই হোক, হিম্মত, স্থৈর্য, পুরুষোচিত

দৃঢ়তা ও মনোবল, সূক্ষ্মতা ও দূরদর্শিতা এবং সবর ও সহিষ্ণুতার গুণাবলী তো দূরের কথা, গযওয়ায়ে ওহুদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন—দেখবেন তা কতখানি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ ছিল। আবু সুফিয়ানের বাহিনী সংখ্যার দিক দিয়ে ছিল কয়েক গুণ, কিন্তু কি পরিমাণ অসহায় ও মজবুর ছিল! আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা চালে কিভাবে সাধারণের ন্যায় নাচছিল এবং একের পর এক ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে কিভাবে নিজেদেরকে ধ্বংসের মাঝে নিক্ষেপ করছিল! শেষ অবধি তিনি নিজেই ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যান। তার হুশ ও অনুভূতি এতখানি বিভ্রান্ত ও বিস্রস্ত ছিল এবং আঁ-হযরত (সা)-এর সামরিক নৈপুণ্যের ভীতি-কর প্রভাবে তিনি এতখানি আচ্ছন্ন ছিলেন যে, একদিকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন আর মাথার ভেতর তার সাফল্যের রঙিন খাব ঘুরপাক খাচ্ছিল। একবার থামছেন, পাল্টা আক্রমণের অভিলাষ নিজেই জাহির করছেন, আবার পরক্ষণেই হিলাবাজীর আশ্রয় গ্রহণ করে ফিরেও যাচ্ছেন। তার প্রতিটি বোকামী, অপ-কৌশল এবং ভীরুতা মুসলমানদের শক্তি, বুদ্ধি, বীরত্ব, অটুট মনোবল, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হচ্ছে।

রসূল আকরাম (সা)-এর মধ্যে মানুষ চেনার এমন একটা ক্ষমতা ছিল যে, ফয়সালা করতে কখনো তিনি ভুল করতেন না। প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিকে পরখ করে তিনি তাকে এমন ভুল করতে বাধ্য করতেন যে, তার হিম্মত ও মনোবলের সমগ্র সম্পদ বরবাদ হয়ে যেত। নতুন ও প্রাচীন সিপাহ-সালারদের মধ্যে নেপোলিয়ন সম্পর্কেও খ্যাতি আছে যে, তিনিই এই বিষয়ে অত্যন্ত পারঙ্গম ছিলেন। কিন্তু মস্কোর উপর আক্রমণ পরিচালনা করে তিনি বিরাট ভুল করেন এবং এইজন্যই মস্কোয় পরাজিত হবার পর তাঁকে বলতে হয়েছিল যে, বিরাট ও বিপুল বিজয়ের পর সাধারণত পরাজয় ঘটে থাকে। অন্য কথায় এর অর্থ এই যে, দূরদর্শিতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার থেকে বিদায় গ্রহণ করে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর ব্যাপারেও কি এমন কথা ও কর্মের কল্পনা করা যায়? দ্বিতীয় উদাহরণ ফ্রেডারিক দি গ্রেট-এর। কোলিন-এর রণক্ষেত্রে তাঁকেও একই পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল যা নেপোলিয়নের হয়েছিল মস্কোতে এবং তা এই কারণেই যে, তিনি প্রতিপক্ষীয় সেনাপতির যোগ্যতা ও ক্ষমতার সঠিক পরিমাপ করতে ব্যর্থ হন। নেপোলিয়ন দু'বার ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দফা,

তিনি ১৮১৩ 'ঈসায়ীতে আন্দাজ করেন যে, জার্মান ফৌজ তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, তাঁর এ ধারণা ভুল ছিল এবং এটাই ছিল তাঁর পরাজয়ের কারণ।

আবু সুফিয়ানের ভুল এই ছিল যে, তিনি ধারণা করেছিলেন মদীনার পূব ও পশ্চিমের ময়দানে লাভার কংকরে পরিপূর্ণ, আর এজন্য তা সৈন্য চলাচলের অনুপযুক্ত। ফলে মুসলিম বাহিনী নিশ্চিতভাবেই উত্তরের ময়দানের দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) রাতের আঁধারে চলাচল করে শত্রুকে তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে একেবারে বেখবর রাখেন। আবু সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর অবহিত হন তখন যখন রসূল আকরাম (সা) ওহুদ গিরিবর্ত্মে মোর্চাবন্দী সম্পন্ন করে ফেলেছেন।

আঁ-হযরত (সা)-এর তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি দেখুন, তিনি অবহিত হলেন যে, খালিদ বিন ওয়ালীদও ওহুদের পশ্চাতে (উত্তর) থেকে এসে পাহাড়ের দক্ষিণে মোর্চা লাগাবে। এক্ষেত্রে উপায় একটাই ছিল যে, হয় ওহুদ গিরিবর্ত্মে মোর্চা কায়েম করা হবে অথবা সেটাকে এভাবে রাখা হবে যে, কাফির বাহিনী মুসলিম ফৌজের চলাফেরা ও গতিবিধি সম্পর্কে যেন আদৌ অবহিত না হতে পারে এবং ভুল স্থানে যেন খালিদের সঙ্গে সংঘর্ষ না হয়। এ পর্যায়ে তিনি প্রথমে সঠিক পরিমাপ এই করেন যে, খালিদ বিন ওয়ালীদ-এর ব্যাটালিয়ন দিনের বেলায় সফর করবে, রাতের বেলায় করবে না। অতএব তিনি রাতারাতি সফর করে আপন নির্ধারিত মোর্চায় পৌছে যান এবং আবু সুফিয়ান ও খালিদ বিন ওয়ালীদের ফৌজী চাল ব্যর্থ করে দেন। এছাড়াও দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, তিনি স্বীয় বাহিনীকে নির্দেশ দেন, তাঁর নির্দেশ ব্যতিরেকে অথবা শত্রুর তরফ থেকে আঘাত না আসা পর্যন্ত যেন হামলা করা না হয়। এরপর তিনি দুশমনকে হামলা করতে উদ্বুদ্ধ করেন বা হামলা করার মওকা দেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তিনি এমনটি কেন করলেন? এর জবাব খুবই সহজ। তিনি এটা চাইতেন না যে, তিনি যে প্লাটুন বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করেছেন তা তাড়াহুড়োর ভেতর কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই দুশমনকে অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে হামলা করে বসুক এবং আসল উদ্দেশ্য পণ্ড করে দিক কিংবা কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কারণ হোক। উদাহরণত, এটা একেবারে সম্ভব ছিল যে, ওহুদের পশ্চাতে যে প্লাটুন নিযুক্ত

করা হয়েছিল তারা শত্রুর সেনাব্যুহের সম্মুখ ভাগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলত। কিন্তু পরবর্তীতে আসল বাহিনী পৌঁছানোর পর নিজেরাই শুধু মারা যেত না, মুসলিম ফৌজের প্রতিরক্ষা কূটকৌশলের সন্ধানও জেনে ফেলত। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর ফৌজ যখন তাঁর পরিকল্পনা মুতাবিক আপন জায়গায় পৌঁছে গেল তখনই তিনি পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশের উপর আমল করা শুরু করলেন। নেপোলিয়নের উক্তি, "প্রতিরক্ষা স্ট্রাটেজী বা প্রতিরক্ষা কৌশলের মর্ম এই যে, ফৌজের জেনারেল সঠিক স্থানে সঠিক সময়ে পৌঁছুবেন। আমি জায়গার মুকাবিলায় সঠিক সময়ে পৌঁছুনোকে অধিক গুরুত্ব দিই। কেননা আমার ধারণায় জায়গা তো শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু যে সময় একবার চলে গেছে, তা আর কখনই হাতে ফিরে আসবে না।" বাস্তব সত্য এই যে, জায়গা সেই সময় সঠিক হবে যখন সময় সঠিক হবে। সময়কে নেপোলিয়ন এজন্যই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, সঠিক অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ে সঠিক স্থানে পৌঁছুনো খুবই জরুরী যেন অধীনস্থ সেনানায়কগণ এটা না মনে করে যে, জায়গামত কয়েক মিনিট পরে পৌঁছা খুব বেশী একটা অন্যায় নয়।

আঁ-হযরত (সা) দূরদর্শিতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার ক্ষেত্রেই একক ছিলেন না ---বরং স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার উপর আমল করার ক্ষেত্রেও নেহায়েত স্থির মেজাজ ও সুদৃঢ় ইস্ছাশক্তির অধিকারী ছিলেন। যদি তাঁর প্রতিপক্ষ অধিনায়ক আবু সুফিয়ানও এসব গুণে গুণান্বিত হ'ত তাহলে ওহুদ যুদ্ধ যেখানে হয়েছিল আঁ-হযরত (সা)-কে সেখানে অন্য কোন পরিকল্পনার উপর আমল করতে হ'ত। মশহূর উক্তি ঃ যুদ্ধের ময়দানে বিজয় সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তিরই সহগামী হয়ে থাকে। আর একেই ইংরেজীতে fortune of war বা যুদ্ধের ভাগ্য বলা হয়।

বদর যুদ্ধে আবু জেহেলের এবং ওহুদ যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের দুর্বলতাদৃষ্টে প্রখ্যাত প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক জোমিনী (Jomini)-এর উক্তি মনে পড়ে। তিনি বলেন, "যুদ্ধ শুধুমাত্র বিজ্ঞান নয় বরং তা রক্তে ভরপুর নাটক।" অর্থাৎ এই নাটকে মানবীয় ফিতরত (প্রকৃতি)-এর সমগ্র শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়ে থাকে। আর এজন্যই কোন কোন সময় প্রখ্যাত সিপাহসালারের দিল ও দিমাগ তথা মন ও মগজ কখনো নিরাশা, কখনো সংশয় ও সন্দেহ এবং কখনো কখনো বিপদের শিকার হয়ে পড়ে। কিন্তু যিনি

এই পরীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হন এবং সর্বাবস্থায় দৃঢ়চিত্ত থাকেন—তিনি চিরন্তন খ্যাতি ও মর্যাদা হাসিল করেন এবং চিরদিনের জন্য তিনি অমর হয়ে থাকেন। এই দু'প্রকার সিপাহসালারের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, শেষোক্তজন প্রকৃতিগত আবেগ ও সম্ভাবনাকে সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মুকাবিলা করে এর উপর জয়লাভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দুশমনকেও পরাভূত করে থাকেন।

আঁ-হযরত (সা)-এর ভেতর প্রকৃতিগত আবেগ ছিল। কেননা পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি মদদ ও জয়লাভের জন্য দরবারে ইলাহীতে সিজদাবনত হতেন। তিনি চিন্তান্বিতও হতেন, কিন্তু কখনো ভীত-সন্ত্রস্ত কিংবা পেরেশান হতেন না। তাঁর মধ্যে এই কামালিয়াত ছিল যে, প্রতিরক্ষা কৌশলের আওতায় আত্মরক্ষামূলক লড়াই লড়া সত্ত্বেও প্রতিরক্ষামূলক অগ্রাভিযানও নিজের তরফ থেকেই করতেন এবং একবার তা লাভ করার পর আর হস্তচ্যুত হতে দিতে চাইতেন না! এজন্যই দুশমন তাঁর প্রতিরক্ষা চাল মুতাবিক চলাচল ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণে বাধ্য হ'ত। কতক প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকের পক্ষে এই বলা সম্ভব যে, আঁ-হযরত (সা) বদর ও ওহুদের যুদ্ধে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন না করে প্রতিরক্ষার স্বীকৃত মূলনীতির পরিপন্থী কাজ করেছেন। এর জওয়াব প্রথমত এই যে, আঁ-হযরত (সা) এ ব্যাপারেও ইজতিহাদ ও ইমামতের আসনে সমাসীন ছিলেন। অতঃপর পশ্চাদ্ধাবন না করাটাও যুক্তিসিদ্ধতা ও উপযোগিতা বহির্ভূত ছিল না। যে সমস্ত লোক এই সব যুদ্ধে সংঘটিত ঘটনাবলী ও অবস্থাদি গভীরভাবে ভেবে দেখবেন, তারা অপরিহার্যভাবেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন না করাটাই সঠিক ছিল। এতদ্ভিন্ন সে যুগে সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাগত আধিক্য কতক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ'ত। আজকাল এর পরিমাপ হাওয়াই জাহাজ, সামুদ্রিক নৌ-বহর এবং আধুনিক যান্ত্রিক সমরাস্ত্র সজ্জিত ফৌজের সঙ্গে করা যেতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ফৌজের নিকট আধুনিক যান্ত্রিক অস্ত্রশস্ত্র অর্থাৎ হাওয়াই জাহাজ, ট্যাংক ইত্যাদি ছিল। এজন্য পোল্যাণ্ডের বীর সৈন্যরা কয়েক দিনের মধ্যেই মরে নিঃশেষ হয়ে যায়। আঁ-হযরত (সা) শত্রুর সংখ্যা এবং খালিদের ব্যাটালিয়ন শক্তির সঠিক পরিমাপ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি স্বীয় সামরিক কূটনীতির দ্বারা তা ছিন্নভিন্ন করেছিলেন এবং এতে নজীরবিহীন সাফল্য লাভ করেন।

ওহুদ যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে আজকের প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকদের জন্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির উপকরণ সরবরাহ করে এবং এর মাধ্যমে আঁ-হযরত (সা) প্রতিরক্ষা কৌশল ও সামরিক কলা-কৌশলের এমন সব উন্নত নমুনা রেখে যান যা হামেশা হেদায়েতের উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকারূপে কাজ করবে।

এ সব গযওয়া বা যুদ্ধের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আঁ-হযরত (সা)-এর সাফল্যে বিশেষ স্থানের দাবীদার, আর তা হ'ল তাঁর দ্রুতগতি নয়---বরং বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন চলাচল ও গতিবিধি। আঁ-হযরত (সা) স্বীয় পরিকল্পনাধীনে বড় বড় বাহিনীকে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে চালনা করতে কৃতিত্বপূর্ণ দক্ষতার অধিকারী ছিলেন, ঠিক বিজলী চমকালে চোখ ধাঁধিয়ে যাবার মতই। দুশমন তাঁর বিদ্যুৎসম চলাচল ও গতি বিধি দৃষ্টে হয়রান ও পেরেশান হয়ে যেত। নেপোলিয়ন সম্পর্কে তাঁর সৈন্যরা বলাবলি করত : তিনি প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন মূলনীতি প্রণয়ন করেন এবং তা এই যে, তিনি আমাদের সঙ্গীনগুলোর মুকাবিলায় আমাদের পাগুলো থেকে বেশি কাজ আদায় করেন। মনে হয় নেপোলিয়ন, যিনি ইতিহাসের একনিষ্ঠ ও নিবিষ্ট চিত্ত পাঠক ছিলেন, এই মূলনীতি আঁ-হযরত (সা) থেকেই শিখে থাকবেন। কেননা আঁ-হযরত (সা)-ই একমাত্র সিপাহসালার যিনি একে অবলম্বন করে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেন এবং এমন স্থানে ও এমন সময়ে করেন যেখানে এ ধরনের দ্রুতগতিসম্পন্ন অগ্রাভিযানের কল্পনাও করা যায় না।

রণাঙ্গনে হুশ-বুদ্ধি ঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরী। বেশীর ভাগ জয় পরাজয় এরই উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। সিপাহসালারের হুশ-বুদ্ধি যখনই খেই হারিয়ে ফেলেছে অমনি ফৌজও খতম হয়ে গেছে; সংখ্যাধিক্য কিংবা সমর ও মারণাস্ত্রের প্রাচুর্য তখন কোনই কাজে আসে নি। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর প্রশান্তি, স্থৈর্য ও উপস্থিত বুদ্ধি পর্যন্ত দুনিয়ার কোন সিপাহসালার আজও পৌছয় নি। তীরন্দাযদের ভুলে ওহুদে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পাশা ওল্টালে কিছু জীবন উৎসর্গকারী সৈন্য চিৎকার করে বলে উঠল : আগে রসূলুল্লাহ (সা)-কে বাঁচাও। কিন্তু তিনি অন্তর্দৃষ্টি মেলে দেখতে পেয়েছিলেন খালিদের ব্যাটালিয়নের হাত থেকে তিনি নিরাপদ এবং অবশিষ্ট কাফির বাহিনীকে প্রথম পরাজয়ের ধকল কাটিয়ে উঠতে ও ধাক্কা সামাল দিতে এবং পাল্টা আক্রমণ করতে সময় লাগবে। তিনি এও অনুভব করেছিলেন

যে, শত্রুর কয়েকজন সেনানায়ক আবু সুফিয়ানের যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রশ্নে সন্দিহান। তিনি আপন স্থানে অটল থাকেন, আর শুধু অটলই থাকেন নি বরং একদিকে তিনি মুসলিম বাহিনী পরিচালনাও করতে থাকেন, আবার অপরদিকে তিনি হাতাহাতি যুদ্ধেও লিপ্ত থাকেন। অবশ্য আল্লাহ্ রব্বুল 'আলামীনের দরবারে এ দু'আ পেশ করেছিলেন অপরিহার্যভাবেই, "ইলাহী! আমার কওমের দোষ-ত্রুটি তুমি মাফ করে দাও। আর এটাও তো সেই প্রশান্তি ও স্থৈর্যেরই আলামত যার বর্ণনা উপরে দেওয়া হয়েছে। এরপর যখন পাল্টা আঘাত হানা হ'ল, দেখা গেল দুশমন ভাগছে। না তাদের সমাবেশ অক্ষুণ্ণ রইল, না রইল তাদের সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি কিংবা মনোবল।

এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই পরিস্থিতির বড় কারণ ছিল আঁ-হযরত (সা)-এর সতর্কতা, বুদ্ধিমত্তা এবং সামরিক নৈপুণ্য। অপর দিকে আবু সুফিয়ানের ভুল-ভ্রান্তিও এর অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু এই ভুলভ্রান্তিও আঁ-হযরত (সা)-এর যোগ্যতার কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণত তার বড় একটা ভ্রান্তি ছিল এই যে, সে স্বীয় বাহিনীর জন্য যথেষ্ট খোরাক ও পানীয়ের যথোপযুক্ত ইন্তেজাম করে নি। অল্প স্বল্প যা কিছু করেছিল তা যুবায়র (রা)-এর অশ্বারোহী কোম্পানী ও মুসলিম বাহিনীর হামলায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। সম্ভবত এটাই কারণ ছিল যে, মুসলিম বাহিনীর বিশৃংখল অবস্থাদৃষ্টে যখন কয়েকটি প্লাটুন মুসলমানদের পরাজয় নিজেদের কামিয়াবী ও সাফল্যের ধারণায় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় নিজ নিজ ছাউনীর দিকে ফিরে চলেছিল, তখন একের পর এক অন্যান্য প্লাটুনও সেদিকেই গতি ফেরায়। তারা যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফলের পরওয়াও করে নি। এটা কোন আশ্চর্যের কথা নয়। ১৯৩৯—৪৫ ঈসায়ীর যুদ্ধেও এ ধরনের ঘটনা একাধিক দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং তার পরিণতিও তেমনিই ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে।

একটি ভুল ধারণা

কতক ঐতিহাসিক আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার উপর গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা না করেই লিখে দিয়েছেন যে, আঁ-হযরত (সা) মদীনার মধ্যে থেকে লড়াই করতে চাইছিলেন, কিন্তু 'আবদুল্লাহ্ বিন উবায়্য

ইবনে সলূলের পরামর্শে মদীনার বাইরে বেরিয়ে পড়তে উৎসাহিত হন। এই পরামর্শ সম্পর্কে ইতিপূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে এবং এর উপর বিভিন্ন মতামতও প্রকাশ করা হয়েছে। এর ভ্রান্তি কোথায় এখন সে সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করছি যাতে একে উপলক্ষ করে আঁ-হযরত (সা)-এর দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বসুলভ যোগ্যতার উপর যে আঘাত আসছে তা দূরীভূত হয়ে যায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেই সাহাবা এবং জ্ঞানী-গুণী ও বিজ্ঞ মুসলমানদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতেন। উদাহরণত, বদর যুদ্ধের পূর্বে তিনি যে পরামর্শ করেছিলেন তার একটা বড় উদ্দেশ্য এই ছিল যে, যেন এর ফলে দুর্বল ও কমযোর মনের অধিকারী এবং অস্থির ও চঞ্চলমতি লোকদের খুঁজে বের করা যায়। এরপর তিনি এমন লোকদের দুশমনের সঙ্গে লড়াই করতে নিয়ে চলেছিলেন যাদের আত্মীয়-স্বজন দুশমনের সঙ্গেই ছিল। তিনি পুরোনো সমরনীতির অনুসরণ করতে চাচ্ছিলেন। তাঁকে মদীনা সনদ-এর বর্ণিত শর্তগুলোও পরিবর্তন করতে হবে এবং মিত্র কবিলাগুলোর হেফাজতের যিম্মাদারীও পুরো করতে হবে। সংবাদদাতা ও গুপ্তচরদের প্রদত্ত তথ্যের যথার্থতা অবগত হওয়া ওহুদ যুদ্ধের পূর্বের পরামর্শের উদ্দেশ্য ছিল। পরামর্শে 'আবদুল্লাহ্ বিন উবায়্য ইবনে সলূলের অংশ গ্রহণ এবং তাঁর থেকে আঁ-হযরত (সা)-এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। 'আবদুল্লাহ্ বিন উবায়্য ইব্ন সলূল ছিল মুনাফিক এবং তার সঙ্গে তিনশ'র মতো লোক ছিল। সে যে শত্রু পক্ষের লোক আঁ-হযরত (সা) তা জানতেন এবং এও জানতেন যে, সে মুসলমানদের চোখে ধূলো দিতে চায়, তাদের করতে চায় প্রতারিত। কিন্তু তবুও তিনি পরামর্শ করলেন এবং এজন্য করলেন যেন শত্রুর পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। আর ব্যাপারটা তাই ঘটল। যখন সে বলল, মদীনার বাইরে গিয়ে লড়াই করা উচিত তখনি তিনি মুশরিকদের যুদ্ধের চিত্র সম্পর্কে বেশ ভালোভাবেই পরিমাপ করতে পারলেন। এটা বোঝা যায় যে, আঁ-হযরত (সা) মদীনার অভ্যন্তরে কেল্লাবন্দী থেকে লড়াই করতে চেয়েছিলেন কিন্তু 'আবদুল্লাহ্র পরামর্শে তিনি বাইরে বেরুলেন, এ-কথা স্পষ্টতই ভ্রান্তিপূর্ণ ও হাস্যকর। যদি এমনটি হ'ত এবং তাঁর যদি নিজস্ব প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণীত না থাকত তবে তিনি মদীনা থেকে বেরিয়ে 'আবদুল্লাহ্ বিন

উবায়্য-এর মর্জি মুতাবিক ঠিক সেই রাস্তাই এখতিয়ার করতেন এবং সেই স্থানে পৌঁছুতেন যেখানে মুশরিককুল তার মাধ্যমে আঁ-হযরত (সা)-কে ফন্দীতে ফাসাতে চেয়েছিল; অথবা তার ইচ্ছা মাফিক না চলতেন তবে মদীনার অভ্যন্তরে থেকেই লড়তেন, কিন্তু ঘটনা উল্লিখিত দু'টো ধারণাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এবং পরিষ্কার ঘোষণা দিচ্ছে যে, আঁ-হযরত (সা) স্বীয় পরিকল্পনা মুতাবিক মদীনা থেকে বেরিয়ে আসেন এবং স্থিরীকৃত পরিকল্পনা মুতাবিক শায়খায়ন পৌঁছেন। 'আবদুল্লাহ্ দেখল যে, তার পরিকল্পনা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। সে সামনে অগ্রসর হতে স্বীকার করে বসলো এবং বিগড়িয়ে গিয়ে পৃথক হয়ে গেল। এর থেকে এ কথার অধিকতর সমর্থন মিলল যে, এই মুনাফিক আঁ-হযরত (সা)-কে ধোকা দিতে চেয়েছিল এবং মনে করছিল যে, সে আঁ-হযরত (সা)-কে স্বীয় জালে ফাঁসিয়ে মুশরিকদের পুরস্কারের হকদার হবে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) এই মুনাফিককে স্বীয় চাল চেলে এমনভাবে মাত করে দিলেন যে, সে আলাদা হয়ে 'ধোপার কুত্তা, না ঘরকা---না ঘাটকা' হয়ে রইল। মুসলমানদের সে যেমন কোন ক্ষতি করতে পারল না, তেমনি পারল না মুশরিকদের কোন উপকার করতে। ফলে দু'দিক দিয়েই তার অবস্থা অনেকটা খারাপ হয়ে গেল।

এ থেকে এই বাস্তব সত্যও দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয়ে যায় যে, আঁ-হযরত (সা) পরামর্শের সময় এর আগে কিংবা পরে স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার গোপন রহস্য কারও কাছেই প্রকাশ করেন নি। কোন কোন মুজাহিদীনেরও এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল যে, আঁ-হযরত (সা) 'আবদুল্লাহ্‌র বলাতেই বুঝি মদীনার বাইরে গিয়ে লড়াই করতে তৈরী হয়েছেন। যদিও তারা পরে তাদের ভুল বুঝতে পেরেছিল এবং তাদের তওবাহ্ করতে হয়েছিল।

কেউ এটা বলতে পারে যে, আঁ-হযরত (সা) যখন স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করে নিয়েছিলেন এবং তাঁর উপরই যখন তাঁকে 'আমল করতে হবে তখন পরামর্শের আর কি প্রয়োজন ছিল। এ পর্যায়ে প্রথমেই এ কথাটা বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাঁর প্রতিটি কর্ম, 'আমল ও বাণী মুসলমানদের জন্য আদর্শ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচিত। তিনি মুসলমানদের বলতে চেয়েছিলেন যে, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও জাতীয় বিষয়ে পরামর্শ

করা অপরিহার্য। বাহাছ-মুবাহাছা বা আলোচনা-সমালোচনা ও বিভিন্নমুখী মতামত পেশের পর যে ফয়সালা গৃহীত হয় তা উৎকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং এর পেছনে থাকে জনসমর্থনের নৈতিক শক্তি। দ্বিতীয়ত, এটাও অকাট্যরূপে নিশ্চিত ও অপরিহার্য হওয়া শর্ত নয় যে, এ ধরনের ফয়সালা নির্ভুল ও সঠিক হবেই। নেতা ও আমীর স্বীয় উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উৎকৃষ্ট কর্মসূচী বানাতে পারেন এবং তার উপর 'আমলও করতে পারেন। পরামর্শ গ্রহণের অর্থ অপরিহার্যভাবে তা অনুসরণ করতেই হবে —এমন নয়।

এ দিক দিয়ে আঁ-হযরত (সা)-এর ব্যক্তিত্ব দুনিয়ার অপরাপর অধিনায়ক থেকে বিলকুল আলাদা। উদাহরণত, নেপোলিয়ন বলেন, "আমি যত লড়াই লড়েছি তা কারও সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকেই লড়েছি। যদি আমি পরামর্শ নিতাম তবে কামিয়াব ও সফল জেনারেল হতে পারতাম না।" অর্থাৎ এ যেন তিনি মতভেদ ও মত-বৈষম্যের হাত থেকে বাঁচার সহজ তরীকা এখতিয়ার করছেন; কিন্তু এতদ্সঙ্গে এটাও স্বীকার করা উচিত ছিল যে, ঐ সব লড়াইকে তিনি ব্যক্তিগত লড়াই বনিয়ে নিয়েছিলেন এবং পরিণতি কিংবা ফলাফলের খেয়াল করেন নি। সামনে এগিয়ে তিনি বলছেন, "প্রতিটি লোকের মতামত ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু স্বাধীন মত পোষণ করা প্রতিটি নাগরিকের জন্মগত অধিকার। তেমনি প্রতিটি জেনারেল নিজস্ব কায়দায় লড়তে চায়। জেনারেল কেলারম্যানের (Kellermen) অভিজ্ঞতাকে আমি স্বীকৃতি দিই এবং নিঃসন্দেহে তিনি দেশের জন্য আমার চাইতেও উন্নত ধরনের লড়াই লড়তে পারবেন। কিন্তু আমরা দু'জন মিলে গড়বড় সৃষ্টি করব এবং ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, আমরা পরাজিত হব। আমার মতে এটাই ফৌজের জন্য উৎকৃষ্ট নীতি যে, মামুলী যোগ্যতাসম্পন্ন একজন অধিনায়ক দু'জন সুদক্ষ ও সুযোগ্য অধিনায়কের চেয়ে উত্তম। অধিকন্তু একজন বাদশাহ্ ও একজন জেনারেলের কার্যক্রমের মধ্যে পার্থক্য এই যে, বাদশাহ্ দূরদর্শিতার সঙ্গে প্রতিটি বিজয়ের ফলাফল ও পরিণতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন (অর্থাৎ যুদ্ধে জয়লাভ তার হুকুমতের জন্য কি পরিণতি বয়ে আনবে), কিন্তু জেনারেল স্বীয় প্রতিরক্ষা উদ্দেশ্যের আওতায় শুধুমাত্র জয়লাভ কামনা করে থাকেন।"

আঁ-হযরত (সা) আল্লাহ তা'আলার মনোনীত নবী, মানব জাতির পথ-প্রদর্শক এবং মুসলমানদের নেতা ও শাসক ছিলেন। তাঁকে বাদশাহ্ অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্মদৃষ্টি ও দূরদর্শিতার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করা জরুরী ছিল। তাঁর সামনে শুধুই বিজয় এবং কেবল হুকুমতের কল্যাণ ও সুব্যবস্থাপনার খেয়ালই ছিল না, বরং পথভ্রষ্ট মানবতাকে সিরাতু'ল-মুস্তাকীমে নিয়ে আসা এবং 'আমল ও আখলাকের একটি পরিপূর্ণ নমুনা কায়েম করাও ছিল জরুরী। অতএব তাঁর জন্য পরামর্শ করা যেমন জরুরী ছিল, তেমনি অপরিহার্য ছিল অতীব উপযোগী ও সঠিকতার উপর 'আমল করে কল্যাণ ও মঙ্গলের শাহী সড়ক উন্মুক্ত করে দেওয়া; সেহেতু তাঁর প্রতিটি নীতি, প্রতিটি কর্ম এবং প্রতিটি বাণী ও আমল ভুল ও ভ্রান্তির হাত থেকে পাক-পবিত্র তথা সকল সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে, জীবনের প্রতিটি বিভাগ, প্রতিটি পর্যায় ও প্রতিটি মনযিলে আলোক-বর্তিকাস্বরূপ। তাঁর গযওয়া বা যুদ্ধসমূহ প্রতিরক্ষা বিভাগের ছোট-বড় প্রতিটি সদস্যের জন্য নমুনা ও দৃষ্টান্তের মর্যাদা রাখে। আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি, উদ্ভাবনী শক্তি, চিন্তা ও গবেষণা, সুযোগ-সন্ধানী ও দৃঢ়তা এবং দুশমনের পরিকল্পনাকে স্বীয় কর্মকৌশল দ্বারা বানচাল করে দেওয়া যে কোন জেনারেলের জন্যই কেবল নয়---প্রতিটি মানুষের কামিয়াবী ও সাফল্যের জন্যও অপরিহার্য।

এটি একটি সর্বজনস্বীকৃত বিষয় যে, আঁ-হযরত (সা) নিজ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে কার্যকর করেন। তাঁর সামনে, ডানে ও বামে ছিল দুশমন। প্রতিরক্ষা কেন্দ্র মদীনা এবং তাঁর ফৌজের মধ্য-ভাগে ছিল শত্রু বাহিনী। অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও স্থৈর্যের পরীক্ষার ছিল নেহায়েত নাযুক সময়। কিন্তু এর থেকে পরিষ্কার প্রতিভাত যে, এমন পরিকল্পনা কেবল তেমন একজন অধিনায়কই তৈরী করতে পারেন এবং তার উপর 'আমল করতে পারেন এমন একজন জেনারেল যিনি পাহাড়সম ইচ্ছাশক্তি, মনোবল ও স্থৈর্যের প্রতিমূর্তি হবেন। একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আঁ-হযরত (সা) কেবল সিপাহসালারই ছিলেন না, তিনি সম্রাটও ছিলেন; ধর্মীয় ইমাম এবং মযহাবী নেতাও ছিলেন তিনি। এজন্য তাঁকে স্বীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের মুহূর্তে কতক প্রতিরক্ষা নীতিকে রাজনৈতিক মূলনীতির আওতায় করতে হয়েছে। আঁ-হযরত (সা) এমন অবস্থায় নির্দোষ ও সর্বাপেক্ষা সফল প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করে দেন যে, এক্ষেত্রেও তিনি একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সিপাহসালার।

আঁ-হযরত (সা)-এর ব্যক্তিসত্তা ও প্রশংসিত গুণাবলী এর থেকে উর্ধ্বে যে, তাঁর প্রশংসার জন্য কোন পার্থিব রাজা-বাদশাহ্‌র সম্পর্কিত প্রশংসামূলক বর্ণনা ও বিবৃতি সমর্থন ও সনদ হিসাবে পেশ করা হোক। তথাপি আমরা প্রতিরক্ষা কৌশল ও সামরিক নৈপুণ্যের সিলসিলায় পাশ্চাত্যের বর্তমান ও অতীত অধিনায়ক ও প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকদের চিন্তাধারা ও পর্যবেক্ষণ থেকে উপকার গ্রহণ করে আসছি এবং এজন্য তা করে আসছি যে, তা পেশ করায় দোষের কিছু দেখতে পাই নি। য়ূরোপের একজন সুযোগ্য প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক একজন বাদশাহ্‌র প্রশংসা নিম্নলিখিত ভাষায় করেছেন ঃ

"সিপাহসালার হিসাবে তিনি নিজের বহু সমসাময়িক অপেক্ষা উত্তম ও অগ্রগামী ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ী হওয়া এবং শোহরত হাসিল করার জন্য তিনি লালায়িত ছিলেন না। সে সব সিপাহসালারের প্রতিও তাঁর কোন ঈর্ষা ছিল না যারা এক্ষেত্রে বিশ্বজোড়া খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। যুদ্ধ ছিল তাঁর নিকট বিশেষ একটি লক্ষ্য হাসিলের মাধ্যমমাত্র, আর সে লক্ষ্য ছিল শান্তির লক্ষ্য। যুদ্ধের ময়দানে তিনি বহু বিজয় লাভ করেছেন। কিন্তু এমন কয়েকটি অভিযানেও অংশ নেন যেগুলো তিনি অঙ্গীকারনামার দ্বারা জয় করেন এবং এ বিজয় তাঁর নিকট যুদ্ধক্ষেত্রের বিজয় অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এজন্যই তিনি অন্যান্য সিপাহসালারের চাইতে ব্যতিক্রমী ছিলেন।"

গভীরভাবে ভেবে দেখুন যে, এই অভিনন্দন ও প্রশংসার পাত্র কি আঁ-হযরত (সা) হন না? যেহেতু এই রায় এবং এই প্রশংসাকে পাশ্চাত্য দুনিয়াতে দৃষ্টান্তমূলক ব্যক্তিত্বের তা'রীফ মনে করা হয়, এজন্যই আমরা সেটা এখানে পেশ করতে সাহসী হয়েছি। আজকাল পাশ্চাত্যের রায় ও মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়। অন্যথায় যেমন আমরা লিখেছি, আঁ-হযরত (সা)-এর ব্যক্তিসত্তা এত উন্নত ও মহান যে, অপর কাউকে মুকাবিলায় এনে তাঁকে দৃষ্টান্ত হিসাবে খাড়া করা অত্যন্ত গোস্তাখী এবং বেয়াদবী বৈ কিছু নয়। যা-ই হোক—এর অর্থ এই যে, আঁ-হযরত (সা) পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মাপকাঠিতেও একজন পূর্ণাঙ্গ সিপাহসালার এবং একজন পরিপূর্ণ সম্রাট ছিলেন। বস্তুত নেপোলিয়ন তো এমন প্রতিটি ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নত মর্যাদার অধিকারী মনে করেন---"যিনি বিপদ-আপদের মুকাবিলায় সদা প্রস্তুত এবং যিনি এ পরিমাপও করতে পারেন কোন্ সময় বিপদাপদের মুখোমুখি

হওয়া যায়। তাঁর (সিপাহসালারের) এই বৈশিষ্ট অন্য সব বৈশিষ্ট্য থেকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ। কেননা এমনটি করার যোগ্যতা তাঁকে বিরাট থেকে বিরাটতর কৃতিত্বপূর্ণ দায়িত্ব আঞ্জামে দক্ষ বানিয়ে তোলে।" অর্থাৎ পূর্বাভাষ ও সঠিক ফয়সালার যোগ্যতা এতখানি গুরুত্ব রাখে যে, নেপোলিয়ন এর অধিকারীকে পরিপূর্ণ সিপাহসালার হিসাবে মেনে নিচ্ছেন।

এখন আঁ-হযরত (সা)-এর যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যগুলো স্মরণ করুন এবং তাঁর মহান মর্যাদার সমুন্নতির পরিমাপ করুন, অন্য কোন সিপাহসালার কি তাঁর মর্যাদায় উপনীত হতে পারেন? সে যুগে যুদ্ধের তরীকা-পদ্ধতি এই ছিল যে, বিবদমান ও সংঘর্ষমুখর দু'টো দল একে অপরের সামনে খাড়া হয়ে যেত। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) সেই তরীকা-পদ্ধতি এখতিয়ার করেন আজকের বিশ্বের প্রথিতযশা সামরিক বিশেষজ্ঞগণ যাকে আধুনিক ও প্রগতিশীল যুদ্ধ-পদ্ধতি বলেন। সবগুলো যুদ্ধে আবার একই পন্থা ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি, বরং মোর্চাবন্দী পরিকল্পনায় প্রতিবারই নতুনত্ব ছিল। বদরে আঁ-হযরত (সা) মুসলিম বাহিনীকে দুশমনের এক পার্শ্বে (flank) মোতায়েন করেন, ওহুদে শত্রুর পরিকল্পনাকে ব্যর্থ ও বানচাল করার জন্য তাদের প্রতিরক্ষা কেন্দ্র ও তাদের বাহিনীর মধ্যখানে মোর্চাবন্দী করেন। আজকের দুনিয়ায় এমন অভিজ্ঞতাসুলভ সৈন্যচালনা ও মোর্চাবন্দীর উদাহরণ আমরা জার্মানী, রাশিয়া এবং মিত্রবাহিনীর সে সব ফ্রন্টে পেতে পারি যা তারা ১৯৩৯-৪৫ 'ঈসায়ীর যুদ্ধে কয়েকবার করেছিল। কিন্তু এ ধরনের যুদ্ধ চলাকালে পরাজিতের ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার কোন কল্যাণ অথবা কোন সামরিক মূলনীতির আওতায় ফৌজকে পেছনে সরানো বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য এর উপর কেবল সেই অধিনায়কই আমল করতে পারেন যিনি সমরশাস্ত্রে পরিপূর্ণরূপে অভিজ্ঞ, অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও মনোবলের অধিকারী এবং তেজোদৃপ্ত ও নির্ভীক হবেন।

ওহুদের পরঃ রাজী'র ঘটনা

ওহুদ যুদ্ধের ফলে আরব কবিলাগুলোর মধ্যে একটা অস্থির ও অস্বস্তিকর অবস্থা ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মন-মানসে কুরায়শদের যবরদস্ত বাহিনী-দৃষ্টে বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে তাদের হিম্মত দানা বাঁধতে শুরু করে। য়াহূদীরা এই সুযোগে ফায়দা ওঠাতে চেষ্টা করে এবং মুশরিকদের সঙ্গে মিলিতভাবে মুসলমানদের

দুর্বল ও কমযোর বানানোর পরিকল্পনা তৈরী করে। মুসলমানদের শক্তি ও সংহতিকে পরাভূত করে খতম করে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

এই পরিকল্পনার আওতায় 'আযল ও কারা' নামক দু'টি গোত্রের একটি দল আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে এসে হাযির হয় এবং আরয পেশ করে : আমাদের কওম যদিও ঈমান এনেছে, কিন্তু তাদের ভেতর অনেক লোকই ইসলামের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে আদৌ অবহিত নয়। অতএব দীন সম্পর্কে জানে এবং এতদসম্পর্কে যোগ্য ও অভিজ্ঞ কিছু লোক আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। তারা আমাদেরকে দীনের কথা শেখাবে এবং শরীয়তের হুকুম-আহকাম সম্পর্কে অবহিত করবে। আঁ-হযরত (সা) 'আসিম বিন ছাবিত (রা)-এর নেতৃত্বে দশজন সাহাবাকে তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন। এ সমস্ত লোক যখন সাহাবাদের এই ক্ষুদ্র দল সঙ্গে নিয়ে রাজী' নামক স্থানে পৌঁছুল,—এটি ছিল 'উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হুদাত-এর পাদদেশে একটি ঝর্ণা---তখন তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বনী লেহ্ইয়ানকে ইঙ্গিত দেয় এদেরকে শেষ করে দিতে। বনূ লেহ্ইয়ান দু'শো সশস্ত্র লোক, যাদের দেড়-শ'ই ছিল তীরন্দায, সঙ্গে নিয়ে মুসলমানদের ঘেরাও করে এবং তাঁদেরকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায়। সাহাবীরা একটি টিলায় গিয়ে আশ্রয় নেন। কাফিররা বলল, "তোমরা নীচে নেমে এস, আমরা তোমাদেরকে আশ্রয় দিচ্ছি।" সাহাবীরা উত্তরে জানালেন, "আমরা কাফিরদের আশ্রয় অস্বীকার করছি।" এই বলে তাঁরা আত্মরক্ষার জন্য সামান্য যা কিছু অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে ছিল—তাই নিয়ে প্রস্তুত হলেন। প্রথমে তাঁরা তীর বর্ষণ করলেন। তীর ফুরিয়ে যাবার পর নেযার সাহায্যে লড়লেন এবং এভাবে লড়াই করে আটজন সাহাবীই শাহাদত বরণ করেন। কাফিররা অবশিষ্ট দু'জন সাহাবীকে অভয় দিল, "আমরা তোমাদের জানে মেরে ফেলব না।" তাঁরা নীচে অবতরণ করলে তাঁদেরকে কয়েদ করা করা হয় এবং নিয়ে যাওয়া হয় মক্কায়। এরপর কুরায়শদের হাতে তাঁদেরকে গোলাম হিসেবে বিক্রি করে দেয়। এঁদের মধ্যে একজনের নাম ছিল খুবায়ব ইব্ন 'আদী (রা) আর অপর জনের নাম ছিল যায়দ বিন ওয়াছনা (রা)। হযরত খুবায়ব (রা) ওহুদ যুদ্ধে হারিছ বিন 'আমেরকে কতল করেছিলেন। তাঁকে হারিছের পুত্ররা পিতার প্রতিশোধে হত্যা করার মানসে কিনে নেয়। যায়দকে সাফ-ওয়ান বিন উমায়্যা হত্যার নিয়তে খরিদ করে। এর কয়েক দিন পর

কাফিররা এই দুইজন সাহাবীকে মক্কার হারাম শরীফের বাইরে নিয়ে যায় এবং বলে, "যদি ইসলাম পরিত্যাগ করো তবে তোমাদের জীবন ভিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।" তাঁরা জবাব দেন, "যদি ইসলামই না থাকল তবে জীবন নিয়ে কি হবে?" খুবায়ব (রা) দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি নিজেকে শাহাদতের মহান গৌরবের জন্য পেশ করেন। কাফিররা শূলে চড়িয়ে তাঁকে হত্যা করে। যায়দ বিন ওয়াছনা (রা)-এর কতলের দৃশ্য দেখবার জন্য কুরায়শদের বড় বড় সর্দার এসেছিল। তাদের মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিলেন। ইনি (যায়দ) বদর ও ওহুদ যুদ্ধে কয়েকজন কুরায়শকে মরণের ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এভাবেই অকুতোভয়ে একমাত্র আল্লা-হর জন্যই তিনি নিজের জীবন বিলিয়ে দিলেন।

বীরে মা'উনার ঘটনা

ওহুদের যুদ্ধের চার-পাঁচ মাস পরের কথা। সফর মাস। আবু বরা' 'আমের বিন মালিক বিন জা'ফর বনী 'আমেরের রঈস। নেযাবাজীতে সে ছিল অত্যন্ত সুদক্ষ। রসূল আকরাম (সা)-এর পবিত্র খিদমতে হাযির হয়ে বহু হাদিয়া-তোহফা পেশ করে। যদিও সে তখনো মুসলমান হয়নি তথাপি সে মুসলমানদের দুশমনও ছিল না। আঁ-হযরত (সা) কিন্তু তার হাদিয়া কবুল করেন নি এবং বলেন, "আমি কখনও কোন মুশরিকের হাদিয়া কবুল করি না।" অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি তাকে ইসলামের দা'ওয়াত দেন। আবু বরা 'আমের ইসলামের দা'ওয়াত ও ঈমানের তালকান শুনে নিশ্চুপ হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর আরজী পেশ করে, "আপ-নার দীন খুবই ভাল। কিন্তু আরও ভাল হবে যদি আপনি আপনার কিছু নির্বাচিত সাহাবা (রা)-কে নজদ-এ পাঠিয়ে দেন। সেখানে গিয়ে তারা নজদবাসীদের ইসলামের দা'ওয়াত দিতে পারবে। আমি আশা করি সে সব লোক এ দা'ওয়াত কবুল করবে।" আঁ-হযরত (সা) বলেন, "আমার লোকদের তারা কষ্ট দেবে বলে আমি আশংকা করছি।" আবু বরা' বলল, "আমি তাদের হেফাজতের সার্বিক দায়িত্ব নিজের যিম্মায় গ্রহণ করছি।" এই ওয়াদার উপর ভরসা করে আঁ-হযরত (সা) চল্লিশ জনের মত সাহাবা (রা)-র একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে মুনযির ইব্ন 'আমর আনসারীর

নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। তাদেরকে নজদের শাসনকর্তা 'আমের বিন তোফায়লের নামে একটি চিঠি লিখে দেন যেন আঁ-হযরত (সা)-এর তরফ থেকে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে তাকে এটি দেওয়া হয়।

এ কাফেলা মদীনা থেকে চার মনযিল দূরে বীরে মা'উনা নামক স্থানে পৌঁছুলে কাফেলার সর্দার আঁ-হযরত (সা)-এর লিপি মুবারক একজন কাসেদ মারফত 'আমের বিন তোফায়লের নিকট পাঠিয়ে দেয় এবং নিজে স্বয়ং সেখানেই অবস্থান করে। কাসেদ হারাম বিন য়ালমান লিপি মুবারক নিয়ে পৌঁছুলে নজদের শাসনকর্তা সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে এবং কাসেদকে পাকড়াও করে হত্যা করে। সঙ্গে সঙ্গে একটি বাহিনীসহ বীর মা'উনা হানা দেয়। বীর মা'উনা ছিল বনী 'আমের এবং বনী সলীম -এর প্রস্তরময় এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে। নজদের শাসনকর্তা বনী 'আমেরকেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে কুরায়শ চেষ্টা করে, কিন্তু যেহেতু আবু বরা' এই প্রতিনিধি দলকে আশ্রয় দিয়েছে—সেজন্য তারা ওয়াদা ভঙ্গ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে। এদের থেকে নিরাশ হয়ে 'আমের বিন তোফায়ল বনী সলীমের নিকট যায়। তারা 'আমেরের কথায় সম্মতি প্রকাশ করে। অতঃপর তারা মুসলমানদের উপর নিদ্রিতা-বস্থায় হামলা করে। মুসলমানগণ অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে মুকাবিলা করেন। কিন্তু যেহেতু শত্রুরা সংখ্যায় ছিল অধিক আর হামলাও ছিল একেবারে অতর্কিত ও আকস্মিক, ফলে একজন মুসলমান ব্যতিরেকে আর সবাই শহীদ হন। যিনি বেঁচেছিলেন তিনি আহত হয়ে শহীদবর্গের লাশের নীচে চাপা পড়ায় দুশমনের অগোচরে থেকে যান এবং মওকা মিলতেই তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান।

সে সময় ঘটনাক্রমে বনী 'আমর বিন 'আওফ-এর মুসলমান—যাদের সর্দার ছিলেন 'আমর বিন উমায়্যা আল-দামিরী এবং তাদের বন্ধু আনসারী বনূ সলীম-এর সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করছিলেন। তারা বিভিন্ন জাতের পাখী একই স্থানে চক্রাকারে ঘুরতে দেখেন। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখতে পান, মুসলিম শহীদদের লাশ স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে আছে। শত্রু বাহিনী সেখানেই বর্তমান ছিল। প্রথমে তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে এবং মদীনায় গিয়ে আঁ-হযরত (সা)-কে এতদ্সম্পর্কে অবহিত করার ব্যাপারটা ভেবে দেখে। 'অতঃপর আমরা দুশমনের ভয়ে পালিয়ে এসেছি'

---কেউ হয়তো এমন ধারণা করতে পারে—ধারণায় প্রথমে তারা তীরের সাহায্যে আক্রমণ চালান। পরে হাতাহাতি লড়েন। এতে আনসারী শাহাদত বরণ করেন এবং 'আমরকে দুশমন গ্রেফতার করে 'আমের বিন তোফায়েলের সামনে পেশ করে।

'আমের বিন তোফায়েল মুসলমানদের থেকে বদলা নেবার সাফল্যে একটি গোলাম আযাদ করার মানত মেনেছিল। অনন্তর সে 'আমরকে মুদার গোত্রের লোক জেনে তাঁর কপালের কিছু চুল কেটে তাঁকে আযাদ করে দেয়।

'আমর বিন উমায়্যা সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে কানাত পৌঁছেন। তিনি কারকুরাহ্‌র উচ্চতায় আরোহণ করে একটি গাছের ছায়ায় বসতেই অপর দিক থেকে দু'জন লোক আসতে দেখতে পান। তাদেরকেও বিশ্রাম নিতে দেখা গেল। 'আমর (রা) তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। জবাবে তারা নিজেদেরকে 'আমের গোত্রের লোক বলে জানায়। এ কথা শ্রবণ মাত্রই তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান। কিছুক্ষণ পর লোক দু'জন শুয়ে পড়লে 'আমর (রা) প্রতিশোধের নিমিত্ত তাদের উভয়কেই হত্যা করে ফেলেন।

এরপর মদীনায় পৌঁছে 'আমর (রা) সমস্ত ঘটনা আঁ-হযরত (সা)-কে বলেন। 'আমের গোত্রের দু'জন লোকের হত্যার খবর শুনে তিনি মন্তব্য করেনঃ 'আমাকে ঐ দু'জনের হত্যার বিনিময়ে রক্তপণ আদায় করতে হবে।'

এদিকে আবু বরা' বনী 'আমেরের ওয়াদা-খেলাফীর কথা জেনে খুবই দুঃখিত ও মর্মাহত হন এবং তার খান্দানের কতিপয় লোক পাল্টা জবাবে 'আমের বিন তোফায়েলকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। 'আমের বিন তোফায়েল আক্রান্ত হয়ে আহত অবস্থায় প্রাণে বেঁচে যায়।

বনূ নাযীর

মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরত্বে বনী নাযীরের বস্তী ছিল। বনূ নাযীর এবং বনূ 'আমেরের মধ্যে ছিল পারস্পরিক মিত্রতা। বনী 'আমেরের দু'জন লোকের হত্যা ঘটনার ভিত্তিতে তিনি হযরত 'আলী (রা), হযরত 'ওমর (রা) এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে বনী নাযীর-এর পাড়ায় তশরীফ নেন। নিজেদের আগমনের

উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমর বিন উমায়্যা ভুলবশত বনূ 'আমেরের দু'জন লোককে কতল করে ফেলেছে। বনী 'আমেরকে আমি নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছিলাম। এজন্য আমি তাদের রক্তপণ দিতে ইচ্ছুক।" বনূ নাযীর সে মুহূর্তে মুখ ফুটে কিছু বলল না বটে, কিন্তু আড়ালে আব-ডালে ফিসফিস চলতে লাগল। আঁ-হযরত (সা) সে সময় দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে বসেছিলেন। ফলে তারা আঁ-হযরত (সা)-কে উপর থেকে পাথর ফেলে একেবারে সাবাড় করে দেবার ষড়যন্ত্র করে। তিনি এই ষড়যন্ত্র টের পেয়ে যান! অতএব তিনি কোন এক অজুহাতে সেখান থেকে উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট সাহাবা সেখানে বসে থাকেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও তিনি না আসায় তাদের মনে চিন্তার উদ্রেক হয়। আশেপাশে তালাশ শুরু হ'ল, কিন্তু কোথায়ও সন্ধান পাওয়া গেল না। তারা মদীনায় ফিরে চললেন। এসে দেখতে পান আঁ-হযরত (সা) মসজিদে তশরীফ রেখেছেন। সাহাবীরা নিজেদের দুশ্চিন্তা ও আশংকার কথা ব্যক্ত করলে তিনি বললেনঃ 'য়াহূদীরা আমাকে হত্যার পরিকল্পনা এঁটেছিল। আমি তা জানতে পেরেছিলাম। অতএব এর ভেতরই মঙ্গল দেখতে পেয়েছিলাম যে, আমিই শুধু তাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে আসব না, তোমরাও নিরাপদ থাকবে। এজন্য আমি একাই শুধু উঠে এসেছি। আর যদি সবাই এক সঙ্গে উঠতাম তাহলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে দেখে নিরাশ হয়ে অবশেষে আমাদের সংখ্যাল্পতা দৃষ্টে অতর্কিত হামলা করে বসত।'

বর্ণিত আছে, যে মুহূর্তে বনূ নাযীর এই পরামর্শ করছিল যে, পাথর নিক্ষেপ করে আঁ-হযরত (সা)-কে চিরতরে খতম করে দেওয়া হবে তখন সালাম বিন মাশকাম এর প্রবল বিরোধিতা করে এবং বলে যে, এর ফলে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসবে। কিন্তু য়াহূদীরা তা মানেনি। 'আমর বিন জাহাশ যখন পাথর নিক্ষেপের জন্য বাড়ীর ছাদে আরোহণ করছিল আঁ-হযরত (সা) সেখান থেকে সে মুহূর্তে উঠে চলে গিয়েছিলেন।

এরপর আঁ-হযরত (সা) মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে ডেকে পাঠান এবং বলেনঃ বনূ নাযীরের য়াহূদীদের গিয়ে বল তারা কেবল ওয়াদা ভঙ্গই করেনি, দাগাবাজীও করেছে; অতএব তারা যেন অনতিবিলম্বে এ বস্তী ছেড়ে চলে যায় এবং মদীনার ধারে কাছেও না থাকে।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা য়াহূদীদেরকে আঁ-হযরত (সা)-এর পয়গাম পৌঁছুলে প্রথমে তারা নিজেদের লোকদেরকে আবেগোত্তেজিত করতে সাধ্য মতো চেষ্টা চালায় এবং বলেঃ কোন ব্যক্তি সম্পর্কে আমাদের এ আশা ছিল না, আর আমরা ভাবতেও পারিনি যে, সে আমাদের পুরনো চুক্তিপত্র ভঙ্গ করবে, আমাদের বাপ-দাদার ভিটে-মাটি ছেড়ে যাবার দাবি জানাবে এবং আওস গোত্র ধর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এতখানি বদলে যাবে। যা-ই হোক, আমরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখব। সম্ভব হলে এ ধরনের শক্ত আদেশ পালন করা কঠিন হলেও বরদাশ্‌ত করব।

এদিকে 'আবদুল্লাহ বিন উবায়্য ইবনে সলূল তাদেরকে বলে পাঠায়, "তোমরা কখনই নিজেদের বস্তী পরিত্যাগ করো না। আমার সঙ্গে দু'হাযার আরবের একটি জনসমষ্টি রয়েছে আর তোমাদের জনশক্তিও রয়েছে যথেষ্ট। এ ছাড়া বনী কুরায়জাও তোমাদের মদদ দেবার জন্য তৈরী আছে।"

বনী কুরায়জা ও আঁ-হযরত (সা)-এর মধ্যে চুক্তি বলবৎ ছিল এবং কা'ব বিন আসাদ চুক্তিপত্রে বনী কুরায়জার পক্ষে দস্তখত করেছিল। সে বলে পাঠায়, "যতক্ষণ পর্যন্ত আমি জীবিত আছি ততক্ষণ আমার কবিলার কোন লোক এই চুক্তিনামার পরিপন্থী কোন কাজ করতে পারে না।" সালাম বিন মাশকাম হুই বিন আখতাবকে আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশ তা'মিল করতে বলে। কিন্তু সে পরামর্শ কানে তোলে নি। সে আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে জুদী বিন আখতাবের মাধ্যমে বলে পাঠায়, "আমরা আপনার হুকুম পালন করব না। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন।" এ ছিল যুদ্ধেরই দা'ওয়াত। তিনি এ দা'ওয়াত কবুল করেন। আঁ-হযরত (সা)-এর মুখে যুদ্ধের ঘোষণা শ্রবণ মাত্র জুদী বিন আখতাব ইবনে উবায়্য ইবনে সলূলের নিকট গেল। সে সময় ইবনে সলূল নিজের কতিপয় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বসে ছিল। আর ওদিকে আঁ-হযরত (সা)-এর নকীব (ঘোষক) লোকদেরকে যুদ্ধ-প্রস্তুতি গ্রহণের সংবাদ দিচ্ছিল।

জুদী দেখল যে, 'আবদুল্লাহ্ বিন উবায়্য ইবনে সলূলের পুত্র 'আবদুল্লাহ্ স্বীয় পিতার সামনেই ঘরে প্রবেশ করল এবং হাতিয়ার নিয়ে মুজাহিদদের কাতারে গিয়ে শামিল হ'ল। এই দৃশ্যে জুদী হতাশ অবস্থায় হুইয়ের নিকট পৌঁছুল এবং তাকে গোটা ঘটনা খুলে বলল।

আঁ-হযরত (সা) স্বীয় বাহিনী সমেত বনূ নাযীরের পাড়া অবরোধ করেন। পনের দিন অবরোধের পর য়াহূদীরা সন্ধির দরখাস্ত পেশ করে। আঁ-হযরত (সা) এই শর্ত পেশ করেন যে, যে পরিমাণ সামান-আসবাব উটের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব—নিয়ে নির্বাসনে চলে যাও, কিন্তু হাতিয়ার নিতে পারবে না। য়াহূদীরা এই শর্ত মেনে নেয় এবং সেখান থেকে চলে যায়।

গাতফান গোত্র

এই অভিযানের পর আঁ-হযরত (সা) কিছু কাল মদীনায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু নজ্দ এলাকার অশান্তি ও ফেতনা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। অতএব তিনি মুজাহিদ বাহিনীসহ নজদের দিকে রওয়ানা হন। বনূ নাযীরকে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার কারণে সমস্ত য়াহূদীর মধ্যে ভীষণ রকমের বে-চইনী ও অস্থির অবস্থা ছড়িয়ে পড়ে। তারা মদীনায় আগমনকারী কাফে-লাগুলো দু'মাতুল জান্দালের আশেপাশে লুটতে শুরু করে। মদীনার খাদ্য-শস্যের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া তারা নজদের বিভিন্ন গোত্রকে আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে শুরু করে এবং মদীনাগামী কাফেলাগুলোকে লুটপাটের উদ্দেশ্যে গাতফানের কতিপয় গোত্রকে বিশেষভাবে তৈরী করে তাদেরকে টাকা-পয়সার লোভ দেখায়। ফলে তারাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লেগে যায়।

মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে নাখলা নামক স্থানে পৌঁছে তিনি এক দিকে গাতফানের বনূ মাহারিব ও বনূ ছা'লাবা কবিলার সামরিক প্রস্তুতির খবর পান। অপর দিকে এই সংবাদও এসে যায় যে, কুরায়শদের একটি তেজারতী কাফেলা নজদের রাস্তা হয়ে মক্কার দিকে যাচ্ছে। এ কাফেলা সিরিয়ার দিক থেকে এসেছিল এবং তিনি নাখ্লা পৌঁছুতে পৌঁছুতে কাফেলা মক্কার দিকে অনেক দূরে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। অনন্তর তিনি আবু সুফিয়ানের রণপ্রস্তুতির খবরও পেয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান একটি বিরাট বাহিনীসহ বদরের দিকে অগ্রসর হতে চাচ্ছিলেন। অতএব গাতফানের কবিলাগুলোকে প্রভাবিত করবার জন্য কয়েক দিন তিনি নাখ্ল-এ অবস্থান করেন। এর প্রভাব তাদের উপর পড়ে। এরপর বিদ্যমান সময় ও অবস্থার

প্রেক্ষিতে মদীনায় ফিরে যাওয়া এবং তেজারতী কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন না করাই তিনি সমীচীন মনে করেন। গাতফানের কবিলাগুলোর তরফ থেকে যখন সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন এবং তারা শয়তানী আচরণ থেকে বিরত থাকল, তখন তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর জুমাদা আল-উলার শেষ ভাগ থেকে রজব মাস পর্যন্ত তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন।

এখন যেহেতু আবু সুফিয়ানের দিক থেকে বেশী আশংকার কারণ ছিল, সেজন্য আঁ-হযরত (সা) তার পরিকল্পনাগুলো ছিন্ন ভিন্ন করার দিকে মনোনিবেশ করেন এবং 'আমর বিন উমায়্যা আল-দামিরী ও একজন আনসারকে এই উদ্দেশ্যেই সেখানে পাঠান যে, তারা সেখানে গিয়ে ভয়-ভীতি ছড়াবে এবং সেখানকার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন ও দুর্বলতা সৃষ্টি করবে। তাদেরকে এও অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যে, সুযোগ পেলে আবু সুফিয়ানকে হত্যা করবে। তারা দু'জনে মক্কার নিকটবর্তী 'বাত্ন' নামক স্থানে পৌঁছে তাদের উট একটি গিরিপথে বেঁধে রেখে নিজেরা মক্কায় প্রবেশ করেন। কিন্তু তাদের একটা ভুল হয়েছিল যে, কা'বা তাওয়াফ করতে তাদের যেন কেউ চিনে না ফেলে সে ব্যাপারে কোন সতর্কতা তারা অবলম্বন করেন নি। অতঃপর মক্কায় ঘোরাফেরার জন্য তারা সঠিক সময়ও যেমন নিরূপণ করেন নি, তেমনি তারা খেয়াল করেন নি আলোর ব্যাপারেও। অনন্তর তারা যখন একটা মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন এক ব্যক্তি 'আমর (রা) কে চিনে ফেলে। সে চিৎকার করে উঠলে লোক তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

'আমর (রা) তাঁর বন্ধুসহ দৌড়ে একটি গিরিগুহায় আত্মগোপন করেন। যে সময় তারা গুহায় লুকিয়ে ছিলেন তখন'উছমান বিন মালিক বিন 'উবায়দুল্লাহ্ নামের একটি লোক ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে গুহার মুখে এসে দাঁড়িয়ে যায়। এরপর অবতরণ করে বসে পড়ে। 'আমর (রা) অতি নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে তার বুকে সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর আমূল প্রবেশ করিয়ে দেয়। ইবন মালিক চিৎকার করে পড়ে যায়। মক্কাবাসীরা তার চীৎকারের আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসে। 'আমাকে 'আমর-বিন উমায়্যা খঞ্জর মেরেছে' কথা ক'টি বলা মাত্রই সে মারা যায়। লোকেরা তার লাশ উঠিয়ে মক্কায় নিয়ে যায়। এই দু'জন দু'দিন পর্যন্ত গুহায় আত্মগোপন করে থেকে পরে

সেখান থেকে তাইয়ান শহরে আসেন। এখানে তারা হযরত খুবায়ব (রা)-এর লাশ শূলদণ্ডে লটকানো দেখতে পান। 'আমর (রা) পাহারাদারদের চোখ এড়িয়ে সামনে অগ্রসর হন এবং লাশ নামিয়ে ও পিঠে উঠিয়ে আনুমানিক ৩০/৪০ গজ যেতেই পাহারাদাররা দেখে ফেলে। তারা এদের পেছনে ধাওয়া করে। 'আমর (রা) লাশ ছেড়ে পালিয়ে যান এবং সফরের পথ ধরেন। সেখান থেকে নিজে পায়ে হেটে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং সমস্ত সংবাদ পৌঁছানোর জন্য সঙ্গীকে নিজের উটের পিঠে চড়িয়ে আগে পাঠিয়ে দেন।

'আমর (রা) গালীল হুজনান পৌঁছে বনী যায়ল বিন বকরের একজন শক্ত-সমর্থ যুবককে শায়িতাবস্থায় কতল করেন এবং রকুবা রওয়ানা হন। এই যুবক ছিল আবু সুফিয়ানের গুপ্তচর। মুসলমানদের সম্পর্কিত তথ্য ও খবরাখবর তাকে সে সরবরাহ করত। রকুবা থেকে তিনি নকী নামক স্থানে পৌঁছেন। এখানে তিনি মক্কার দু'জন লোকের সাক্ষাত পান। তারা গোয়েন্দাগিরির জন্য মদীনায় গিয়েছিল এবং সেখানকার খবর নিয়ে কুরায়শদের নিকট ফিরে আসছিল। 'আমর (রা) তাদের চিনে ফেলেন ও লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হন এবং তীর দ্বারা একজনকে শেষ করে দিয়ে অপরজনকে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে আসেন।

সাবীক বা ছাতুর যুদ্ধ

দ্বিতীয় বদর

গযওয়া সাবীক বা ছাতুর যুদ্ধ হিজরী চতুর্থ সনে সংঘটিত হয়। আবু সুফিয়ান ওহুদ থেকে যাবার কালে উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বলেছিলেন যে, আগামী বছর বদর প্রান্তরে পুনরায় যুদ্ধ হবে। সে মুতাবিক কুরায়শরা বিরাট এক বাহিনী তৈয়ার করে। দূর-দূরান্তরের কবিলাগুলোকে মিত্র বানিয়ে তাদের থেকে বন্ধুত্ব রক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করে। প্রসিদ্ধ স্থান-গুলো থেকে ভাল ভাল অস্ত্র আনিয়ে নেয়। বহু সংখ্যক কবিলা মক্কায় এসে জমায়েত হয়। রসদ-সম্ভারেরও সুব্যবস্থা করা হয়। মোট কথা, হাযার হাযার পদাতিক ও আরোহীর সমাবেশ ঘটিয়ে আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মার আল-জাহরানের পাশে মুজান্না নামক স্থানে এই

উদ্দেশ্যে যাত্রা বিরতি দেন যে, অপরাপর কবিলাগুলো এখানে এসে মিলিত হবে। এখানেই ন'ঈম বিন মাস'উদের সঙ্গে আবু সুফিয়ানের সাক্ষাৎ ঘটে। ন'ঈম 'উমরাহ করার নিয়তে মদীনা থেকে মক্কা যাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান তাকে আঁ-হযরত (সা)-এর সমর প্রস্তুতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। সে জবাবে বলে, আঁ-হযরত (সা) সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আবু সুফিয়ান এই উত্তরে অত্যন্ত ঘাবড়ে যান এবং সুহায়ল বিন 'আমরকে জামিন বানিয়ে ন'ঈম বিন মাস'উদকে বলেন, 'যদি তুমি আঁ-হযরত (সা)-কে কোন বাহানায় বদর প্রান্তরের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখতে পার তাহলে আমি তোমাকে বিরাট অংকের পুরস্কার দেব। খরার বছরের কারণে এত বড় বিরাট বাহিনীর জন্য যথোপযুক্ত ইন্তেজাম আমরা করতে পারি নি। আবার আমরা এও চাচ্ছি না যে, ওয়াদা খেলাফী আমাদের তরফ থেকে হোক।' ন'ঈম এ প্রস্তাব মেনে নেয় এবং মদীনায় এসে মুসলমানদের আড়ালে ডেকে গোপনভাবে বলতে থাকে যে, আবু সুফিয়ান বিরাট বড় বাহিনী নিয়ে আসছে এবং তার সঙ্গে বহু কবিলাও রয়েছে। অতএব আঁ-হযরত (সা)-এর পক্ষে বদরে গিয়ে খামাখা বিপদ ডেকে আনা ঠিক হবে না ; বরং মদীনায় থেকেই দুশমনের অপেক্ষা করা ভাল। একথা শ্রবণ মাত্রই মুসলমানদের মনে দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। 'আবদুল্লাহ্ বিন উবায়্য সলূলও শহরের ভেতর থেকে লড়াই লড়বার পক্ষে অভিমত রাখে। শত্রুর এ ধরনের প্রোপাগাণ্ডার প্রতিক্রিয়া অনেক মুসলমানের মনেই দেখা দেয়।

আঁ-হযরত (সা)-এর খবর মিলতেই জিহাদের এলান করে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ফরমানও জারি করেন যে, সৈন্যবাহিনীর সদস্যরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সামান-আসবাবও সঙ্গে নেবে যেন বদরের বাজারে গিয়ে দুশমন আসার আগেই কিংবা তাদেরকে পরাজিত করার পর সেগুলো বিক্রী করে লাভবান হতে পারে। এরপর তিনি মুজাহিদ বাহিনী সঙ্গে করে বদরে পৌঁছেন। বদরে অবস্থানকালীন মাখশা বিন 'আমর আল-দামরী, যে বনী দামরার তরফ থেকে সেখানে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য সন্ধি-সমঝোতা করেছিল, আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়। আঁ-হযরত (সা) তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা থেকে জানতে পারেন যে, তারা বদরে মুসলিম বাহিনীর আগমনে খুশী নয়। আঁ-হযরত (সা) তাকে বল্লেন, "যদি তোমরা সন্ধি-সমঝোতা ভাঙবার উদ্দেশ্যে এসে থাক তবে ভালই । আমি তোমাদের

সঙ্গে লড়বার জন্যও তৈরী আছি।” এতে তারা ভয় পেয়ে যায় এবং আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট ওযরখাহী করে চলে যায়। এমনি সময়ে মা'বাদ বিন আবী মা'বাদ আল-খুযা'ঈ এদিক দিয়ে অতিক্রম করে, কিন্তু তারও আঁ-হযরত (সা)-কে কিছু বলতে হিম্মত হয় নি।

আঁ-হযরত (সা) বদর প্রান্তরে আট দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন। সে সময় আশেপাশের এলাকাগুলোতে দুর্ভিক্ষ চলছিল। এজন্য মুসলমানদের আনীত সামান দশ গুণ বেশী দামে বিক্রি হয়। তিনি যখন নিশ্চিত জানতে পারলেন যে, আবু সুফিয়ান সামনে অগ্রসর হবার পরিবর্তে পশ্চাদপসরণ করাকেই শ্রেয় মনে করে মক্কা ফিরে গেছে, তখন তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। মুসলমানদের উৎসাহ ও মানোবল এ ঘটনার পর আরও বেড়ে যায় এবং মুশরিক ও ইসলামের দুশমনদের অন্তরে নানা ধরনের সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হতে থাকে।

ফলাফল ও শিক্ষা

যদিও এসব অভিযানে লড়াই সংঘর্ষ হয় নি, কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর এই সব প্রতিরক্ষামূলক কার্যকলাপ থেকে বহু উপকারী শিক্ষা মেলে।

১. আধুনিক যুগের প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকদের সম্মিলিত রায় হ'ল, যখন বিভিন্ন কবিলা ও উপজাতীয় গোত্রের সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করতে হয় তখন অপরিহার্যভাবেই দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার সঙ্গে তা করতে হয়। যদি তারা জানতে পারে যে, তাদের দুশমন মোর্চায় তাদের আগেই পৌঁছে যাবে তবে তাদের সাহস জবাব দিয়ে বসে। আঁ-হযরত (সা)-এর পদক্ষেপগুলো থেকে এই মতের অনুকূল সমর্থন মেলে।

২. এ ধরনের যুদ্ধ ও অভিযানের জন্য সংবাদ আদান-প্রদানের গোপন চ্যানেল নেহায়েত সুশৃংখল, সুসমঞ্জস ও পরিপূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। তাতে শত্রুর গতিবিধি ও চলাচল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সময়মত পাওয়া যায়।

৩. এরূপ এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী ও সংঘর্ষমুখর সেনাবাহিনীর সামরিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত ব্যবস্থাপনার খবর জানা থাকে। অতএব যে ফৌজ অগ্রাভিযানের মাধ্যমে সে সবের উপব নিয়ন্ত্রণ জাঁকিয়ে বসে তারা

তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে অসহায় ও কমযোর করে ফেলে। উদাহরণত, পানির ঝরনা ও রসদ-সম্ভার সরবরাহের স্থানসমূহ অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষপূর্ণ অঞ্চল ইত্যাদি। এ ধরনের যুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক অগ্রাভিযান অত্যন্ত জরুরী।

৪. শত্রুর উপর সব সময় নজর রাখতে হবে এবং এতদুদ্দেশ্যেই গুপ্তচর, ছোট-খাটো ফৌজী প্লাটুন অথবা বিরাট ফৌজী কোম্পানী যা দরকারী মুহূর্তে শত্রুর মুকাবিলা করতে পারে---পাঠাতে হবে।

অর্থাৎ আজকের প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকগণ ৩ ও ৪ নম্বরে যা কিছু বলছেন তা পুরোপুরিই আঁ-হযরত (সা)-এর সামনে ছিল। নজদের দিকে একটি শক্তিশালী ক্ষুদে বাহিনী নিয়ে তিনি এজন্যই গিয়েছিলেন যেন সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে সঠিক অবহিতি লাভ করতে পারেন। কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন এবং বনূ গাতফানের কবিলাগুলোর সঙ্গে যুদ্ধ না করার এটাই ছিল কারণ। এই অভিযান ছিল শুধুমাত্র শক্তির মহড়া প্রদর্শন এবং সঠিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার জন্য।

৫. শত্রু এলাকায় পঞ্চম বাহিনী ও কমাণ্ডো তথা ঝটিকা বাহিনী পাঠাতে হবে। রসূল করীম (সা)-এরূপ বাহিনী পাঠিয়েছেন এবং এ ধরনের বাহিনী ও প্লাটুন প্রতিরোধের জন্য সুন্দর ইন্তেজাম করেন।

৬. প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী ও শত্রুতা পোষণকারী কবিলাগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার আবশ্যক। কেননা এরা দয়ার্দ্রতা ও কোমলতাপূর্ণ ব্যব-হারকে দুর্বলতা বলে ভুল বুঝে থাকে। এতে তারা শুধু সাহসীই হয়ে ওঠে না বরং বাকী গোত্রগুলোর সামনেও খারাপ নজীর পেশ করে এবং অশান্তি সৃষ্টি করে থাকে।

আঁ-হযরত (সা) বনূ নাযীরকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কারণে যে শাস্তি দিয়ে-ছিলেন তা এই নীতির আলোকে শুধু সঠিকই ছিল না এবং এর দ্বারা তার সমর্থনে ও অনুকূলে শুধু স্বীকৃতিই মেলে না, বরং তার অপরিহার্যতা ও আবশ্যকতাও এর দ্বারা প্রমাণিত হয়।

৭. এই সব ফৌজের প্রশিক্ষণ ও সংগঠন—যাদেরকে এ ধরনের গোত্রীয় ও উপজাতীয় দুশমনের সঙ্গে লড়তে হবে---নিম্নোদ্ধৃত পন্থায় তা পরিপূর্ণ হতে হবে। এরূপ প্রশিক্ষণ ও সংগঠন দ্বারাই তারা দুশমনের বিরুদ্ধে কামিয়াবী হাসিল করতে পারে।

ক. সমস্ত সেপাই ও অফিসার শারীরিক দিক দিয়ে উন্নত মানের হবে যেন তারা পরিশ্রমী, ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু এবং দীর্ঘ সফর করতে পারে; আরামপ্রিয় না হয়ে তারা কঠোর শ্রম ও কঠোর প্রাণের অধিকারী হবে।

খ. দিন ও রাতের বেলায় সফর করার ক্ষেত্রে একইরূপ অভ্যস্ত হবে।

গ. প্রতিটি সিপাহী ও অফিসারের অন্তর-মানস শত্রুর উপর আকস্মিক হামলা করতে অনুপ্রাণিত হবে এবং বাহিনীর প্রতিটি সদস্য পাল্টা হামলা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত থাকবে। এই কাজের পরিপূর্ণতা লাভ ও প্রশিক্ষণের জন্য ফৌজকে ছোট ছোট প্লাটুনে ভাগ করে বিভিন্ন অভিযানে পাঠাতে হবে যেন প্রতিটি সিপাহী একা-দোকা স্থৈর্য ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে শত্রুর উপর প্রতিরক্ষামূলক অগ্রাভিযান করতে পারে।

ঘ. দুশমনকে নিজেদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এবং চলাফেরা ও গতিবিধি সম্পর্কে অনবহিত ও ধোকার মধ্যে রাখতে হবে।

ঙ. প্রতিটি সিপাহীকে নিজের এবং শত্রু এলাকায় ঘোরাঘুরি করার উপযোগী ও সক্ষম বানাতে হবে।

চ. শত্রুর উপর প্রাধান্য বজায় রাখার ব্যাপারে গোটা বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। প্রাধান্য লাভের জন্য ফৌজের প্রতিটি সদস্যকে নিজস্ব অস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী, শাসন-শৃংখলার অনুসারী এবং সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হওয়া অপরিহার্য।

ফেলে আসা পৃষ্ঠাগুলোতে কয়েকবারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে যে, আঁ-হযরত (সা) মুজাহিদদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ও কয়েকটি দলকে বিভিন্ন স্থানে শত্রুর উপর গোয়েন্দাগিরি, পশ্চাদ্ধাবন ও তাদের মধ্যে এসে গুজব ছড়িয়ে দিতে এবং তাদেরকে মুকাবিলা করার জন্য পাঠান। কখনো কখনো তিনি নিজেও এরূপ বাহিনীর সঙ্গে গিয়েছেন। বাহিনী এমন রাস্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং নিজেও গেছেন যা অত্যন্ত দুরতিক্রম্য। এক্ষেত্রে দিন কিংবা রাতের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। গোপন অভিযানগুলোতে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়েছে। আঁ-হযরত (সা)-এর প্রশিক্ষণের বরকতে তাঁর ফৌজের সাধারণ সিপাহী থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ের মুজাহিদ সবাই আপাদমস্তক ফৌজী ছিল এবং প্রতিটি হেদায়েত নিঃশব্দে ও অবনত মস্তকে এমনভাবে কার্যকর করত যে, তার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো

পর্যন্ত অপূর্ণ থাকত না। সাহসিকতা ও জীবনের উপর বাজি রাখার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই ছিলেন একক। এটাই একমাত্র কারণ যে, মুষ্টিমেয় মুজাহিদের মুকাবিলায় কাফির ও মুশরিক অগণিত হওয়া সত্ত্বেও শেষাবধি মুজাহিদদের মস্তকেই বিজয় মুকুট শোভা পেয়েছে। কোনরূপ দাগা কিংবা প্রতারণার কারণে কখনো যদি দুশমনের পাতা ফাঁদে পা আটকেছে তখন বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে শাহাদতের অমর পেয়ালা পান করেছেন, কিন্তু ঈমান ও 'আমলের উপর সামান্য আঁচড়টুকুও লাগতে দেননি! দুনিয়া থেকে এভাবে বিদায় নিয়েছেন যে, দুশমন ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছে। সাহসিকতা, নির্ভীকতা, ধৈর্য, স্থৈর্য, দৃঢ়তা, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ—এ সবই ছিল সফল গুণাবলীর প্রতীক। আঁ-হযরত (সা)-কে দুশমন গোত্রগুলো চিনত। কিন্তু তাঁর শক্তি ও মর্যাদার ভীতি এরূপ ছিল যে, খোলাখুলি সামনে আসার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারত না। তারা ইসলামের দা'ওয়াত যেমন কবুল করেনি, তেমনি তাঁর বর্ধিত ক্ষমতায় ভেসেও যায়নি, তারা বাধ্য হয়ে চুপ করে ছিল। এভাবে তিনি কুরায়শ শক্তি খতম এবং স্বীয় প্রতিরক্ষাগত উদ্দেশ্য হাসিল করেন। আর 'তোমরাই উন্নত'—আল্লাহ্‌র এ বাণীর বাস্তব ও কার্যকর প্রমাণ পেশ করে ঈমানদারদের জন্য উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা-স্বরূপ প্রতিরক্ষা নীতি রেখে যান।

গযওয়ায়ে খন্দক বা খন্দকের যুদ্ধ

খন্দকের যুদ্ধের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, আমাদের নিকট কিন্তু মতভেদের কোন অবকাশ নেই। সাবীক বা ছাতুর যুদ্ধ মক্কাবাসীদের মনে হতাশার সঙ্গে প্রতিশোধ-স্পৃহার আগুনই শুধু জ্বালিয়ে দেয়নি, বরং অন্যান্য কবিলাগুলোকেও ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিয়েছিল। এদের সবারই আশংকা ছিল যে, যদি মুহাম্মাদ (সা)-কে এখনই প্রতিরোধ না করা যায় তাহলে তাঁর শক্তির সয়লাব তাদেরকে খড়-কুটোর মতই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মুসলিম ফৌজের শাসন-শৃংখলা, তাদের সাহসিকতা ও নির্ভীকতা, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, অটুট মনোবল ও আত্মোৎসর্গিত মানসিকতার দৃশ্য এমনই ভীতিপ্রদ ছিল যে, তার সামনে কারুরই মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার হিম্মত হ'ত না। অতএব তারা তাদের আযাদী ও শাসন-এখতিয়ারকে কয়েক দিনের মেহমানের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী মনে করতে থাকে।

যেখানে অন্যান্য কবিলার সামনে এ ধরনের বিপদ ঘনীভূত, সেখানে য়াহূদী-দের মনে তাদের ফেতনাপ্রিয় স্বভাব ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে জড়ে-মূলে উৎসন্নে যাবার ষোল আনা আশংকা ছিল বিরাজমান। তারা ভেবে দেখল, এখানেও তাদের সেই হাশরই না হয় যা তাদের শাম-এ হয়েছিল। এজন্যই স্বাভাবিকভাবেই তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছিল কুরায়শদের উপর। ওহূদের যুদ্ধ তাদের চোখের সামনে আশার এক ঝলক আলোক-রেখা তুলে ধরেছিল, কিন্তু ছাতুর যুদ্ধ সেটুকুও খতম করে দেয়। হুই বিন আখতাব, কিনানা বিন রবী', বনূ ফুযারাহ, বনূ ওয়াইল এবং বিভিন্ন কবিলার মধ্যে গাতফান, 'উয়াইনিয়া বিন হাসীন, হুযায়ফা বিন বদর, হারিছ বিন 'আওফ বিন আবী হারিছা, আল-মাররী বিন বনূ মাররাহ, বনূ আশজা প্রভৃতি গোত্র মক্কায় একত্র হয় এবং কুরায়শদেরকে আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে সমর পরিকল্পনা তৈরী করার দা'ওয়াত জানিয়ে নিজেদের তরফ থেকে পুরো সহযোগিতা ও মদদ দেবার নিশ্চিত আশ্বাস দেয়।

আঁ-হযরত (সা) এ সব সম্পর্কে আগা-গোড়া খবর পেয়ে আসছিলেন। কুরায়শরা যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের প্রশ্নে অনড় ও অটল ছিল, তথাপি এই সব কবিলার লড়াই-সংঘর্ষ সৃষ্টির আবেগাপ্লুত প্রেরণা কতটুকু, তার পরীক্ষা নেবার মানসে তারা য়াহূদীদেরকে জিজ্ঞাসা করেঃ তোমরা কি মূর্তিপূজকদের মুসলমানদের উপর অগ্রাধিকার দিচ্ছ? এমন না হয় যে, তোমরা মুসলমানদের আহ্‌লে কিতাব বা আসমানী গ্রন্থের অধিকারী মনে করে আমাদের প্রতারিত কর। এর জবাবে য়াহূদীরা তাদের সাহায্য ও সহযোগিতার পূর্ণ আশ্বাস প্রদান করে। ফলে য়াহূদীদের সম্পর্কে কুরায়শদের মনে কোন সংশয় আর বাকী রইল না।

একক যুদ্ধের বিপদ যখন আর রইল না, কুরায়শরা তখন নিশ্চিত মনে আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে মদীনাভিমুখে রওয়ানা হ'ল। আঁ-হযরত (সা) জিহাদের ঘোষণা দিলেন এবং সমরোপকরণ, মারণাস্ত্র, রসদ-সম্ভার ইত্যাদির যথাযথ ব্যবস্থা সেরে সম্মিলিত মুশরিক বাহিনীকে এবার মদীনা থেকেই মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সালমান ফারসী (রা)-এর পরামর্শ-ক্রমে মুশরিকদের তিনি এমনই একটি নতুন পদ্ধতিতে যুদ্ধ করতে মজবুর করলেন যার যোগ্যতা তাদের একেবারেই ছিল না। তিনি ছোট ছোট দুর্গে আবদ্ধ হয়ে লড়াই করবার পরিবর্তে মুসলমান ও মিত্র বস্তিবাসীদেরকে

একটি খন্দক (পরিখা)-এর আওতায় আনার ফয়সালা করেন। এর ফলে অন্যান্য উপকার ছাড়া আরও একটি উপকার এও হয় যে, সমস্ত মুসলমান ও মিত্র ফৌজ সরাসরি আঁ-হযরত (সা)-এর নেতৃত্বাধীনে এসে যায়। আঁ-হযরত (সা) নিজেই খন্দকের সীমারেখা ঠিক করেন এবং চৌহদ্দী নির্দিষ্ট করে প্রতিটি কবিলাকে তাদের সীমার নির্ধারিত অংশটুকু খননের আদেশ দেন। খননের কাজে তিনি নিজেও সশরীরে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিম শিবিরের মুনাফিকরা খন্দক খননের ক্ষেত্রে কোনরূপ অংশ নেয়নি এবং নিজেদের অনুপস্থিতির জন্য নানাবিধ ওযর-আপত্তির আশ্রয় নিতে থাকে। তবে তারা কোনরূপ বিরোধিতাও করেনি।

ওহুদ যুদ্ধের অধ্যায়ে লেখা হয়েছে যে, আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা দৃষ্টিকোণ থেকে মদীনার উপর হামলার সর্বাধিক আশংকা ছিল উত্তর দিক থেকে। কেননা এ দিকটাই ছিল খোলা ময়দান। অতএব মদীনার চতুস্পার্শ্বে খন্দক খননের ফয়সালা যখন নেওয়া হ'ল তখন সর্বাগ্রে সেদিক থেকেই খননের কাজ শুরু হ'ল। আঁ-হযরত (সা) কতিপয় আনসার ও মুহাজির সাহাবা (রা)-কে সঙ্গে নিয়ে এবং ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে শহরের চতুর্দিককার এলাকা ঘুরে ফিরে দেখেন। বিভিন্ন ক্ষুদ্র দুর্গে যত মহিলা, শিশু ও পশুপাল রাখার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেই মুতাবিক খোরাকসহ অন্যান্য সামান যাতে একত্র করা যায় সেটাই ছিল এই ঘোরাফেরার উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন স্থান মুজাহিদ বাহিনীর ছাউনী ফেলার জন্য নির্বাচিত করা হয়। শহরের যে দিকটায় বাগ-বাগিচা এবং তার চতুষ্পার্শ্বে ঘেরাও কিংবা দেওয়াল ছিল, সেগুলোকে গভীরভাবে ভেবে-চিন্তে দেখে এবং শত্রু সংখ্যার আশংকা সামনে রেখে নানা ধরনের প্রতিরোধ ও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়। সংকীর্ণ রাস্তার উপর যেখানে একই সময়ে একটি মাত্র উটই চলতে পারে চৌকী মোতায়েন করা হয় এবং সেগুলো কেল্লাবন্দী করে দেওয়া হয় যেন দুশমন সংকীর্ণ গলি-পথও ব্যবহারে না আনতে পারে। বনী কুরায়-জার য়াহূদীদের সঙ্গে সম্পর্ক যদিও ভাল ছিল তবু সেদিকেও দৃষ্টি রাখা হয়। এমনিভাবে দক্ষিণ এলাকাকে, যেখানে বিভিন্ন কবিলা বাস করত, মযবুত ও সুদৃঢ় করে চারদিককার দেওয়ালগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়।

রসদ-সম্ভারের ভেতর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল পানির। তিনি এরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। সমস্ত কুয়া ভালোভাবে দেখে শুনে পানির সংরক্ষণ ও সরবরাহের পুরো বন্দোবস্ত করেন এবং যুবাব নামক স্থানে একটি কুয়া খনন করেন।

উত্তরদিকের খন্দক পূর্ব হররাহ থেকে পশ্চিম হররাহ পর্যন্ত এবং সিলা' পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত হয়ে অতিক্রম করে পুনরায় বাতহান উপত্যকার সঙ্গে মেলান হয়। অতঃপর এখান থেকে বাতহান উপত্যকার অভ্যন্তরে মাহদারুর উপত্যকা হয়ে অতিক্রম করে বনূ কুরায়জা পল্লী পর্যন্ত আনা হয়। উত্তর দিকের খন্দক ছিল লম্বায় সাড়ে তিন মাইলের অধিক। এটা খনন করতে তিন সপ্তাহ সময় লেগেছিল। এর সঙ্গে সঙ্গেই অপর পার্শ্বের খন্দক খননের পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। যেহেতু এতে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক উঁচু-নীচু এবং উপত্যকাগুলো পুরোপুরি কাজে লাগানো হয়েছিল সেজন্য খন্দকের বিরাট অংশই প্রাকৃতিক বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। খন্দকের গভীরতা ও প্রস্থ এতখানি রাখা হয়েছিল যাতে কোন ঘোড়সওয়ার লাফিয়ে পার হয়ে ভেতরে না আসতে পারে।

খন্দক খনন শেষ হলে তার দরোজাও নির্দিষ্ট করা হয় এবং প্রতিটি দরোজায় প্রত্যেক কবিলার একজন করে লোক পাহারায় রাখা হয়। যুবায়র বিন 'আওয়াম (রা)-কে এদের সবার সর্দার বানিয়ে আঁ-হযরত (সা) হুকুম দেনঃ যদি লড়াই হ'তে দেখ তবে তোমরাও লড়াই শুরু করে দেবে। এরই সঙ্গে উঁচু উঁচু পাথর এবং দুর্গের উপর তীরন্দায নিযুক্ত করেন যেন দুশমনকে পার হতে বাঁধা দেওয়া যায়।

সিলা' পর্বতে আঁ-হযরত (সা) স্বীয় ফৌজী হেড কোয়ার্টার স্থাপন করেন এবং তাঁর তাঁবু ফেলা হয় যুবাব পর্বত ও সিলা' পর্বতের মধ্যবর্তী একটি নিরাপদ স্থানে। তার স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার তাগিদে এখন সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। যেখানে যেখানে চারজন সহকারী অধিনায়ক, যথাক্রমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত 'উছমান, হযরত সালমান ফারসী এবং হযরত আবু যর (রা)-এর তাঁবু স্থাপিত হয়েছিল, সেসব স্থানেও মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাযার। এদের কয়েকটি দলে ভাগ করা হয়। এদের মধ্য থেকে টহল দানের জন্য ছোট ছোট

প্লাটুন পাঠানো হ'ত। তীরন্দাযেরা তাদের মোর্চায় দৃঢ়ভাবে শত্রুর অপেক্ষায় থাকে। অধীনস্থ অধিনায়কগণের অধীনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্লাটুন মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু ফৌজের বড় অংশই প্রয়োজনের মুহূর্তে যাতে দ্রুত সাহায্যকারী বাহিনী হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়া যায় সেজন্য আঁ-হযরত (সা)-এর নেতৃত্বধীনে নিজেদের প্রধান ঘাটিতেই অবস্থান করে।

বনূ নাযীর যেহেতু মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়ে এবং মাল-পত্র ও সামান-আসবাব সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সেজন্য তারা বিরুদ্ধ গোত্রগুলো বিশেষ করে সমধর্মী ও একই মযহাবের য়াহূদীদের উত্তেজিত করতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সবাই মিলে গাতফানের কবিলাগুলোকে এর বিনিময়ে ক্ষতিপূরণস্বরূপ খায়বারের সমস্ত খেজুর বাগানের উৎপাদিত একটি মৌসুমের খেজুর প্রদানের ওয়াদা করে।

শত্রুর ফৌজী ছাউনী নিম্নরূপ বিন্যস্ত ছিল ঃ

বনূ কুরায়শ, বনূ কিনানা এবং বনূ হাবিশ বী'র-এ-রূমা থেকে আল-'আকীক উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বনূ গাতফান এবং বনূ আসাদ মদীনার উত্তর দিক আল-নু'মান উপত্যকার ওহুদ পর্বত থেকে বী'র-এ রূমার পূর্ব পর্যন্ত তাঁবু ফেলেছিল অর্থাৎ যেখানে যেখানে ক্ষেত-খামার ও খেজুর বাগান ছিল সেখানে তাদের বিভিন্ন দল ছাউনী ফেলেছিল।

কুরায়শদের সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাযার কিংবা একটু বেশী। হেজাযবাসী এর পূর্বে এতবড় বিরাট বাহিনী আর কখনো দেখেনি।

যদিও মোর্চাবন্দী হয়েছিল এবং যুদ্ধ লাগার আশংকা ছিল প্রতি মুহূর্তে তথাপি মুনাফিকরা নিজেদের জোর তৎপরতা অব্যাহত রাখে। বনূ কুরায়জা ছিল আঁ-হযরত (সা)-এর মিত্র। অতএব হুই বিন আখতাব তাদের সর্দার কা'ব বিন আসাদের নিকট আসে। উদ্দেশ্য ছিল তাকে প্ররোচিত করে মুসলমানদের থেকে আলাদা করে দেওয়া। প্রথম দিকে সে অবশ্য খুব বেশী সফল হয়নি। সম্ভবত এসব কবিলা সুযোগের অপেক্ষা করছিল এবং দেখছিল যে, ভাগ্য কার দিকে গড়ায়। যেদিকে গড়াবে সেদিকেই তারা ভিড়ে পড়বে। অতএব মুশরিকদের সংখ্যা শক্তি যখন ক্রমেই বাড়তে লাগল এবং পরিণতিতে অবরোধের কঠোরতাও বৃদ্ধি পেতে থাকল, খাদ্য ঘাটতি অনুভূত

হতে লাগল, তদুপরি ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবার কারণে অর্থনৈতিক মন্দাভাবের চিহ্ন পরিস্ফুট হতে আরম্ভ করল, তখন বনূ কুরায়জা তাদের সুর পাল্টাতে শুরু করল এবং শেষাবধি হুই বিন আখতাবের সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে কৃত মিত্রতা চুক্তি ছিন্ন করে দিল।

আঁ-হযরত (সা)-এই খবর পেয়ে এর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আওস গোত্রের রঈস সা'দ ইব্ন মা'আয এবং বনূ খাযরাজের রঈস সা'দ ইব্ন 'উবাদাহ্‌কে কতিপয় সাহাবা (রা)-সহ বনূ কুরায়জার নিকট পাঠিয়ে দেন। তাদের হেদায়েত দিয়ে দেন যে, খবর যদি সত্য হয় তাহলে অত্যন্ত গোপনীয়-তার সঙ্গে একান্ত নিভৃতে আমাকে এসে বলবে যেন অন্য মিত্রদের মনোবল না ভেঙে পড়ে। আর এ সংবাদ যদি মিথ্যা হয় তবে শিবির সন্নিবেশের স্থানে গিয়ে এর এলান করবে।

এই দলটি সেখানে গিয়ে দেখতে পায় যে, কা'ব বিন আসাদ শুধু বন্ধুত্ব-মূলক অঙ্গীকারই ভঙ্গ করেনি বরং শত্রুর সঙ্গে মিলিত হয়ে শত্রুতা সাধনেও লিপ্ত। মুসলমানদের দেখে সে বলল: আমি মুহাম্মদের সঙ্গে কখনো কোন চুক্তি করিনি। আমি তো অনেক কাল আগে থেকে এমনি সময়ের অপেক্ষা করছিলাম কখন প্রতিশোধ নেব। আঁ-হযরত (সা) এ সংবাদ পেতেই সৈন্যবাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেন: মুসলমানেরা! সুখবর শোন, আমাদের সামনে এখন কঠিন মুহূর্ত সমুপস্থিত বিধায় আমাদের দায়িত্বও বেড়ে গেছে। তবুও আমাদের কল্যাণ কিন্তু এরই ভেতর নিহিত!

অবস্থা যেহেতু বাহ্যত পরিবর্তিত হচ্ছিল সেজন্য মুনাফিকদের মনগড়া কাহিনী রটনা ও ঠাট্টা-মস্করা করার সুযোগ মিলেছিল। তারা তাদের মুনা-ফিকী তৎপরতা পূর্বের তুলনায় বহু গুণ বাড়িয়ে দেয় যেন মুসলমানেরা মনোবল হারিয়ে বসে এবং বিশৃংখল ও হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে যায়।

এ সময়েই বনূ হারিছার আওস বিন কিবতী আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে পৌঁছে আরয করে: আমি আমার কওমের পক্ষ থেকে এই দরখাস্ত এনেছি যে, যেহেতু আমাদের বস্তী খন্দকের বাইরে আর শত্রু একেবারে নিকটবর্তী, এজন্য আপনি আমাদের অনুমতি দিন যেন আমরা আমাদের ঘরে ফিরে যেতে পারি। এটা শুনে তিনি তাদেরকে কিছু দিন ধৈর্য ধরার জন্য বলেন।

এরপর অবরোধের প্রায় এক মাস গুযরে গেলেও এর মধ্যে একবারও হাতাহাতি লড়াইয়ের সুযোগ আসেনি। মুশরিক বাহিনী কয়েকবার খন্দক পার হবার নিষ্ফল চেষ্টা চালিয়েছিল বটে, কিন্তু মুজাহিদ বাহিনীর হুঁশিয়ারী, সদা সতর্কতা ও দৃঢ়তাদৃষ্টে প্রতিবারই নিজেদের অভিপ্রায় পূরণে ব্যর্থ হয়।

খন্দক যুদ্ধের এ সময়টি ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত হতবুদ্ধিকর ও ধৈর্য-পরীক্ষামূলক। একদিকে তারা শত্রুদের দ্বারা ঘেরাও আর অপর দিকে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা এবং খানাপিনার কষ্ট; তৃতীয়ত মুনাফিকদের গাদ্দারী ও দাগাবাজী এবং য়াহূদীদের মন্দ অভিপ্রায়। যদিও ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ও জীবন উৎসর্গকারী আর দরবারে রেসালতের দীপশিখায় আকৃষ্ট সত্যিকার পতঙ্গগুলোর উপর এসব অবস্থার কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না, তথাপি আঁ-হযরত (সা) তাদের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন ও অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন। অতএব তিনিও রাজনৈতিক কৌশল অবলম্বনে পরাঙমুখ ছিলেন না। তাঁর পক্ষ থেকেও শত্রুকে কমযোর এবং তাদের মনোবল ভেঙে দেবার চেষ্টার কমতি ছিল না, আর এতে তিনি সফলও হয়েছিলেন। কুরায়শের মিত্রদের পরস্পরের মধ্যে তিনি বিভেদ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেন। অনন্তর এ সময়েই গাতফান কবিলার সর্দারগণ সুযোগের ফায়দা লুটবার জন্য এই শর্ত পেশ করে যে, মদীনার উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ যদি তাদের প্রদান করা হয় তাহ'লে তারা তাদের দলবলসহ ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত। এ ব্যাপারে আঁ-হযরত (সা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন। সা'দ ইব্‌ন মা'আয এবং সা'দ ইব্‌ন 'উবাদাহ (রা) এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বলেন: আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে যুদ্ধ অব্যাহত রাখব। বনূ গাতফান বহু দিন থেকেই মদীনার খেজুর বাগানগুলো কব্‌জা করার দিবা-স্বপ্নে বিভোর। আমরা কিন্তু আমাদের অধিকার এতদিন তলোয়ারের সাহায্যেই হেফাজত করেছি। আর এখন তো আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র রসূল আমাদের সঙ্গে আছেন।

আঁ-হযরত (সা) তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। দীর্ঘ অবরোধের ফলে মুশরিকেরাও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। অবরোধ যত দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল তাদের কষ্ট ও যন্ত্রণাও ততই অসহনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আরব কবিলাগুলো যারা কুরায়শদের সঙ্গে এসেছিল তাদের ভেতর দুশ্চিন্তা দেখা দিচ্ছিল।

তারা মনে করেছিল যে, লড়াই দু'তিন দিনের ভেতরই শেষ হয়ে যাবে। এজন্য তারা কুরায়শদের সঙ্গ পরিত্যাগের জন্য ছিল উদগ্রীব। একদিন আবু সুফিয়ান তার বাহাদুর সৈনিকদের নিয়ে খন্দকের অভ্যন্তরে অবতরণ করেন, কিন্তু পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। এরপর মক্কার কতিপয় সর্দার ও ঘোড়সওয়ার, 'আমর বিন 'আবদুদ প্রমুখ খন্দক পার হয়ে ভেতরে চলে আসে। হযরত 'আলী (রা) পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদের অধিকাংশেরই জীবনলীলা সাঙ্গ করেন। দু'জন বেরিয়ে পালিয়ে যায়। এদের মধ্যে একজন ঘোড়াসমেত খন্দকের মধ্যে পড়ে যায়। অপরজন খন্দক পেরোতে গিয়ে তীরের আঘাতে আহত হয় এবং অপর পারে গিয়ে মারা যায়। হামলারত মুশরিকদের এই পরিণতি দেখে দুশমনের অনুভূতিটুকুও লোপ পাবার উপক্রম হয়। এরপর আর কেউ খন্দক পেরোতে কোশেশ করেনি। মুসলিম বাহিনীর উপর এর বেশ ভাল প্রভাব পড়ে। যুদ্ধের ময়দানে মুসলিম মহিলারা অত্যন্ত বীরত্ব ও দৃঢ়তার সঙ্গে চিকিৎসা সাহায্য, আহতদের দেখাশোনা ও খাবার ইত্যাদি পৌঁছে দেবার কাজ করছিল।

যে সময় অবরোধের কারণে দুঃখ-কষ্ট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং যুদ্ধের কোন ফয়সালা কোন দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল না, সে সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। আঁ-হযরত (সা) গাতফান কবিলার পেশকৃত সমঝোতা শর্ত প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছিলেন; কিন্তু অবরোধের দীর্ঘসূত্রিতা তাদের ধ্যান-ধারণায় অনেক কিছুই পরিবর্তন সূচিত করেছিল। একদিন গাতফান গোত্রের রঈস ন'ঈম বিন মাস'উদ বিন 'আমের বিন আনীফ বিন ছা'লাবা বিন কুরজ বিন হেলাল বিন গাতফান আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম কবুল ক'রে আরয পেশ করেনঃ যদিও আমি ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়েছি, কিন্তু আমার কওম তা জানে না। তথাপি আপনি আমাকে যা হুকুম করবেন অবনত মস্তকে আমি তা পালন করব।

আঁ-হযরত (সা) তাকে একটু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি পরিকল্পনার কথা বললেন। ন'ঈম বিষয়টা সম্পূর্ণ বুঝে নিয়ে বনূ কুরায়জার নিকট যান। বনু কুরায়জা তাঁকে খুব মান্য করত। আলোচনাকালে তিনি যুদ্ধের ফলাফল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেনঃ গাতফান এবং কুরায়শ মুহাম্মাদ (সা)-এর সঙ্গে লড়তে এসেছে। তোমাদের অবস্থা তাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যদি তাদের পরাজয় ঘটে তবে তারা দেশে ফিরে যাবে। অতঃপর মুহাম্মদ (সা)-এর আওতা থেকেও তারা মুক্ত ও নিরাপদ হয়ে গেল। এখন তোমরা নিজেদের সম্পর্কে কি চিন্তা-ভাবনা করে রেখেছ? তোমাদের মুহাম্মদ (সা)-এর ধারে কাছেই বসবাস করতে হবে। দূরদর্শিতার দাবী হ'ল, তোমরা গাতফান ও কুরায়শদের থেকে তাদের কয়েকজন সর্দারকে জামিন হিসাবে নিজেদের কাছে রেখে দাও যেন তারা তোমাদের ধোকা দিতে না পারে, না পারে প্রতারিত করতে এবং শেষ পর্যন্ত লড়তে বাধ্য হয়। যদিও তারা আমার নিকটাত্মীয়, তবুও এ ব্যাপারে আমার যা মতামত তা আমি বললাম। এখন তোমরা নিজেরাই বুঝে দেখ কি করবে।

বনূ কুরায়জা ন'ঈম-এর এই অভিমত পেশের জন্য খুব শুকরিয়া আদায় করে। এখন তাদের মাথা ঘোরা শুরু হ'ল এবং ভাবতে লাগল, না জানি তাদের অবস্থাও বনূ নাযীরের মতই হয়! তারা ন'ঈম (রা)-এর কথা আচ্ছা করে মনে গেঁথে নিল।

ন'ঈম (রা) বনূ কুরায়জার নিকট থেকে উঠে গিয়ে কুরায়শদের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানেও তাঁর খাতির যত্ন হ'ল। খানাপিনা শেষে ন'ঈম (রা) আবূ সুফিয়ানকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেনঃ আমি এমন একটা সংবাদ পেয়েছি যা আপনাকে না বললে বন্ধুত্বের দাবী আদায় করতে ব্যর্থ হব। তারপর পেশকৃত তথ্য গোপন রাখার ওয়াদা নিয়ে বললেনঃ আমার মনে হচ্ছে যে, য়াহূদীরা মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য লজ্জিত। এজন্য তারা মুহাম্মদ (সা)-কে খবর পাঠিয়েছেঃ আমরা যদি গাতফান ও কুরায়শদের বিশিষ্ট কয়েকজন সর্দার আপনাকে সোপর্দ করে দিই তাহলে আশা রাখি আপনি আমাদের কসূর মাফ করবেন। আপনার সঙ্গে মিলে মিশে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে পর্যন্ত প্রস্তুত আছি। আমাদের এই কাজে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই বেশী। আক্রমণকারীদের মন-মানসের উপর তাদের নেতাদের বন্দী হয়ে যাবার কারণে নিরাশার কালো মেঘ ছেয়ে যাবে। অনন্তর মুহাম্মদ (সা) তাদের পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট হয়ে সম্মতি প্রকাশ করেছেন।

আবূ সুফিয়ান ছিলেন কমযোর মনের মানুষ। তিনিও এই চালে আটকা পড়লেন এবং তাঁর ধ্যান-ধারণাও ঘোলাটে হয়ে গেল।

কুরায়শদের সঙ্গে মিলিত হবার পর ন'ঈম (রাঃ) বনূ গাতফানের নিকট আসলেন এবং আপন কবিলার সর্দারদের গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে বললেনঃ আমি আপনাদেরই লোক। অতএব শত্রুর কূট চাল সম্পর্কে আপনাদের অবহিত করাকে আমি আমার দায়িত্ব ও কর্তব্য বলেই মনে করি। বনূ কুরায়জা আবু সুফিয়ান ও আমাদের থেকে জামিনস্বরূপ বিশিষ্ট সর্দারদের চেয়ে পাঠাবে। আমার পরামর্শ, তোমরা যেন নিজেদের সর্দার-দেরকে বলির পাঁঠা না বানাও—এমন কি কুরায়শরা তাদের সর্দারদের পাঠাতে রাযী হয়ে গেলেও না।

আবু সুফিয়ান এবং গাতফানের দায়িত্বশীল লোকেরা ন'ঈমপ্রদত্ত সংবাদ ও পরামর্শ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আর কোন আলাপ-আলোচনা করেনি। অবশ্য এতটুকু সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল যে, 'ইকরামা বিন আবূ জেহেলকে কুরা-য়শ ও গাতফানের কতিপয় সর্দারের সঙ্গে বনূ কুরায়জার নিকট পাঠানো হবে এবং তাদেরকে বলা হবে যে, আগামীকাল ভোরে তারা তাদের অঞ্চলে মুসলমানদের উপর হামলা করার জন্য তৈরী থাকবে এবং আবু সুফিয়ানের নির্দেশ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে আক্রমণ করে মুসলমানদের খতম করে দেওয়া হবে। এত সত্বর হামলা করার কারণ পেশ করতে গিয়ে বলা হ'লঃ যে জায়গায় আমরা ছাউনী ফেলেছি সেখানে এত বড় বিরাট বাহিনীর পক্ষে দীর্ঘদিন অবস্থান করা সমীচীন নয়। পশুপালের ঘাসের ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমাদের খুবই কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মওসুম তেমন সুবিধের না হওয়ায় বহুসংখ্যক জীব-জানোয়ার আমাদের মারা গেছে। ফলে আমরা আর অধিককাল এখানে অবস্থান করতে পারছি না।

বনূ কুরায়জা বললঃ কাল তো শনিবার, আর শনিবার দিন আমরা কোন কিছু করি না। যারাই এর ব্যতিক্রম করেছে তারাই কোন না কোন মুসীবতে গ্রেফতার হয়েছে। এ ছাড়াও আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গে লড়াই করব না কিংবা তাঁর উপর আক্রমণোদ্যত হ'ব না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের কতিপয় বিশিষ্ট সর্দারকে জামিনস্বরূপ আমাদের হাতে আপনারা না তুলে দিচ্ছেন। কেননা আপনাদের কথায় বেশ বোঝা যাচ্ছে আপনারা বিপদে ঘেরাও হয়ে পড়েছেন। যদি আপনাদের পরাজয় ঘটে তবে আপনারা নিজেদের দেশে চলে যাবেন, আর আমাদের মুসলমানদের

জুলুম সইবার জন্য ছেড়ে যাবেন। আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গে একাকী তো আর লড়াই করতে পারব না।

বনূ কুরায়জার এই জবাবের ফলে আবু সুফিয়ান এবং বনূ গাতফানের বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মে গেলঃ ন'ঈম আমাদের সত্য খবরই দিয়েছে। বনূ কুরায়জাকে তারা বলে পাঠালঃ আমরা জামিনস্বরূপ আমাদের একজন লোককেও দেবার জন্য তৈরী নই। তোমরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে লড়াই করবার জন্য নিজেদের অঞ্চল ছেড়ে চলে এস। বনূ কুরায়জারও ন'ঈম বিন মাস'উদের কথায় আস্থা হ'ল। ফলে তারা লড়াই করতে সরাসরি অস্বীকার করে বসল এবং বলে পাঠালঃ যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা জামিন পাঠাচ্ছ, আমরা যুদ্ধ করব না।

এদিকে আঁ-হযরত (সা)-এর রাজনৈতিক কৌশল নিজ গতিতে তার কাজ করে চলেছিল। শত্রুর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছিল, অন্যদিকে আল্লাহর অপার কুদরত তা'দের মুসীবত ও দুখ-কষ্ট আরও এক ধাপ বাড়িয়ে দিল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস ও শৈত্য প্রবাহ মুশরিকদের সুখ-স্বপ্ন হারাম করে দিল। প্রচণ্ড হাওয়ায় তাবুগুলো সব উড়ে গেল আর সাজ-সরঞ্জাম হ'ল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; পানির পাত্রগুলোও গেল উল্টে। মোট কথা, চারদিকেই একটা সাধারণ বিশৃংখলা, অরাজকতা, দুর্যোগঘেরা পেরেশানী এবং বিমর্ষ গুমোট আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কারো খবর নিতে পারে না। লেখকের এখানকার মওসুমের কাঠিন্য সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। কেননা লেখক যুদ্ধের সময় এখানে কাটিয়েছেন। এখানকার আবহাওয়ার তীব্রতা অত্যন্ত প্রচণ্ড ও অসহনীয়।

এ সময়েই হুই বিন আখতাব বিশটি উট ভর্তি যব এবং আরও কতিপয় উট ভর্তি ভুষি ও খেজুর মুশরিক শিবিরের জন্য পাঠায়। আঁ-হযরত (সা) যথাসময়ে এ বিষয়ে অবহিত হন এবং অতর্কিত হামলা চালিয়ে সে-গুলো দখল করে নেন। এ ঘটনার ফলে শত্রু ক্যাম্পে একেবারে হতাশা ও নিরাশার কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়ে। তাদের ভেতর পারস্পরিক আস্থাও কমে যায় আর মনোমালিন্যের সুস্পষ্ট চিহ্নও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

আঁ-হযরত (সা) শত্রু ক্যাম্পের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য হুযায়ফা বিন আল-য়ামানকে পাঠিয়ে দেন। হুযায়ফা (রা) লুকিয়ে রাতের বেলায় সেখানে পৌঁছেন। সে সময় আবু সুফিয়ানের পরামর্শ অধিবেশন

চলছিল। আবু সুফিয়ান বক্তৃতা শুরুর আগে বললেনঃ প্রত্যেকেই যেন তার পার্শ্বস্থ লোকটির পরিচয় জেনে নিয়ে নিশ্চিত হয় যে, তাদের ভেতর কোন অপরিচিত লোক উপস্থিত নেই। এর ফলে কেউ হুযায়ফা (রা)-কে কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগে তিনিই অন্যদের প্রশ্ন করতে শুরু করেন। তখনও সওয়াল জওয়াবের পালাই চলছিল এমনি সময় আবু সুফিয়ান বক্তৃতা শুরু করেন এবং বলেনঃ আমাদের আহার্য ও খোরাকী আর খুব অল্পই আছে। এ দিকে মওসুম খুবই ঠাণ্ডা এবং ভয়াবহও বটে যার কারণে সিপাহী ও জীব-জানোয়ারের খুব ক্ষতি হচ্ছে। শওয়াল ও যী-কা'দাহ মাস একেবারে মাথার উপর। এ মাসে কুরায়শরা ধর্মত যুদ্ধ করতে পারে না। এজন্য আমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত এবং সবার আগে আমিই অগ্রসর হচ্ছি, আর সবাইকে পরামর্শও দিচ্ছিঃ চলো, রাতের বেলায়ই বেরিয়ে পড়ি যেন দুশমন আমাদের পিছু ধাওয়া না করতে পারে। এরপর তিনি তার উটের নিকট গেলেন এবং তার পিঠে সওয়ার হয়ে পড়লেন আর সঙ্গে সঙ্গে তার অনুগমন করল অন্য কুরায়শরাও।

গাতফান ও মিত্র বাহিনী কুরায়শদের চলে যাবার খবর শুনতেই ময়দান ছেড়ে পালাল। সে সময় তাদের ন'ঈম (রা)-এর সৎ পরামর্শ আরও একবার অনুভূত হ'ল। বনূ কুরায়জাও ছিল পরম তৃপ্ত, ছিল প্রশংসামুখর এজন্য যে, 'নঈম (রা) বন্ধুত্বের হক পুরোপুরিই আদায় করেছেন। কিন্তু তাদের অবস্থা কুরায়শ ও বনূ গাতফানের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তারা ছিল পেরেশান ও বিমর্ষ।

ভোর হলে মদীনার চারদিকেই নিঃস্তব্ধতা ও নিঃসীম শূন্যতা বিরাজ করছিল। আঁ-হযরত (সা) সংবাদ আনার জন্য একদল আরোহী পাঠিয়ে দিলেন, কাউকে পাঠালেন হামলা করবার জন্য। কিন্তু তাদের প্রতি নির্দেশ রইল,—তাদেরকে শুধু সন্ত্রস্ত ও পেরেশান করে রাখতে হবে, দৃঢ়পদে একই স্থানে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া যাবে না। আঁ-হযরত (সা) জানতেন যে, বনূ কুরায়জা এখনও বর্তমান এবং তাদের নিকট কমবেশী এক হাযার সশস্ত্র নওজোয়ান রয়ে গেছে। এজন্যই তিনি চাচ্ছিলেন না, মদীনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোন কারণে কমযোর হোক। ভোর বেলায় তিনি এলান করে দিলেন যে, আল্লাহ্ ও তদীয় রসূলের অনুগত প্রতিটি ব্যক্তিকেই 'আসরের সালাত বনূ কুরায়জার নিকটস্থ ময়দানে গিয়ে আদায় করতে

হবে। কিন্তু হযরত 'আলী (রা)-কে পতাকা প্রদান করে সে মুহূর্তেই রওয়ানা করে দেন।

বনূ কুরায়জা যুদ্ধ

আঁ-হযরত (সা) হযরত 'আলী (রা)-কে বনূ কুরায়জার কুয়াঁ আন্নার পাড়ে অবস্থান করার হেদায়েত প্রদান করেন। অতঃপর হযরত 'আলী (রা) সেখানে পৌঁছার কিছু পরই তিনিও সেখানে পৌঁছেন। মুসলমানরা দলে দলে সেখানে জমায়েত হতে শুরু করে।

কুরায়শ ও বনূ গাতফানের চলে যাবার খবর বনূ কুরায়জা কিছু আগে পেয়েছিল। তারা তখন বেরও হতে পারে নি, মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবনকারী দলকে তারা দেখতে পায়। অতঃপর এও দেখতে পায়, হযরত 'আলী (রা) ইসলামী ঝাণ্ডা হাতে আগে আসছেন। পরিবর্তিত অবস্থাদৃষ্টে তারা ঘাবড়ে গিয়ে কেল্লার দরজা বন্ধ করে দেয়।

কেল্লা বন্ধ দেখে ইসলামী ফৌজ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। একুশ দিন যাবত তারা ঘেরাও হয়ে থাকে। এরপর তারা সন্ধির দরখাস্ত পেশ করে এবং বলে যে, তারাও বনূ নাযীরের মত নির্বাসনে যাবার জন্য প্রস্তুত আছে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে জওয়াব গেলঃ আগে হাতিয়ার ফেলে দাও; আঁ-হযরত (সা) যে ফয়সালা চাইবেন করবেন। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল অপরাধী, আর অপরাধও ছিল গাদ্দারী ও বিশ্বাসঘাতকতার, এজন্য বিনা শর্তে অস্ত্র সমর্পণ করতে তারা রাযী হয়নি। বরং আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে আবু লুবাবাকে পাঠিয়ে দেবার আবেদন পেশ করে। আবু লুবাবার কবিলা ছিল তাদের মিত্র। আঁ-হযরত (সা) তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। তারা আবু লুবাবাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমরা কি আমাদেরকে মুসলমানদের নিকট সোপর্দ করে দিতে পারি? আপনার মত কি?" জবাবে আবু লুবাবা বলেন, "করো, কিন্তু কৃত অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে হত্যা করা হবে।" এতে তারা আবারও অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করে বসল এবং অবরোধও দীর্ঘায়িত হতে থাকল। শেষ পর্যন্ত বনী আওস (আনসার) তাদেরকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেবার পরামর্শ দেয়। আনসারদের এ পরামর্শক্রমে আঁ-হযরত (সা) বললেনঃ যদি তোমরা চাও তবে এর

ফয়সালা তোমাদের সর্দার সা'দ বিন মা'আয (রা)-কে সোপর্দ করা যাচ্ছে। এ প্রস্তাব য়াহূদী সমেত সবাই সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়।

সা'দ (রা) খন্দক যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। সে সময় তাঁর অবস্থা বেশ ভাল ছিল। আঁ-হযরত (সা) ডেকে পাঠাতেই তিনি বনূ কুরায়জা এলাকায় পৌছেন।

হুই বিন আখতাব কুরায়শদের যাবার পর বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি মুতা-বিক বনূ কুরায়জার নিকট চলে এসেছিল যেন শেষাবধি তাদের সঙ্গে থাকতে পারে। সে তাদেরকেও বনূ নাযীরের মত উস্কানী দেয় এবং বলেঃ অস্ত্র ত্যাগ ক'রো না; বরং তিনটি শর্তের ভেতর যে কোনটি গ্রহণ করে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেল।

প্রথমত, আমরা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর ঈমান আনব এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণ করব। তোমাদের কিতাবে লিখিত আছে য, তিনি নবী-এ-মুরসাল বা প্রেরিত নবী। এর ফলে তোমাদের এবং তোমাদের পরিবার-বর্গের জীবন বেঁচে যাবে এবং আরাম ও পরিতৃপ্তির সঙ্গে জীবন যাপন করতে পারবে।

দ্বিতীয়ত, বাল-বাচ্চাদের কতল করে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে যাও যেন দুশমন আমাদের বীরত্বের পরিমাপ করতে পারে। যদি জিতে যাই তবে আরও বহু বিবি মিলবে, বাল-বাচ্চাও পয়দা হতে থাকবে, এবং সম্পদ ও সৌভাগ্য আমাদের পদচুম্বন করবে।

তৃতীয়ত, শত্রুর উপর আচানক হামলা কর। আজ শনিবার, শত্রু নিশ্চিত থাকবে যে, আজ আমরা লড়াই করব না। ফলে তারা অসতর্ক ও বে-খবর থাকবে। এমতাবস্থায় আমাদের সাফল্য ও কামিয়াবী নিশ্চিত।

য়াহূদীরা হুই-এর তিনটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করে।

সা'দ বনী কুরায়জায় পৌছুলে আঁ-হযরত (সা) য়াহূদীদের, যাদেরকে ঘোষণা দিয়ে ডেকে একত্র করা হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করে জানতে চান, সা'দ যে ফয়সালা করবে তা কি তারা মেনে নেবে? বনূ কুরায়জা জবাবে জানায়, তারা তা মেনে নেবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারাও আঁ-হযরত (সা)-কে বলে যে, তিনিও কি তার ফয়সালা কবুল করে তার উপর কায়েম থাকবেন?

আঁ-হযরত (সা) কায়েম থাকার প্রতিশ্রুতি দেন।

সা'দ বিন মা'আয (রা) যে ফয়সালা দিলেন আঁ-হযরত (সা) তা মেনে নিলেন এবং য়াহূদীদেরকেও তা মানতে হল। এই ফয়সালা মুতাবিক য়াহূদী-দের মালমাত্তা মুসলমানদের মধ্যে ভাগ-বন্টন হয়ে যায়।

এই লড়াইয়ে যে মালে গনীমত হস্তগত হয় তার বন্টন এভাবে করা হয়েছিল যে, এক-পঞ্চমাংশ বের করে ঘোড়-সওয়ারকে তিন ভাগ (একটা অংশ তার নিজের আর দু'অংশ তার ঘোড়ার) এবং পদাতিক বাহিনীকে এক ভাগ দেওয়া হয়। এজন্য এটা করা হয় যে, আঁ-হযরত (সা) স্বীয় ফৌজকে শক্তিশালী করে গড়বার স্বার্থে মুজাহিদদের মধ্যে এই আগ্রহ সৃষ্টি করতে চাচ্ছিলেন যেন তারা সবাই ঘোড়া রাখে এবং অধিকতর মর্যাদাবান ও গর্বিত হয়। যতদিন ফৌজে অশ্বারোহী বাহিনী থেকেছে আরোহী ও পদাতিক বাহিনীর মধ্যে বেতনের পার্থক্য সর্বদা ও সর্বস্থানে ছিল। আজও ট্যাংক ফৌজের সিপাহীকে প্রকৌশলগত নৈপুণ্যের কারণে অধিক বেতন দেওয়া হয়। আঁ-হযরত (সা)-এর দূরদর্শিতার ফলে মুসলিম বাহিনী সত্বর সর্বোত্তম ও শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয়।

বদর যুদ্ধে আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট কেবল দু'টো ঘোড়া ছিল। ওহুদ যুদ্ধে সেনানায়কদের নিজেদের ছাড়া সিপাহীদের নিকট ৩০টি ঘোড়া এবং খন্দক যুদ্ধে শুধুমাত্র ৩৬ জন ঘোড়সওয়ারের একটি প্লাটুন ছিল। এটা বাড়াবার দরকার ছিল জরুরী ভিত্তিতে এবং সেই যুগে স্বেচ্ছাপ্রণোদনের ভিত্তিতে বাড়ানোর এটা ছিল সর্বোত্তম প্রয়াস।

ফলাফল ও শিক্ষা

আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা কৌশল এখন স্পষ্টতর হতে চলেছিল। এই প্রতিরক্ষা কৌশল সমরশাস্ত্রের সেই প্রতিরক্ষা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যার ভেতর নিরাপত্তা ও আশ্রয়কে স্বীয় হেফাজতেই অভিহিত করা হয় না বরং তার আসল উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, শত্রুর উপর এমন মুহূর্তে এবং এমন জায়গায় হামলা করা যেখানে সে কমযোর ও দুর্বল। এই মূলনীতির উপর বরাবর সাফল্যের সঙ্গে 'আমল করা হচ্ছিল এবং এখন তার শ্রেষ্ঠত্ব, প্রাধান্য ও ফলপ্রসূ প্রকাশ ঘটবার এটা ছিল তৃতীয় মওকা। আঁ-হযরত (সা) দুশমনকে স্বীয় প্রতিরক্ষা কৌশলের পরিকল্পাধীনে সেই নাচ নাচালেন

যে, তাদের যেখানে চাইলেন প্রতিরক্ষা চালে চেলে নিয়ে আসলেন এবং এনে একটা কলংকজনক পরাজয়ের তিলক চিহ্ন তাদের কপালে পরিয়ে দিলেন। প্রথমত, দু'টি বাজীতে তাদের উপর মারাত্মক আঘাত হানলেন, আর যেহেতু এ যখম ছিল যুদ্ধের, ফলে তা দৃশ্যমান হয়ে রইল। তৃতীয় আঘাত এমনই কার্যকরভাবে হানলেন যে, তা মুশরিকদের কোমর ভেঙে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু চিরদিনের মত ছিনিয়ে নিল।

এই পরিকল্পনা ছিল হুবহু তেমনি যেমনি প্রথমে শিকারী দানা ফেলে জালে শিকারকে আটকায়। উদাহরণত, বদর নামক স্থানে কুরায়শরা শক্তির দম্ভে মত্ত হয়ে আঁ-হযরত (সা)-এর শক্তি খর্ব করতে এসেছিল। আর অন্য দিকে আঁ-হযরত (সা) নিজের স্বল্প সংখ্যক সঙ্গী-সাথীর সমাবেশ ঘটিয়ে তাদের এমনই এক ময়দানে নিয়ে আসেন যেখানে তাদের আর কোন হুশ-জ্ঞানই রইল না এবং পরাজয় ও ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে তাদের পালিয়ে যেতে হ'ল। তিনি তাদের ফেলে যাওয়া অর্থ-বিত্ত দিয়ে নিজের ফৌজকে অধিকতর মযবুত বানালেন। দ্বিতীয় বার তিনি ওহুদ ময়দানকে নির্বাচিত করেন। প্রথমে তিনি তাদেরকে নিজেদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা বেশ ভালোভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ দিলেন। প্রকাশ করবার পর আঁ-হযরত (সা) এমনই প্রতিরক্ষা চাল চাললেন যে, তাদেরকে মদীনার উত্তর দিকের ময়দানে লড়াইয়ের পরিবর্তে তাকে নিজেদের পেছনে ফেলতে হয়। অতঃপর এই পশ্চাদদেশ তাদের জন্য ভয়াবহ ও বিপজ্জনক মনে হওয়ায় তারা কানাত উপত্যকায় জমায়েত হয় এবং এমন মূলনীতির উপর লড়তে হয় যার উপর আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে লড়াইয়ে নামাতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয়বার ঘটেছিল অবস্থার পরিবর্তন। শত্রু বিরাট বাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছিল। ফলে এবার তিনিও প্রতিরক্ষার অস্ত্রে নতুনভাবে শান দিলেন এবং যুদ্ধের চিত্র এভাবে তৈরী করলেন যে, দুশমন এবারও সে জালে অন্ধ-ভাবে ফেঁসে গেল। এই তৃতীয়বারের লড়াই তাদের জীবনের শেষ লড়াই প্রমাণিত হ'ল। তিনি জানতেন যে, যুদ্ধ কখনো দু'দফা একই ময়দানে একই মূলনীতির উপর সাফল্যের সঙ্গে লড়া যায় না। তাঁর এও জানা ছিল যে, মদীনার উত্তর এলাকা শত্রুর জন্য নেহায়েত উপযোগী এবং এও জানা ছিল যে, দুশমন কর্দমাক্ত ময়দানকে এখন দুরতিক্রম্য হিসাবে মেনে নেবে

না। অধিকন্তু তিনি এও বুঝতেন যে, য়াহূদীরা দাগাবাজী করবে! এমতাবস্থায় যুদ্ধের নকশা নতুনভাবে প্রণয়ন করা ছিল জরুরী। তিনি এও চাইছিলেন যে, যেভাবে প্রথম যুদ্ধগুলোতে শত্রুর বাহিনীগুলোকে বেকার ও অথর্ব করা গিয়েছিল এবারও সেভাবেই করা হবে। ফলে সমস্ত দিকের উপর ভেবে-চিন্তে তিনি এমন খন্দক তৈরী করেন যা মুশরিকদের ঘোড়সওয়ার পেরোতে না পারে। এই সঙ্গে এমন মযবুত মোর্চা বানান যে, শত্রুর পদাতিক বাহিনীও যেন বিরাট সংখ্যায় একযোগে হামলা করতে না পারে; বরং তাদেরকে সংকীর্ণ রাস্তা ও গলি পথ অতিকম করে আসতে হয় যেন দু'দিকের কয়েকজন সৈনিকই মাত্র একে অপরের সঙ্গে হাতাহাতি মুকাবিলা করতে পারে। অতঃপর তিনি সে সব সংকীর্ণ রাস্তার উপর প্রস্তর নির্মিত ছোট ছোট ঝুপড়ীকে কেল্লাবন্দী করে সে সবের ভেতর তীরন্দায মোতায়েন করেন যেন দুশমনের অগ্রাভিযানের ক্ষেত্রে অধিকতর অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

আঁ-হযরত (সা) নিজ বাহিনী ছোট ছোট গ্রুপে বিভক্ত করে সমগ্র ফ্রন্টের হেফাজতের জন্য কেবলমাত্র নির্দেশই দেন নি বরং একটি অংশ সমস্ত মোর্চায় নিযুক্ত করেন এবং বৃহত্তম অংশকে সাহায্যকারী বাহিনী হিসাবে নিজের নিকট রিজার্ভ রাখেন যাতে মুহূর্তের নোটিশে বিপদস্থলে পাঠানো যায়। মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনী খালিদ বিন ওয়ালীদের মত যোগ্য ও বাহাদুর অধিনায়কের নেতৃত্বাধীনে ছিল। তার মুকাবিলায় তিনি মুসলিম ঘোড়সওয়ারদের অধিনায়ক হিসেবে হযরত 'আলী (রা)-র মত নামকরা জেনারেলকে নিযুক্ত করেন। লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল, মুশরিক অশ্বারোহী বাহিনী যেখান থেকেই খন্দক পার হোক না কেন সেখানেই যেন তাকে খতম করা যায়, তাদের একজনও যেন ফিরে যেতে না পারে। কার্যত তাই হয়েছিল। 'আমর বিন 'আবদুদ ও নওফল বিন 'আবদুল্লাহ্ বিন আল-মুগীরার মতো বিখ্যাত বীরদেরকে মরণের ওপারে পাঠিয়ে দিয়ে শত্রু বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়। হযরত 'আলী (রা) এই সুযোগে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব হাতে নিয়ে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক অগ্রাভিযানশাস্ত্রে সর্বোত্তম নীতি কায়েম করেন। আর তা এই যে, যদি কোথাও দুশমন মোর্চা ভেঙে ফেলতে কামিয়াব হয় তবে তাদের উপর তাৎক্ষণিকভাবে পাল্টা হামলা চালিয়ে তাদেরকে খতম করে দিতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান অধিনায়ক ফিল্ড মার্শাল রোমেল য়ূরোপে দ্বিতীয় দফা হামলার সময় এই নীতির

উপর 'আমল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিত্রবাহিনীর অধিনায়ক তা ব্যর্থ করে দেন! যদি রোমেল মিত্রবাহিনীর সেই সব জীবন উৎসর্গকারী প্লাটুন-কে যারা হিটলারের আটলান্টিক মহাসমুদ্রের প্রাচীর গুড়িয়ে দেবার জন্য ফ্রান্স ভূখণ্ডে অবতরণ করেছিল—ধ্বংস ও বরবাদ করে দিতে পারতেন তাহলে যুদ্ধের চিত্রই পাল্টে যেত। তেমনি হযরত 'আলী (রা) যদি সে সব আরোহীকে কতল না করতেন তাহলে মদীনার রণক্ষেত্র অন্যরূপ ধারণ করত আর মুসলমানদের সম্মুখীন হতে হ'ত খুবই সঙ্গীন ও ভয়াবহ অবস্থার। ইসলামী বিশ্ব হযরত 'আলী (রা)-কে যে "হায়দার" (সিংহ) উপাধিতে স্মরণ করে থাকে তা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। এর দ্বারা আঁ-হযরত (সা)-এর বীর্যবত্তা, বীরত্ব ও নির্ভীকতাই প্রকাশ পায়।

খন্দক যুদ্ধকে যদি আজকালকার প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে, আঁ-হযরত (সা) এ্যান্টি ট্যাংক হিসাবে ট্যাংকের হাত থেকে বাঁচবার তাগিদে খন্দক খনন করেছিলেন। ট্যাংক প্রকৃতপক্ষে অশ্বারোহী সৈন্যেরই পরবর্তী সংস্করণ। অতএব আজকাল ট্যাংকের হাত থেকে হেফাজতের তাগিদে যে সব খন্দক খনন করা হয়ে থাকে তা নতুন কোন আবিষ্কার নয়। এর উদ্ভাবক ও প্রবর্তক ছিলেন আঁ-হযরত (সা)।

এ ব্যাপারে আঁ-হযরত (সা)-এর আরও একটি নতুনত্ব রয়েছে আর তা হ'ল, তিনি প্রমাণ করে দেন অশ্বারোহী বাহিনীকে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় কয়েকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর দ্বারা শত্রুর রসদ-সম্ভার ও যুদ্ধের সামান-আসবাবের কাফেলার উপর অতর্কিত ও ঝটিকা হামলার কাজ নেওয়া যেতে পারে। গত মহাযুদ্ধে রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে এই নীতির উপরই 'আমল করেছিল। রাশিয়া জার্মান ফৌজের বিরাট বাহিনীর জন্য জাল বিছিয়েছিল। জার্মান ফৌজ বিদ্যুৎগতিতে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মস্কো এবং স্টালিনগ্রাডের সামনে না পৌঁছে রাশিয়া একই স্থানে দৃঢ় ও সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই করে নি। রুশ সৈন্য হাযার হাযার বন্দী হয়েছে। জার্মান বাহিনী সাফল্যের নেশায় মত্ত হয়ে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকেই এমন এলাকায় পৌছে যায় যেখানকার মওসুমী অবস্থার মুকাবিলা করা তাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ও দুঃসাধ্য ছিল। একই ভুল নেপোলিয়নও করেছিলেন আর হিটলার সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি কর-লেন মাত্র। সে সময় এই প্রশ্ন ছিল যে, স্টালিন কি লাল ফৌজকে জার্মান

ও তার মিত্রবাহিনীর মুকাবিলায় দৃঢ়পদ রাখতে পারবেন? স্টালিনের নিজ জাতি ও ফৌজের উপর পূর্ণ আস্থা ছিল। জার্মানদের মিত্রবাহিনী সে সব মোর্চা জয় করার জন্য বেধড়ক কুরবানী দিয়েছিল। কিন্তু তারা কামিয়াব হতে পারেনি। তথাপি তারা হিম্মত হারায় নি। হিটলার নিজের কথায় অনড় থাকেন। কিন্তু যখন গুড়ি গুড়ি বরফপাত ও প্রচণ্ড শৈত্য-প্রবাহ ভয়াবহ রূপ নিয়ে হাযির হ'ল তখন সম্পূর্ণ চিত্রই গেল পাল্টে। জার্মানরা না যথেষ্ট খোরাক পেল, না পেল শীতের পোশাক। কামানের গোলা যেমন প্রচুর ছিল না, তেমনি ছিল না ট্যাংক, সাজোয়া ও রসদবাহী গাড়ীর পেট্রল। রাশিয়ানরা পাল্টা হামলা শুরু করল। অগত্যা জার্মানদের পক্ষে পশ্চাদপসরণ ভিন্ন আর কোন গত্যন্তর রইল না। তারা যখন পিছু হটলো তখন রুমানিয়ার মিত্রবাহিনী স্বদেশের পথ ধরল এবং রাশিয়ানরা তাদের নিকট থেকে বিরাট এলাকা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হ'ল।

এই সাফল্য ও কামিয়াবীর কারণ ছিল যেখানে মওসুমের সহযোগিতা, সেখানে অন্যতম কারণ এও ছিল যে, রাশিয়া তাদের ফৌজের একটা বড় অংশই সক্রিয় সাহায্যকারী বাহিনী হিসাবে রিজার্ভ রেখেছিল। উদ্দেশ্য ছিল, জার্মান ফৌজ যেখানে রাশিয়ান ফ্রন্ট লাইন ভেঙে ফেলতে প্রয়াস চালাবে সেখানে এই সাহায্যকারী রিজার্ভ বাহিনী যেন ঝটিকা বেগে পৌঁছে পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারে। এতদভিন্ন আরও একটি কারণ এও ছিল যে, রাশিয়ানরা তাদের সেনাপতির উপর পূর্ণ আস্থাশীল ছিল, কিন্তু জার্মানীর মিত্রবাহিনীর বেলায় একথা খুব একটা দৃঢ়তা ও জোরের সঙ্গে বলা যায় না। রুশ অধিনায়ক ছিলেন অটুট মনোবলসম্পন্ন আর স্থির-মস্তিষ্ক। কিন্তু তার প্রতিপক্ষীয় জেনারেল শক্তি ও জয়ের নেশায় ছিলেন মত্ত। অতএব মস্কোর উপর রাশিয়া ও জার্মানীর সংঘটিত বিরাট যুদ্ধে খন্দক যুদ্ধের আধুনিকতম পন্থা বেশ ভালোভাবেই অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

খন্দক যুদ্ধ মুশরিকদের মন-মগজে বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে, প্রতিরক্ষা নীতি সেই মুহূর্তে অত্যন্ত কার্যকর হয়ে থাকে যখন আত্মরক্ষা পরিকল্পনার উপর বাস্তব রূপদানকারী সিপাহসালার নিজের নিকট বিরাট সংখ্যক সক্রিয় সাহায্যকারী বাহিনী রিজার্ভ রাখেন এবং উক্ত বাহিনী প্রতিটি স্থানে বেশ সহজভাবে পৌঁছানো যায়। এই সক্রিয় সাহায্যকারী বাহিনী যেন যুদ্ধক্ষেত্রের সেই ঢালের মতই ছিল যা সে দুশমনের আঘাতকে সাফল্যের সঙ্গে রুখতে ব্যবহার

করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মস্কো এবং স্টালিনগ্রাডের বিখ্যাত যুদ্ধগুলো দুনিয়ার প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকদের যেন আর একবার আলস্যের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিল এবং বুঝিয়ে দিল যে, সাফল্যের জন্য শুধুমাত্র হামলা ও অগ্রাভিযানই একমাত্র পূর্ব শর্ত নয়, বরং যদি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় আক্রমণোদ্যত ও হামলারত দুশমনকে এমন চাল দ্বারা ধোকা দেওয়া যায় যে, সে আত্মরক্ষার মোর্চায় মাথা কুটে কুটে নিজের শক্তিকে নিঃশেষ করে দেবে, তবে এটাই হবে সবচেয়ে বেশী কার্যকর ও অধিক ফলপ্রসূ।

খন্দক যুদ্ধের উপর গভীরভাবে ভাবুন। প্রতিপক্ষ বাহিনীর সংখ্যাশক্তি একের তুলনায় তিন। এই সংখ্যাধিক্যের প্রতিবিধান তাই ছিল যা আঁ-হযরত (সা) করেছিলেন অর্থাৎ তিনি এটাকে সামনে রেখেই খন্দক এতখানি দীর্ঘায়িত করলেন যেন অত্যন্ত আসানীর সঙ্গে প্রতিরোধ করা যায়, সাহায্যকারী বাহিনীকে সরাতে-নড়াতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়, যেখানেই দরকার পড়ুক না কেন সঙ্গে সঙ্গে বিনা আয়াসেই যেন সৈন্য পাঠানো যায়। মুসলিম বাহিনী যদি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে প্রস্তর নির্মিত ঝুপড়ীতে কেল্লা বন্দী হয়ে থাকত তাহলে মুশরিক বাহিনী কয়েক দিনেই বিজয় লাভে সমর্থ হ'ত। রসদ-সম্ভার, পানি ও ঘাসের জোগাড় করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠত। সমবেত শক্তি ছোট ছোট মোর্চায় বিচ্ছিন্ন হয়ে কমযোর হয়ে যেত। খন্দকের দীর্ঘ মোর্চার কারণে একে তো মুসলিম ফৌজের চলাচলের জন্য প্রচুর জায়গা মিলেছিল, অপর দিকে শত্রু পক্ষকেও বিরাট ফ্রন্টের জন্য তার বাহিনীকে ছড়িয়ে দিতে হয়েছিল। আঁ-হযরত (সা) স্থানীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বেশ ভালোভাবেই পরিমাপ করে নিয়েছিলেন যে, দুশমন তাঁদের চতুর্দিক থেকে সব সময় ঘেরাও করে রাখতে পারে না। কয়েক মাইল লম্বা ও কয়েক মাইল চওড়া কর্দমাক্ত ময়দান অবশ্যই অতিকমযোগ্য ছিল, কিন্তু অবস্থানযোগ্য আদৌ ছিল না। এজন্য আঁ-হযরত (সা) সহজেই পরিমাপ করে নেন যে, দুশমন স্বীয় শক্তির অধিক সমাবেশ ঘটাবে কোন্ কোন্ জায়গায় এবং পরবর্তী অবস্থা ও ঘটনাবলী এটাকে সঠিক ও নির্ভুল প্রমাণ করেছিল। শত্রু আঁ-হযরত (সা)-এর এই নবতর অস্ত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণাও করতে পারেনি। তাদের নীতি ছিল সেই অতি প্রাচীন কালের যে নীতির উপর আরবে লড়াই হ'ত। অতএব তাদের সামগ্রিক প্রস্তুতিতে সেই নীতিই সক্রিয় ছিল। কিন্তু তারা যখন মদীনায়

পৌঁছে আঁ-হযরত (সা)-এর এই সমর পরিকল্পনা দেখল, দেখে হয়রান ও হতভম্ব হয়ে গেল। তারা তাদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় রসদ-সম্ভার এবং মওসুমী পরিবর্তন মুতাবিক পোশাক-পরিচ্ছদও এনেছিল। তারা ভেবেছিল যে, মুসলিম ফৌজ কয়েক দিনের মধ্যে না হলেও কয়েক সপ্তাহ্‌র ভেতরই আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু অবরোধ যখন দীর্ঘায়িত হতে চলল তখন তাদের গোটা ব্যবস্থাপনাই ভেঙ্গে পড়ল। এটা তাদের কল্পনায়ও স্থান পায় নি যে, যুদ্ধ পবিত্র মাসসমূহ পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে এবং তা শেষ হবার কোন লক্ষণই দেখা যাবে না। এ ধরনের ভুল ১৯৪০ সালে মিত্রবাহিনীও গ্রীষ্ম মওসুমে করেছিল। তাদের ধারণা ছিল যে, আমাদের নতুন প্রতিরক্ষা কৌশল এমনই অভিনব হবে যে, দুশমন সকল অনুভূতি হারিয়ে সন্ধির দরখাস্ত পেশ করতে বাধ্য হবে। তাদের ধারণায় জার্মানীকে তারা সফলতম ও পরিপূর্ণতমভাবে অবরোধ করে রেখেছিল। অতএব তাদের প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকগণ মিত্র-শক্তির সরকারগুলোকে পরামর্শ দিয়েছিল যে, যথাসম্ভব সত্বর যুদ্ধের পরি-সমাপ্তির একটি মাত্রই পন্থা রয়েছে আর তা হ'ল এই যে, শত্রুরাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে ভয় কিংবা ধমক দেখিয়ে সন্ধি করতে উৎসাহিত করে তোলা হোক। অনন্তর তারা এই পরিকল্পনাধীনে ১৯৪০ সালের গ্রীষ্ম মওসুমের সূচনায় জার্মানীর বড় বড় শহরে ২৩ হাযার টন ওজনের বোমা নিক্ষেপ করে এবং ১৯৪২ ঈসায়ীতে এর ওজনের পরিমাণ বাড়িয়ে ৩৭ হাযার টন করা হয়। কিন্তু এতেও যখন কোন ঈপ্সিত ফল লাভ হ'ল না তখন তাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয় যে, তারা যথেষ্ট সংখ্যক বোমা বর্ষণ করেনি। অতএব ১৯৪৩ ঈসায়ীতে ওজন বাড়িয়ে ১৩৫ হাযার টনে উন্নীত করা হয়। এরপর আমেরিকাও যখন য়ুরোপের সমর ক্ষেত্রে এসে হাযির হ'ল তখন তার পরিমাণ বাড়িয়ে ১৮০ হাযার টন করা হয়। ১৯৪৪ ঈসায়ীতে দৈনিক পাঁচ হাযার টন বোমা নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয় নি। জার্মানী বরাবরের মতই লড়াই চালিয়ে যায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিমান যুদ্ধে ধ্বংসের বিভীষিকা ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিটি ব্যক্তির উপর এর প্রতিক্রিয়া কিছু না কিছু পড়েই থাকে। কিন্তু এটা ততক্ষণ পর্যন্ত চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে না যতক্ষণ না প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে মনোবল অটুট থাকে এবং শত্রুকে পাল্টা জবাব দানের শক্তি অবশিষ্ট থাকে।

মক্কার মুশরিকরা স্বীয় ফৌজের শক্তি বৃদ্ধি, অবরোধের পরিপূর্ণতা এবং বিভিন্ন স্থানে শক্তির মহড়া প্রদর্শন করে মদীনাবাসীদেরকে পরাজয় স্বীকার করতে যারপরনাই কোশেশ করে। কিন্তু মদীনাবাসীরা তাতে হিম্মত হারাবার পরিবর্তে যেন সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও অটুট মনোবলের অধিকারী হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত মুশরিকরা নিজেরাই অক্ষম ও পেরেশান হয়ে প্রস্থান করে।

আঁ-হযরত (সা)-এর লড়াই করার উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধের পর শান্তি ফিরে আসবে এবং বিজেতা ও পরাজিত উভয়ে আত্মিক, মানসিক ও সামাজিক প্রশান্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই যুদ্ধে তিনি ঠিক ততটুকু মাত্র জীবন ও সম্পদ হানি ঘটানোকে জায়েয রেখেছেন যতটুকু যুদ্ধ পরিসমাপ্তি ও শান্তি লাভের জন্য ছিল অপরিহার্য। অন্যথায় তিনি এমন পরিকল্পনা তৈরী করতেন না এবং সামরিক চাল চালতেন না যার ফলে দুশমন বিনাযুদ্ধেই ভীতসন্ত্রস্ত ও হতভম্ব হয়ে হিম্মত হারিয়ে বসত আর অধিক রক্ত ক্ষয় ব্যতিরেকেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল হয়ে যেত। এই সামরিক কলা-কৌশলকেই বৃটিশ প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ লীডল হার্ট-এর উক্তি মুতাবিক জার্মানীর প্রখ্যাত প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষক নিম্নোক্ত ভাষায় পুনরাবৃত্তি করেছেন ঃ

"প্রতিরক্ষা কৌশলের সাহায্যে এমনিভাবে কর্ম সম্পাদন করতে হবে যে, লড়াই ব্যতিরেকে অন্য পন্থায়ও শত্রুর উপর বিজয় সাধিত হয়।"

অর্থাৎ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এমন হওয়া দরকার যে, উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার সঙ্গে শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যও যেন সম্মুখে থাকে এবং এই শান্তি যেন সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী না হয়; বরং তা যেন স্থায়ী ও চিরন্তন হয়। একথা বর্ণনার উদ্দেশ্য হ'ল এই যে, সমগ্র শক্তি ও উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে যদি শত্রুর উপর বিজয় লাভ করা যায় তবে তাকে পারিভাষিক অর্থে বিজয় অবশ্যই বলা যায়। কিন্তু যদি এর কারণে বিজয়ী জাতিগোষ্ঠীর রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে পড়ে তবে তারা নিজেরাই শান্তির ন্যায় অমূল্য সম্পদ খুইয়ে বসবে। কেননা নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সুস্থ করবার জন্য তারা দুশমন কিংবা বিজিত জাতি বা গোষ্ঠী থেকে শক্তি প্রয়োগে অর্থ-কড়ি ও ধন-সম্পদ জমা করে। এভাবেই তাকে হীনবল, হতাশা ও দারিদ্র্যের শেকলে আবদ্ধ করে মজবুর ও লাচার বানিয়ে ফেলে। এর প্রতিক্রিয়া

প্রতিশোধ ও ঘৃণার আকারে প্রকাশ পায় এবং এভাবে দেখতে না দেখতেই অতঃপর আর একটি নতুন যুদ্ধের কালো মেঘে ছেয়ে যায় আসমানের দিগন্ত রেখা। আর এর ফলে না বিজেতার পক্ষে শান্তি ও স্বস্তি জোটে, আর না জোটে বিজিতের পক্ষে। আর এ ধরনের বিজয় যদি কতিপয় জাতি-গোষ্ঠী ও গোত্র ইত্যাদি মিলিত হয়ে হাসিল করে এবং তা হাসিল করতে গিয়ে তারা যদি নিজেদের সকল পন্থা ও উপায়-উপকরণ বেপরোয়া কাজে লাগিয়ে থাকে তা হলে তা তো শান্তি ও নিরাপত্তা আরও কল্পনার বিষয়ে পরিণত হয়। কেননা বিজয়ের পর এই মিত্রশক্তি যারা আর্থিক ও সহায়-সম্পদের দিক দিয়ে একেবারেই দেউলিয়া হয়ে যায় নিজেদের দেউলিয়াপনা দূর করবার ও রাজকোষ ভর্তি করবার নিমিত্ত শত্রুর নিকট থেকে যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণ উসুল করে থাকে। এখন যেহেতু মিত্রশক্তির প্রতিটি সদস্যই নিজের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে এবং যুদ্ধজনিত জরুরী কোন সাধারণ বিপদাশংকাও আর অবশিষ্ট থাকে না, সেহেতু পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতিও আর পূর্বের ন্যায় বজায় থাকে না; বরং তা বিদায় নেয়। সে জায়গায় অবিশ্বাস ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। সামনে অগ্রসর হয়ে এই মনোমালিন্য ও বিভেদ একটি নবতর যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে।

১৯১৪-১৮ এবং ১৯৩৯-৪৫ ঈসায়ীর মহাযুদ্ধের ফলাফল আমাদের সামনে রয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্ম দেয়, আর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে তৃতীয় যুদ্ধের বিভীষিকাময় মূর্তি তৈরী হচ্ছে। অতঃপর এই অবিশ্বাস, সন্দেহপরায়ণতা ও মনোমালিন্য শুধু জয়ের মুহূর্তেই সৃষ্টি হয় না, কোন সময় তা এর পূর্বেও সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তাদের পরস্পর থেকে আলাদা করে দেয়। এ ধরনের বিচ্ছিন্নতা অধিকাংশ সময় খতরনাক হয়ে থাকে। ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি নজীর মিলবে। প্রথম মহাযুদ্ধের মিত্রশক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেছে এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ের পর একে অন্যের জন্য চরম শোণিত পিপাসু ও জালিমে পরিণত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, প্রতিরক্ষা কৌশল কোন মূলনীতির উপর স্থাপিত হওয়া উচিত? এর জবাবের পূর্বে আরও একটি সওয়াল পয়দা হয় যে, সে তার নিজ রাষ্ট্রীয় সীমান্তকে বিজয়ের মাধ্যমে বৃদ্ধি ও বিস্তৃত করতে থাকবে অথবা সে তার নিজ অবস্থার উপর কায়েম থাকবে এবং ধৈর্য ধারণ করবে। যদি

উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম বর্ণিত বিষয় হয় তবে স্বীয় বিরুদ্ধবাদীদের ফৌজকে ধ্বংস এবং তাদেরকে নিজ অধীনে আনাই হবে তার প্রতিটি যুদ্ধের প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য। যেহেতু এ ধরনের রাষ্ট্র অপরাপর রাষ্ট্রকে গ্রাস করতে চায়, সেজন্য সে নিকট ও দূরের সকল রাষ্ট্রকে স্বীয় প্রতিপক্ষ বানিয়ে একটি বিরাট ওয়ার ফ্রন্ট কায়েম করে নেয়। নেপোলিয়ন ও হিটলারের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনেই রয়েছে। এ ব্যাপারে অধিক টিকা-টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

পক্ষান্তরে সে সব হুকূমত যারা গোটা দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে শুধুমাত্র নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের হেফাজতেই তুষ্ট থাকে তারা আস্তে আস্তে ছিনতাইকারী বিজয়ীদের সাম্রাজ্যবাদী লিপ্সার শিকারে পরিণত হয়। নেপোলিয়ন ও হিটলারের প্রাথমিক বিজয়গুলোতে এর সুস্পষ্ট নজীর রয়েছে। অতএব জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার এবং অভিজ্ঞতা ও গভীর পর্যবেক্ষণের ফয়সালা হ'ল, যে হুকূমত স্বীয় অধিকার ও স্বার্থের হেফাজতের জন্য আক্রমণাত্মক ইচ্ছাশক্তি ও অদম্য মনোবলের পোশাকে আবৃত হয় সে শুধু তার অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচেই থাকে না বরং অন্যান্য হুকূমতের নজরেও ইয্যত ও মর্যাদার মহান আসন লাভ করে। বর্তমান কালে এর সর্বোত্তম নজীর বৃটেন। সে আট শত বছর থেকে যে নীতি অবলম্বন করে রেখেছে, তা এ-টাই। য়ুরোপে যখনই কোন হুকূমত আগ্রাসন ও আক্রমণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বৃটেন তাৎক্ষণিকভাবেই এই পলিসি দৃঢ়ভাবে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে অনুসরণ করে এসেছে এবং য়ুরোপে শক্তির ভারসাম্য বজায় রেখেছে। এমনও মুহূর্ত এসেছে যখন সে য়ুরোপে মিলিত শক্তির হিরো হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে বটে, কিন্তু কখনই সে য়ুরোপে নিজ রাষ্ট্র সম্প্রসারণের চেষ্টা চালায় নি; বরং যখনই এবং যেখানেই লড়াই খতম হয়েছে অমনি সে 'বাণিজ্যিক সংগ্রামে' লিপ্ত হয়ে গেছে। ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী যখনই বিজয়ীর মর্যাদা লাভ করেছে, অমনি সে অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর কব্জা জমাতে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছে। কিন্তু বৃটেন এ জাতীয় গোলমাল থেকে ফায়দা উঠিয়ে তার নয়া উপনিবেশ বাড়িয়েছে। যা-ই হোক, সফল ও নিরাপদ হুকূমতের জন্য জরুরী হ'ল স্বীয় অধিকার ও স্বার্থ হেফাজতের জন্য আক্রমণকারী হিসেবে প্রতিরক্ষামূলক অগ্রাভিযানের জন্য তৈরী থাকা। বৃটেন ছাড়াও এই দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিকতা ও গুরুত্ব আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা নীতি থেকেও বেশ ভালভাবেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু আমাদের বোধশক্তি,

উপলব্ধি, জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অবস্থা এই যে, আমরা নেপোলিয়ন প্রমুখ ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাকে রাষ্ট্রনীতি ও সরকারের গগনচুম্বি নায়কের আসনে সমাসীন করেছি এবং তার কার্যাবলী মুগ্ধ বিস্ময়ে ও ভক্তি গদগদ চিত্তে পড়ে ও দেখে থাকি। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর সামগ্রিক গুণাবলী, ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পর্কে এতখানি অজ্ঞ যেন জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির সঙ্গে আঁ-হযরত (সা)-এর কোন সম্পর্কই ছিল না এবং তিনি রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ও যুদ্ধবিগ্রহ বিষয়ে যেন কোন দিক-নির্দেশনাই রেখে যাননি।

প্রথম মহাযুদ্ধ আমাদের কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়েছে; আমাদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়েছে। কিন্তু তথাপি আমরা আমাদের আলস্যের ঘুম ছেড়ে আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠিনি। উল্টো অন্যের যাদুমন্ত্রের শিকার হয়ে হুশ-জ্ঞান, সংহতি ও ঐক্যের ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট পুঁজিটুকুও আমরা হারিয়ে বসেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত সয়লাব এল এবং মাথার উপর দিয়ে তা চলেও গেল, কিন্তু আমরা একবারও পাশ ফিরলাম না। আঁ-হযরত (সা)-এর নাম মুখে উচ্চারণকারী এবং তাঁরই পদাংক অনুসরণকারী হিসাবে দাবীদার অন্যদের প্রতারণা জালে গ্রেফতার এবং নিজেদের দাসত্বপনা ও অসহায়তায় পরম তুষ্ট।

যা-ই হোক, আঁ-হযরত (সা) খন্দক যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদেরকে পুনরায় শেখালেন যে, শক্তির পরীক্ষা দু'ধারী তলোয়ারের মত। এর অনর্থক ব্যবহার এবং কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে এর পরীক্ষা বিপজ্জনক। আঁ-হযরত (সা) শুরুতে কুরায়শদেরকে সত্যের পয়গাম শোনান। এতে তারা তাঁর উপর জুলুম-অত্যাচারের পাহাড় নামিয়ে দেয় এবং তা অব্যাহত থাকে। যখন আর কোন উপায় রইল না এবং ধৈর্য ও সহ্যের সকল সীমা অতিক্রম করল তখনই তিনি হিজরতের মত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং এর উপর আমল করতে শুরু করেন। মক্কার মুকাবিলায় মদীনাকে হারাম বানিয়ে মক্কাবাসীদের কার্যত বলে দিলেনঃ তোমরা তোমাদের ঘরে সুখে-শান্তিতে থাক, আর আমরা আমাদের ঘরে সুখে-শান্তিতে থাকি। কুরায়শরা কিন্তু এর জবাব দিতে চাইল শক্তির প্রদর্শন ঘটিয়ে এবং একের পর এক অনেকগুলো লড়াইও তারা লড়ল। মুশরিকরা এটা বুঝল না যে, যুদ্ধ যেখানে নিজের কথাকে জোর-যবরদস্তিমূলক মানিয়ে নেবার জন্য শুরু

১৮—

হয়ে থাকে, সেখানে শত্রুর পেশকৃত শর্তাদি মেনে নিয়ে তার অবসান ঘটাও সম্ভব। অন্য কথায়, অধিকাংশ সময়ে যুদ্ধ অবসানের অবস্থার আওতায় আক্রমণকারী সরকারগুলোকে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষের দলীল-প্রমাণ ও শর্তাদির সামনে মাথা নত করে দিতে হয়। এতে সন্দেহ নেই যে, প্রতিটি সরকারের ভেতর নিজেদের অধিকার সংরক্ষণের সবল ও অটুট ইচ্ছা থাকা দরকার। কিন্তু এই সঙ্গে এটাও পরিষ্কার থাকা উচিত, যে সব লোক যুদ্ধের ময়দানে সবর ও বরদাশ্ত তথা ধৈর্য, সহ্য, সহিষ্ণুতা ও স্থৈর্যের সঙ্গে কাজ করে থাকে—অপরিণামদর্শী ভয়-ভীতিহীন বীর বাহাদুরের চেয়ে সব-দিক দিয়ে সেসব লোকই উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং পরিণতিতে তারাই কামিয়াব হয়ে থাকে। বীরত্ব ও সাহসিকতা নিশ্চয়ই একটি উত্তম গুণ। এর সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে বুদ্ধি ও মধ্যম পন্থা অনুসরণ করা নেহায়েত জরুরী। যে সমস্ত লোকের হাতে ক্ষমতার চাবিকাঠি কিংবা ফৌজের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে তাদের ভেতর দূরদর্শিতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা ও সতর্কতা থাকা অপরিহার্য। যদি এ সবের কোন একটির বা দু'টি ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তাহলে দেশ ও জাতির ধ্বংস নিশ্চিত। অতএব এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদারী সে সমস্ত লোকই সঠিকভাবে ও সুষ্ঠু পন্থায় বহন করতে পারে যারা অপরিণামদর্শী নয়, ত্বরাপ্রবণ কিংবা সীমাতিরিক্ত নির্ভীক নয় এবং যারা উপযোগী মুহূর্তে হুশ-জ্ঞান খুইয়ে বসে না।

আঁ-হযরত (সা)-এর পরিচালিত সমস্ত যুদ্ধ প্রচলিত ও সাধারণ নিয়মের বিপরীত ছিল। সাধারণত দুশমনকে ধ্বংস ও বরবাদ করা, শত্রুকে উচ্ছেদ করা এবং গর্ব ও অহমিকার কাঞ্চনজঙ্ঘায় আরোহণের জন্য যুদ্ধ করা হয়ে থাকে। কুরায়শরা আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে যে কয়টি যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল তার সবগুলো এই উদ্দেশ্যেই করেছিল। কিন্তু ঘটনাবলী সাক্ষী এবং আঁ-হযরত (সা)-এর কর্ম-পদ্ধতি এর দলীল যে, তিনি কোন একটি যুদ্ধও এই উদ্দেশ্যে লড়েন নি। বদর যুদ্ধের উদ্দেশ্য যেমন এরূপ ছিল না, তেমনি ওহুদ, গযওয়ায়ে সাবীক কিংবা খন্দক যুদ্ধেও এরূপ কোন লক্ষ্য ছিল না তাঁর। উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র শান্তি অর্জন ও শান্তি স্থাপন, আর এই উদ্দেশ্যেই তিনি ওয়া'জ-নসীহত ও তবলীগের তরীকা ইখতিয়ার করেন এবং এরই জন্য তিনি জিহাদ করেন।

যে হুকুমত অথবা যে নেতা ও অধিনায়ক ব্যক্তিগত উচ্চাকাংক্ষা ও অহমিকার কারণে যুদ্ধের ময়দানে আগমন করে শান্তির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। সে দেশকে ধ্বংসের চূড়ান্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করে শোহরত ও খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে প্রয়াস চালায়। নিকট অতীতের যুদ্ধগুলোর দৃষ্টান্ত দুনিয়ার সামনে রয়েছে। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের হুকুমতকে যে পরিমাণে আর্থিক সম্পদের দিক দিয়ে অনটন ও বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্যে নিপতিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার কারণ একমাত্র এই যে, তারা জার্মানীকে পরিপূর্ণ ধ্বংসের উদ্দেশ্য সামনে রাখা ব্যতিরেকে নিজেদের শান্তি, নিরাপত্তা ও কল্যাণের ব্যাপারে আদৌ কোন ইচ্ছা পোষণ করেনি। যেভাবেই হোক না কেন, তাকে পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস করেই দম নিয়েছে। ঠিক তেমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা ব্যবহার করে জাপান ও কোরিয়ার উপর কব্জা তো জমিয়েছে, কিন্তু শান্তি ও স্বস্তি তার ভাগ্যে জোটেনি, বরং এর বিপরীতে আজ কয়েক বছর থেকে তারা একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত।[১]

যুদ্ধে দৃঢ় ও মযবুত সংকল্প নিঃসন্দেহে অপরিহার্য। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যদি লড়াই করতে করতে সাময়িক স্বস্তি জোটে এবং এর ভেতর শান্তি ও সমঝোতার মওকা আসে, তা হলে তাকে শুধুমাত্র শক্তির অহমিকায় এবং বিজয় হাসিলের দাবীদার হবার জন্য নষ্ট করে দিতে হবে। সন্ধির শান্তি বিজয়ের শান্তি থেকে অনেক অনেক বেশী মূল্যবান ও শান্তিপ্রদ হয়ে থাকে। এমন বিজয় লাভ যা সম্পদ ও আর্থিক দিক দিয়ে দেশকে দেউলে ও দারিদ্র্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায় এবং বিজয়ের হাসি দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণায় পরিবর্তিত হয়ে বিপদ বৃদ্ধির কারণে পর্যবসিত হয় তবে তা সেই শান্তির মুকাবিলায় কখনই অগ্রাধিকার পাবার যোগ্য নয় যা সন্ধি-সমঝোতার মাধ্যমে কায়েম হয়। বিজয় শান্তি হাসিল করার উদ্দেশ্যের পথে একটি মাধ্যমমাত্র। জয়লাভ স্বয়ংসম্পূর্ণ কোন উদ্দেশ্য নয়। আর এটা হাসিল করতে গিয়ে শান্তির পারাবতই যদি মহাশূন্যে হারিয়ে যায় এবং এরই সঙ্গে নেমে আসে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের অবিশ্রান্ত ধারা, তবে কোন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিই এই বিজয়কে সত্যিকার বিজয় নামে অভিহিত করবে না।

---

১. মনে রাখতে হবে যে, এ বই যখন লেখা হয় তখন কোরিয়া যুদ্ধ চলছিল।—অনুবাদক।

প্রতিটি যুধ্যমান শক্তির জন্য ফরয যে, তারা যুদ্ধ অবসানের পরের অবস্থাকে যেন সব সময় সামনে রাখে এবং একক ও সঠিক বিজয়ের মায়া-মরীচিকার পেছনে অন্ধভাবে যেন না দৌড়ায়। আঁ-হযরত (সা)-এর সামনে এমনি বিজয়ের বেশ কিছু মওকা এসেছিল; কিন্তু তিনি এর প্রতি আদৌ কখনও দৃকপাত করেন নি। যদি তিনি গাতফানের কিংবা কুরায়শের পর্যুদস্ত ও অবসন্ন-প্রায় বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে তাদেরকে খতম করে দিতেন তবে কি এর মধ্যে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ ছিল? তিনি কি শানদার বিজয় হাসিল করতে পারতেন না? অবশ্যই করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তো শানদার বিজয়লাভ ছিল না, ছিল শানদার শান্তি স্থাপন। তিনি যুদ্ধ এবং সাফল্যকে উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম বানিয়েছিলেন, আসল উদ্দেশ্য নয়। এই উদ্দেশ্য যখন হাসিল হয়ে গেল তখন তিনি শান্তি ও সমঝোতার পরিবেশ কায়েমে মগ্ন হয়ে গেলেন। দা'ওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে অনাচার ও উচ্ছৃংখলতা তথা ফেতনা-ফাসাদ নির্মূল করতে থাকেন।

কিন্তু এরই সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখা উচিত, যে দেশ এবং যে সরকার নৈতিক দিক দিয়ে কমযোর হয় তাকে শুধুমাত্র শক্তির প্রদর্শনী দ্বারাই বশীভূত করা যায়। এর উদাহরণ ঠিক সেই গুণ্ডার মতই যে প্রতিটি ভদ্র ও শরীফ লোককে হেনস্তা করতে মজা পায়; কিন্তু যেখানেই তার চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী লোকের সাক্ষাৎ ঘটে এবং পুলিশের ডাণ্ডা দেখতে পায় অমনি সে ভেজা বিড়ালের মত হয়ে যায়। এই উদাহরণ শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সত্য নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতি-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এরূপ অবস্থায় মানিয়ে-বুঝিয়ে, অনুরোধ-উপরোধ কিংবা উপদেশ দেওয়ার পরিবর্তে আক্রমণাত্মক অভিযান আবশ্যক। যদি তাদেরকে একবারও লোভ দেখিয়ে কিংবা লালসা জাগিয়ে দেওয়া হয় তবে তাদের দন্ত-নখর আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। অতএব এমতাবস্থায় 'ঢিল নিক্ষেপের বদলে প্রস্তারাঘাত'—এই নীতির উপর আমল হওয়া উচিত। আঁ-হযরত (সা) এই নীতির উপর আমল করেই বনী কুরায়জার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন এবং উম্মতের জন্য এই শিক্ষা রেখে গেছেন যে, যখনই এ ধরনের মওকা আসবে এবং শরাফতী ও যুক্তিগ্রাহ্যতার জবাব দেওয়া হয় গাদ্দারী, দাগাবাজী, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, শঠতা ও প্রবঞ্চনার মাধ্যমে, তখন চরম পদক্ষেপ গ্রহণে এতটুকু ইতস্তত করা উচিত নয়।

এক্ষেত্রে আরও একটা কথা উল্লেখযোগ্য যে, অধিকাংশ সময় এমনও হয় যে, কোন শান্তিপ্রিয় জাতি এসব কোন জাতির আক্রমণাত্মক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক তৎপরতা প্রদর্শনের সময় সীমা অতিক্রম করে যায়; জরুরী, বে-জরুরী, জায়েয, না-জায়েযের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখে না; উদ্দেশ্য হাসিলের পথে যখন অসুবিধা দেখা দেয় তখন সন্ধি করার জন্য প্রস্তুত হয়। তারা এই বাস্তবতাকে ভুলে যায় যে, আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনাকারী কওম লোভ-লালসার বশে এমনটি করে থাকে। যখন উদ্দেশ্য হাসিলের পথে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন তারা বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে রাযী ও উৎসাহী হয়ে ওঠে। কেননা তাদের আসল উদ্দেশ্য তো গুণ্ডামি। দুর্বলতা থেকে তারা ফায়দা উঠায় আর শক্তির সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়। অথচ তাকে (শান্তিপ্রিয় হুকূমতকে) অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সঙ্গে সমগ্র অবস্থা ভেবে-চিন্তে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা উচিত এবং গুণ্ডা হুকূমতকে শেষ পর্যন্ত লড়তে বাধ্য না করা উচিত। কেননা এটা মর্যাদা ও পরিণামের খেলাফ। ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু এর একটি তাজা দৃষ্টান্ত অবিভক্ত ভারতে বৃটিশ সরকারের রয়েছে। সে সীমান্তের একজন মামুলী দরবেশকে এতখানি পেরেশান করেছিল যে, শেষ পর্যন্ত সে যথারীতি মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এবং ১৯৩৬ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত বরাবর তার ফৌজী শক্তির মুকাবিলা করেছে। এই দরবেশ ছিলেন ই, পি, ফকীর। বৃটিশ হুকূমত কয়েক হাযার সৈন্য-সম্বলিত ফৌজকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করে অভিযানে পাঠায়। কিন্তু তাকে বশে আনা সম্ভব হয়নি কিংবা তার শক্তি প্রভাবে কোন প্রকার দুর্বলতাও সৃষ্টি হয়নি।

অধিকাংশ প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকের ধারণা, যদি চার্চিল ও ফ্রান্স হিটলারের সন্ধি প্রস্তাবের উপর ভেবে দেখত এবং নাজীবাদকে দুনিয়ার বুক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বদ্ধপরিকর না হ'ত তাহ'লে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এত জীবন ও সম্পদ হানির কারণ ঘটত না এবং দুনিয়ার উপর এই ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটও নেমে আসত না। যেহেতু যুদ্ধের সিদ্ধান্ত হিটলারের প্রস্তাবের উভয় দিক বিবেচনা না করেই নেওয়া হয় তাই হিটলারের গোটা জীবনটাই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় এবং মিত্র বাহিনী য়ুরোপের শক্তিকে উপেক্ষা করে পূর্ণাঙ্গ বিজয় ও নাজীবাদের ধ্বংসের

ব্যাপারে কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লাগে। অতএব লড়াই প্রতিশোধের উন্মত্ত আবেগাধীনে দিনকে দিন ভয়াবহ এবং নৈতিক দিক দিয়ে অবনতির নিম্নতম পর্যায়ে চলে যায়। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর কর্মনীতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি সর্বদাই চেষ্টা করেছেন দুশমনকে তার নৈতিক অবনতির অনুভূতি জাগিয়ে পরাভূত করতে যাতে তা ফৌজী লড়াই পর্যন্ত না গড়ায় এবং রক্তপাত ও হত্যাকাণ্ড না ঘটে। মক্কার চূড়ান্ত যুদ্ধে এই নীতির সারবত্তা তিনি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে দেন।

বনী লেহ্‌য়ান এবং বনী মুস্তালিক যুদ্ধ

পেছনের কোন এক অধ্যায়ে 'আযল ও কারার লোকদের দাগাবাজী, বনী লেহ্য়ানের জুলুমবাজী এবং ইসলামী প্রতিনিধিদলের সদস্যদের শাহাদতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বনী কুরায়জার যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি পাবার পাঁচ মাস পর আঁ-হযরত (সা) ৬ষ্ঠ হিজরীতে জুমাদা আল-উলা মাসের সাহাবাদের শাহাদাতের বদলা নেবার এবং মুশরিকদের সমুচিত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বাইরে আসছেন এবং সিরিয়া গমন করছেন—এরূপ একটি ধারণা তিনি জনমনে দিতে প্রয়াস পান। আর এভাবেই তিনি তাঁর এ অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রাখেন যেন বনী লেহ্য়ানকে তাদের কৃত জুলুমের উচিত শাস্তি দিতে পারেন।

মদীনা থেকে বেরিয়ে তিনি জাবাল-ই-গুরাব বা গুরাব পাহাড়ের পথ ধরেন। এই পাহাড়টি সিরিয়ার রাস্তায় অবস্থিত। এখান থেকে মখীস হয়ে বায়্যিন পৌঁছেন। অতঃপর সামীরাত আল-য়ামাম তশরীফ রাখেন। সেখান থেকে মক্কার প্রধান সড়ক দিয়ে রওয়ানা হন। তিনি দ্রুততার সঙ্গে গাররান পৌঁছান। গাররান ছিল আল-সুব্হ ও 'উসফানের মধ্যবর্তী একটি উপত্যকা যা সায়া নামক স্থান বরাবর চলে গেছে। গাররান ছিল বনী লেহ্য়ানের আবাসভূমি। কিন্তু এই কবিলাটি কোনক্রমে আঁ-হযরত (সা)-এর আগমন সংবাদ জেনে ফেলায় তারা পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আত্ম-গোপন করে। আঁ-হযরত (সা) গাররান শূন্য দেখতে পেয়ে সৈন্যবাহিনী সমেত 'উসফান পাহাড় থেকে অবতরণ করে 'উসফানে অবস্থান করেন। এই অভিযানের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল আর তা হ'ল মক্কাবাসীরা যেন

আঁ-হযরত (সা)-এর ফৌজ দেখতে পায়। আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে দু'শ উষ্ট্রারোহী ছিল। 'উসফান থেকে তিনি দু'জন উষ্ট্রারোহীকে আগে পাঠিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেন যে, কিরা' আবূ না'ঈম পর্যন্ত গিয়ে যেন তারা ফিরে আসে। এরপর তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। কোনরূপ মুকাবিলা ব্যতিরেকেই এ অভিযান সফল হয়।

বনী মুস্তালিক

ঐ একই মাসে আঁ-হযরত (সা) খবর পান যে, বনী মুস্তালিক মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। তাদের সর্দার ছিল হারিছ বিন আবী দারার জুওয়ায়রিয়া। আঁ-হযরত (সা) একটি বাহিনী নিয়ে মদীনা থেকে বহির্গত হন এবং বাঁকাচোরা রাস্তা হয়ে সামনে অগ্রসর হন যেন দুশমন তাঁর আগমনের সংবাদ অবগত হতে না পারে। তিনি সমুদ্রোপকূল হয়ে কাদীদ-এর পার্শ্ববর্তী মারঈয়াস নামক ঝর্ণাধারায় পৌঁছে আচানক উক্ত কবিলার উপর হামলা করেন। তুমুল যুদ্ধের পর শেষাবধি বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে এবং তাদেরকে ভীষণ জীবনহানির সম্মুখীন হতে হয়। এই বিদ্রোহের পরিণামে বহু নারী-পুরুষ মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। তাদের মধ্যে হারিছের কন্যা ছিল অন্যতমা। তার কান্নাকাটির কারণে আঁ-হযরত (সা) নিজের থেকে ফিদ্য়ার অর্থ আদায় করে তাকে আযাদ করে দেন।

বিভিন্ন অভিযান

এ বছর রবি'উ'ল-আখির মাসে আঁ-হযরত (সা) হাঙ্গামা-প্রিয় লোকদের শায়েস্তা করবার জন্য বিভিন্ন অভিযান রওয়ানা করেন। এগুলোর মধ্যে থেকে একটি 'আককাশা বিন মুহাসিন-এর নেতৃত্বধীনে পাঠানো হয়। এতে চল্লিশ জন মুজাহিদ অংশ নিয়েছিলেন। এই অভিযান সত্বর ও অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গাম্‌র পৌছে। শত্রু কোনক্রমে এদের আগমনের সংবাদ পূর্বাহ্নেই জেনে ফেলে। ফলে তারা পালিয়ে গিয়ে নিজেদের জান বাঁচায়। হাঙগামাবাজদের দু'শো উট মুজাহিদ বাহিনীর হস্তগত হয়। সেগুলো

নিয়ে তারা মদীনা প্রত্যাগমন করে। এই অভিযানকে গাম্‌র-এর অভিযান বলা হয়।

যিল-কিসসা ও অন্যান্য অভিযান

এ বছর আঁ-হযরত (সা) যিল-কিস্‌সার বেদুঈনদের উৎপাতের সংবাদ পান। তিনি চল্লিশ জন মুজাহিদ আবু 'উবায়দা ইবন আল-জার্‌রাহ (রা)-এর অধিনায়কত্বে যিল-কিসসা পাঠিয়ে দেন। হাঙগামা-প্রিয় এসব লোক তাদের আগমনের খবর পেয়েই পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। মুসলমানেরা তাদের উট ও অন্যান্য মাল-আসবাব মদীনায় নিয়ে আসেন।

অতঃপর তিনি বনী সুলায়মকে শিক্ষা দেবার জন্য যায়দ বিন হারিছা (রা)-কে প্রেরণ করেন। সেখানে বহু উট ও বকরী যায়দ (রা)-এর হস্তগত হয় এবং বেশ কিছু লোক বন্দী হয়ে মদীনায় আসে।

এরপর আঁ-হযরত (সা) যায়দ (রা)-কে ঈরেস অভিযানে পাঠান। সেখানে আবু'ল-'আস বিন আল-রাবী'র সমস্ত মাল-আসবাব দখলে আসে। এই অভিযান শেষে বনী ছা'লাবাকে শায়েস্তা করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়। যায়দ (রা)-এর বাহিনী এখানেও সফল হয়। বহু উট গনীমতের মাল হিসাবে হস্তগত হয়। এরপর তাদের বনী হিসামকে সাজা দেবার উদ্দেশ্যে হাসযায় পাঠানো হয়। দাহিয়াতু'ল-কালবী রোম সম্রাট কায়সারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর অনেক পুরস্কার নিয়ে আসছিলেন। পথে বনী হিসাম তার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। বনী হিসামকে এই অন্যায় আচরণের জন্য শাস্তি প্রদান করা হয়।

দুমাতু'ল-জন্দল, ফিদাক ও ওয়াদিউ'ল-কুরার অভিযান

একই বছরে আঁ-হযরত (সা) 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা)-কে ইসলামের তবলীগের জন্য বনী আল-আসী'র নিকট পাঠান। তাঁর প্রচারে গোটা কবিলাই ইসলাম কবুল করে।

ফিদাকঃ ৬ষ্ঠ হিজরীর শা'বান মাসে বনী সা'দ বকরের বিদ্রোহ দমনের জন্য হযরত 'আলী (রা)-কে ফিদাক প্রেরণ করা হয়। পথিমধ্যে হযরত 'আলী (রা) উক্ত কবিলার গুপ্তচরের দেখা পান। তাকে তারা খায়বারের য়াহূদীদের নিকট পাঠিয়েছিল এই উদ্দেশ্যে যে, যদি য়াহূদীরা এ বছর খায়বারের উৎপাদিত খেজুরের অর্ধাংশ তাদের দেয় তাহলে তারা মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে য়াহূদীদেরকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। হযরত 'আলী (রা) দিনের বেলায় আত্মগোপন করতেন এবং রাত্রিবেলা সফর করতেন। এভাবে তিনি ফিদাক পৌঁছেন এবং বনী সা'দকে সমুচিত সাজা দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন।

ওয়াদিউ'ল-কুরা

যায়দ বিন হারিছাকে বনী ফুযারাহ্র ঔদ্ধত্যের জবাব দানের জন্য ওয়াদিউ'ল-কুরা পাঠানো হয়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে তুমুল লড়াই হয়। এ যুদ্ধে হযরত যায়দ (রা)-ও আহত হন। দ্বিতীয় দফা পুনরায় তাঁকে সৈন্য দিয়ে পাঠানো হয়। এবার উক্ত কবিলা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং বহু গনীমতের মাল ও কয়েদী হস্তগত হয়।

আরঈয়াতীন কবিলা আঁ-হযরত (সা)-এর পশু চালককে হত্যা করে কিছু পশু নিয়ে পালিয়েছিল। তাদের এ ধরনের ধৃষ্টতামূলক আচরণের জন্য কুর্য (রা) ইব্ন জাবির আল-ফিহ্রির নেতৃত্বে উষ্ট্রারোহীর একটি প্লাটুন প্রেরণ করেন। কুর্য (রা) তাদের শাস্তি দেন এবং কামিয়াবীর সঙ্গে ফিরে আসেন।

এভাবে আঁ-হযরত (সা) আরো অভিযান পাঠান। আলোচনা দীর্ঘ হবার আশঙ্কায় এগুলোর বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করছি।

ফলাফল ও শিক্ষা

এসব অভিযান থেকে একথা দিবালোকের মত ফুটে উঠেছে যে, খন্দক যুদ্ধের পর আঁ-হযরত (সা) অবস্থাকে আয়ত্তে আনবার জন্য এতটুকু বিরতির আশ্রয় নেননি; বরং সমস্ত গোত্রের সামনেই একটা কথা

উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরেন যে, কল্যাণ ও পরিতৃপ্তি লাভের একটা পথই খোলা আছে আর তা হ'ল তাঁর নির্দেশ তামিল করা এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিরোধিতা না করা। এর বিরোধিতায় নামলে কিংবা বাগাওয়াত করলে শক্ত রকমের সাজা ভোগ করতে হবে। দ্বিতীয় আনুষঙ্গিক সুফল এই লাভ করা গেল যে, বহু গনীমতের মাল মুসলমানদের হস্তগত হয়। এর ফলে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল হয়ে যায়।

এতদ্ভিন্ন এসবের মাধ্যমে বিশেষ একটি উপকারও লাভ হয়। আর তা হ'ল, আঁ-হযরত (সা)-এর সেনানায়কদের যোগ্য নেতৃত্বের প্রভাব কায়েম হয়। কেননা কোন কোন মহলে এই অশুভ ধারণা সৃষ্টি হতে চলেছিল যে, আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট তাঁর নিজস্ব সত্তা ছাড়া এমন কেউ নেই, যে ইসলামের প্রসারিত এই তরণীর হাল সফলতার সঙ্গে ধরতে পারে।

দ্বিতীয় বড় ফায়দা হ'ল, আঁ-হযরত (সা)-এর শাসন ক্ষমতার বিস্তৃতির সঙ্গে গোটা রাষ্ট্রের আইন-শৃংখলা ও সংহতি রক্ষার সুযোগ মিলে যায় এবং তিনি ভবিষ্যতের পরিকল্পনাগুলো কার্যকর করার সর্বোত্তম প্রয়াস ইখতিয়ার করতে সক্ষম হন। উমরাহ্ করবার জন্য মক্কা যাবার সিদ্ধান্ত, এর জন্য বিশেষ আয়োজন এবং পরবর্তী ঘটনাবলী এর স্পষ্ট প্রমাণ।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বড় উপকার হ'ল এই যে, ইসলামের মুজাহিদবৃন্দ এবং হুযূরের অধীনস্থ সেনানায়কদের গোপন গতিবিধি ও চলাফেরা, দ্রুতগতি এবং অতর্কিত হামলার পরিপূর্ণ অনুশীলন ও মহড়া এতে হয়ে যায় এবং তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এটা জানা যায় যে, যুদ্ধে এগুলোর গুরুত্ব কতটা এবং এসবের মাধ্যমে কতটা লাভবান হওয়া যায়। এ অভিযানগুলো এই দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যাতে মুজাহিদদের অধিকতর প্রশিক্ষণের জন্য পূর্ণ চালের মহড়া ও অনুশীলনের সঙ্গে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও অদম্য মনোবল এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিশেষ ফায়দা হ'ল এই যে, আঁ-হযরত (সা)-এর বিরোধী ও শত্রু কবিলাগুলোর শক্তি ও সংহতির ব্যাপারে ভালভাবে জানা হয়ে যায়। যে সমস্ত লোক ঐক্যবদ্ধ হয়ে কোন সময় ফেতনা-ফাসাদ বাধাতে পারত তাদেরকে এক এক করে দমন করে রাজনৈতিক শাসন-শৃংখলার অভিন্ন সূত্রে আবদ্ধ করা হয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

আরব কবিলাগুলোর গোলমাল ও বিশৃংখলা দমন করার পর অবস্থা যখন মোটামুটি স্থিতাবস্থায় এসে গেল এবং সামরিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক দিক দিয়ে একটা সংহত রূপ সৃষ্টি হ'ল তখন আঁ-হযরত (সা) 'উমরাহ্ আদায়ের নিয়তে মদীনা থেকে রওয়ানা হলেন। তিনি মদীনা ও তার আশেপাশের মুসলমান ছাড়াও হেজাযের আরব ও বেদুঈনদেরও সফর-সঙ্গী হবার আহ্বান জানান। তাদের মধ্যে যারা এসেছিল তাদের এবং মুহাজির ও আনসারগণসহ মদীনা থেকে তিনি রওয়ানা হন। যেহেতু তিনি 'উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, কোনরূপ লড়াই-সংঘর্ষের উদ্দেশ্য ছিল না, সেজন্য তিনি কুরবানীর জন্য সত্তরটি উট সঙ্গে নেন। সফর-সঙ্গীর সংখ্যা কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ১৪০০ জনের মত। অপর কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তাদের সংখ্যা ছিল ১৫ শ'র মত। যা-ই হোক, সংখ্যা অনেক ছিল।

মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে প্রথমে তিনি 'আসফান নামক স্থানে যাত্রা-বিরতি দেন। এখানে বাশার বিন সুফিয়ান আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয পেশ করেঃ কুরায়শরা আপনার রওয়ানা হবার খবর শুনে মুকাবিলার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বহির্গত হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে অপরাপর লোকের সংখ্যাও বিরাট। এই মুহূর্তে তারা তাওয়া নামক স্থানে অবস্থান করছে। তারা তাদের উপাস্য দেবতাদের নামে কসম খেয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই তারা আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক খালিদ বিন ওয়ালীদ স্বীয় বাহিনীসহ কিরা' আল-না'ঈম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

হুদা থেকে তিনি যখন যু'ল-হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছেন তখন হযরত ওমর (রা) আরয করেন যে, কুরায়শরা যুদ্ধ করতে স্থির সংকল্প। অতএব সামনে অগ্রসর হবার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের দরকার আছে। আঁ-হযরত (সা) কুরায়শদের সমর প্রস্তুতিতে অতীব আফসোস প্রকাশ করেন এবং বলেন, "আমি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে ইচ্ছুক নই। কিন্তু যে দীনের উপর আল্লাহ্ পাক আমাকে পাঠিয়েছেন তার হেফাজতের জন্য তারা যদি লড়াই করতে আমাকে বাধ্য করে তাহলে আমি অবশ্যই তাদের সঙ্গে

লড়ব। ফলাফল একমাত্র আল্লাহ্‌র হাতে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে লড়াই যাতে না হয় সে ব্যাপারে সম্ভাব্য সব রকম চেষ্টা আমি করব।"

অতঃপর তিনি সাধারণ রাস্তা পরিত্যাগ করে পাহাড়ের মধ্যবর্তী অত্যন্ত দুরতিক্রম্য রাস্তা অবলম্বন করেন। কাফেলার লোকদের এজন্য খুবই তকলীফের সম্মুখীন হ'তে হয়। এরপর তিনি এমন রাস্তা ধরে চলতে শুরু করেন যা উপত্যকার ডান দিকে খাম্‌স-এর মধ্যবর্তী দুই দিকের উচ্চ সমান্তরাল রেখা হয়ে মক্‌কার নিম্ন এলাকা হুদায়বিয়ার ঢালুতে ছানিয়াতু'ল-মিরার-এ গিয়ে বের হয়। শত্রু বাহিনী কিরা' আল্‌-না'ঈম-এ আঁ-হযরত (সা)-এর অপেক্ষা করছিল। যখন তারা তাঁর কাফেলার উৎক্ষিপ্ত ধূলি ছানিয়াতু'ল-মিরার-এর নিকটবর্তী দেখল তখন তারা ঘাবড়ে গিয়ে সেখান থেকে পিছু সরে আসে এবং গিয়ে কুরায়শদের সঙ্গে মিলিত হয়।

কথিত আছে যে, যখন তিনি ছানিয়াতু'ল-মিরার অতিক্রম করে যাচ্ছি-লেন তখন তার উটনী চলতে চলতে বসে পড়ে। সাহাবীরা বলেনঃ উটনী আড়ি করছে। আঁ-হযরত (সা) বলেন, 'এটা তার স্বভাব নয়। মনে হচ্ছে, যে শক্তি হস্তীবাহিনীকে মক্‌কায় অগ্রসর হতে বাধা দিয়েছিল সেই শক্তিই তাকে থামিয়ে দিয়েছে।' অতএব তিনি সেখানেই অবস্থান গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, এখানে পানি পাওয়া যাবে না। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর হুকুমে একটি খননকৃত গর্ত আরো খনন করা হ'লে তা থেকে প্রচুর পানি বেরিয়ে আসে।

ইসলামী কাফেলা সেখানে অবস্থান করা কালীনই খুযা'আ গোত্রের বুদায়ল বিন ওয়ারাকা আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে এসে হাযির হয়। সে আরয করে, "কা'ব বিন লুওয়াই এবং 'আমির বিন লুওয়াই হুদায়-বিয়ার কূপের নিকট অবস্থান করছে। তাদের সঙ্গে বদমাশদের একটি দলও রয়েছে। তারা আপনার সঙ্গে অবশ্যই সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হবে এবং কখনো আপনাকে বায়তুল্লাহ্‌ যিয়ারত করতে দেবে না।" জবাবে আঁ-হযরত (সা) বললেন, "আমরা 'উমরাহ করতে এসেছি, লড়াই করতে আসিনি। আমাদের জানা আছে যে, পেছনের লড়াইগুলোতে কুরায়শদের সকল বল-ভরসা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এজন্য তারা যদি চায় তাহলে আমাদের সঙ্গে যেন একটা সমঝোতায় উপনীত হয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকে।

অন্যথায় আমি তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত লড়ব যতক্ষণ পর্যন্ত আমার ধড়ে জান আছে অথবা আল্লাহ্ পাক আমাকে অন্য কোন হুকুম দেন।"

এই জবাব শুনে বুদায়ল কুরায়শদের কাছে গিয়ে তাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, আঁ-হযরত (সা) যুদ্ধ করতে চান না। কিন্তু যদি তারা খামাখা লড়তে চায় তাহ'লে তিনি তার জন্যও প্রস্তুত রয়েছেন। তার পরামর্শ এইঃ তোমরা তাঁর সঙ্গে একটা সমঝোতায় আস, আর এ পরামর্শটাই ভাল।

এ কথা শুনে কুরায়শদের আস্থাভাজন 'উরওয়া ইব্ন মাস'উদ ছাকাফী স্বীয় কওমকে সমঝোতা করার জন্য পরামর্শ দেয় এবং বলেঃ এ কাজের জন্য আমি আমার খিদমত পেশ ক'রছি। সবাই 'উরওয়াহ্র প্রস্তাব মেনে নেয়। সে কুরায়শদের দূত হিসাবে আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়। তিনি তাঁকেও তাই বলেন যা তিনি বুদায়লকে বলেছিলেন। সে ছিল অত্যন্ত বিচক্ষণ, চতুর, সতর্ক ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি। পরীক্ষার নিমিত্ত সে এমন কয়েকটি কথা বলে যা সাহাবা (রা)-দের নিকট অত্যন্ত আপত্তিকর ছিল। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) নিশ্চুপ থাকেন। 'উরওয়াহ্ কিন্তু বরাবর গভীরভাবে লক্ষ্য করতে থাকে যে, তাঁর সাহাবা (রা)-বৃন্দ কি ধরনের লোক এবং একমাত্র এজন্যই সে কোন না কোন বাহানায় আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে থাকে যেন সে তাদেরকে বুঝতে ও সঠিক পরিমাপ করতে সুযোগ পায়।

এখান থেকে ফিরে গিয়ে 'উরওয়াহ্ তার কওমকে বললঃ আমি কয়েকজন বাদশাহ্র দরবার দেখেছি। আমি রোম সম্রাট কায়সার, পারস্য-রাজ কিসরা এবং আবিসিনিয়াধিপতি নাজাশীর দরবারে দৌত্যগিরি করেছি। কিন্তু আমি সম্মান, শ্রদ্ধা ও আত্মোৎসর্গের সেই আবেগোদ্দীপ্ত প্রেরণা কোথাও দেখিনি যা মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারীদের মধ্যে দেখেছি। আমার পরামর্শ এই যে, আপনারা তাঁর শর্ত কবুল করে নিন। আর এটাই যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন। এর উপর বনী কিনানার প্রতিনিধি বললঃ আপনারা কোন ফয়সালা করার পূর্বে আমিও একবার মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হ'তে চাই।

বনী কিনানার প্রতিনিধির আগমনের খবর শুনে আঁ-হযরত (সা) তাকে প্রভাবিত করবার জন্য কুরবানীর পশুগুলোকে এমন জায়গায় এনে দাঁড়

করিয়ে দেন যেখান থেকে অবশ্যই সেগুলো তার নজরে পড়বে। তিনি জানতেন যে, কুরবানীর পশুর ব্যাপারে উক্ত খান্দানের ধর্মীয় আবেগ ও প্রেরণা কতখানি। এই প্রতিনিধি ছিল বনী হারিছ বিন 'আব্‌দ মনাত খান্দানের এবং সে সে সময় হাবূশ-এর সর্দার ছিল। উপত্যকায় বিপুল সংখ্যক হৃষ্টপুষ্ট ও উত্তম কুরবানীর পশু দেখতে পেয়ে সে খুবই প্রভাবিত হয় এবং আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে মিলিত না হয়েই কুরায়শদের নিকট ফিরে যায়। সে তাদের বলল: মুসলমানরা শুধুমাত্র 'উমরাহ্ করার জন্যই এসেছে। তারা নিজেদের সঙ্গে কুরবানীর জন্য যেসব জানোয়ার এনেছে সেগুলোর গর্দানে গলাবন্ধের দাগ পড়ে গেছে। আমি দেখেছি, তারা জোরে জোরে 'লাব্বায়িক' উচ্চারণ করছে। অতএব তারা মন্দ অভিপ্রায়ে আগমন করেনি। তারা 'উমরাহ্ করতে চায়। তাদেরকে মক্কায় আসার অনুমতি দেওয়া উচিত।

এরপর কুরায়শদের তরফ থেকে সন্ধি করবার জন্য একটি প্রতিনিধিদল আসে। আলাপ-আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছিল এমনি মুহূর্তে আবু সুফিয়ানের পক্ষের কিছু সংখ্যক মুশরিক মুসলমানদের উপর হামলা করে বসে। হামলাকারীদের মধ্য থেকে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয় এবং আঁ-হযরত (সা)-এর সামনে তাদেরকে পেশ করা হয়। কিন্তু তিনি সবাইকে মাফ করে দেন। তিনি তাদের হাতিয়ার সমেত ফিরে যাবার অনুমতিও প্রদান করেন।

এরপর তিনি হযরত 'উছমান (রা)-কে দূত নিযুক্ত করে কুরায়শদের নিকট পাঠান। রাস্তায় 'আমর বিন সা'ঈদ বিন আল-'আস-এর সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে। সে তাঁকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের নিকট নিয়ে যায়। হযরত 'উছমান (রা) আঁ-হযরত (সা)-এর পয়গাম তাদেরকে পৌঁছুলে আবু সুফিয়ান বললেন: আপনি নিজে কা'বা তাওয়াফ করতে পারেন। কিন্তু জবাবে তিনি বললেন: যতক্ষণ পর্যন্ত আঁ-হযরত (সা) তাওয়াফ না করবেন, আমি কখনই তাওয়াফ করব না। এতে কুরায়শরা বিগড়ে যায় এবং হযরত 'উছমান (রা)-কে সেখানেই আটকে রাখে।

হযরত 'উছমান (রা)-এর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হতে থাকায় এদিকে মুসলমানদের ভেতর খবর রটে যায় যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। এতে আঁ-হযরত (সা) অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি মুসলমানদের থেকে দরকার পড়লে শত্রুর সঙ্গে চূড়ান্ত যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার বায়'আত বা শপথ

গ্রহণ করেন। এই বায়‘আতকেই ‘বায়‘আতে রিদওয়ান’ বলা হয়। বায়-‘আত গ্রহণের পর খবর পাওয়া যায় যে, হযরত ‘উছমান (রা) জীবিত ও কুশলেই আছেন। ওদিকে কুরায়শরা বনী ‘আমের বিন লুওয়াই কবিলার সুহায়ল বিন ‘আমরকে সন্ধির জন্য পাঠিয়ে দেয় এবং বলে পাঠায় যে, এবার মুহাম্মদ (সা) ‘উমরাহ্ ব্যতিরেকে ফিরে যাবেন যেন আরবরা বলতে না পারে মুহাম্মদ (সা) যবরদস্তিভাবে আমাদের ঘরে প্রবেশ করেছেন। কোন কোন সাহাবা (রা) এরূপ শর্ত না-মঞ্জুর করার পরামর্শ দেন। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) যখন তাদেরকে সময়ের উপযোগিতা এবং সন্ধির পরিণাম সম্পর্কে অবহিত করেন তখন তাঁরাও এতে সানন্দে সম্মতি প্রকাশ করেন। সন্ধির বিস্তারিত শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ ঃ

১. মুসলমান ও কুরায়শদের মধ্যে দশ বছর পর্যন্ত সব রকম যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

২. এই সময়ে প্রতিটি ব্যক্তিই নিরাপদ ও মাহফুজ থাকবে। কেউ কারুর উপর চড়াও হবে না।

৩. কুরায়শদের কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট আগমন করলে আঁ-হযরত (সা) তাকে তার অভিভাবকের নিকট পাঠিয়ে দেবেন।

৪. যদি আঁ-হযরত (সা)-এর কোন লোক কুরায়শদের নিকট চলে যায় তবে কুরায়শরা তাকে আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট ফিরিয়ে দেবে না।

৫. এখন উভয় পক্ষের মাঝে আর কোন লড়াই থাকবে না, তলোয়ার বের করা হবে না, তীরন্দাযী চলবে না কিংবা হবে না কোন প্রস্তর বর্ষণ। যাদের ইচ্ছা তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারবে এবং যাদের ইচ্ছা কুরায়শদের সঙ্গে অনুরূপভাবে সন্ধি কিংবা চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু মক্কায় যে সমস্ত মুসলমান রয়েছে আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন না।

৬. এ বছর হযরত (সা) হুদায়বিয়া থেকে ‘উমরাহ্ ব্যতিরেকেই ফিরে যাবেন এবং মক্কায় প্রবেশ করবেন না। আগামী বছর কুরায়শরা তিন দিনের জন্য আঁ-হযরত (সা)-এর খাতিরে মক্কা ছেড়ে যাবে। তিনি তাঁর

সাহাবীদের সঙ্গে মক্‌কায় প্রবেশ করবেন। কিন্তু সবার কাছে একমাত্র তলোয়ার ছাড়া আর কোন অস্ত্র থাকবে না, তাও থাকবে কোষবদ্ধ।

মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই সুলেহ্‌নামা (সন্ধিপত্র) লেখেন হযরত 'আলী (রা)। কয়েকদিন পর্যন্ত হুদায়বিয়ায় অবস্থান করার পর আঁ-হযরত (সা) কুরবানী করেন এবং মাথা মুণ্ডন করেন। তাঁকে অনুসরণ করেন সমস্ত সাহাবা (রা)। এরপর আঁ-হযরত (সা) মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলীর উপর ভাসা ভাসা দৃষ্টিপাত করলে মনে হবে এতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়; বরং পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, এটা ছিল উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক বিজয় এবং আল্লাহ্ তা'আলাও আয়াতে কারীমা إنا فتحنا لك فتحا مبينا (আমি নিশ্চয় তোমাকে সুস্পষ্ট ও অবধারিত বিজয় দান করেছি) নাযিল করে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট বিজয় হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, আবু বসীর, 'উতবা (রা) বিন সা'দ আল-জাবিয়া প্রমুখ মুসলমান কুরায়শদের হাতে বন্দী ছিলেন; চুক্তিপত্র সম্পাদনের পর তারা পালিয়ে মদীনায় চলে আসেন। আযহার বিন 'আওস আঁ-হযরত (সা)-কে লেখেন, চুক্তি মুতাবিক আবু বসীর (রা)-কে তার আভিভাবকের কাছে হাওয়ালা করা হোক। অতঃপর নিজের পক্ষ থেকে বনী 'আমের বিন লুওয়াই-এর একজন লোককে একজন গোলামসহ আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে পাঠিয়ে দেয়। আঁ-হযরত (সা) আবু বসীর (রা)-কে বলেনঃ আমরা ওয়াদা খেলাফী করতে পারব না। অতএব তুমি এসব লোকের সঙ্গে মক্‌কায় ফিরে যাও। আমরা দু'আ করছি, আল্লাহ্ পাক তোমাদের মত কমযোর মুসলমানদের সহায় ও মদদগার হোন এবং তোমাদের জন্য কোন সহজ রাস্তা তিনি তৈরি করে দিন।

আঁ-হযরত (সা)-এর ইরশাদ মুতাবিক আবু বসীর (রা) প্রত্যাবর্তনের জন্য রওয়ানা হয়ে গেলেন। যি'ল-হুলায়ফা পৌঁছে এক সুযোগে তিনি বনী 'আমেরের লোকটিকে হত্যা করেন। গোলামটি প্রাণ বাঁচিয়ে আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে এসে হাযির হয় এবং ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে। আবু বসীর (রা)-এর এহেন কার্যকলাপে আঁ-হযরত (সা) বলেন, এমনটি যেন না হয় যে এ ধরনের লোকেরা একত্র হয়ে কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধিয়ে বসে।

আবু বসীর (রা) এই ভয়ে—না জানি তাকে আবারও মক্কায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়—সিরিয়াগামী রাস্তায় সাগর তীরবর্তী যী-আলমারওয়াহ্‌র পার্শ্ব-বর্তী জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করেন। মক্কা থেকে আরও কিছু মুসলমান এসে সেখানে আশ্রয় নেয়। এভাবে ক্রমান্বয়ে তাদের সংখ্যা সত্তরে গিয়ে উপনীত হয় এবং জীবিকার তাগিদে তারা কুরায়শ কাফেলা লুট করতে শুরু করে। কুরায়শরা তাদের লুটতরাজ ও ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। অবশেষে তারা আঁ-হযরত (সা)-কে বলে পাঠায়ঃ আপনি তাদেরকে লিখে দিন যে, যারা আপনার কাছে ফিরে আসবে তারাই নিরাপদ। এরপর তিনি লিখে পাঠালে এ সমস্ত লোক মদীনা মুনাওয়ারায় এসে যায় এবং এভাবেই সুলেহ্‌নামার শর্তাবলীতে কুরায়শদের দরখাস্তের ভিত্তিতে সংশোধন করা হয়।

কি শিক্ষা পেলাম

হুদায়বিয়ার সন্ধির অন্যান্য উপকারী ফলাফলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটি ফল এই পাওয়া গেল যে, লড়াই-সংঘর্ষ বন্ধ হবার ফলে লোকেরা আঁ-হযরত (সা) ও মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশার এবং তাঁদেরকে নিকট থেকে দেখবার ও বুঝবার সুযোগ পেল। অতএব সুস্থ বুদ্ধি ও চেতনাসম্পন্ন লোক-দের অন্তর-রাজ্য ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হ'ল। এরপর তাদের সামনে যখন ইসলাম পেশ করা হ'ল তখন তারা মুসলমান হয়ে গেল। অনন্তর সন্ধির পর দু'বছরের মধ্যেই এত অধিক সংখ্যক লোক মুসলমান হ'ল যা ইতিপূর্বে সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফললাভ এই হ'ল যে, কবিলাগুলো আযাদী পেল; তারা কুরায়শ অথবা মুসলমানদের মধ্য থেকে যার সঙ্গে ইচ্ছা চুক্তি করবে। এর ফলে মুসলমানদের মিত্র কবিলার সংখ্যা বেড়ে যায়। ভুল বোঝাবুঝি ও খারাপ ধারণা দূর হ'ল এবং ইসলামের প্রভাব ও শক্তি বেড়ে গেল।

প্রতিরক্ষাগত দৃষ্টিকোণ থেকে আঁ-হযরত (সা) এমনি মূলনীতির উপর আমল করেন, যাকে ইংরেজীতে Indirect approach বলা হয়। এর অর্থ এই যে, শত্রুর বিরুদ্ধে এমন চাল চালা হবে যে, লড়াই-সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই তাদের হিম্মত ও মনোবল ভেঙে পড়বে। একে ভালভাবে

মগজে গেঁথে নেবার জন্য আরও একবার বনী লেহয়ান-এর যুদ্ধের উপর দৃষ্টিপাত করুন। আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে শাস্তি দেবার জন্য তশরীফ নেন। কিন্তু তাদেরকে যখন তিনি পাহাড়ে আত্মগোপনরত দেখতে পেলেন তখন তিনি গাররান থেকে 'উসফান পৌঁছেন এবং সেখানে অবস্থান করে দু'জন অশ্বারোহীকে এজন্যই মক্কার দিক পাঠিয়ে দেন যে, মক্কা-বাসীরা তাদেরকে ভালভাবে দেখে নিক। কুরায়শরা আঁ-হযরত (সা)-এর অভিযানগুলো ও ফৌজী গতিবিধিকে সন্দেহের চোখে দেখছিল। কিছু-দিন আগে তাঁর গাররান থেকে 'উসফান আসার খবর থেকে, বিশেষ করে মুসলিম ঘোড়সওয়ারকে মক্কার এত কাছে দেখে তাদের মনে বিপদাশংকা সৃষ্টি হয় যে, সম্ভবত মুসলমানরা মক্কার উপর চড়াও হতে চায় অর্থাৎ বনী লেহয়ান-এর অভিযান থেকে আঁ-হযরত (সা) সর্বোত্তম পন্থায় ও সাফ-ল্যের সঙ্গে দুশমনকে চিন্তা-ভাবনার ও পেরেশানীর মাঝে নিক্ষেপ করে দেন। আঁ-হযরত (সা)-এর অভিপ্রায় সম্পর্কে তাদের কোন কিছু জানা ছিল না অর্থাৎ এভাবে তিনি কুরায়শদের শুধুমাত্র নিজের প্রতিরক্ষাগত গতিবিধি সম্পর্কেই ধোকার মধ্যে রাখেন নি, বরং তাদেরকে এমনি চালে চলতে বাধ্য করেন যে, যা প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ হিসাবে তাদের জন্য সামরিক দিক দিয়েও ভ্রান্ত ছিল। নেপোলিয়ন গোপন গতিবিধি এবং দুশমনকে পথভ্রষ্ট করার শব্দ থেকে স্বীয় প্রতিরক্ষা নীতির গুরুত্ব বারবার তুলে ধরেছেন।

যাই হোক, এখন আমাদের দেখা দরকার যে, আঁ-হযরত (সা) দুশমনকে এরূপ দো-টানায় ফেলে কি লাভ করেছিলেন।

আঁ-হযরত (সা)-এর একথা জানা হয়ে গিয়েছিল যে, কুরায়শরা তাঁর মক্কা প্রবেশের ভীষণ বিরোধিতা করবে। এমন কি এজন্য তারা যুদ্ধ করতেও দ্বিধা করবে না। অর্থাৎ মুসলমানদের কাফেলার মক্কার দিকে রওয়ানা হওয়াটাই তা—'উমরাহ্‌র জন্যই হোক না কেন, অনিবার্যরূপে যুদ্ধের কারণ হবে। এরপর আঁ-হযরত (সা) এই ঘোষণা দেনঃ আমি উমরাহ্ আদায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, যুদ্ধ করার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই। প্রশ্ন জাগে যে, এই অবস্থায় কি সমীচীন ছিল না যে, তিনি 'উমরাহ্‌র অভি-প্রায় পরিত্যাগ করে রওয়ানা হবার পূর্বে মক্কায় প্রবেশের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা দ্বারা শর্তাদি স্থির করে নিতেন! ফলে কোন প্রকার ঝগড়া-কলহ কিংবা যুদ্ধের কোন আশংকাই আর থাকত না! এর জবাব নিঃসন্দেহে

এই যে, তা সমীচীন ছিল না এবং এজন্য ছিল না যে, সে সময় প্রতিরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে মক্কার যে অবস্থা ছিল তা সামনে রেখে রওয়ানা হবার পূর্বে শর্তাদি স্থির করা প্রতিরক্ষা কৌশলের পরিপন্থী হ'ত এবং সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগামিতা যা আঁ-হযরত (সা)-এর অর্জিত হয়েছিল, হাত থেকে ফস্কে যেত। কুরায়শরা বদর প্রান্তরে পরাভূত হয়, ওহুদে পরাজিত হবার পর বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে, কিন্তু পুনরায় হার মানে; খন্দকের যুদ্ধে তাদের প্রতিরক্ষা কৌশলের দিক দিয়ে পরাজয়ের প্রকাশ ঘটেছিল। এখন বাকী ছিল শুধু সেই পরাজয়টাকে কবুল করে নেওয়া। আঁ-হযরত (সা) সে সব অবস্থা বেশ ভালভাবে আন্দায করে নিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় সমঝোতার আলাপ-আলোচনাকে অনিবার্যভাবেই প্রতিরক্ষাগত দুর্বলতা হিসাবে বিবেচনা করা হ'ত আর এর প্রভাব পড়ত অন্যান্য কবিলার উপরও। আঁ-হযরত (সা)-এর এমন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করার দরকার ছিল যাতে যুদ্ধও না হয় এবং শত্রুর ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট শক্তিটুকুও যেন নিঃশেষ হয়ে যায়। অনন্তর তিনি এমন পরিকল্পনাই প্রণয়ন করেন এবং সম্ভবত এটা তাঁর নিজস্ব পদ্ধতির প্রথম পরিকল্পনা যা দুনিয়াবাসী প্রত্যক্ষ করেছে। মশহূর আমেরিকান জেনারেল শেরম্যান (Sharman) এবং নেপোলিয়ন যারা প্রাচ্য ইতিহাসের একজন ছাত্র ছিলেন—এ ধরনের পরিকল্পনা তৈরি করে তার উপর 'আমল করেছিলেন।

কুরায়শরা আঁ-হযরত (সা)-এর সেই রাস্তা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে যা তিনি বনী লেহয়ানের খেলাফ ব্যবহার করেছিলেন এবং এরই সঙ্গে তারা মুসলিম বাহিনীকে রুখবার প্রস্তুতিও সম্পন্ন করে। কিন্তু তাদের উপর আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা চাল এমন কিছু যাদু সৃষ্টি করে যে, তারা যে সব কৌশল অবলম্বন করেছিল তা সবই বেকার প্রমাণিত হয়। তারা যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হবার এবং 'উসফানের পথ ধরার তথ্য অবগত হয় তখন তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যে, তিনি পুনরায় সেই পথেই গমন করবেন যে পথে তিনি কয়েক মাস আগেও একবার গমন করেছিলেন। অনন্তর তারা নিজেদের লোক-লশ্কর সেই দিকেই রওয়ানা করে দেয় এবং অশ্বারোহী বাহিনীকে অগ্রগামী বাহিনী হিসাবে কিরা' আল-না'ঈম পাঠায় যেন 'উসফান উপত্যকা থেকে আগে অগ্রসর হয়ে উপযোগী মওকা মিলতেই মুসলমানদের ধ্বংস করে দেয়। এরই সঙ্গে পদাতিক ফৌজও

অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম কাফেলা যদি অশ্বারোহী বাহিনীকে পর্যুদস্তও করে দেয় তাহলে পদাতিক ফৌজ তাদের সাহায্যার্থে পৌঁছে যাবে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) যি'ল-হুলায়ফা থেকে এমন রাস্তা ধরে চলতে থাকেন যা কুরায়শরা কল্পনাও করতে পারেনি। কুরায়শরা এই রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম ও দুরতিক্রম্য মনে করে। ফলে এর পাহারাদারির কোন প্রয়োজন তারা মনে করেনি। কুরায়শ বাহিনী আঁ-হযরত (সা)-এর কাফেলার আগে বেরিয়ে যাবার খবর সেই মুহূর্তে জানতে পায় যখন তারা মক্কার কয়েক মাইল দূরত্বে হুদায়বিয়ার নিকটবর্তী পৌঁছে গেছে এবং রাস্তায় প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী ফৌজ তখন মক্কা থেকে শতাধিক মাইল দূরে অবস্থান করছে। কুরায়শ বাহিনী ঘাবড়ে গিয়ে মক্কার দিকে ফিরে চলল, কিন্তু এর ফলে তারা তাদের পদাতিক ফৌজ থেকে আরও দূরে সরে গেল। ফলে সে সময় মক্কার প্রতিরক্ষাগত পজিশন ছিল এই যে, কুরায়শদের পদাতিক ফৌজ কিরা' আল-না'ঈম-এর নিকট ফিরে আসছিল, আর ওদিকে অশ্বারোহী বাহিনী মক্কার দিকে দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছিল। কুরায়শদের সাহায্যকারী কবিলাগুলো হুদায়বিয়ার কাটা ছোট সংযোগ খালের পাশে ছিল, আর সেসব ফৌজ, কবিলা এবং মক্কা শহরের মাঝখানে আঁ-হযরত (সা)-এর কাফেলা অথবা কুরায়শ ফৌজের রাস্তা আটকে রেখেছিল।

সমর শাস্ত্রের দিক দিয়ে কুরায়শ কার্যত হেরে গিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, অতঃপর আঁ-হযরত (সা) মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন না কেন?

নিঃসন্দেহে যদি এই ক্ষেত্রে আঁ-হযরত (সা) ভিন্ন অপর কোন জেনারেল হতেন তবে দূরদর্শিতাকে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে অবশ্যই তিনি শহরে প্রবেশ করতেন। কেননা মক্কা তো শিকার বনে গেছে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর মত অতুলনীয় সমরবিদ ও অনন্যসাধারণ জেনারেল এ ধরনের ভুল করতে পারেন না। কারণ শুধুমাত্র বিজয় লাভ করা তাঁর ফৌজী অভিযান কিংবা জিহাদের উদ্দেশ্য কখনই ছিল না। তাঁর উদ্দেশ্য ও মিশন ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা কায়েম করা এবং ফেতনা-ফাসাদ ও ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের উচ্ছেদ সাধন। তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল তো সেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল করার জন্যই, জয়লাভের আমেজ পেতে কিংবা

তৃপ্তি উপভোগের জন্য নয়। তিনি যথাসম্ভব রক্তপাত এড়াতে চাইতেন। সে সময় মক্কা জয়ের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ ছিল না। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, এর জন্য প্রচুর রক্তপাত ঘটত এবং এরই সঙ্গে এও আশংকা ছিল যে, কুরায়শ ফৌজের কিছু অংশ অথবা মিত্র কবিলাগুলো প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত মদীনার উপর হামলা করে বসত। এখানে আমরা স্বীকার করেছি যে, আঁ-হযরত (সা)-এর মত একজন অভিজ্ঞ জেনারেল এসব আশংকাকে অংকুরে বিনষ্ট করবার জন্য অবশ্যই কোন ব্যবস্থা করে ফেলতেন এবং বিজয়ীও হতেন। কিন্তু এ ধরনের লড়াই-এ একটা বিরাট মূল্য প্রদানের মাধ্যমেই কেবল জয়লাভ করা সম্ভব হ'ত এবং তাতে ব্যাপক আকারের হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাতে বিজিত কবিলাগুলোর ভেতর প্রতিশোধ-স্পৃহার দাবানল সৃষ্টি হ'ত এবং এ বিজয় আরও একটি যুদ্ধের সূচনা করে অধিকতর রক্তপাতের কারণ হ'ত। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) সকল যুদ্ধেই একটা কথা সামনে রেখেছিলেন আর ত হ'ল, বিজিতরা প্রকৃত ও স্থায়ী শান্তির দ্বারা নিকটতর হোক এবং ইসলামের উন্নত ও মহান নীতিমালা ইখতিয়ার করে নিজেদেরকে বিজিত ও পরাজিত মনে না করুক ; বরং ইসলামী সাম্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে كل مؤمن اخوة (প্রত্যেক মু'মিন একে অপরের ভাই)-এর নমুনা হয়ে উঠুক এবং দুনিয়ার শিক্ষকতা ও নেতৃত্বের মহান আসনে সমাসীন হয়ে উভয় জগতের সাফল্য ও কামিয়াবী হাসিল করুক। এমত অবস্থায় সামরিক বিজয়ের দ্বারা প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল হ'ত না। অতঃপর তাঁর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এবং কুরায়শদের কমযোরী ও অসহায়ত্বের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও অনুভূতি ছিল। তিনি নিশ্চিত ছিলেন আর এজন্যই তিনি কোন অগ্রাভিযান করেন নি, বরং পরিপূর্ণ বদান্যতা ও উদার আন্তরিকতার সঙ্গে কুরায়শদের পেশকৃত সকল শর্তই কোনরূপ আপত্তি ব্যতিরেকেই মেনে নেন। যদি দুশমনের উপর কার্যকর আঘাত না লাগত এবং তিনি যদি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত না হতেন তবে মশহূর বর্ণনা মুতাবিক বুদায়ল বিন ওয়ারাকা আল-খুযা'ঈকে একথা বলতেন না : "আমরা কারো সঙ্গে লড়াই-ঝগড়া করতে আসিনি, শুধুমাত্র 'উমরাহ করতে এসেছি। আমরা লড়াই করার আগেই কুরায়শদের বলবীর্য নিংড়ে দুর্বল করে দিয়েছি।" অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি তাদের সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন যে, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও আমরা যুদ্ধের পরিবর্তে সন্ধি

কামনা করছি। কোন বিখ্যাত লোকের উক্তি, "জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকের জন্য ইশারাই যথেষ্ট;" এটা এমনই যবরদস্ত একটা প্রতিরক্ষা চাল ছিল যে, তা কুরায়শ ও অন্যান্য কবিলাগুলোকে তাঁর সামনে অস্ত্র সংবরণ করতে মজবুর করে দেয়। গর্ব ও অহমিকার নেশায় মত্ত মক্কাবাসীদের উপর তা অত্যন্ত কার্যকর আঘাত হানে। দৃশ্যত আঁ-হযরত (সা) কুরায়শদের পেশকৃত শর্তাদি মঞ্জুর করেন; কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, তিনি কার্যত মক্কা জয় করে নিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধি তাঁর জন্য ছিল বিরাট কামিয়াবী এবং পরবর্তী ঘটনাবলী এই কামিয়াবীরই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইতিহাসে এর বহু উদাহরণ বিদ্যমান যে, যখনই সংঘর্ষমুখী ও বিবদমান দুটি গ্রুপের মধ্য থেকে কোন পক্ষ প্রতিপক্ষের উপর তাদের আকাংক্ষা মাফিক চাল চেলেছে কিংবা এমন মোর্চার উপর হামলা করেছে যেখানে দুশমন অপেক্ষায় ছিল, তাতে ফলাফল ও পরিণতি কখনই চূড়ান্ত হয়নি। নেপোলিয়ন এটাকেই নিম্নোদ্ধৃত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তি শারীরিক শক্তির চেয়ে তিন গুণ অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে।" যখন দু'জন পাহলোয়ান মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তখন একে অপরকে মাটিতে ফেলে দেবার জন্য এমন সব দাও-প্যাঁচ কষে যেন প্রতিপক্ষ ভারসাম্য হারিয়ে নিজে নিজের চার হাত-পা ছড়িয়ে চিৎপাত হয়ে পড়ে। কোন পাহলোয়ান প্রতিপক্ষ পাহলোয়ানকে সে মুহূর্ত পর্যন্ত শুধুমাত্র গায়ের জোরে ফেলে দিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এক পক্ষ অপর পক্ষের তুলনায় শারীরিক শক্তিতে অনেক বেশী হয়, আসুরিক শক্তির অধিকারী হয় এবং সেই অবস্থায় যখন কেউ নিজেকে অহেতুকভাবে ক্লান্ত ও অবসন্ন করে তোলে। এমনিভাবে যখন কোন ফৌজের অধিনায়ক প্রতিপক্ষের ধারণা মুতাবিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তবে তার উদাহরণ হবে সেই পাহলোয়ানের মত, যে শুধুমাত্র গায়ের জোরে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করতে চায়। এর বিপরীতে ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও ভূরি ভূরি ছড়িয়ে রয়েছে যে, চূড়ান্ত যুদ্ধ হামেশা শত্রুর নৈতিক ও চারিত্রিক শক্তিকে পর্যুদস্ত করার মাধ্যমেই চালানো হয়েছে অর্থাৎ সে সব লড়াইয়ে আখড়ায় লড়াকু পাহলোয়ানের মত যুধ্যমান দু'জনের মধ্যে একে অপরকে উপযোগী দাও-প্যাঁচ কষে নিজের বুদ্ধির দ্বারা পরাভূত করেছে এবং আঘাত হেনে তার শক্তিকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে।

প্রতিরক্ষা কৌশলে শুধুমাত্র শক্তির উপর ভরসা করে দুশমনকে পর্যুদস্ত করাকে Pericfean poli cy বলা হয়। এই পলিসি বা নীতির লক্ষ্য থাকে এই যে, নিজ শক্তি দ্বারা দুশমনকে এতখানি কমযোর করে দিতে হবে যাতে সে মজবুর হয়ে হাতিয়ার ফেলে দেয় এবং পরাজয় স্বীকার করে নেয়। যখন যোগ্যতার সঙ্গে সামরিক কৌশল এবং দাও-প্যাঁচ দ্বারা তাকে শুধুমাত্র মজবুর বানিয়ে কম থেকে কমতর শক্তি কাজে লাগিয়ে ও ব্যবহার করে পরাভূত করা হয় তখন তাকে Indirect approach বলা হয়। আঁ-হযরত (সা) এই সুযোগে এই মূলনীতিকে নেহায়েত যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজে লাগান এবং কুরায়শ শক্তিকে খতম করে চিরদিনের জন্য বাধ্য ও অনুগত বানিয়ে দেন।

Indirect approach-এর প্রসঙ্গে আমরা জেনারেল শেরম্যানের বর্ণনা দিয়েছি। তিনিও আমেরিকার গৃহযুদ্ধে (civil war) আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে চলাচল করে শত্রুর নৈতিক শক্তির সঙ্গে তাদের সামরিক শক্তি চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পদাতিক ফৌজকে এমনভাবে বিন্যস্ত এবং প্রস্তুত করেছিলেন যে, তার বড় বড় প্লাটুন শত্রু এলাকায় কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থাতেও বিদ্যুৎ গতিতে অতিক্রম করত এবং দুশমনকে মজবুর ও বেসামাল করে অবশেষে পর্যুদস্ত করে দিত। শেরম্যানের এ লড়াই সমরশাস্ত্রের একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখের দাবি রাখে। ভবিষ্যৎ বংশধররা তা থেকে এই শিক্ষা নেয় যে, বিদ্যুৎ গতিতে কিভাবে চলাচল করা যায় এবং এরূপ মওকায় কোনরূপ অলসতা ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কি অর্থ হয়ে থাকে।

হুদায়বিয়ার সন্ধির অভিযানের উদাহরণ হ্যানিবল (Hannibal)-এর কার্যকলাপেও পাওয়া যায়। হ্যানিবলও এ ধরনের ফৌজী অভিযানের সমর্থক ছিলেন। যে অভিযান তার প্রতিপক্ষও অসম্ভব কল্পনা করত, তিনি তাই অবলম্বন করতেন এবং এমন রাস্তায় গমন করতেন যা অত্যন্ত দুরতিক্রম্য ও কষ্টসাধ্য বলে মনে করা হ'ত। তিনি তাঁর দুশমনকে কখনই এমন সুযোগ দিতেন না যাতে সে তার নিজ পসন্দ মাফিক মোর্চা তৈরী করতে পারে কিংবা ময়দানে তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সুযোগ পায়।

হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা থেকে আরও একটি শিক্ষা পাই যে, যুদ্ধ করার সময় দূরদর্শিতাকে কখনই হাতছাড়া করতে নেই আর করা উচিতও

নয়। এমনিভাবে বিজয়ী হবার খাহেশকে জয়লাভের ফলাফল, পরিণতি ও প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করা অপরিহার্য। যদি বিজয় অর্জিত হবার পর অশান্তি-বিশৃংখলা, রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহ'লে এর থেকে সেই শান্তিপ্রদ সন্ধি যদ্দ্বারা নৈতিক দিক দিয়ে দুশমন সামনে অগ্রসর হয়ে পরাজয় বরণ করে, সব দিক দিয়েই অগ্রাধিকার ও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু এমন কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করার মুহূর্তে এই কথাটা বিবেচনাধীন রাখা জরুরী, যে কওম কিংবা যে হুকুমত নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের শিকার হয় সে শক্তির মহড়াকে বেশী মান্য করে থাকে অর্থাৎ সে কওম অথবা হুকুমতের বেলায় এই উপমা সত্য হয়ে দেখা দেয় যে, 'লাথির ভূত কথায় তাড়ানো যায় না।' তাহ'লে এমতাবস্থায় স্বীয় নীতির খাতিরে এতটা শক্তিশালী ফৌজ রাখা জরুরী যার মুকাবিলা শত্রুর সাধ্যাতীত হয়। উদাহরণত গুণ্ডা, বদমাশ ও লম্পট চরিত্রের লোকদের উপর ওয়া'জ-নসীহত ও যুক্তিগ্রাহ্য কথার কোন আছর হয় না, তাদের জন্য পুলিশের ডাণ্ডার প্রয়োজন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় আঁ-হযরত (সা) স্বীয় প্রতিরক্ষা চাল ও ফৌজী প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দরুন দুশমনকে তাঁর কথা মানতে বাধ্য করেন এবং এভাবে কুরায়শ ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। যদি তারা তাঁর শক্তি সম্পর্কে ভীত না হ'ত তবে কখনই তারা তাঁর কথা শুনত না এবং অবশ্যই রক্তপাতের পর্যায়ে নেমে আসত।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ফেতনা-পুরস্ত এবং নৈতিক ও চারিত্রিক দিক দিয়ে যারা হীন চরিত্রের, তা কোন ব্যক্তি বিশেষই হোক কিংবা কোন জাতি-গোষ্ঠীই হোক, তারা যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা সঠিক পথে কখনই আসে না। যখনই তাদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে তখনই তা দুর্বলতা ভেবে তারা আরও দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে এবং পূর্বের তুলনায় অধিকতর আক্রমণাত্মক ও মারমুখো কর্মপদ্ধতি ইখতিয়ার করেছে। কিন্তু ঢিলের জবাব যখন পাথর দ্বারা দেওয়া হয়েছে তখন ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি ও শয়তানী অপচেষ্টার মনোবল ও মানসিকতা চুপসে গেছে এবং সকল বীরত্ব ও বাহাদুরী সঠিক পর্যায়ে এসে গেছে। এটাই গুণ্ডাদের স্বভাব। কিন্তু সকল বীরত্ব ও বাহাদুরী ঠিকঠাক হয়ে যাবার মানে এ নয় যে, তাদের মেযাজ মর্জি বদলে গেছে এবং তারা শান্তিপ্রিয় হয়ে গেছে। এটা বুঝলে ভুল করা হবে। তাদেরকে ক্রমে ক্রমে বদলানো যায়। আর যদি

কোন রাষ্ট্র ও সরকার কলহ-কোন্দল ও অশান্তিপ্রিয় হয় তবে তারা সাময়িক সন্ধি থেকে অধিকাংশ সময় উপকারী ও ফলপ্রসূ ফলাফল তৈরি করতে পারে এবং তা নিম্নোক্ত দু'টি বিকল্প অবস্থার চেয়ে উত্তম ও উপযোগী বলা চলে ঃ

প্রথমত, তাকে বা তাদেরকে একেবারে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিতে হবে। তার জন্য রক্তপাত অপরিহার্য। এ ধরনের লোকদের যখন তাদের এই পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞানের উন্মেষ ও বোধোদয় ঘটে, হাঁ, তখন তারা আরও দুঃসাহসী ও ভয়াবহ রকমের শত্রুতে পরিণত হয়। কেননা তারা মনে করে থাকে যে, এখন একমাত্র মরণ ছাড়া তাদের সামনে কোন বিকল্প নেই। সুতরাং কোন কিছুরই পরওয়া করা আর ঠিক হবে না।

দ্বিতীয়ত, উভয় পক্ষের শক্তির মাঝে খুব বেশী ব্যবধান যেন না থাকে। আর যে হুকূমত নিজেই নিজেকে শক্তিশালী মনে করে এবং প্রতিপক্ষকে দুর্বল ভাবতে চায় সে-ই চিরদিনের জন্য পরাভূত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় সম্ভবত যে শক্তিশালী সে জয়যুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এটা লাভ করতে গিয়ে আর্থিক তথা সম্পদের দিক দিয়ে সে এতটা কমযোর হয়ে যাবে যে, এই জয়লাভ তার জন্য দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। গত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী মিত্রশক্তিসমূহের মধ্যকার অনেক মিত্ররাষ্ট্র অনুরূপ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে এবং এই জয়লাভের জন্য তাদের বিরাট মূল্য দিতে হয়েছে। কিন্তু যদি সন্ধির কারণে এই ভয় দেখা দেয় যে, সময় মিলতেই ফেতনা-ফাসাদপ্রিয় শক্তি আরও শক্তি সঞ্চয় করবে তা হ'লে এমন সন্ধি না হওয়াই উচিত। কেননা এর অর্থ হবে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা।

পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আঁ-হযরত (সা)-এর দৃষ্টি কত সঠিক ও নির্ভুল ছিল! তিনি যেরূপ বিজ্ঞজনোচিত উপায়ে কাজ করেছেন তা কি পরিমাণ উপকারী ও কার্যকর ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধি প্রতিরক্ষা কৌশলের দিক থেকে একটি মাইলফলকের মর্যাদা রাখে।

খায়বার যুদ্ধ

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আঁ-হযরত (সা) সেই সব কবিলার দিকে মনোনিবেশ করেন যারা মদীনার আশে-পাশে ফেতনা-ফাসাদ ও অশান্তি

সৃষ্টিতে তৎপর ছিল। তাদের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী এবং সর্বাপেক্ষা বড় ফেতনাবাজ ছিল খায়বারের য়াহূদী সম্প্রদায়। মদীনা থেকে বহিষ্কৃত ও নির্বাসিত হবার পর বনী নাযীর খায়বারে আসে এবং এখানকার য়াহূদীরা তাদেরকে আশ্রয় দেয়। স্বাভাবিকভাবেই তাদের খাহেশ ছিল, মদীনার খেজুর বাগানগুলোর উপর বনী নাযীর-এর পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হোক। বনূ গাতফান খন্দকের যুদ্ধে এবং এর পরেও সতর্কভাবে নিজেদের বাঁচিয়ে নেয়। এ কারণে তাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা ছিল, আঁ-হযরত (সা)-এর তাদের মুকাবিলায় আসার সাহস নেই! এজন্য তারা য়াহূদীদেরকে উস্কানী দেবার ব্যাপারে আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। আঁ-হযরত (সা) খায়বারের য়াহূদীদের উচ্ছৃংখলতা দমনের জন্য ফৌজী কার্যক্রম শুরু করেন এবং এ খবর মশহূর হয়ে পড়লে বনী গাতফান তাদের সাহায্যার্থে খায়বার রওয়ানা হয়ে যায়।

আঁ-হযরত (সা)-এর সামরিক গতিবিধি সব সময়ই গোপনীয় হ'ত। যখন তিনি খায়বারের দিকে রওয়ানা হন তখন সোজাসুজি না গিয়ে এমন একটা পথ ধরে চলেন যা ছিল গাতফান ও খায়বারের মধ্যবর্তী। এজন্য য়াহূদী এবং গাতফানের কেউই পরিমাপ করে উঠতে পারে নি যে, কার উপর হামলা হতে যাচ্ছে। যেহেতু আঁ-হযরত (সা) আচানক হামলা করতেন এবং তাঁর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে কেউ সঠিক জ্ঞান রাখত না, এজন্য দু'জনেরই ভয় দেখা দেয় যে, হয়তো আমাদের উপরই আক্রমণ হতে যাচ্ছে। অতএব গাতফানের কবিলাগুলো তাদের সৈন্যবাহিনীকে ফেরত ডেকে নেয় এবং তারা য়াহূদীদের ছেড়ে নিজেদের হেফাজতের তদবীরে লেগে পড়ে। আর য়াহূদীরা হয়ে পড়ে একেবারে একাকী। প্রথমে আঁ-হযরত (সা) গাতফানের এলাকা দখল করেন। এরপর ক্রমান্বয়ে খায়বার অবরোধ করতে শুরু করেন।

য়াহূদীরা খায়বার গিরিপথের বিভিন্ন স্থানে ছোট-বড় প্রস্তর নির্মিত ঘর এবং দুর্গ বানিয়ে রেখেছিল। এইসব দুর্গ ছিল পেশাওয়ার ও কোহাটের মধ্যবর্তী অথবা পাকিস্তানের খায়বর গিরিপথের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত গড়, চূড়া ও দুর্গের মত। এ সব গড় ও দুর্গ সেখানকার বসবাসকারীদের এবং এলাকার একটি বিশেষ অংশের হেফাজত করে থাকে। আর বাইরের আক্রমণকারীদের মুকাবিলায় সেগুলো একটি যবরদস্ত হেফাজতী

মোর্চার মর্যাদা রাখে। আজকাল সেসব চূড়া বা গুম্বজগুলোতে তোপ ও বন্দুক ইত্যাদি চালাবার ছিদ্র নির্মিত হয়েছে। আগে তীরন্দাযী অথবা গোপিয়া এবং হাতের দ্বারা পাথর নিক্ষেপের ব্যবস্থা থাকত।

মুসলিম বাহিনীর হামলার পর হিস্ন না'ঈম নামক ছোট্ট একটি দুর্গ-বিশেষ বিজিত হয়। এখানে য়াহূদীরা মাহমূদ বিন মাসলামের উপর পাটার টুকরো নিক্ষেপ করে। ফলে তিনি শহীদ হন। হিস্ন না'ঈম-এর পর কামূস এবং ইব্ন আবী আল-'আকীক-এর দুর্গ দখল করা হয়। অতঃপর সা'দ বিন মা'আয-এর কেল্লার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অনেক-গুলো বড় বড় শস্য-ভাণ্ডার মুসলমানদের হস্তগত হয়। এইসব দুর্গে পরা-জয়ের পর য়াহূদীরা ওয়াতী'ও সুল্লালিম এবং খায়বারে গিয়ে একত্র হয়। শাক্কি নাজাত ও কিতার কেল্লা এবং গড়গুলোও মুসলমানদের অধিকারে এসে গিয়েছিল।

আঁ-হযরত (সা) এসব কেল্লা জয় করার জন্য পালাক্রমে কয়েকজন অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং মুসলিম ফৌজ বারো দিনের অবরোধকালে কয়েক বার সেগুলো জয় করার জন্য প্রয়াস চালায়। কিন্তু কামিয়াব হতে পারেনি। তেরো দিনের দিন আঁ-হযরত (সা) স্বয়ং যুদ্ধের ময়দানে তশ-রীফ নেন এবং অধিনায়কত্বের পতাকা হযরত 'আলী (রা)-কে সোপর্দ করে বিজয়ের জন্য দু'আ করেন। হযরত 'আলী (রা) খায়বারের উপর ভীষণ বেগে আক্রমণ করেন এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর কেল্লা বিজিত হয়। কবিলার সর্দার কিনানা বিন আল-রাবীক বিন আবী আল-হাকীক গ্রেফতার হয়।

খায়বার দখলের পর ওয়াতী'ও সুলালিম-এর অবরুদ্ধ অধিবাসীরা জীবন ভিক্ষা ও নির্বাসনের শর্তে অস্ত্র সমর্পণ করে সকল বিষয় সম্পত্তি ছেড়ে বের হয়ে যেতে রাযী হয়। আঁ-হযরত (সা) তাদের পেশকৃত প্রস্তাব কবুল করেন এবং যে সব য়াহূদী কৃষক হিসেবে সেখানে থাকবার খাহেশ জাহির করে তিনি তাদেরকে থাকবার অনুমতি দান করেন।

বনী হারিছার মুহাসসিয়া বিন মাস'উদ স্বীয় খিদমতের বিনিময়ে য়াহূদীদের দ্বারা চাষবাস করাবার জন্য এই এলাকাকে আঁ-হযরত (সা) থেকে এই ওয়াদার উপর নিয়ে নেয় যে, সমস্ত ফসলের অর্ধাংশ প্রতি বছর মুসলমানদেরকে দেবে। আঁ-হযরত (সা) বনূ হারিছার এই দরখাস্ত এই

শর্তে মঞ্জুর করেনঃ যতদিন আমাদের আবশ্যক না হবে তোমরা বর্গার ভিত্তিতে কৃষিকাজ করতে পারবে।

ফিদাক-এর কবিলাগুলো অর্ধভাগের শর্তে যুদ্ধ ব্যতিরেকেই আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে সন্ধি করে নেয়।

খায়বার থেকে আঁ-হযরত (সা) জিহাদের জন্য ওয়াদিউ'ল-কুরা তশরীফ নেন। কিন্তু সেখানকার কবিলাগুলো তাঁর আনুগত্য কবুল করে নেয়।

এরপর তিনি 'ওমর ইব্ন আল-খাত্তাব (রা)-কে হাওয়াযিন কবিলাকে বিশেষভাবে সতর্ক ও হুশিয়ার করে দেবার জন্য প্রেরণ করেন। এই অভিযানের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র তিরিশ জনের মত। এই প্লাটুন দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকত এবং রাতে সফর করত। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও হাওয়াযিন কবিলার লোকেরা মুসলিম বাহিনীর গতিবিধি জেনে ফেলে এবং প্রাণের ভয়ে পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে।

অপর আর একটি প্লাটুন তিনি গালিব বিন 'আবদুল্লাহ্র নেতৃত্বে সিফায়া রওয়ানা করেন। মুসলমানদের একজন মিত্রের হত্যার অপরাধে বনী মাররাহ্কে শাস্তি দেওয়াই ছিল এই অভিযানের উদ্দেশ্য। এই প্লাটুন অভি-যান সম্পন্ন করার পর বহুবিধ গনীমতের মাল নিয়ে মদীনায় ফিরে আসে।

গালিব বিন 'আবদুল্লাহ্র অধীনে আরও একটি অভিযান বনী 'আব্দ বিন ছা'লাবাকে সাজা দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়।

'উমরাহ ও হজ্জ

গত বছর যী-কা'দাহ্ মাসে তিনি 'উমরাহ্র জন্য তশরীফ নিয়েছিলেন; কিন্তু কুরায়শরা যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়ে তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়নি। তিনি তাদের বোঝাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারা তা কিছুতেই বুঝতে চায়নি। অবশ্য তারা সন্ধি করে মেনে নিয়েছিল যে, তিনি আগামী বছর আগমন করতে পারবেন। সে সময় তিন দিনের জন্য তারা মক্কা খালি করে দেবে। এই শর্ত মুতাবিক আঁ-হযরত (সা) পরের বছর উল্লিখিত মাসেই সেই সমস্ত সাহাবাদের নিয়ে, যারা ইতিপূর্বে তাঁর সঙ্গী ছিলেন, মক্কায় রওয়ানা হন। মক্কাবাসীরা যখন আঁ-হযরত (সা)-এর

আগমনের সংবাদ অবহিত হ'ল তখন ইতিপূর্বেকার কৃত চুক্তির শর্ত মুতাবিক মক্কা থেকে বাইরে চলে গেল; কিন্তু কিছু লোক শহর অভ্যন্তরে রেখে যায় যেন তারা আঁ-হযরত (সা)-এর মুসলমানদের আর্থিক পেরে-শানীর পরিমাপ করতে পারে। শত্রুরা চতুর্দিকে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, মুসলমানদের উপর দারিদ্র্য ছেয়ে গেছে এবং অভাব-অনটন তাদেরকে একে-বারে কমযোর ও দুর্বল করে দিয়েছে। আঁ-হযরত (সা)-এর ফরমায়েশ মুতাবিক সমস্ত সাহাবা (রা) তিনবার দ্রুততার সঙ্গে তাওয়াফ করেন। এ দৃশ্যে কাফিররা অত্যন্ত বিস্মিত হয় এবং তাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, মুসলমানদের আর্থিক ও শারীরিক অবস্থা খুবই ভাল। হজ্জব্রত সম্পন্ন করে তিনি মদীনা তশরীফ নেন।

অষ্টম হিজরী

অষ্টম হিজরীর সফর মাসে আঁ-হযরত (সা) বনী মালূহকে শাস্তি দিবার জন্য একটি প্লাটুন গালিব (রা) বিন 'আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। তাদের মোট সংখ্যা ছিল চৌদ্দ জন। এ অভিযান পরিপূর্ণরূপে সফল হয়। প্লাটুনের সদস্যদের বীরত্ব ও বাহাদুরীর দৃষ্টান্ত এই যে, গালিব (রা) বিন 'আবদুল্লাহ্ কাদীদ পর্বতের পাদদেশে শত্রুর গতবিধি পর্যবেক্ষণ করবার জন্য জুনদুব বিন মিকবাছ (রা) আল-জুহনীকে মোতায়েন করেন। দুশমন তাকে দেখে ফেলে। কিন্তু দূরত্ব বেশী হবার কারণে তারা ফয়সালা করতে পারেনি ওটা কোন মানুষ না পাথর। ফলে তারা নিশ্চিত হবার জন্য তীর নিক্ষেপ করে। এরপর আরও দুটি তীর নিক্ষেপ করা হয়। আর তিনটি তীরই জুনদুব (রা)-এর শরীরে বিদ্ধ হয়। কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর জায়গা থেকে এতটুকু হেলেন নি, পাছে দুশমন তাদের অবস্থান জেনে ফেলে। দুশমন অতঃপর নিশ্চিন্ত হয় যে, আসলেই ওটা পাথর। ফলে তারা রাতের বেলায় নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। মুসলমানরা রাতের বেলা তাদের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়ে গনীমতের মাল নিয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তন করে।

জিয্‌য়া

এ বছরেই আঁ-হযরত (সা) ‘আলী বিন আল-হাদরামী (রা)-কে মুনযির বিন সাওয়া আল-‘আবদীর নিকট নিজের একটি চিঠি দিয়ে পাঠান। এতে লেখা ছিলঃ যে ব্যক্তি মুসলমানদের মত নামায পড়বে এবং তাদের যবেহ্ করা পশুর গোশ্‌ত ভক্ষণ করবে সেই মুসলমান। তার অধিকার ও যিম্মাদারী ঠিক ততখানি যা অপর কোন মুসলমানের। যে এটা অস্বীকার করবে তার থেকে জিয্‌য়া গ্রহণ করা হবে। মুসলমান তাদের মেয়েদেরকে যেমন বিয়ে করবে না, তেমনি তাদের যবেহ্ খাবে না। অগ্নি-উপাসকেরা আঁ-হযরত (সা)-এর এই শর্ত মঞ্জুর করে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়।

এরূপে সে বছরই ‘আমর (রা) ইবন আল-‘আসকে ‘আম্মান পাঠান। সেখানকার কিছু লোক মুসলমান হয়। কিন্তু যারা ঈমান আনেনি তারা জিয্‌য়া প্রদানে স্বীকৃত হয়।

এ বছরের রবী‘উ’ল-আউয়াল মাসে শুজা‘ (রা) ইব্‌ন আয়্যূবকে একটি প্লাটুনসহ বনী ‘আমেরের ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেবার জন্য রওয়ানা করেন। এ অভিযানও ছিল সফল ও কামিয়াব। শুজা‘ (রা) বহু উট ও অন্যান্য পশু পাল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে নিয়ে ফিরে আসেন।

‘আমর ইবনুল-‘আস এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ-এর ইসলাম গ্রহণ

এ বছর সফর মাসের প্রথম দিকে ‘আমর ইব্‌ন আল-‘আস, ‘উছমান ইব্‌ন তালহা আল-বারী এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ বিন আল-মুগীরা ঈমান আনেন। ‘আমর ইব্‌ন আল-‘আসের ‘আম্মান অভিযানে রওয়ানা হবার ঘটনা এর পরবর্তীকালের। তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থে ‘আমর ইব্‌ন আল-‘আস (রা) থেকে বর্ণিত আছেঃ খন্দক যুদ্ধের পর আমার খেয়াল হ’ল ইসলাম সত্য-সুন্দর ধর্ম। আমার সাথীদের নিকট যখন একথা প্রকাশ করলাম তখন তাদেরকেও একইরূপ, অভিমত পোষণকারী হিসাবে পেলাম। কিন্তু তখনও আমাদের অন্তরে সন্দেহ ও শংকা ছিল যে, যদি কুরায়শরা মুহাম্মদ (সা)-এর উপর বিজয়ী হয় তবে আমাদের কোথাও দাঁড়াবার স্থান থাকবে না। অতএব সিদ্ধান্ত নিলাম যে, দেশ ত্যাগ করে নাজ্জাশীর দেশে চলে যাব

এবং সেখানে সকল ঘটনা নিরাপদ শান্তির সঙ্গে অনুধাবন করব। আমরা যখন নাজাশীর দরবারে পৌঁছুলাম তখন আমরা জা'ফর (রা) ইব্‌ন আবী তালিব ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নাজাশীর সঙ্গে মোলাকাত শেষে ফিরে আসতে দেখলাম। আমরা নাজাশীর সামনে গেলাম এবং তাঁকে তোহ্‌ফা পেশ করলাম। তিনি খুব খুশী হলেন। আমরা এই সুযোগকে দুর্লভ মনে করে আরয করলাম ঃ 'আমর বিন উমায়্যা আল-দামরী জা'ফর ইবন আবী তালিবের সঙ্গে এসেছিল। আপনি তাদেরকে আমাদের হাওয়ালা করে দিন যেন তাদেরকে হত্যা করে আমাদের সেসব নেতৃস্থানীয় অভিজাত ব্যক্তিবর্গের হত্যার বদলা নিতে পারি, যারা তাদের প্রভু মুহাম্মদ (সা)-এর সাথে লড়াইয়ে মারা গেছে। একথা শুনতেই নাজাশী ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলেন। আমি তক্ষুণি এর জন্য অনুনয়ের সঙ্গে ক্ষমা ভিক্ষা করলাম এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আরয করলাম ঃ আমি যদি এতটুকুও জানতে পারতাম যে, আপনি এতে দুঃখ পাবেন, তাহ'লে আমি কখনই এরূপ আচরণ করতাম না।

এতে নাজাশী বললেন ঃ মূসা (আ)-এর মতই মুহাম্মদ (সা) একজন পয়গম্বর এবং তাঁর নিকট আল্লাহ্‌র তরফ থেকে জিব্রাঈল (আ) বিধান নিয়ে অবতীর্ণ হন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, যেভাবে মূসা (আ) ফির'আউনের সৈন্যবাহিনীর উপর জয়লাভ করেছিলেন, ঠিক তেমনি মুহাম্মদ (সা)-ও তাঁর দুশমনের উপর জয়লাভ করবেন। নাজাশীর মুখে একথা শোনার পর আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হ'ল যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রসূল। অতএব আমি নাজাশীর কাছে দরখাস্ত করলাম ঃ আপনি আঁ-হযরত (সা)-এর পক্ষ থেকে আমার বায়'আত নিয়ে নিন। মুসলমান হয়ে আমি মদীনার দিকে যাচ্ছিলাম, এমন সময় রাস্তায় খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ ও 'উছমান (রা) বিন তালহার সঙ্গে মোলাকাত হয়। আমি সফরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁরা বললেন ঃ আঁ-হযরত (সা)-এর খিদমতে মুসলমান হবার নিয়তে তাঁরা চলেছেন। সেখান থেকে তিনজনেই পবিত্র খিদমতে হাযির হয়ে বায়'আত লাভে ধন্য হই।

'আমর ইবনুল-'আস (রা)-এর দ্বিতীয় অভিযান

জুমাদা আল-ছানী মাসে আঁ-হযরত (সা) 'আমর ইব্‌ন আল-'আস (রা)-কে তিন শ' সাহাবা (রা)-এর সঙ্গে বনী কুদা'আর অন্তরের বেদনা

প্রশমনের জন্য পাঠান। তাদের অন্তরের বেদনা প্রশমন ছাড়াও এ অভি-যানের আর একটা উদ্দেশ্য এও ছিল যে, ঐ সব আরবকে সিরিয়ার উপর হামলা করতে উদ্বুদ্ধ করা। 'আমর (রা)-এর মা এই কবিলার বিল্লী এলাকার অধিবাসী ছিল। বনী কুদা'আ বিল্লী এবং 'আমরাহ্‌র এলাকায় অবস্থান করছিল। সালাসিল ঝর্ণার নিকট পৌঁছে 'আমর আশংকা করেন যে, মাত্র তিন শ' সাহাবার সমন্বয়ে গঠিত তাঁর এই বাহিনী হয়ত লক্ষ্য অর্জনে যথেষ্ট হবে না। অতএব তিনি আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট পয়গাম পাঠিয়ে আরও অধিক সংখ্যক সাহায্যকারী বাহিনী পাঠিয়ে দেবার দরখাস্ত করেন। আঁ-হযরত (সা) আবু 'উবায়দাহ্ (রা) ইবন আল-জার-রাহ্‌র অধীন দু'শ মুহাজির 'আমর (রা)-এর সাহায্যার্থে পাঠান। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-ও ছিলেন। রওয়ানা দেবার সময় আঁ-হযরত (সা) আবু 'উবায়দাহ্ (রা)-কে বলেন, "তোমরা দু'জন যেন একে অপরের বিরুদ্ধে না যাও।" আবু 'উবায়দাহ্ (রা) সালাসিল পৌঁছুলে 'আমর (রা) আবু 'উবায়দাহ্‌কে বলেন, "তোমরা আমার সাহায্যে এসেছ।" আবু উবায়দাহ্ (রা) জবাব দিলেন, "আঁ-হযরত (সা) আমাকে হেদায়েত করেছেন যেন তোমার এবং আমার মধ্যে মতভেদ না হয়। অতএব আমি সর্বাবস্থায় তোমাকে অনুসরণ করে চলব।" 'আমর (রা) বলেন, "আমি তোমাদের আমীর।" আবু 'উবায়দাহ্ (রা) বলেন, "নিশ্চয় আপনি আমীর।" এই অভিযানকারীরা সেখানকার কবিলাগুলোর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে প্রত্যাবর্তন করে ; কিন্তু তেমন সন্তোষজনক ফল লাভ এতে হয় নি।

এ অভিযান এই দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এ থেকে আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশের সম্মান ও মর্যাদা পুরোপুরি প্রকাশ পায়। আঁ-হযরত (সা) যে সাহাবীর প্রতি যে কাজই সোপর্দ করতেন তিনি জীবন উৎসর্গ করে হলেও সেটাকে পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছুতেন, কোন মূল্যেই সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিও হতে দিতেন না। অতঃপর যাকে যে কাজেই যোগ্য ও উপযুক্ত বলে মনে করতেন এবং যে অভিযানে যাকে আমীর নিযুক্ত করতেন, ছোট-বড় সবাই তার আনুগত্য করত। এটাই সামরিক শৃংখলার সর্বোত্তম নমুনা।

খাবতের যুদ্ধ

আঁ-হযরত (সা) আরও একটি অভিযান আবূ 'উবায়দা (রা) ইব্‌ন আল-জাররাহ্‌র নেতৃত্বে সমুদ্রোপকূলের দিকে রওয়ানা করেন। তিনশ' আনসার ও মুহাজির তাতে শামিল ছিলেন। খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতার কারণে তাদের বহু কষ্ট ও তকলীফ পোহাতে হয়। কয়েক সপ্তাহ জংলী গাছের শুকনো পাতা খেয়ে তাঁদের কাটাতে হয়। এক স্থানে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে একটি সামুদ্রিক প্রাণী সাগরের কিনারে এসে দেখা দেয়। সেটাকে শিকার করে তার গোশ্‌ত ও চর্বি খেয়ে তাঁদের কয়েক সপ্তাহ কাটে। কয়েক মাস পর এই বাহিনী ফিরে আসলে আঁ-হযরত (সা) তাদের খুব প্রশংসা করেন। এই যুদ্ধের নাম খাবতের যুদ্ধ।

শা'বান মাসে আঁ-হযরত (সা) আবু কাতাদাহ্ (রা)-কে দু'জন সাহাবা-সহ রিফা'আহ্ বিন কয়েস-এর শয়তানী খতম করার জন্য প্রেরণ করেন। রিফা'আহ্ বনী হাশ্‌ম-এর একটি দলের সঙ্গে গার-এর এলাকায় নিজের লোকদেরকে এবং বনী কয়েসকে আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত। আঁ-হযরত (সা) নির্দেশ দেন যে, রিফা'আহ্‌কে ধরে নিয়ে আসবে অথবা তার খবর নিয়ে আসবে। এই তিনজন পদব্রজে সফর করে সূর্য ডোবার সময় শত্রুর বাসস্থানের নিকট অতি সংগোপনে ফাঁদ পেতে অপেক্ষায় বসে যান। রিফা'আহ্‌র একজন রাখাল বেলা ডোবার পরও ফিরে না আসায় সে একাকীই তার সন্ধানে বের হয়। সে সব বীরদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁরা তাকে হত্যা করেন। এরপর অন্ধকার যখন চারদিকে ছেয়ে গেল তখন তার সঙ্গী-সাথীদের উপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়েন। অতর্কিত এই হামলায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যায়। তাঁরা বহু মাল-সামান নিয়ে ফিরে আসেন।

মূতার যুদ্ধ

জুমাদা আল-আওয়াল মাসে একটি অভিযান সিরিয়ার দিকে প্রেরিত হয়। যায়দ ইব্‌ন হারিছা (রা)-কে এই বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করা হয়। এটা ছিল একটা বিরাট অভিযান যার ভেতর তিন হাযার মুজাহিদ শামিল

২০—

ছিল এবং এটাই ছিল প্রথম সুযোগ যে, এত বিরাট বাহিনীর সৈনাপত্য তিনি কোন সাহাবীকে সোপর্দ করেন। অভিযানের গুরুত্বের পরিমাপ এর থেকে করা যেতে পারে যে, তিনি বলেন, "যদি যায়দ যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে যায় তাহলে তার স্থানে জা'ফর (রা) ইব্‌ন আবু তালিব আমীর হবে। এবং সেও যদি শহীদ হয় তবে 'আবদুল্লাহ্ বিন রওয়াহা সর্দার হবে।" অতঃপর বাহিনী রওয়ানা হলে আঁ-হযরত (সা) কিছুদূর পর্যন্ত স্বয়ং তাদের সঙ্গে পথ চলেন এবং দু'আ করে মদীনায় ফিরে আসেন।

এই বাহিনী যখন সিরিয়ার মা'আন নামক স্থানে পৌঁছে তখন খবর পাওয়া গেল যে, রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এক লক্ষ রোমক সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে বলকার মা'ব শহরে অবস্থান করছেন। প্রথমে এই এলাকা রোমকদের কব্‌জায় ছিল। কিন্তু পরে সেখানে বিদ্রোহ ঘটে, যার উপর তারা পুনরায় নিয়ন্ত্রণ লাভে সক্ষম হয়। এই রোমক বাহিনী ছাড়াও অন্যান্য কবিলারও প্রায় এক লাখ লোক জমায়েত হয়েছিল। বনূ ফাখম, বনূ জুযাম, বনূ বালকায়ন, বনূ বাররা এবং বিল্লী আরবের বনূ মুসতা'রিবার কবিলাগুলোও ছিল যার সর্দার ছিল মালিক বিন রাফিলা। সে ছিল বিল্লীর তারাশ্‌তা কবিলার আমীর।

এ সমাবেশের খবর শুনে মুসলিম বাহিনী দু'দিন পর্যন্ত মা'আন-এ অবস্থান করে। উদ্দেশ্য ছিল পরিস্থিতির সঠিক পরিমাপ করা। বহু বিচার-বিশ্লেষণ ও চিন্তা-ভাবনার পর সিদ্ধান্ত হ'ল যে, শত্রুর শক্তি অনেক বেশী। তবুও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে যাওয়া হবে কাপুরুষতার নামান্তর। অতএব ওদের মুকাবিলা করা দরকার এবং সামনে অগ্রসর হওয়া উচিত।

এখান থেকে অগ্রসর হয়ে ফৌজ যখন তাখম নামক স্থানে পৌঁছুল তখন রোমানদের কবিলাগুলোর বাহিনীও সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বালুকার জনপদ মাশরফ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছে। মুসলিম ফৌজ মূতা নামক স্থানে পৌঁছে মোর্চাবন্দী হয়। দক্ষিণ ভাগের অধিনায়ক কুতবা (রা) ইবন কাতাদাহকে নিযুক্ত করা হয় এবং বাম পার্শ্বের অধিনায়ক নিযুক্ত হন আবাবা (রা) ইব্‌ন মালিক আনসারী।

এ যুদ্ধ ছিল অত্যন্ত ভয়াবহ। যায়দ (রা) ইব্‌ন হারিছা শাহাদত বরণ করলে জা'ফর (রা) ইব্‌ন আবী তালিব সিপাহসালার নিযুক্ত হন। তিনি

শহীদ হয়ে গেলে 'আবদুল্লাহ্ (রা) বিন রওয়াহা তাঁর স্থান দখল করেন এবং এরপর তিনিও যখন শহীদ হয়ে গেলেন তখন সম্মিলিত সিদ্ধান্তে খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ কমাণ্ড হাতে নিলেন।

খালিদ (রা) শত্রুর উপর উপর্যুপরি পালটা আক্রমণ চালান। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কঠোরতা আনতে পারলেন না। রোমক বাহিনীর সিপাহসালার স্বীয় ফৌজকে পিছু হটিয়ে মোর্চাবন্দ হবার নির্দেশ দেয়। তাদের পিছু হটার ফলে খালিদ (রা)-এর নিজের ফৌজকে সুবিন্যস্ত করার সুযোগ মেলে। আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট যুদ্ধের সমগ্র তথ্যই পৌঁছে যাচ্ছিল। জীবন-হানি সম্পর্কে অবগত হয়ে তিনি জিহাদের ঘোষণা দেন, সিপাহসালারদের বীরত্বের প্রশংসা করেন এবং তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করেন। খালিদ (রা) সম্পর্কে বলেনঃ "সে আল্লাহ্র তলোয়ারসমষ্টির মধ্যে একটি তলোয়ার।" সেদিন থেকেই খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ 'সায়ফুল্লাহ্' বা আল্লাহ্র তলোয়ার উপাধিতে মশহূর হয়ে আছেন।

আঁ-হযরত (সা)-এর জিহাদ ঘোষণার খবর রোমানদের সম্মিলিত বাহিনীতে যখন পৌঁছে তখন তার পয়লা প্রতিক্রিয়া হয় বনূ হাদস-এর শাখা বনূ গানাম-এর উপর। তারা তক্ষুণি যুদ্ধ থেকে আলাদা হয়ে যায়। তাদের আলাদা হবার ফলে অন্যান্য কবিলাও প্রভাবিত হয় এবং তারাও নিজ নিজ এলাকায় চলে যায়। ফৌজের এই সংখ্যাল্পতার কারণে রোমকরা ---যারা প্রথমেই পেছনে হটে এসেছিল, নিজেদের মোর্চায় চুপ মেরে যায়। এরপর যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করে চলে যায়। খালিদ (রা)-ও ময়দান শূন্য দেখে স্বীয় বাহিনীসহ মদীনায় ফিরে আসেন। এ বাহিনী যখন মদীনার নিকট পৌঁছে তখন আঁ-হযরত (সা) স্বয়ং তাদের অভ্যর্থনা জানাতে গমন করেন। তিনি জা'ফর (রা) ইব্ন আবী তালিবের অল্পবয়স্ক সন্তান 'আবদুল্লাহ্ (রা)-কে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার করে নিজের সামনে বসান এবং অন্যান্য শহীদদের সন্তানদেরকেও তিনি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার করান। মুসলিম ফৌজের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি তাঁদের বীরত্ব ও পুরুষোচিত কর্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন, আহতদের সান্ত্বনাবাক্য শুনান এবং সমগ্র ফৌজের মনোবল চাঙ্গা করে তোলেন। আর তা তিনি এমন সময় করে তোলেন যখন মদীনাবাসী মুসলিম বাহিনীর জীবনহানির কারণে লজ্জা ও অনুশোচনায় অত্যন্ত ম্রিয়মান হয়ে পড়েছিল। আঁ-হযরত (সা) এভাবে

তাঁদের মনোবল বাড়িয়ে শুধু মুজাহিদ বাহিনীর অন্তর থেকে দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতা সম্পর্কিত সন্দেহ সংশয়কেই দূরীভূত করেন নি, বরং সমগ্র মুসলমানের মধ্যেই একটি নতুন প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি করেন এবং মুনাফিকদের মুখও বন্ধ করে দেন।

বাস্তব সত্য এই যে, সার্বিক অবস্থার পরিমাপ করা শুধুমাত্র আঁ-হযরত (সা)-এর মত যোগ্য ও দূরদর্শী অধিনায়কেরই কাজ ছিল। অনন্তর তাবুকের যুদ্ধ থেকে—যা মূতার যুদ্ধের পরবর্তীতে সংঘটিত হয়—এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, সেখানকার লোকেরা ইসলামের মুজাহিদবৃন্দের বীরত্বের স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাদের পরাজয় সেই পাকা ফলটির মত ছিল যা মুজাহিদবৃন্দের কোলে পতনোন্মুখ। অনন্তর সে সব কবিলা কোনরূপ মুকাবিলা ও সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই তাবুক যুদ্ধের পর অনুগত হয়ে যায়।

ইসলামের দা'ওয়াত

আঁ-হযরত (সা) ছিলেন আল্লাহ্র রসূল। তাঁর সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের তবলীগ এবং শান্তি ও সমঝোতা স্থাপন। তিনি কাফির ও মুশরিকদের সঙ্গে লড়াই করেছেন; কিন্তু তাও শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্যে যে, কলেমায়ে হক-এর সমুন্নতির রাস্তার সকল প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যাক এবং পথভ্রষ্ট মানবতাকে ভ্রান্তি ও ধ্বংসের রাস্তা থেকে সরিয়ে এনে ইসলামের সিরাতে মুস্তাকীম-এর উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হোক। অনন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহের পূর্বে যখনই তিনি সময় পেয়েছেন লোকদেরকে ইস-লামের পয়গাম পৌঁছিয়েছেন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন সময়ে নিজের সাহাবা (রা)-দেরকে ইসলামের প্রচার ব্যাপদেশে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছেন। ইব্ন ইসহাক তাবারীর উদ্ধৃতি দিয়ে নিম্নোক্ত সাহাবা (রা)-দের রওয়ানা হবার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

১. বনী 'আমের বিন লুওয়াই-এর সলীত বিন 'আমর 'আব্দ শাম্স বিন 'আবদুদকে য়ামামার রঈস হাওয়াই বিন 'আলীর নিকট পাঠানো হয়।

২. বাহরায়নের রঈস মুনযির বিন সাওয়া-র নিকট 'আলী (রা) ইব্ন আল-হাদরামীকে পাঠান।

৩. 'আমর (রা) ইব্‌ন আল-'আসকে 'আম্মানের র'ঈসবৃন্দ বনী আস্‌ফ-এর হাযকা'আ বিন হালবাদ ও 'আব্বাদ বিন হালবাদ-এর নিকট পাঠান।

৪. হাতিব (রা) ইব্‌ন আবী বালতা'আকে আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ্ মুকাওকিসের নিকট চিঠি মুবারক দিয়ে পাঠিয়ে দেন। মুকাওকিস আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে চারটি বাঁদী নযরানাস্বরূপ পাঠান।

৫. দাহিয়্যা (রা) বিন খলীফা আল-কালবী আল-খাযরাজীকে একটি চিঠি দিয়ে রোমের কায়সার হেরাক্লিয়াসের নিকট পাঠান। সে সময় আবু সুফিয়ানও হেরাক্লিয়াস-এর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গিয়েছিলেন। হেরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে আঁ-হযরত (সা)-এর বংশপরিচয় ও আচার-অভ্যাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। আবু সুফিয়ান তার ঠিকঠাক উত্তর দেন এবং আঁ-হযরত (সা)-এর প্রশংসাও করেন। এতে হেরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে পরামর্শ দেন যেন তারা আঁ-হযরত (সা)-এর নবূওতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন না করেন! তিনি বলেনঃ আমার অবস্থা যদি আমাকে অনুমতি দিত তবে আমি তাঁর খেদমত করতাম। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, তিনি আমার সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করবেন। আঁ-হযরত (সা)-এর চিঠির ভাষ্য নিম্নরূপ ছিলঃ

"বিসমিল্লাহি'র-রাহ·মানি'র-রাহী·মঃ এই চিঠি আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে রোমের কায়সার হেরাক্লিয়াসের প্রতি পাঠানো হচ্ছে। যারা হেদায়েত ইখতিয়ার করেছে, তারা শান্তিপ্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করো, শান্তি পাবে। ঈমান আনয়ন কর, আল্লাহ্ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কারে ভূষিত করবেন। আর যদি আমার এই দা'ওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমার অজ্ঞ প্রজাবৃন্দের পথভ্রষ্টতার গোনাহ্ও তোমারই উপর বর্তাবে।"

বর্ণিত আছে যে, আঁ-হযরত (সা)-এর চিঠি পাবার পর হেরাক্লিয়াস দাহিয়্যা (রা)-কে এও বলেছিলেনঃ আমি জানি, তোমাদের নবী সত্য নবী। ইনিই সেই নবী আমরা যাঁর অপেক্ষায় ছিলাম এবং যাঁর বর্ণনা আমাদের কিতাবেও বিদ্যমান। রোমানরা আমাকে জানে মেরে ফেলবে বলেই আমার যা ভয়। জীবনের ভয় যদি আমার না থাকত, তবে অবশ্যই আমি তাঁর অনু-সরণ করতাম। এখন এটাই সমীচীন যে, তুমি দাগাতির আসকাফের নিকট যাও এবং তার নিকট তোমাদের নবী সম্পর্কে সব কিছু খুলে বল।

দাহিয়্যা কালবী (রা) দাগাতিরের নিকট গেলেন এবং তাঁকে সকল কিছু বললেন। দাগাতির গির্জায় সমবেত রোমানদের নিকট আঁ-হযরত (সা)-এর প্রেরিত চিঠির বর্ণনা দেন। তিনি আঁ-হযরত (সা)-এর রসূল হওয়া সম্পর্কে উক্তি করার সাথে সাথে তারা তাঁর উপর চড়াও হয়ে তাঁকে সেখানেই শহীদ করে দেয়।

এই ঘটনার পর দাহিয্যা (রা) হেরাক্লিয়াসের নিকট আগমন করলে তিনি বলেনঃ আমি যা ভয় করেছিলাম অবশেষে তাই ঘটল। রোমানদের মনে দাগাতিরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল অত্যধিক। তারা যখন তাঁর মুখে রসূল (সা)-এর প্রশংসা শুনতেই তাঁকে হত্যা করেছে, তখন আমার পরিণতিও তদ্রূপই হবে। অতএব আমি মজবুর ও লাচার। দাহিয়্যা রোম থেকে ফিরে আসেন।

৬. বনী আসাদ বিন খুয়ায়মার শুজা' (রা) ইব্‌ন ওয়াহহাবকে মুনযির বিন আল-হারিছ বিন আবী শাম্‌র আল-ফাসানী নামক দামিশকের শাসন-কর্তার নিকট স্বীয় চিঠিসহ পাঠান। মুনযির এই চিঠি পড়ামাত্র অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে এবং ইসলামের দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।

৭. জা'ফর (রা) ইব্‌ন আবী তালিব-এর নেতৃত্বে 'আমর (রা) ইব্‌ন উমায়্যা আল-দামরীকে অন্যান্য সাহাবা (রা)-র সঙ্গে স্বীয় পত্রসহ হাবশের বাদশাহ্ নাজ্জাশী আল-আসহামের নিকট পাঠান।* চিঠির ভাষ্য ছিল নিম্নরূপঃ

"বিস্‌মিল্লাহি'র-রাহ্‌মানি'র-রাহীমঃ এই পত্র আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ্ নাজ্জাশী আল-আসহাম-এর নামে প্রেরিত হচ্ছে। নিরাপদে থাকো; আমি তোমাদের সামনে আল্লাহ্ পাকের, যিনি তামাম সৃষ্টি জগতের শাসক, যিনি পাক ও পবিত্র, নিজে নিরাপদ এবং অপরকেও নিরাপত্তা প্রদানকারী শক্তিমান প্রভু, তাঁরই তা'রীফ করছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'ঈসা ইবন মারয়াম আল্লাহ্‌র রূহ এবং তাঁর কলেমা ছিলেন

* পত্র প্রেরণের এই ঘটনা মূতা যুদ্ধের পূর্বেকার। হযরত জা'ফর (রা) পূর্ব থেকেই হাবশে (আবিসিনিয়ায়) অবস্থান করছিলেন। সম্ভবত পত্রবাহক হযরত 'আমর (রা) রাজদরবারে উপস্থিত হবার পূর্বে হযরত জা'ফর (রা)-কে সঙ্গে নিয়েছিলেন। হযরত জা'ফর খায়বার অভিযানের সময় মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন এবং মূতার যুদ্ধে শহীদ হন।—অনুবাদক।

যিনি তাঁকে সতীসাধ্বী মারয়ামের পেটে সৃষ্টি করেন এবং 'ঈসা মারয়ামের পেটে গর্ভাকারে প্রকাশিত হন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে স্বীয় রূহ' ও ফুৎকার দ্বারা সেভাবে সৃষ্টি করেন যেভাবে তিনি আদম (আ)-কে আপন কুদরতী হস্ত দ্বারা পয়দা করেন এবং তাঁর ভেতর প্রাণের সঞ্চার করেন। আমি তোমাকে সেই আল্লাহ্র দিকে যিনি এক, যাঁর কোন শরীক নেই, দা'ওয়াত দিচ্ছি। তাঁর উপর ঈমান আনয়ন কর, তাঁর আনুগত্যে আমার সঙ্গী হও, আমার অনুসরণ কর এবং আমার রিসালতকে মেনে নাও। কেননা আমি আল্লাহ্র রসূল। আমার চাচাতো ভাই জা'ফর (রা)-কে অপরাপর মুসলমানের সঙ্গে পাঠালাম। যখন এরা তোমার নিকট পৌছুবে তাদেরকে বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ করবে এবং রাজত্বের অহমিকা ত্যাগ করবে। আমি তোমাকে এবং তোমার প্রজাবৃন্দকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি। আমি আল্লাহ্র পয়গাম তোমাকে আন্তরিকতার সাথে পৌঁছিয়েছি। আমার এই উপদেশকে কবুল কর। তার উপর শান্তি হোক যে হেদায়েতের আনুগত্যে অটল রয়েছে।"

নাজ্জাশী লিপি মোবারক পেয়ে এর জবাবে আঁ-হযরত (সা)-কে লিখেনঃ "বিসমিল্লাহি'র-রাহ'মানি'র-রাহী'ম; এই চিঠি নাজ্জাশী আল-আসহামের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর নামে প্রেরিত হচ্ছে। হে আল্লাহ্র নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং সেই আল্লাহ্র যিনি বিনা অংশীদারিত্বে এক এবং যিনি আমাকে ইসলামের হেদায়েত দান করেছেন। রহমত বর্ষিত হোক, আপনার উপর বরকত নাযিল হোক। হে আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ! আপনার প্রেরিত চিঠি আমি পেয়েছি। আপনি 'ঈসা (আ)-এর কথা যা উল্লেখ করেছেন, স্বয়ং তিনিও এর বেশী এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলেন নি এবং কিছু করেনও নি। আমি আপনার রিসালতের স্বীকৃতি দানকারী। আমি আপনার চাচাতো ভাই এবং তার সঙ্গী-সাথীদের আমার মেহমানরূপে গ্রহণ করেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্র রসূল এবং অন্যান্য রসূলগণেরও সত্যতা সমর্থনকারী। আমি আপনার চাচাতো ভাইয়ের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি। আমি আমার পুত্র আরহা বিন আল-আসহাম বিন আবজাফকে আপনার খেদমতে পাঠাচ্ছি। কেননা আমি শুধু আমার নফসের মালিক। আর আপনারও যদি এটাই অভিপ্রায় হয় যে, খোদ আমিও আপনার খেদমতে হাযির হই, তাহ'লে আমি

তার জন্যও তৈরী আছি। আপনার নির্দেশ সবই সত্য।—ওয়াসসালামু 'আলায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ্।"

৮. "বিসমিল্লাহি'র-রাহ'মানি'র-রাহী'মঃ এই চিঠি আল্লাহ্র রসূল মুহাম্মদ (সা)-এর পক্ষ থেকে পারস্যের সম্রাট কিসরা সমীপে প্রেরিত হচ্ছে। যে সত্যধর্মের আনুগত্য অবলম্বন করেছে তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক ; আর তার উপর, যে আল্লাহ্র ও তদীয় রসূল (সা)-এর উপর ঈমান এনেছে এবং এ কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ (সা) তাঁর রাসূল যাঁকে সমস্ত বিশ্ব-জগতের জন্য পাঠানো হয়েছে যেন তিনি তাদেরকে আখিরাত সম্পর্কে ভয় দেখাতে পারেন যারা জীবিত। ইসলাম কবুল কর, নিরাপদ হবে, আর যদি এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহ'লে সমস্ত অগ্নি-উপাসকদের গোনাহ্ও তোমারই উপর বর্তাবে।"

কিসরা আঁ-হযরত (সা)-এর এই চিঠি দেখামাত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। সে মুসলমান তো হয়ই নি বরং হুকুম দেয় যে, আঁ-হযরত (সা)-কে তার সামনে যেন হাযির করা হয়। এই হুকুমের পর বেশী দিন জীবিত থাকার সৌভাগ্য তার হয়নি। সে নিহত হয়।

কি শিক্ষা পেলাম

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর আঁ-হযরত (সা) কুরায়শদের নিরস্ত্র করে দিয়েছিলেন। অতএব প্রয়োজন ছিল প্রতিরক্ষা কৌশল মুতাবিক সে সব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখার যার বদৌলতে মদীনায় স্থায়ী শান্তি কায়েম হ'ত। অনন্তর আঁ-হযরত (সা) সে সব য়াহূদীকে মদীনার আশপাশ থেকে বের করে দেওয়া জরুরী মনে করেন যারা অকাট্যরূপে বিশ্বাসের অনুপযুক্ত প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর অনুভূতি খুবই সচেতন ছিল যে, য়াহূদীদের মদদ জোগাতে গাতফান অবশ্যই এগিয়ে আসবে। এজন্য তিনি এদের দু'জনকেই পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। এরপর পালাক্রমে উভয়কেই পরাভূত করেন। আর এভাবেই তাঁর ফৌজ বিরাট জীবন হানির হাত থেকে রক্ষা পেল এবং অভিযানও অল্পদিনে শেষ হয়ে গেল। তিনি দুই মিত্রকেই এভাবে আলাদা করেন যেভাবে দরজাকে চৌকাঠ থেকে খুলে ফেলা হয় এবং অংকুশগুলো ভেঙে বের করে ছুঁড়ে ফেলা হয়।

এ ব্যবস্থার জন্য তিনি ফৌজী গতিবিধি এভাবে প্রচ্ছন্ন রাখেন যে, উভয়েই নিজের স্থানে বসেই এই চিন্তা করতে থাকে যে, মুসলিম ফৌজের গতি এবার তাদেরই দিকে। অতর্কিত হামলার এটা সর্বোত্তম নমুনা। অতঃপর তিনি দুশমনের উপর সেই দিক দিয়ে হামলা করেন যে দিক দিয়ে আক্রান্ত হবার আদৌ আশংকা তারা করেনি। এ কারণে য়াহূদীদের বহুদিনের সাজান-গোছানো সামরিক প্রস্তুতি একটিমাত্র চালের কারণে একেবারেই মাটি হয়ে গেল।

এ ধরনের হামলার উদাহরণ আমরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পাই। ১৯৪০ ঈসায়ীতে জার্মান ফৌজ মার্শাল রড স্টেড-এর অধিনায়কত্বে ম্যাজিনিউ লাইনের বাম পার্শ্বে হামলা করে। মিত্রবাহিনী এই ধারণায় ছিল যে, জার্মান ১৯১৪ ঈসায়ী সনের আক্রমণের পুনরাবৃত্তি করছে মাত্র। এজন্য তারা সাহায্যকারী বাহিনীর সহায়তা প্রদানের জন্য একটি বিরাট বাহিনী বেলজিয়াম পাঠায়। কিন্তু জার্মানীর ট্যাংক ফৌজ মিত্রবাহিনীকে এভাবে দু'অংশে বিভক্ত করে দেয় যে, উভয় অংশই বেকার হয়ে পড়ে। এভাবে বিভক্ত করে দেবার পর জার্মানরা প্রথমে একটি অংশকে ডানকার্কের রাস্তায় মেরে তাড়ায়। অপর অংশকে ম্যাজিনিউ লাইনের পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রমণ করে পরাভূত করে। ম্যাজিনিউ লাইন সামনের দিক থেকে হামলাকারীর জন্য অত্যন্ত মযবুত ও বিপজ্জনক প্রতিবন্ধক ছিল। তার মযবুতী ও দৃঢ়তার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না, কিন্তু পশ্চাদ্দিকের অংশের প্রতিরক্ষার কোন কার্যকর ইন্তেজাম ছিল না। এই হামলা এমন ছিল যে, প্রথমে তার দরোজা খোলে। অতঃপর অংকুশের উপর থেকে উপড়িয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এখানে এ কথাটাই প্রণিধানযোগ্য যে, তিনি খায়বারের বিদ্রোহী য়াহূদীদেরকে বনী হারিছার য়াহূদীদের সাহায্যে বহিষ্কার করেন এবং এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ বনী হারিছাকে খায়বারের বাগান ও আবাদযোগ্য জমি কর্ষণের ও চাষের জন্য দেন—এই শর্তে যে, যখন মুসলমানদের বাগান ও জমিজমার দরকার হবে তাদের থেকে ফেরত নেওয়া হবে।

যা-ই হোক, য়াহূদীদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে তিনি তাদেরকে অত্যন্ত কমযোর ও দুর্বল করে দেন।

এখন সেই বর্ণনার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা যাচ্ছে যেখানে বলা হয়েছিল যে, আঁ-হযরত (সা) স্বীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাকে এভাবে বিন্যস্ত করেন যে, সেখানে মদীনাকে কেন্দ্র এবং মক্কাকে বৃত্তের অর্ধেক ব্যাস বানিয়ে তার ভেতরকার সমস্ত বিরোধী শক্তিকে একের পর এক পর্যুদস্ত করেন। তলোয়ার যদি একদিকে থেকে থাকে তাহ'লে অপর দিকে ছিল তার ঢাল। হিজরতের দ্বিতীয় বছর থেকে বরাবর এই পরিকল্পনার উপর 'আমল চলতে থাকে। খায়বার যুদ্ধে তাঁর তলোয়ার গাতফান এবং খায়বারের য়াহূদী কবিলাগুলোর দিকে ধরা ছিল আর ঢাল ছিল অন্য দিকে। বিস্তারিত বর্ণনা আগামী কোন এক অধ্যায়ে পেশ করা যাবে।

মক্কা বিজয়

আরবের দু'টো কবিলা বনূ বকর ও বনী খুযা'আর ভেতর প্রাচীন কাল থেকেই শত্রুতা চলে আসছিল। তাদের মধ্য থেকে যখনই কোন একজন অন্যের উপর চড়াও হবার মওকা পেত অমনি হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠত। যে সময় ইসলামের প্রদীপ্ত সূর্য আরব ভাগ্যাকাশে উদিত হ'ল সে সময় প্রায় সব কবিলাই একে অপরের বিরুদ্ধে জোর তৎপর ছিল। কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে সাধারণ শত্রুতা সাময়িকভাবে হ'লেও তাদের ভেতর একটা ঐক্য সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং তারা সবাই মিলে একটি কমন ফ্রন্ট গঠনের কোশেশ করেছিল। কিন্তু এই প্রয়াস বেশী দিন সফলতার মুখ রক্ষা করতে পারে নি। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় বনূ বকর কুরায়শদের সঙ্গে মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হ'লে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী বনূ খুযা'আ মুসলমানদের সঙ্গে বিশ্বস্ততার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় এবং এভাবেই প্রতিদ্বন্দ্বী কবিলা প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মিত্রে পরিণত হয়। এই অঙ্গীকার ও চুক্তিবদ্ধ হবার কারণে পুরনো শত্রুতা পুনরায় জীবন্ত হয়ে ওঠে এবং বনী বকর তাদের স্বগোত্র আসওয়াদ বিন রিমনের পুত্রদের হত্যার প্রতিশোধ নেবার—যে বনূ খুযা'আর হাতে নিহত হয়েছিল—উত্তম সুযোগ মনে করে। এতদুদ্দেশ্যে তারা তাদের মিত্র কবিলা বনী আল-ওয়ায়লের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

বনী আল-ওয়ায়লের সরদার নওফেল বিন মু'আবিয়া আল-ওয়ায়লী বনী খুযা'আর উপর এমনি সময়ে রাত্রিকালীন হামলা পরিচালনা করে

যখন তারা নিজেদের একটি রাস্তার উপর অবস্থান করছিল। বনী খুযা'আ এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। তখন সেখানে বনী বকর খোলাখুলিভাবে বনী আল-ওয়ায়লের সাহায্যার্থে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করে। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হতে থাকলে কুরায়শরাও প্রচ্ছন্নভাবে বনী আল-ওয়ায়ল ও বনী বকরের সাহায্যে পৌঁছে যায় এবং হাতিয়ার ও সেপাই-সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতে থাকে। বনী খুযা'আ যেহেতু মক্কার নিকটবর্তী ছিল, অতএব তারা পালিয়ে হারাম শরীফে আশ্রয় নেয় এবং বনী কা'বকে সাহায্যের জন্য আবেদন জানায়। বনী কা'বের 'আমর বিন সালেম আল-খুযা'ঈ ফরিয়াদ নিয়ে আঁ-হযরত (সা)-এর দরবারে মদীনায় আগমন করে এবং বনী বকর ও কুরায়শদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অভিযোগ করে। আঁ-হযরত (সা) আমর বিন সালেমকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর বুদায়ল বিন ওয়ারাকা ও খুযা'আ গোত্রের কতিপয় প্রতিনিধিও খেদমত মুবারকে হাযির হয় এবং রাত্রিকালীন অতর্কিত আক্রমণের সমস্ত ঘটনা শোনায়। আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে সান্ত্বনা দেন এবং সাহাবা (রা)-দেরকে বলেন যে, আবু সুফিয়ান তার পক্ষ থেকে সাফাই গাইবার জন্য এবং সন্ধি চুক্তি অধিকতর দৃঢ় করবার জন্য সত্বর আগমন করছে। প্রকৃত ঘটনা এই যে, আবু সুফিয়ান এতদুদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বহির্গত হয়ে গিয়েছিলেন।

অনন্তর বুদায়ল বিন ওয়ারাকা এবং সঙ্গী-সাথীরা যখন মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'উসফান নামক স্থানে পৌঁছে তখন সেখানে তাদের আবু সুফিয়ানের সঙ্গে মোলাকাত হয়। তিনি কুরায়শদের তরফ থেকে সন্ধি চুক্তি সুদৃঢ় ও সময়সীমা বর্ধিত করার ব্যাপারে আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্য মদীনা যাচ্ছিলেন। যদিও আবু সুফিয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ সব লোক আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে আসছে তবুও তিনি জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা কোথা থেকে আসছে এবং কোথায় যাচ্ছে। বুদায়ল জবাব দেয় যে, তাদের স্বগোত্রীয় কিছু লোকের সঙ্গে তারা দেখা করতে গিয়েছিল। সমুদ্রোপকূলের ধারে উপত্যকায় তারা বসবাস করে। এরপর তিনি প্রশ্ন করেনঃ মুহাম্মদ (সা)-এর সঙ্গে দেখা করতে তো যাওনি? বুদায়ল এর 'না' সূচক জবাব দেয়।

আবু সুফিয়ান মনের দিক দিয়ে যেহেতু অপরাধী ছিলেন, সেজন্য তিনি উটনী পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে সেই জায়গায় গেলেন যেখানে বুদায়ল রাতের বেলায়

অবস্থান করেছিল। সেখানে উটের মল ভেঙে দেখলেন তার ভেতর খেজুরের আটি। ফলে তার আরও সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মায় যে, তারা মদীনায়ই গিয়েছিল এবং আঁ-হযরত (সা)-কে সকল অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে এসেছে।

আবু সুফিয়ান মদীনায় পৌছে নিজ কন্যা আঁ-হযরত (সা)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রা)-এর ঘরে যান। কিন্তু মেয়ে যখন মুশরিক পিতার প্রতি এতটুকু ভ্রূক্ষেপও করল না, তখন তিনি উঠে আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে গিয়ে হাযির হন এবং তার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন। আঁ-হযরত (সা)-ও যখন তার কথার কোন জবাব দিলেন না, তখন তিনি উঠে গিয়ে প্রথমে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আসেন এবং তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। এরপর হযরত ওমর ফারূক (রা)-এর নিকট পৌছেন। কিন্তু তাঁরা উভয়েই নিজেদের অপারগতার কথা প্রকাশ করেন। সেখান থেকে নিরাশ হয়ে তিনি হযরত 'আলী (রা)-র কাছে যান এবং আত্মীয়তা ও বিগত দিনের সম্পর্কের দোহাই পেড়ে সাহায্যের আবেদন জানান। কিন্তু হযরত 'আলী (রা)-ও কোন সহযোগিতা প্রদান করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। নিরুপায় হয়ে আবু সুফিয়ান হযরত ফাতিমা যোহরা (রা)-র নিকট যান এবং তাঁর সন্তানের দোহাই দিয়ে নিজের জন্য নিরাপত্তা ভিক্ষা করেন। কিন্তু ওখান থেকেও যখন অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই মিলল না তখন তিনি ঘাবড়ে গিয়ে পুনরায় হযরত 'আলী (রা)-র নিকট নিরাপত্তা প্রার্থী হন। হযরত 'আলী (রা) বললেনঃ আপনি বনী কিনানার রঈস। আপনার জন্য তো এটাই সমীচীন যে, আপনি মসজিদে গিয়ে প্রকাশ্য সভায় মদীনাবাসীদের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন এবং তার পর-পরই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। আবু সুফিয়ান পরামর্শ মাফিক তাই করলেন এবং উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তক্ষুণি মক্কার পথ ধরলেন।

তিনি যখন কুরায়শদের নিকট পৌছলেন এবং দৌত্যগিরির সম্পর্কিত সব কিছু বিবৃত করলেন, তখন সবাই বললঃ 'আলী (রা) আপনার সঙ্গে মস্করা করেছেন এবং আপনাকে সকলেই প্রত্যাখ্যান করেছে।

আবু সুফিয়ানের প্রত্যাবর্তনের পর আঁ-হযরত (সা) সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন এবং মুসলমানদের বললেনঃ আমরা মক্কা যাচ্ছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও তাকীদ করলেন যে, ইসলামী ফৌজের

গতিবিধি ও চলাফেরা সম্পর্কে দুশমন যেন আদৌ কিছু জানতে না পারে এবং গুপ্তচর সম্পর্কে যেন পুরোপুরি সজাগ ও সতর্ক থাকা হয়।

হাতিব ইব্ন আবী বালতা'আর আত্মীয়-স্বজন মক্কায় ছিল। হাতিব তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে চিন্তা করে কুরায়শদেরকে আঁ-হযরত (সা)-এর অভিপ্রায় সম্পর্কে অবহিত করবার জন্য একটি চিঠি লিখেন এবং মারিনা কবিলার একজন মহিলার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেন। মহিলাটি চুলের উপর দিয়ে খোপা বেঁধে তার ভেতর চিঠি লুকিয়ে নেয় যেন সহজে তা কারও চোখে না পড়ে।

আঁ-হযরত (সা) হযরত 'আলী (রা) ও যুবায়র (রা) ইব্ন আল-'আওয়ামকে ডেকে বললেনঃ হাতিব আমাদের প্রস্তুতির খবর মক্কাবাসীদের জানানোর জন্য একটি চিঠিসহ এক মহিলাকে পাঠিয়েছে। তোমরা তাকে পাকড়াও করে তার থেকে উক্ত চিঠি এক্ষুণি নিয়ে এস। মহিলাটি হালিফা-ই-ইব্ন আবী আহমাদ নামক স্থানে তাদের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু চিঠি অনাবিষ্কৃতই থেকে যায়। হযরত 'আলী (রা) তাকে কড়া ভীতি প্রদর্শন করলে সে তক্ষুণি মাথার উপরিভাগের খোপাকৃত চুলের ভেতর থেকে উল্লিখিত চিঠি বের করে দেয়। এভাবেই ইসলামী ফৌজের গতিবিধি সম্পর্কে কোন খবর আর মক্কায় পৌঁছুতে পারে নি।

মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে আঁ-হযরত (সা) কাদীদ নামক স্থানে যাত্রা বিরতি দেন। 'উসফান ও আম্‌জ-এর মধ্যবর্তী এলাকায় কাদীদ অবস্থিত। এখান থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি মার আল-জাহরান পৌঁছেন। সঙ্গে দশ সহস্র সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী। মার আল-জাহরানে বনী সুলায়ম এবং বনী মারিনা গোত্রের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল মুসলমান; তারাও আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গী হয়।

যদিও তিনি সৈন্য-সামন্ত ও লোক-লশকরসহ মার আল-জাহরানে অবস্থান করছিলেন, তথাপি মক্কার কুরায়শ ও অন্য কবিলাগুলো এ ব্যাপারে আদৌ জানতে পারেনি—আঁ-হযরত (সা)-এর অভিপ্রায় কোন দিকে। কেউ আবার গুজব ছড়ায় যে, তিনি হাওয়াযিনের দিকে যাচ্ছেন। কেউ কেউ বলে যে, বনী ছাকীফকে শায়েস্তা করবার জন্য যাচ্ছেন। 'আব্বাস ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব আঁ-হযরত (সা)-এর মদীনা থেকে রওয়ানা হবার খবর

পেয়ে এই নিয়তে মক্কা থেকে বহির্গত হন যে, আঁ-হযরত (সা)-এর গতিবিধি সম্পর্কে তিনি তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং যথাসম্ভব কুরায়শদের উপর হামলা করা থেকে তাঁকে বিরত রাখতে কোশেশ করবেন যেন তারা একেবারে ধ্বংস ও বরবাদ না হয়ে যায়। তিনি মক্কা থেকে আরাক পৌছেন। রাতের বেলায় তিনি আঁ-হযরত (সা)-এর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, এমনি সময় তাঁর কানে আবু সুফিয়ান বিন হারব, হাকীম বিন হিযাম এবং বুদায়ল বিন ওয়ারাকা আল-খুযা'ঈর আওয়াজ আসে। তারাও আঁ-হযরত (সা)-এর গতিবিধি সম্পর্কে জানার জন্য মক্কা থেকে বের হয়েছিল। তারা সবাই যখন মিলিত হয়ে অগ্রসর হ'ল তখন বহু দূর থেকে তারা কিছু চুলো জ্বলতে দেখতে পেল। এ দৃশ্যে বুদায়ল আবু সুফিয়ানকে বলল ঃ এসব চুলো তো বনী খুযা'আর মনে হচ্ছে। কিন্তু আবু সুফিয়ান বললেন ঃ কখখনো নয়, এটা ভুল। 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ আমার ধারণায় ওগুলো মুহাম্মদ (সা)-এর সৈন্যবাহিনীর। আবু সুফিয়ান এত বড় বিরাট বাহিনীর আন্দায করে ঘাবড়ে যান এবং 'আব্বাসের (রা) সাহায্যপ্রার্থী হন। 'আব্বাস (রা) তাকে নিজের খচ্চরের পিঠে চড়িয়ে আঁ-হযরত (সা)-এর ক্যাম্পের দিকে নিয়ে চললেন যেন তিনি আবু সুফিয়ানকে নিরাপত্তা ও অভয়দান করতে পারেন। সময়টা ছিল রাত্রিকাল। মুজাহিদরা কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর চাচা 'আব্বাস (রা)-এর সাদা খচ্চর দেখে চিনে ফেলে এবং সামনে এগুতে অনুমতি প্রদান করে। আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে পৌছে 'আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করেন। তিনি অভয়বাণী মঞ্জুর করেন এবং পরের দিন আবু সুফিয়ানকে নিজের সঙ্গে আনবার জন্য বলে দেন। পরদিন 'আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে নিয়ে পুনরায় তাঁর খেদমতে হাযির হন। আবু সুফিয়ান আঁ-হযরত (সা)-এর সামনে এসে কালেমায়ে শাহাদত পড়েন এবং মুসলমান হন। এরপর আঁ-হযরত (সা) 'আব্বাস (রা)-কে বলেন যে, আবু সুফিয়ানকে এই উপত্যকার নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়ার উপর খাড়া করে দিন যেন সে ইসলামী ফৌজকে ভালভাবে দেখতে পারে। মুসলিম ফৌজ মার্চ শুরু করে। বিভিন্ন কবিলার বাহিনী সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার সময় আবু সুফিয়ান 'আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করতেন ঃ এরা কারা। 'আব্বাস (রা) বলতেন ঃ এরা অমুক অমুক। প্রথমে বনী সুলায়ম-এর লশকর ছিল। এরপর বনূ আসলামের, তারপর জুহায়নার, এরপর আঁ-হযরত (সা)-এর মুজাহিদবৃন্দের (মুহাজির ও আনসার)

বিরাট আজীমুশশান ফৌজ দেখে আবু সুফিয়ান আঁ-হযরত (সা)-এর অনুমতিক্রমে দৌড়ে মক্কায় যান এবং চিৎকার করে নিজের লোকদের বলতে থাকেনঃ মুহাম্মদ (সা) বিরাট লোক-লশকর নিয়ে আসছেন। যারা মসজিদুল হারাম, আমার বাড়ি এবং নিজ নিজ বাড়িতে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে এবং যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে, তারাই হবে নিরাপদ ও অভয়প্রাপ্ত। মক্কাবাসী আবু সুফিয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে।

আঁ-হযরত (সা) মক্কায় প্রবেশের জন্য ফৌজকে বিভিন্ন অধিনায়কের অধীনে বিভক্ত করে প্রত্যেককেই তাদের নির্দিষ্ট দিক থেকে মক্কা প্রবেশের নির্দেশ প্রদান করেন। যুবায়র (রা)-কে মুহাজির ও আনসার অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করে মহানবী (সা) একটি পতাকা প্রদান করেন এবং হুকুম দেন যে, তিনি যেন এটাকে মক্কার উচ্চ অংশ জহূন-এ স্থাপন করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি নিজের জায়গায় অবস্থান করবেন।

খালিদ (রা)-কে কুদা'আ এবং বনী সুলায়ম ছাড়াও অন্যান্য মুসলিম কবিলা, যেমন আসলাম, গিফার, মুরায়না, জুহায়না প্রভৃতির অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং মক্কার নিম্নাংশ মকামে লায়ত দিয়ে প্রবেশ করার জন্য নির্দেশ দেন। এইদিকে কুরায়শরা বনূ বকরকে নিজেদের সহযোগী ও মদদগার হিসাবে মোতায়েন করেছিল এবং বনী বকরের সাহায্যের জন্য বনী হারিছ, বনী 'আব্দ মনাফকে নিজেদের ও হাবশী বাহিনীর সঙ্গে নিযুক্ত করেছিল।

একটি মযবুত বাহিনী যার ভেতর মুহাজির ও আনসার শামিল ছিলেন ---হযরত 'আলী (রা)-র অধীনে ছিল। অপর একটি বাহিনী গদার দিক থেকে মক্কা প্রবেশের জন্য নিযুক্ত করা হয়। খোদ রসূলে আকরাম (সা) 'আসাফির এলাকা দিয়ে প্রবেশ করেন। প্রবেশের পূর্বে তিনি সকল অধিনায়ককে নির্দেশ দান করেছিলেনঃ তোমাদের মুকাবিলায় কেউ নিজে এগিয়ে না আসলে তোমরা কারও সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে না। এর সাথে সাথে কিছু লোকের নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, তাদেরকে গ্রেফতার করবে। আর তারা যদি প্রতিরোধ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হয় তাহলে তাদের হত্যা করবে।

বনী বকর এবং হাবশীরা খালিদ (রা)-এর প্রবেশ পথে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে যার কারণে রক্তপাত ঘটে। কিন্তু তারা ভীষণ রকমে পর্যুদস্ত হয়। এ ছাড়া আর কোথাও লড়াই-ঝগড়া হয়নি। ফলে মুসলিম ফৌজ কোনরূপ বাঁধা-প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নির্ধারিত দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে। আঁ-হযরত (সা) মক্কায় তশরীফ আনেন এবং প্রকাশ্য ঘোষণা দেন যে, মক্কাবাসীরা আযাদ। কুরায়শদের কিছু লোক—যাদের ভেতর 'ইকরামা বিন আবু জেহেল অন্যতম—মক্কা থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু বিজয়ের পর অভয় বাণী পেয়ে সে ফিরে আসে

কি শিক্ষা পেলাম

মক্কা বিজয়ের কালে আঁ-হযরত (সা) যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা আজ-কালও করা হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার Indirect approach-এর প্রতিরক্ষা নীতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। হিটলার প্রথমে প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে শত্রু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতার আবেগ-উদ্দীপনাকে খতম করে দিতেন এবং এভাবে নিজেদের হামলার সাফল্যকে নিশ্চিত বানিয়ে নিতেন। এরই সঙ্গে শত্রুর শক্তিশালী সহযোগীকে তার থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন করে দিতেন যেন তারা তার থেকে সরাসরি ফায়দা না উঠাতে পারে, আর তাহলে দুশমনের শক্তি ভেঙে পড়বে। অতঃপর তার রাষ্ট্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করা হ'ত যার ফলে তাদের অবশিষ্ট ছিটে-ফোঁটা মনোবলটুকু দুর্বল হয়ে যেত। তিনি ১৯৩৮ ঈসায়ীতে এই সব নীতি অনুসরণ করেই জার্মানীকে বিরাট ও বিশালতর জার্মানীতে পরিণত করেছিলেন।

আঁ-হযরত (সা) আজ থেকে সাড়ে তের শত বছর আগে এই প্রতিরক্ষা স্ট্র্যাটেজী এমনভাবে কার্যকর করেন যে, বুদ্ধি খেই হারিয়ে ফেলে। তিনি প্রথমে কুরায়শদেরকে যুদ্ধের ময়দানে পরাজিত করেন। অতঃপর কুরায়শদের সহযোগী শক্তিগুলোকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে তাদের অবশিষ্ট মর্যাদা ও প্রভাবটুকুও খতম করে দেন। এরপর মক্কা বিজয় পাকা ফলের ন্যায়ই হয়ে রইল যা সামান্য ঝাকুনিতেই বোটা থেকে খসে টস করে এসে কোলের উপর পড়ল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কুরায়শদেরকে তিনি ধ্বংস করেন নি। তাদেরকে তিনি হেয় ও অবমানিত করেন নি, বরং মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতিরেকে সবাইকেই তিনি আযাদ করে দেন। না কারো জীবন ও সম্মানের উপর তিনি আঁচড় কেটেছেন, না তিনি কারো সম্পদ-হানি ঘটিয়েছেন। আর এ সবই ছিল সংস্কার ও গঠন—ধ্বংস

ও প্রতিশোধ গ্রহণ নয়। তিনি তাদেরকে মক্কার মুহাফিজ রাখতে চেয়েছিলেন এবং তাদের দিয়ে অন্য কাজ করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে যদি এমত পরিমাণ অবনমিত করা হ'ত যে, ইসলামী সমাজ জীবনের উপর বোঝাস্বরূপ হ'ত তাহলে এ বিজয় রহমতস্বরূপ হবার পরিবর্তে মুসীবতরূপে দেখা দিত। কিন্তু তিনি এমনভাবে কাজ করলেন যে, সাপও মরল, অথচ লাঠিও ভাঙল না।

শত্রুকে দুর্বল ও কমযোর করবার তিনটি পদ্ধতি রয়েছেঃ

ক. বৈষয়িক তথা বস্তুগত দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করে তার মনোবল অবনমিত করা।

খ. নৈতিক দিক দিয়ে পরাজিত করা।

গ. মানসিক দিক দিয়ে পর্যুদস্ত করা।

উল্লিখিত তিনটির মধ্যে সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল বৈষয়িক ক্ষতি। এই দুর্বলতাকে হয়তো দুশমন স্বয়ং মওকা পেতেই পূরণ করে নেয় অথবা তার মিত্ররা নিজেদের স্বার্থেই তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাচিয়ে নেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়ে মিত্রশক্তির সমরোপকরণ ও মারণাস্ত্রের উপর বিরাট বিপর্যয় নেমে আসে। কিন্তু এর কিছু অংশ স্বয়ং বৃটিশ পূরণ করে দেয়, আর কিছুটা আমেরিকার সাহায্যে পূরণ হয়ে যায়। ফ্রান্স সরকারের অবশিষ্ট প্রতিনিধিদেরকে সমগ্র মিত্রশক্তি মিলিত হয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। ঠিক এমনি জার্মানীর আক্রমণে রুশ একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৪১ সালে বৃটিশ ও আমেরিকার সাহায্যে এই ক্ষতির একটা বিরাট পরিমাণই পূরণ হয়ে যায় এবং তারা জার্মানদেরকে রুশ ভূখণ্ডের বাইরে তাড়িয়ে দিতে কামিয়াব হয়।

আর্থিক তথা বৈষয়িক পরাজয়ের মুকাবিলায় নৈতিক পরাজয় অনেক বেশী ভয়াবহ ও বিপজ্জনক হয়ে থাকে। নেপোলিয়ন একে একের মুকাবিলায় তিনগুণ বেশী মারাত্মক বলেছেন। আর্থিক ও বস্তুগত ক্ষতি সত্বর অথবা বিলম্বে পূরণ হতে পারে; কিন্তু নৈতিক পরাজয়ের ক্ষতিপূরণ অসম্ভব ব্যাপার। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪০ সালের ফ্রান্সের কথাই ধরুন না কেন? নৈতিক অবনতির কারণে ফ্রান্স ১৯৪০ সালে হাতিয়ার সমর্পণ করেছিল। কিন্তু কিছু লোক যাদের ভেতর মিত্র রাষ্ট্রগুলোর কাজ হাসিলের

মাধ্যম—উদাহরণত, রাষ্ট্রীয় প্রতিরোধ সৃষ্টিকারীদের সংগঠন Resistance movement এবং জানবায ফৌজ কৃতিত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল দায়িত্ব পালন করে ফ্রান্সের মরা গাঙে জোয়ার সৃষ্টি করে। ফলে দুনিয়ার বুকে তাদের নাম-নিশানা বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায় অর্থাৎ ফরাসীদের নৈতিক পরাজয়ের চিহ্ন পুরোপুরিভাবে ফুটে ওঠেনি। অতএব তারা কোন না কোনভাবে বেঁচে ওঠে। কিন্তু মানসিক পরাজয় সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক ও ভয়াবহ হয়ে থাকে। মানসিক পরাজয় যখন আসন গেড়ে বসে তখন জীবনের আর কোন স্পন্দনই অবশিষ্ট থাকে না।

আঁ-হযরত (সা) দুশমনকে পয়লা বদর প্রান্তরে আর্থিক দিক দিয়ে পরাজিত করেন। অতঃপর খন্দক যুদ্ধে নৈতিকভাবে পর্যুদস্ত করেন এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মানসিক দিক দিয়ে পরাজয় ঘটিয়ে বিলকুল মজবুর ও অসহায় করে ছাড়েন। হুদায়বিয়ার সন্ধি কাফিরদেরকে মুসলমানদের সঙ্গে মেলামেশা করতে, ইসলাম, তার প্রতিষ্ঠাতা ও মুসলমানদের বুঝতে, তাদের চরিত্র ও কার্যকলাপ জানতে এবং ভালমন্দ যাচাই-বাছাই করার মওকা দেয়। আর এর ফলে মক্কা বিজয় সহজ হয়ে যায়।

এ যুগে রাশিয়া মানসিক পরাজয়ের প্রতিরক্ষা নীতিকে নেহায়েত কার্যকরভাবে ব্যবহার করছে।

কতক লোকের মনে এ প্রশ্ন উদয় হতে পারে যে, আঁ-হযরত (সা) যখন মক্কা বিজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন তখন তিনি এত বড় যবরদস্ত আকারের সমর প্রস্তুতি কেন গ্রহণ করলেন? এত বড় লশকর নিয়ে কেন গেলেন? এর জবাব এই যে, আঁ-হযরত (সা) মক্কাবাসীদের কম থেকে কমতর ক্ষতি চেয়েছিলেন। তিনি যদি কমতর প্রস্তুতি ও স্বল্প সংখ্যক ফৌজ সঙ্গে নিতেন তখন কুরায়শরা যুদ্ধ না করে ছাড়ত না এবং এর ফলে এই যুদ্ধে জীবন ও সম্পদ দু'টোরই হানি ঘটত এবং এরপরই কেবল তাদের প্রতিরোধ খতম হ'ত। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর বিরাট বাহিনী দেখে কুরায়শ ও তার মিত্রদের শেষ আশা-ভরসাটুকুও মিইয়ে যায় এবং মানসিক পরাজয় এমনভাবে তাদের উপর চেপে বসে যে, মুকাবিলার হিম্মতটুকুও তারা হারিয়ে ফেলে, অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের সময় আঁ-হযরত (সা)-এর অবস্থান যেন সেই সার্জনের মত ছিল যিনি অপারেশনের পূর্বে স্থির নিশ্চিত হয়ে নেন যে, যন্ত্রপাতি সব ঠিক আছে, অপারেশনের মওকাও ঠিকঠাক

এবং রোগীও অপারেশনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত, আর এমনি ক্ষেত্রেই রোগীকে সাধারণত বেহুশ করার ঔষধ শুঁকিয়ে দেওয়া হয়। মক্কা বিজয়ে আঁ-হযরত (সা) ছিলেন সার্জন, মক্কাবাসীরা রোগী আর ইসলামী ফৌজ-এর প্লাটুনগুলো ছিল বেহুশকারী দাওয়াই যারা রোগী অর্থাৎ মক্কাবাসীদেরকে অবশ ও বিবশ বানিয়ে দিয়েছিল।

যোগ্য জেনারেলই আপন ফৌজের কম থেকে কমতর ক্ষতি করে দুশমনের উপর অধিকতর গভীর প্রভাব কায়েম করতে পারেন। মক্কা বিজয় বিশ্ব ইতিহাসে সৈনিকসুলভ যোগ্যতার মহত্তম নমুনা, আর আঁ-হযরত (সা)-কে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও সর্বাধিক যোগ্য জেনারেল হিসাবে প্রতিভাত করে তোলে।

মক্কা বিজয়ের পর

মক্কা বিজয়ের পরও হুযূর পাক (সা) আগের মতই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলোর ভেতর কিছু অভিযান আগেকার অভিযানগুলো থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তার ভেতর তাঁর হুকুমে কতক গোত্রীয় এলাকাকে মূর্তি ও মূর্তিঘরের অপবিত্রতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা হয়।

অনন্তর তিনি খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা)-কে নাখলা রওয়ানা করেন। সেখানে বনী সুলায়মান-এর একটি শাখা বনী শায়বান বসবাস করত। সেখানকার লোকদের দেবতা ছিল 'উয্যা। খালিদ (রা) মূর্তি ভেঙে ফেলেন এবং মূর্তিঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন।

'আমর (রা) ইবন আল-'আসকে রিবাত পাঠানো হয়। সেখানকার মূর্তিঘরে ছিল বুদায়লের মূর্তি। আঁ-হযরত (সা)-এর নির্দেশে তিনি সেটাকে ভেঙে-চুরে খতম করে দেন। এভাবেই আওস ও খাযরাজের মূর্তিগুলোকে সা'দ বিন যায়দ আল-আশহা ভেঙে টুকরো টুকরো করেন।

হাওয়াযিন যুদ্ধ

মক্কা বিজয়ের পর আঁ-হযরত (সা) সেখানে অর্ধমাস কাল অতিবাহিত করার পরপরই বনী হাওয়াযিন ও বনী ছাকীফের সমর প্রস্তুতির সংবাদ

পান। এই কবিলা দু'টি যি'ল-হিজাযের উপত্যকায় বসবাস করত। যদিও হাওয়াযিনের কিছু কবিলা মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ে নামতে রাযী হয়নি, তবু তাদের একটা বিরাট বাহিনী হুনায়ন নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হয়। তারা তাদের বাল-বাচ্চা, নারী ও পশুপাল নিয়ে এসেছিল। যখন এরা আওতাস নামক স্থানে পৌঁছায় তখন অন্যান্য কবিলা যারা তখন পর্যন্ত হাওয়াযিন বাহিনীতে শামিল হয়নি—তাদের নিকট আসে। কবিলার মশহুর সমর-বিশেষজ্ঞ দুরায়দও তাদের সঙ্গে ছিল। বার্ধক্যের—কারণে সে উটের পিঠে হাওদায় চড়ে এসেছিল। সে আওতাস ময়দানকে অত্যন্ত পসন্দ করে। কেননা সেখানে অশ্বারোহী বাহিনীর চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ছিল এবং যমীন যেমন বেশী নরমও ছিল না, আবার বেশী শক্তও ছিল না, তেমনি ছিল না তা প্রস্তর-সংকুল। হাওয়াযিনের সরদারমণ্ডলীর নাম জানতে চেয়ে ও জেনে সে তেমন খুশী হয়নি। সে বলতে থাকে যে, এসব লোক তেমন অভিজ্ঞ নয়। এরই সঙ্গে সে তাদের সরদার মালিক বিন আসফ আল-নাসরীকে পরামর্শ দেয়, সে যেন মহিলা ও শিশুদেরকে কোন নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেয়। মালিক কিন্তু তার কথায় 'আমল দেয়নি এবং সমর-প্রস্তুতিতে সে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে প্রায় বারো হাযার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী ছিল। ঐতিহাসিক তাবারী তাঁর গ্রন্থে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেনঃ আমরা হুনায়ন উপত্যকার সামনে এসে তিহামার উপত্যকা শ্রেণীর মধ্যকার একটি গভীর উপত্যকায় অবতরণ করলাম। ঢালু এতখানি সোজা ছিল যে, বিনা আয়াসেই আমরা নিম্নে অবতরণ করলাম। সময়টা ছিল ভোর বেলা আর দুশমন আমাদের আগেই পৌঁছে গেছে উপত্যকার পেঁচালো নিম্ন-দেশে এবং মোড়ে মোড়ে আমাদের তাঁক করে বসেছিল। আমরা অসতর্ক অবস্থায় নেমেই চলেছিলাম নীচের দিকে, ঠিক এমনি অবস্থায় দুশমন ওঁৎ পেতে থাকা গোপন খাত থেকে বেরিয়ে অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করে। আমরা মুকাবিলা করতে পারলাম না। ফলে পালাতে থাকলাম। কারুর দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসতও ছিল না আমাদের। রসূল আকরাম (সা) ডানদিকে সরে গিয়ে থামলেন এবং সজোরে ডাক দিলেনঃ কোথায় যাচ্ছ তোমরা? আমার এখানে এস।

বিদ্রোহী ও দুষ্ট প্রকৃতির মক্কাবাসী---যারা আঁ-হযরত (সা)-এর সাথে ছিল, মুসলমানদের এভাবে পালাতে দেখে নিজেদের অন্তরের মালিন্য

প্রকাশ না করে আর থাকতে পারেনি। আবু সুফিয়ান বিন হারব বলতে থাকেনঃ এখন এরা সমুদ্র পর্যন্ত না গিয়ে আর থামবে না।

আঁ-হযরত (সা) ব্যক্তিগত বীরত্ব ও সাহসিকতা দ্বারা অবস্থা আয়ত্তে আনেন। তাঁর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হযরত 'আলী (রা) ও অন্য সাহাবাবৃন্দ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে হাতাহাতি লড়াই লড়তে থাকেন। তাঁদেরকে লড়তে দেখে অপরাপর মুসলমানও ক্রমান্বয়ে আপন আপন অধিনায়কের পাশে এসে জমায়েত হয়। কতিপয় মুসলিম মহিলাও—যারা এ বাহিনীর সঙ্গে ছিল, জীবনপণ করে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

জমায়েত যথেষ্ট হওয়ার সাথে সাথে মুসলমানেরা পালটা হামলা শুরু করে। তাতে শত্রুপক্ষের কতিপয় নামকরা সরদার নিহত হয়। বনূ ছাকীফের কয়েকজন পতাকাবাহী একের পর এক মারা যায়। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'উছমান বিন 'আবদুল্লাহ্। হাওয়াযিনের সম্মিলিত মিত্র বাহিনীর রণ-পতাকা ছিল কাবির বিন আল-আসওয়াদ বিন মাস'উদের হাতে। সে সেটাকে একটি ঝোঁপের ভেতর নিক্ষেপ করে নিজের সঙ্গী-সাথীসহ পালিয়ে যায়।

পাশা পরিবর্তন হতে দেখে বাকী বনূ হাওয়াযিনও পালাতে থাকে। তাদের একটি দল তায়েফের দিকে মোড় নেয়, আর অপর দল আওতাসের দিকে। আঁ-হযরত (সা) তায়েফের দিকে গমনরত দুশমনের পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য একটি অশ্বারোহী বাহিনী পাঠিয়ে দেন। তাদের সঙ্গে মালিক বিন 'আওফও ছিল। তাদের কিছু লোক নাখলার দিকে চলে যায়। মালিকের অশ্বারোহী বাহিনী তাদের পলায়নরত সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করার জন্য একটি ঘাটিতে মোর্চাবন্দী হয়ে বসে যায়। ফলে সে মুসলিম ফৌজের হাতে ধরা পড়েনি।

আঁ-হযরত (সা) হুনায়ন থেকে খোদ তায়েফে তশরীফ নেন। প্রথমে তিনি নাখলিয়্যাতু'ল-য়ামামা যান এবং সেখান থেকে কারূন ও য়ালীহ হয়ে লায়্যার বাহরাতু'র-রিসা আসেন। এখানে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করান এবং মালিক বিন 'আওফের ঘর-বাড়ী ধ্বসিয়ে দেন। এর পর তিনি সানিকার পথে নাজ্ব এবং নাজ্ব থেকে তায়েফে পৌঁছেন।

তায়েফ পৌঁছে তিনি বনী ছাকীফ অবরোধ করেন। পনের দিন পর্যন্ত এ অবরোধ অব্যাহত থাকে। এরপর তিনি য়ূহান্নার পথে সৈন্যবাহিনী

সমেত জা'রানা তশরীফ নেন। এখানেই হাওয়াযিন যুদ্ধবন্দীদের রাখা হয়েছিল। এখানে পৌঁছে হাওয়াযিনদের দরখাস্তক্রমে কতিপয় লোক ব্যতিরেকে অবশিষ্ট সবাইকে তিনি আযাদ করে দেন।

মালিক পালিয়ে তায়েফ গিয়েছিল। আঁ-হযরত (সা) যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন তখন সুযোগ পেয়ে সে রসূল করীম (সা)-এর খেদমতে হাযির হয় এবং ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়। এরপর পার্শ্ববর্তী অন্য কবিলাগুলোও আস্তে আস্তে ইসলাম কবূল করে যার ভেতর বনূ তামামা, ফাহম ও সালমা কবিলাও ছিল। আঁ-হযরত (সা) মালিককে তার নিজের কবিলা ব্যতিরেকে বাকী সব কবিলার 'আমিল (গভর্নর) নিযুক্ত করেন। বনূ ছাকীফ তখন পর্যন্ত ঈমান আনে নি। তারা ঘাবড়ে যায়। অতঃপর বনী আসাদও যখন মুসলমান হয়ে গেল তখন তারা আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে নিরাপত্তা ভিক্ষা করে। কিন্তু সাথে সাথে এই দরখাস্তও পেশ করে যে, তাদের দেবতা লাত-এর মূর্তিকে যেন তিন বছর পর্যন্ত ভাঙা না হয়। আঁ-হযরত (সা) তাদের দরখাস্ত না-মঞ্জুর করেন। তারা অবশেষে এটাকেও সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত ইসলাম কবূল করে। মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) নিজের হাতে তাদের দেবমূর্তি লাত-কে ভেঙে খতম করেন।

এসব অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল দুশমনের উপর শেষ কার্যকর আঘাত হানা। আঁ-হযরত (সা) এতে পুরোপুরি সফল হন এবং শত্রুর উপর নৈতিক ও মানসিক উভয় দিক দিয়েই বিজয় লাভ করেন।

তবুক যুদ্ধ

হুনায়ন যুদ্ধ থেকে অব্যাহিত পেয়ে আঁ-হযরত (সা) যি'ল-হাজ্জ থেকে রজব মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। সে বছরটা ছিল দুর্ভিক্ষের। গরমের দাবদাহও ছিল তেমনি প্রচণ্ড। লোকজন খেজুর বাগানে কতকটা ছায়া-শীতল স্থানে দিন কাটাচ্ছিল। মদীনাবাসী তাদের ফসলের উপর অত্যধিক মনোযোগী ছিল। ধন-সম্পদের দিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা ছিল দুর্বল। মোটের উপর শান্তি ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার তেমন কোন

অবকাশ ছিল না। এমনি মুহূর্তে আঁ-হযরত (সা) জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন।

রসূল আকরাম (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, যেখানেই তিনি জিহাদের জন্য গমন করতেন সে স্থানের নাম তিনি কখনো প্রকাশ করতেন না। কিন্তু এবার তিনি তবুক যাবার সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দিলেন। ঐতিহাসিকগণ এই পরিবর্তনের কতকগুলো কারণ নির্দেশ করেছেন। সেগুলো হ'ল নিম্নরূপঃ

ক. প্রতিপক্ষের সংখ্যা-শক্তি ছিল অনেক বেশী এবং তাকে বহু শক্তিশালী বলে অভিহিত করা হচ্ছিল।

খ. সফর ছিল দীর্ঘ আর মনযিল ছিল দুস্তর। সেজন্য যথেষ্ট ইন্তিজামের দরকার ছিল। নামের ঘোষণা দেওয়ায় প্রয়োজন মাফিক সবারই উপযোগী ইন্তিজামের সুযোগ মিলে যায়।

গ. দেশে ছিল দুর্ভিক্ষ। সেজন্য অন্য কোন স্থান থেকে রসদসম্ভার সংগ্রহ করার আশা-ভরসা ছিল খুবই কম। এজন্য দরকার ছিল সমস্ত জরুরী সামান যথাসম্ভব মদীনা থেকেই সংগ্রহ করা।

ঘ. রোম সাম্রাজ্যের দাপট, জাঁকজমক ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রভাব সাধারণ মানুষের অন্তর-রাজ্যে আসন গেড়ে ছিল। এজন্য মুজাহিদ বাহিনীকে বলে দেওয়ার দরকার ছিল যে, তাদেরকে কোন্ হুকূমত ও কোন্ ফৌজের সঙ্গে লড়তে হবে যেন কমযোর ও দুর্বল মনের লোক সঙ্গে গিয়ে বাহিনীর জন্য বোঝা হয়ে না দাঁড়ায়।

আঁ-হযরত (সা)-এর মূলনীতির উপর হিটলার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে কয়েক বার 'আমল করেন। হিটলার ছিলেন প্রতিরক্ষা কৌশল ও ইতিহাসের একজন সর্বোত্তম পর্যবেক্ষক। এর উপর তিনি বেশীর ভাগ 'আমল এজন্যই করেন নি, কারণ ফৌজী গতিবিধির গন্তব্যকে প্রতিটি অধিনায়কই গোপন ও প্রচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিপক্ষ গোয়েন্দাগিরি ও গুপ্তচরবৃত্তি ইত্যাদি মারফত একটা উল্লেখযোগ্য অংশের সন্ধান করে নেয়। অতএব বিপরীত কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের দরকার ছিল। বরং তিনি আঁ-হযরত (সা)-র প্রতিরক্ষা স্ট্রাটেজীর অঙ্গনের একটা ক্ষুদ্র টুকরো গ্রহণ করেছিলেন এবং এর থেকে তিনি অনেক ফায়দাও উঠিয়েছিলেন। শুরুতে যখন তিনি হামলার জায়গা সম্পর্কে ঘোষণা দিলেন তখন তাঁর

দুশমনেরা তা বিশ্বাস করতে পারেনি এবং তারা এটাই বুঝে নেয় যে, হিটলার উল্লিখিত জায়গা ব্যতিরেকে অপর কোন স্থানে হামলা করবে। আর এভাবেই তিনি তাদেরকে ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তির মাঝে নিক্ষেপে কামিয়াব হন। তবুক যুদ্ধের ঘটনাবলী সাক্ষী যে, আঁ-হযরত (সা)-এর ঘোষণাকেও বিরুদ্ধবাদীরা বিশ্বাস করতে পারেনি। আর সে কারণে তারা মুকাবিলার জন্য কোনরূপ প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনি। এমন কি এক কবিলার রঈস শিকার খেলতে গিয়েই গ্রেফতার হয়।

ঐতিহাসিকদের বর্ণিত কারণগুলো ছাড়াও আমাদের ধারণায় তার আরও একটি কারণ এও হতে পারে যে, মদীনায় মুনাফিকদের সংখ্যা ছিল বেশ। আঁ-হযরত (সা) তাদের দুষ্টামী ও ফেতনা-প্রিয়তার ব্যাপারটি অবহিত হতে চেয়েছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, যখন তিনি জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিলেন তখন তারা লোকদেরকে বলল: এত বড় প্রচণ্ড গরম এবং এত বিরাট দীর্ঘ সফর! মরণের মুখে গিয়ে পড়া ছাড়া আর কী? তোমরা যখন চলে যাবে তখন তোমাদের ফসল কে কাটবে? আর নিদারুণ এই দুর্ভিক্ষে ফসল ফেলে চলে যাওয়া সরাসরি ক্ষতির মুখোমুখি হওয়া ভিন্ন আর কী?

কতিপয় ব্যক্তি তাদের কথায় ভিজে গেল এবং তারা বাহানাবাজীর আশ্রয় নিল।

কিন্তু সকল অসুবিধা সত্ত্বেও আঁ-হযরত (সা) জিহাদের সফরের প্রস্তুতি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং সচ্ছল অবস্থার লোকদেরকে আল্লাহ্‌র রাহে গরীব মুসলমানদের সওয়ারী ও রাস্তার দরকারী খরচপত্র জুগিয়ে ছওয়াব ও পুরস্কারের হকদার হবার প্রেরণা জোগান।

অতঃপর তিনি হযরত 'আলী (রা) ইব্‌ন আবী তালিবকে তাঁর অনুপস্থিতিতে সমস্ত কাজকর্মের ইন্তিজাম করতে মদীনায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এরপর তিনি বিরাট লোক-লশ্‌কর নিয়ে রওয়ানা হন। মদীনা থেকে রওয়ানা হয়ে তিনি ছানিয়াতু'ল-বিদা' নামক স্থানে অবস্থান করেন। 'আবদুল্লাহ্ বিন উবায় সলূল যার অধীনে ছিল একটা বড় প্লাটুন---আঁ-হযরত (সা) থেকে আলাদা হয়ে জাব্বানা নামক স্থানে দাবাব পাহাড়ের নিকট ছাউনী ফেলে। তার সঙ্গে বনী খাযরাজ এবং বনী কায়নুকা'র কতিপয় সরদারও ছিল। এরা সবাই সেখানে পৌঁছে জিহাদে শরীক না হবার

ফয়সালা নেয় এবং আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট গিয়ে ওযরখাহী করে। তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। কিন্তু যেসব লোক মদীনা থেকেই বাহিনীর সঙ্গে শরীক হয়নি তারা দ্রুততার সঙ্গে মনযিল অতিক্রম করে নবী করীম (সা)-এর সৈন্যদলে গিয়ে শামিল হয়।

ছানিয়াতু'ল-বিদা' থেকে আঁ-হযরত (সা)-এর বাহিনী জরফ গমন করে। এরপর হুজুর-এ অবস্থান করে। মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে কেউ যদি পেছনে থেকে যেত এবং তিনি যদি তা জানতে পারতেন তাহলে বলতেন ঃ তাকে যেতে দাও। ঐ সমস্ত লোকের অংশ গ্রহণ যদি আমাদের জন্য ফলপ্রসূ ও উপকারী হয় তবে আল্লাহ্ পাক সত্বর তাদেরকে আমাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন। আর যদি এর বিপরীত হয় তাহলে আল্লাহ্ পাক আমাদের তাদের সম্পর্কে নিশ্চিত করে দিয়েছেন। প্রায় অনুরূপ বাক্য তিনি 'আবদুল্লাহ্ বিন উবায় সলূল এবং তার সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কে তাদের বিচ্ছিন্ন হবার সময় উচ্চারণ করেছিলেন। কয়েকবার এমনও হয় যে, যারা পেছনে পড়ে গিয়েছিল তারা পুনরায় আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হয়। উদাহরণ-স্বরূপ, আবুযর গিফারী (রা)-এর উট ক্লান্তির কারণে সামনে অগ্রসর হতে গড়িমসি করতে থাকায় এবং কোনক্রমেই আর এগুতে না চাওয়ায় আবুযর গিফারী (রা) সকল সামান উটের পিঠ থেকে নামিয়ে নিজের পিঠে উঠিয়ে নেন এবং মনযিলের পর মনযিল অতিক্রম করে রাতের বেলায় আঁ-হযরত (সা)-এর ছাউনীতে গিয়ে উপস্থিত হন।

এই পর্যায়ে আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা সমীচীন মনে করছি। ১৯৪০ ঈসায়ীতে যখন আমরা ডানকার্কের ঘটনার পর ইংলণ্ডে পৌঁছলাম তখন ১৯৪১ ঈসায়ী সন। মিত্র বাহিনী ফ্রান্সের উপর দ্বিতীয়-বার হামলার প্রস্তুতি শুরু করছে। ফ্রান্সে জার্মানদের হাতে পরাজয় বরণ করার বিভিন্ন কারণের মধ্যে এটাও একটা যে, অধিকাংশ ফৌজ যান্ত্রিক যুদ্ধকে ভুল বুঝেছিল এবং তারা এতখানি আরামপ্রিয় হয়ে গিয়েছিল যে, সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পতম দূরত্বকেও মোটরে আরোহণ ব্যতিরেকে অতিক্রম করত না। এই কারণে যুদ্ধে বেশ সংকটজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৪১ ঈসায়ীতে ওয়েল্‌স, এরপর স্কটল্যাণ্ডের বরফাবৃত পাহাড়ে ফরাসী ফৌজকে পাঠানো হতে থাকে। উদাহরণত, একটি ব্রিগেডকে যদি কৃত্রিম যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়েছে, তো সমস্ত পদাতিক বাহিনী তথা গোটা প্লাটুনকে প্রায় একশ' মাইলের

দূরত্ব পায়দল চলে চার কিংবা এর কম দিনে অতিক্রম করতে হয়েছে। এই সফরে যারা পেছনে পড়ে যেত তাদেরকে লরী কিংবা অন্য কোন যানবাহনে চড়িয়ে আর একত্র করা হ'ত না, বরং তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, তারা নিজেরাই হেঁটে নিকটস্থ কোন ছাউনী অথবা তার সম্মুখবর্তী কোন ছাউনীর ফৌজের সঙ্গে মিলিত হবে। প্রাথমিক সফরগুলোতে বহু সেপাই ক্লান্তি ও অবসন্নতায় ভেঙে পড়ে অবশেষে পেছনে পড়ে রইত। কিন্তু তারা যখন দেখল সমবেদনা জানাবার পরিবর্তে তাদের সাথীরা তাদের প্রতি তিরস্কার করছে, তখন তাদের সবার জড়তা ও অলসতা কেটে যায়। এরপর খুব কম সংখ্যক সেপাইকেই ভীরুতার দরুন পিছনে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আর এভাবেই তাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অদম্য মনোবলের সাহায্যে কর্ম সম্পাদনের ট্রেনিং প্রদান করা হয়।

আঁ-হযরত (সা)-ও এমনি দুর্গম ও কষ্টসাধ্য মনযিল অতিক্রম করে-ছিলেন। এই সফরে দুর্বল মন ও দুর্বল শরীরের লোকদের জন্য কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু এই পন্থায় মুজাহিদ বাহিনীর মধ্যে অটুট ইচ্ছাশক্তি ও সুদৃঢ় মনোবল আরো বেড়ে যায়।

আঁ-হযরত (সা)-ও তবুক পৌছুলে বনূ এলিয়ার রঈস ফুহানা বিন রুওয়াইয়া পবিত্র খেদমতে হাযির হয়ে জিয্য়া প্রদান করে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। এরপর জুরবা ও আযরাজবাসীও সন্ধি করে এবং লিখিতভাবে নিয়মিত জিয্য়া প্রদান মঞ্জুর করে নেয়।

আঁ-হযরত (সা) খালিদ (রা) ইব্ন ওয়ালীদকে বনূ কিন্দা গোত্রের সরদার আকীদর বিন 'আবদুল মালিকের মুকাবিলায় পাঠান এবং বলেনঃ যখন তুমি সেখানে পৌছুবে তখন আকীদরকে নিজ কেল্লা দূমার বাইরে নীল গাঈ শিকাররত দেখতে পাবে।

আকীদর ছিল খ্রীস্টান। চাঁদনী রাতে কেল্লার পাঁচিলের উপর সেদিন সে নিজ স্ত্রীর সঙ্গে পায়চারী করছিল। এমন সময় হঠাৎ তার স্ত্রী বলে উঠলঃ একটি নীল গাঈ কেল্লার ফটকের উপর শিং দিয়ে গুতা মারছে এবং নিজের মৃত্যুকে এভাবে সে নিজেই ডেকে আনছে। যাও, গিয়ে শিকার করো। আকীদর কিছু সংখ্যক সেপাই নিয়ে নীল গাঈ-এর পেছনে ধাওয়া করল।

আঁ-হযরত (সা) প্রতিটি জরুরী বিষয় ওহীর মাধ্যমে জেনে ফেলতেন, বিগত যুদ্ধের অধ্যায়গুলোতেও এর উল্লেখ করা হয়েছে। এরই সঙ্গে তাঁর গুপ্তচরগণও প্রতিটি বিষয়ে তাঁকে দরকারী তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করত। আর এই জ্ঞান ও প্রাপ্ত এই তথ্যের ভিত্তিতে তিনি সকল বিষয়েই পুরোপুরি ওয়াকিফহাল থাকতেন।

যে সময় আকীদর নীল গাঈ-এর পশ্চাতে কেল্লা থেকে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন খালিদ (রা) স্বীয় বাহিনীসহ কেল্লার দিকে আসছিলেন। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং খালিদ (রা) আকীদরকে গ্রেফতার করেন।

আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে পেশ হবার পর আকীদর জিযয়া প্রদানের শর্তে সন্ধিতে আবদ্ধ হয়। আঁ-হযরত (সা) অতঃপর তাকে তার কেল্লায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন।

তবুকে বারো-তেরো দিন অবস্থান করে তিনি মদীনা প্রত্যাবর্তন করেন। যে সব মুনাফিক রাস্তা থেকে ফিরে এসেছিল কিংবা বিনা কারণেই সঙ্গে যায়নি, তাদের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মুসলমানেরা তাদের সঙ্গে সালাম-কালামও বন্ধ করে দেয়। ফলে তারা খুব লজ্জিত হয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে মাফ করে দেন।

তবুক যুদ্ধের পর নিম্নোক্ত রঈস ও সরদার আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে পত্র পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণের আগ্রহের কথা ব্যক্ত করেঃ

১. হুমায়র বিন হারিছ বিন কালাল, ন'ঈম বিন কালাল এবং যি-রিহায়ন। তিনি ছিলেন হামাদানের শাসনকর্তা।

২. মু'আদিরের রঈস নু'মান।

৩. বনী বাকা'র প্রতিনিধি দল মদীনায় এসে ইসলাম কবূল করে।

৪. বনী হারারাহ্ দশজনের একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে তাদের ইসলাম কবূলের এ'লান করে।

৫. ছা'লাবা বিন মুনা'আজ ও সা'দ বিন হুযায়ম পবিত্র খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম কবূল করে এবং এরপর নিজেদের কবিলাকে মুসলমান করে।

আঁ-হযরত (সা) খালিদ (রা) ইব্‌ন ওয়ালীদকে চার শ' সৈন্যসহ বনী হারিছ বিন কা'বের মুকাবিলায় পাঠিয়ে দেন এবং নির্দেশ দেনঃ যদি এ

সমস্ত লোক তিন দিনের ভেতর ইসলাম কবূল করে তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না। তারা তিন দিনের ভেতরই ইসলাম কবূল করায় এ অভিযান কোনরূপ লড়াই-সংঘর্ষ ব্যতিরেকেই পুরোপুরিভাবে সাফল্যের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করে।

শাওয়াল মাসে বনূ সালামানের এবং রমযানে গাসসানের প্রতিনিধি আগমন করে এবং ইসলাম কবূলের ঘোষণা দেয়। অনুরূপ বনী আরযাদ-এর প্রতিনিধি দলও মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে।

সে রমযানেই আঁ-হযরত (সা) 'আলী (রা) ইব্ন আবী তালিবের নেতৃত্বে খালিদ (রা) ইব্ন ওয়ালীদকে য়ামন পাঠান। সেখানকার সকলেই হযরত 'আলী (রা)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। এ খবর শোনার পর আঁ-হযরত (সা) সেখানকার অধিবাসীদের নিরাপত্তা ও সুখ-শান্তির জন্য দু'আ করেন।

উক্ত বছরেই বনী রবীদের প্রতিনিধি দল 'আমর ইব্ন মা'দীর নেতৃত্বে হুযূর (সা)-এর পবিত্র খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম কবূল করে এবং সে সময়েই বনী হানীফার প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে ইসলামের ঘোষণা দেয়।

অতঃপর মাহারিব, ওয়ায়বিন, বাহারান ও সা'ঈদ-এর প্রতিনিধি দল আগমন করে এবং আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে সন্ধির দরখাস্ত করে।

বনী 'ঈস, হাল্লাফ, খুওলান, বনী যায়দ-এর কবিলাগুলোও ইসলাম কবূল করে। বনী তাঈ তাদের সরদার যায়দ আল-খালীলকে প্রতিনিধি দলের আমীর নিযুক্ত করে আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে প্রেরণ করে এবং ঈমান আনয়নের ঘোষণা প্রদান করে।

এ সময়ে ইসলাম আরবের দূর-দূরান্তে বিস্তার লাভ করে। আঁ-হযরত (সা) তামাম এলাকায় সাদকাহ্ আদায়কারী নিযুক্ত করেন।

কি শিক্ষা পেলাম

তবুক যুদ্ধ থেকে আরবের যে বিস্তীর্ণ এলাকা আঁ-হযরতের (সা) গতি-বিধি ও ইসলামের প্রভাববলয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার অর্ধেক ছিল মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত। এখন তিনি একে আরও বর্ধিত করলেন এবং বাড়িয়ে একদিকে ইরান এবং অন্য দিকে মিসর পর্যন্ত নিয়ে যান। তবুকের পার্শ্ববর্তী

কবিলাগুলো তখন পর্যন্ত ইসলামের দা'ওয়াত কবূল করেনি। এজন্য তিনি নিজেই সে এলাকায় গমন করেন এবং পূর্বেকার স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে মনযিলের নাম প্রকাশ করে ও প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তিনি এমনভাবে সেখানে তশরীফ নিলেন যে, কাফিররা তা বিশ্বাস করতে পারেনি। ফলে তারা কোনরূপ প্রতিরোধ সৃষ্টি করেনি কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কোনরূপ প্রস্তুতিও নেয়নি। ফল হ'ল এই যে, তবুকে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হ'ল এবং দুশমন জিয্‌য়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করতে বাধ্য হ'ল। অবশিষ্ট কবিলাগুলো ইসলাম কবূল করল এবং এভাবেই দূর-দূরান্তর পর্যন্ত ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়ল।

তবুকের যুদ্ধে কোনরূপ মুকাবিলা হয়নি, কোন প্রাণীর জীবন হানিও ঘটেনি। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, বিজয় ও সাফল্য দু'টোই হাসিল হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত রহস্য এই যে, তিনি দুশমনের বিরুদ্ধে সেই চাল চাললেন যার কারণে তারা তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে পুরোপুরি গাফিল রইল। এমন কি মদীনার মুনাফিকদের কাছে পর্যন্ত ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হয়নি। আর এভাবেই তিনি যখন তাদের ঘাড়ের উপর গিয়ে পৌঁছলেন তখন তাদের মজবুর ও অসহায় হওয়া ছাড়া আর কোন পথ রইল না।

সার-কথা

বিগত অধ্যায়গুলোতে আঁ-হযরত (সা)-এর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করে দেখা গেছে এই মূল্যায়নে তিনি প্রতিরক্ষা স্ট্র্যাটেজীর সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ, দুনিয়ার সফলতম সিপাহসালার, অদম্য মনোবলসম্পন্ন বিজয়ী এবং সর্বোত্তম কুশলী ব্যবস্থাপক হিসাবে দৃষ্টিগোচর হন।

হিজরতের পর তিনি সাতাশটি যুদ্ধ করেছেন এবং জিহাদের জন্য বিভিন্ন সময়ে ৩৫টি অভিযান বিভিন্ন স্থানে পঠিয়েছেন, আর এসবই করেছেন মাত্র দশ বছরের সংক্ষিপ্ততম সময়ে। এর ফল এই হ'ল যে, বিরোধিতা ও শত্রুতার বিষবৎ ঝঞ্ঝা ও তুফান খতম হয়ে গেল। বিদ্রোহী ও উদ্ধত স্বভাবের লোকগুলো বিনীত ও ভদ্র হ'ল, খুন-পিয়াসী ও জানের দুশমন জীবন উৎসর্গকারীতে পরিণত হ'ল। যেখানে কুফ্‌র ও শিরক-এর

রাজত্ব ছিল সেখানে ইসলামের কূজন উত্থিত হতে লাগল। পশুত্ব ও বর্বরতার জায়গা দখল করল মানবীয় মর্যাদা ও ভদ্রতা। তাহযীব ও তমদ্দুন তথা সভ্যতা ও সংস্কৃতি স্বভাবজাত সম্পদে পরিণত হ'ল। যেখানে বিশৃংখলা, বিভেদ আর অরাজকতা চলছিল সেখানে কায়েম হ'ল শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। জীবনের আপাদমস্তকই রহমতে পরিণত হয়ে গেল এবং আরববাসী পরিণত হ'ল দুনিয়াবাসীর হাদী ও শিক্ষকে।

অতঃপর আপনি জানেন কি যে, আঁ-হযরত (সা)-এর এই নজীরবিহীন সাফল্যের গতি কি ছিল? ক্রমান্বয়ে এবং ধারাবাহিকভাবে এই বিস্তৃতির অবস্থাটাই-বা কি ছিল? বিজয় কিরূপ দ্রুতগতিতে সংঘটিত হচ্ছিল? সকল যুদ্ধ ও অভিযানে জীবনহানির হারই-বা কি ছিল? দৈনিক ২৭৪ বর্গমাইল ব্যাপী দশ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই বিস্তৃতি চলে। মুসলমানদের জীবনহানি ছিল প্রতি মাসে একটি আর দুশমনের কম পক্ষে ১৫০ জন। দশ বছর যখন পূর্ণ হ'ল এবং আঁ-হযরত (সা)-এর মিশন পরিপূর্ণতার স্তরে উপনীত হ'ল তখন দশ লক্ষ বর্গমাইলের অধিক এলাকা তাঁর অধীনে এল আর লাখো মানুষ দৃঢ়চিত্তে তাঁর অনুগত ভৃত্যে পরিণত হ'ল। এত বড় বিজয়, এত বিরাট ও শানদার কৃতিত্ব, এত বড় বিস্তৃত সাম্রাজ্য দখল, অথচ মানুষের খুন ঝরল অতি সামান্যই! কোন যুদ্ধে পরাজয় নেই, কোথাও নেই পশ্চাদপসরণ, কোথাও অলসতা নেই, সব জায়গায় সামনে চলা আর অগ্রাভিযান, সর্বত্রই সাফল্য আর কামিয়াবী! অধিকন্তু দুশমনের মুকাবিলায় সংখ্যা-শক্তি হামেশাই কম এবং উপকরণ ও আসবাব সর্বদাই স্বল্পতর! অতঃপর বিজয়ের নিরবচ্ছিন্ন স্রোত এখানেই থামল না, নিঃশেষ হয়ে গেল না কিংবা তাঁর পবিত্র জীবনের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল না; বরং সামনে অগ্রসর হ'ল এবং দুনিয়া থেকে তাঁর বিদায় নিয়ে যাবার পরও তা অব্যাহত রইল! তাঁর জন্য জীবন উৎসর্গকারী ও তাঁর শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলল, এমন কি ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা এশিয়া, য়ূরোপ ও আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্রেই হ'ল বিস্তৃত।

দুনিয়ার ভেতর এমন কোন মানুষ আর একটিও কি গুজরে গেছেন যিনি এত স্বল্পতম সময়ের মধ্যে চিরদিনের তরে স্থায়ী ও নিত্য এমন কোন সুকীর্তি আনজাম দিতে পেরেছেন? আছেন কি এমন কোন সিপাহসালার,

কোন বিজয়ী রাষ্ট্রনীতিবিদ, কোন কুশলী ব্যবস্থাপক, কোন সংস্কারক যিনি সারা জীবনের চেষ্টা ও সাধনার ফল তাঁর দশ ভাগের এক ভাগও পেশ করতে পারেন?

বিজয়ী হবার, যুদ্ধ কৌশলে ও চাতুর্যের সঙ্গে কাজ করার এবং শান-দার কামিয়াবী ও সাফল্য হাসিল করে শোহরত ও খ্যাতির গগনচুম্বী আলোক ঝলকানির বহু দৃষ্টান্ত মিলবে। ইতিহাসের পাতা তাদেরই কীর্তির বর্ণনায় ভরপুর। জাতি আজ তাদের পূজো করছে এবং তাদেরকে মহান ও সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দিচ্ছে। কিন্তু তাদের কীর্তি-কাহিনীকে কি আঁ-হযরত (সা)-এর কীর্তি-কাহিনীর সঙ্গে কোনও ভাবে তুলনা করা যায়? দুনিয়ার কোন নামকরা থেকে আরও নামকরা এবং মশহুর থেকে মশহূরতর জেনারেল, বিজয়ী ও কুশলী ব্যবস্থাপক-এর জীবনে এই পরিমাণ সাফল্যের কোন নজীর মিলে কি যা আঁ-হযরত (সা) হাসিল করেছেন? ইতিহাসের পুঁজি কি? খ্যাতির আসমানে চাঁদ-সুরুজ হিসাবে কোন্ কোন্ ব্যক্তিত্ব প্রতিভাত? মানুষের মস্তক কাদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নুইয়ে আসে? কাদের ব্যক্তিত্বের কল্পনা তাদের বিস্ময়ের সমুদ্রে নিমজ্জিত করছে? বীর্যবত্তা ও জ্ঞানবত্তার মানদণ্ড কি? মর্যাদা ও প্রভাবের সঠিক পরিমাপ কি? আপনি কোন্টাকে মন্দ বলছেন এবং মন্দ ভাবছেন? কাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার প্রয়াস চালানো হয় এবং কাকেই-বা কর্মের আদর্শ ও নমুনা বানানো হয়ে থাকে? কার বর্ণনা দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও মনোবলকে সুদৃঢ়তর করে তোলে? উত্তম ও উঁচু পর্যায় থেকে মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত এবং শাসন ক্ষমতার অধিকারী থেকে শুরু করে অসহায় ও শাসন ক্ষমতাহীন ব্যক্তি পর্যন্ত কার সামনে হাঁটু গেড়ে আদরের সঙ্গে উপবেশন করে, কার পথে চলবার জন্য কোশেশ করে, কার থেকে হেদায়েত ও পথ-নির্দেশনা লাভ করে থাকে? নির্বাচনের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু মানদণ্ডের ক্ষেত্রে থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ কয়েক জন ব্যক্তিত্বের কথা এখানে তুলে ধরছি—দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন, হিটলার প্রমুখের। আপনি যদি চান তবে এর সংখ্যা আরও বাড়িয়ে নিন। পসন্দ মাফিক প্রজ্জ্বল থেকে প্রজ্জ্বলতর এবং উল্লেখযোগ্য থেকে উল্লেখযোগ্যতর উদাহরণ নিয়ে নিন। কিন্তু খ্যাতি, মর্যাদা, কামিয়াবী ও সফল বিজয়ের চমকের নীচে কি আছে? ঘটনাবলী কি বলে আর ইতিহাসের সাক্ষ্যই

বা কি? কাকে জীবন-পথের আলোকবর্তিকা মনে করা হয়ে থাকে এবং ব্যক্তি, জাতি ও গোষ্ঠী কার পেছনে চলতে কোশেশ করছে? সময়, শ্রম ও পুঁজি কার অনুকরণে ব্যয় করা হচ্ছে? তাদের যারা ব্যর্থ ও অক্ষম হয়েছে, যারা সীমাবদ্ধ বৃত্তের মধ্যেও জীবন্ত ও স্থায়ী কৃতিত্বপূর্ণ কর্ম আনজাম দিতে পারেনি, যারা দেশ ও জাতির ধ্বংসের কারণ হয়েছে এবং পরিণামে নিজেরাও ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে গেছে? চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর এই রাস্তা দৃশ্যত নতুন ও অপরিচিত দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কিন্তু যদি চিন্তা ও গভীর ভাবনার সঙ্গে কাজ করা হয় তাহ'লে এর ভেতর কোন নতুনত্ব নেই, অপরিচয়ের নেই কোন লেশ। এর দ্বারা কাউকে কোনরূপ খোটা দেওয়া কিংবা দোষারোপ করা অথবা কাউকে হেয় করা কিংবা খাটো করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

যদি বিরাট যুদ্ধ করা কিংবা বড় কোন জয়লাভ করাটাই মর্যাদার প্রমাণ হয়, জোর-যবরদস্তি করে কোন জাতিকে পরাজিত করাটাই যদি শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হয় এবং ক্ষমতা ও কৃতিত্বের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কোন মানবগোষ্ঠী থেকে ইচ্ছা ও মর্জি মাফিক কাজ আদায় করাটাই যদি কৃতিত্ব-পূর্ণ সাফল্য হিসাবে অভিহিত হয় তবে এতে কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিরই-বা এমন কি বিশেষত্ব থাকে যে, তাদেরই মস্তকের উপর মর্যাদার শাহী তাজ পরিয়ে দিতে হবে এবং তাদেরকেই শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্র বলা হবে? আরও শত শত হাযার হাযার সমকক্ষতার দাবিদারও তো রয়েছে। আলেকজাণ্ডার প্রমুখের শ্রেষ্ঠত্বের ভেতর একজন লুণ্ঠনকারী ডাকাতকে কেন শরীক করা হবে না? পার্থক্য তো শুধু সংখ্যা ও পরিমাণের; গুণ ও অবস্থার দিক দিয়ে তো উভয়েই সমান।

কিন্তু মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব, মঙ্গল ও কল্যাণ যদি সাফল্যের পাল্লায় মাপা যায়, বিজয় ও কামিয়াবীর মানদণ্ডে পরীক্ষা করা হয়, প্রয়োজনীয় ব্যাপারের মূল্যায়ন যদি সে সবের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে, ব্যক্তিগত ও গর্বের পরিবর্তে সাধারণের সুফল ও কল্যাণকে যদি উপদেশ ও সঠিক কাজ মনে করা হয়, কর্মের মর্যাদাকে যদি নিয়্যত ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে এবং উপকরণের ঘাটতি সত্ত্বেও ইচ্ছার আন্ত-রিকতা, উদ্দেশ্যের প্রতি একাগ্রতা ও ধ্যান কর্মপন্থার উত্তমতা ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর মহত্ত্বের কোন অর্থ যদি থাকে তবে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির কথা

উল্লেখ করে পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায় যে, আঁ-হযরত (সা) ভিন্ন দুনিয়ায় কোন বড়, কোন কামিয়াব, কোন প্রশংসাযোগ্য ও অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব আর সৃষ্টি হয়নি।

নিঃসন্দেহে সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তিগত কৃতিত্ব ও মহত্ত্বের কথা অস্বীকার করা যায় না এবং এটা যিন্দেগীর বিভিন্ন শাখায় হামেশা নৈতিক চরিত্র ও কর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুণাবলী হিসাবে অভিহিত হয়ে আসছে। আর এ সবের ভেতরই পূর্ব বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের মর্যাদাপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিকগুলোকেও শামিল করা যেতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা সাধারণ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের পাত্রে পরিণত হয়ে গেছেন এবং সূর্য-কণিকাসম হয়ে গেছেন। এমনটি ভেবে বসা শুধু জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার অবমাননা এবং নিজের আত্মাকে (নফ্‌স) ধোকা দেওয়াই নয়, বরং প্রকৃত বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে গোমরাহী খরিদ করারই নামান্তর।

যা-ই হোক, রসূল আকরাম (সা)-এর নবূওত প্রাপ্তির প্রথম দিকের সমস্যাগুলো দেখুন। বিরোধিতা, শত্রুতা, গোমরাহী তথা পথভ্রষ্টতা, বক্র-বুদ্ধি এবং ভ্রান্ত নিদর্শনগুলো সামনে রাখুন। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের বদ আচরণ, বদ প্রতিশ্রুতি, অধর্ম ও অবিশ্বাসসমূহ স্মরণ করুন। অতঃপর বস্তুগত উপায় ও উপকরণের শূন্যতা ও ঐশ্বর্যহীনতার কল্পনা করুন। একদিকে জুলুম-অত্যাচার ও হিংসা-বিদ্বেষ, আর অপর দিকে একাকী ও সাজ-সরঞ্জামহীন হওয়া সত্ত্বেও কী অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি ও ধৈর্য, সংযম ও আত্মবিশ্বাস, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা! মুকাবিলা হচ্ছে কতিপয় ব্যক্তির সঙ্গে নয় বরং পুরো কওমের সঙ্গে; শুধু অনাত্মীয়-বেগানার সঙ্গে নয়, আত্মীয়-এগানার সঙ্গেও। আর এসব কেন হচ্ছে? শতাব্দীকালের 'আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-অভ্যাস, শত বছরের রসম-রেওয়াজ তথা প্রথা-পদ্ধতি—মোটকথা, শতাব্দীকালের ছাঁচে ঢালা জীবনের পুরোটাই বদলে দেওয়া হচ্ছে—শুধু প্রকাশ্যভাবে নয়, প্রচ্ছন্নভাবেও, আকৃতিগত, বস্তুগত এবং আধ্যাত্মিকভাবেও, আর তা হচ্ছে অটুট মনোবল ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সমগ্র শক্তির সঙ্গে। এ ব্যাপারে কোন সমঝোতা হতে পারে না, কোন রেয়াতও করা যেতে পারে না, কোন লোভ-লালসার ঠাঁই এর মাঝে নেই, কোনরূপ কষ্ট-কাঠিন্যও এই পথে অন্তরায় হতে পারে না।

অতঃপর ধৈর্য ও সহ্য যখন একটা সীমায় পৌঁছে যায় তখন তিনি তাঁর কর্ম-পদ্ধতি বদলান, প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং সেটাকে কার্যকর করবার জন্য মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় তশরীফ রাখেন। যে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি মক্কায় কণ্টকাকীর্ণ জুলুম-নির্যাতন সয়েছিলেন, এখন সেজন্যই প্রতিরক্ষা স্ট্রাটেজী ও সামরিক কৌশল ইখ্‌তিয়ার করেন এবং তাও আবার এমন অবস্থায় যখন তাঁর নিকট টাকা-কড়ি, বিত্ত-সম্পদ, লোক-লশ্‌কর কিছুই নেই। রাষ্ট্র ক্ষমতা কিংবা কোন বস্তুগত উপায়-উপকরণও তাঁর হাতে ছিল না। মক্কা থেকে শূন্য হাতে কেবল মাত্র একজন জীবন উৎসর্গকারী বন্ধু সঙ্গে নিয়ে তিনি রওয়ানা হচ্ছেন। দুশমন তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছে আর উদ্ভাবন করছে—কিভাবে তাঁর জীবন নেওয়া যায়। তাঁর মস্তিষ্কে কিন্তু তখনো প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা কাজ করে চলেছে। ভয় নেই, ভীতি নেই, কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্বও নেই; পেরেশানী যেমন নেই, তেমনি নেই হতাশার নিকষ কালো অন্ধকার—সাধারণ পরিভাষায় তাকে হিজরত বা দেশত্যাগ করে দেশান্তর গমন বলা হয়। এর দ্বারা মজবুরী ও অসহায় অবস্থার কল্পনা স্বভাবতই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, যাকে বিরুদ্ধবাদীরা flight বা পলায়ন নাম দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এটা শুধু আবাসভূমি ও কর্মপন্থার পরিবর্তন। আর এর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, যার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষগণ এ থেকে ইসলামী বর্ষপঞ্জী শুরু করেছেন। অন্যথায় মুসলমানদের মত অদম্য ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও সচেতন জাতি তো দূরের কথা, কোন দুর্বল থেকে দুর্বলতর মনোবলসম্পন্ন জাতিও কখনো পরাজয় ও পলায়নের কোন ঘটনাকে স্মরণীয় স্মৃতি বানায় না। মানবীয় ফিতরত বা প্রকৃতিতে শুরু থেকে এ জাতীয় কল্পনার কোন স্থান নেই।

এখন সেই সমস্ত লোক দেখুন যাঁদের মস্তকে গৌরব মুকুট রাখা হয়েছে এবং ব্যর্থ ও অক্ষম প্রতিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও যাঁদেরকে গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক মনে করা হয়। আলেকজাণ্ডারকেই নিন না কেন! তাঁর কৃতিত্ব তো এতটুকু যে, তিনি মেসিডোনিয়া থেকে উঠে ভারতবর্ষ পর্যন্ত অনেক রাষ্ট্র ধ্বংস ও বরবাদ করে সেগুলো জয় করেছিলেন এবং নিজের সামরিক শক্তির অজেয় প্রভাব বিস্তার করে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীকে পরাধীন ও গোলাম বানিয়ে উল্কার মত ছুটে চলেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, তিনি তাঁর পিতা সম্রাট ফিলিপের পুত্র ছিলেন এবং

স্বীয় ভূ-খণ্ডের অধীশ্বর ছিলেন। সরকার, দেশের রাজভাণ্ডার, সমর ও মারণাস্ত্রের দরকারী উপকরণ এবং বিরাট ফৌজের মালিক ছিলেন তিনি। তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি, মনোবল, ও শ্রেষ্ঠত্বের শক্তির ভিত্তিতে একের পর এক দেশ পরাভূত ও করতলগত করে চলেন। কিন্তু প্রকৃত মর্যাদা, সচেতনতা ও দূরদর্শিতার অবস্থাটা কি ছিল? তা তো এই ছিল যে, পাঞ্জাব পৌছে ফৌজ তাঁর সঙ্গে চলতে অস্বীকার করে বসে। অনন্তর পশ্চাতে ফেরা ব্যতিরেকে তাঁর আর কোনই গত্যন্তর রইল না। এর পর মৃত্যুর পয়গাম যখন তাঁর শিয়রে পৌছুল তখন তাঁর সালতানাতের ও শাসন ক্ষমতার ভিত্তিমূলই ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। না থাকল তার বিস্তৃতি, না থাকল সে শক্তি-সামর্থ্য। গোটা বিজয়টাই হাঁসের পালক-ঝরা পানির মত খসে পড়ল।

নেপোলিয়নকে সামরিক যোগ্যতা এবং বিজয়ের বিস্তৃতির দিক দিয়ে একক মনে করা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, সিপাহসালার হিসাবে কোন এক যুগে তিনি একজন যোগ্যতম জেনারেল ছিলেন। ঘটনাবলী ও অবস্থাসমূহের উপর তাঁর দৃষ্টি ছিল সঠিক ও নির্ভুল। কার্যকর প্রতিভা এবং উন্নত শ্রেণীর চিন্তাশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি, ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক, চতুর, দৃঢ়চেতা ও সুযোগসন্ধানী। সাহসিকতা ও বাহাদুরীর গুণাবলীতে তিনি ছিলেন গুণান্বিত এবং এসব গুণাবলীই মিলিত-ভাবে তাঁকে বড় জেনারেল, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন বিজয়ী এবং প্রতিরক্ষা বিশারদে পরিণত করেছিল। কিন্তু এটা শুধু তাঁর ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব এবং তাঁর আজিমুশ্‌শান সিপাহ্‌সালার হওয়ার সহায়ক হয়েছিল। অতঃপর একের পর এক বিজয় ও সফলতা যখন তাঁর পদচুম্বন করতে শুরু করল, অমনি গর্ব ও অহমিকার শিকার হলেন তিনি। তাঁর চিন্তা ও কল্পনাশক্তি আত্মপ্রতারণার উপকরণে পরিণত হ'ল। ফের'আওনী ভাবধারা, বোধশক্তি, সমুচ্চ শক্তি ও সূক্ষ্মদর্শিতা তাঁর উপর প্রভাব জমিয়ে বসল। তিনি কোন কিছুকেই তাঁর কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার বাইরে মনে করতেন না। ঘটনাবলীকে তিনি তাঁর ইচ্ছা মাফিক দেখতে চাইতেন। আর যদি অভিপ্রায় মাফিক না হ'ত তাহ'লে তিনি তার অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসতেন। তিনি ছিলেন তাঁর যমানা ও পরিবেশের সৃষ্টি। যে সময় তিনি জন্মেছিলেন সে সময় তাঁর জন্ম হওয়া অপরিহার্য ছিল। ফ্রান্সের ইতিহাস তার সাক্ষী। কিন্তু তিনি যখন নেপোলিয়ন হয়েছেন তখন তিনি উদ্ধত, দাম্ভিক, দুর্বিনীত,

অত্যাচারী, নৃশংস ও আবেগপ্রবণ শাহানশাহে পরিণত হয়েছেন। জোর-যবরদস্তি, দাম্ভিকতা ও অহংকার তাঁর বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। আর তাঁর পতন যখন দেখা দিল তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্য ফ্রান্সেরও পতন এসে দেখা দিল। তাঁর কামিয়াবী ও সফলতার বিজয়, তাঁর সামরিক নৈপুণ্য ও দক্ষতা শুধুই ব্যক্তিগত তরক্‌কী ও ব্যক্তিগত খ্যাতির কারণ ঘটল, আর তাও একটি সীমা, একটি সময়সীমা পর্যন্ত। এরপর পতন, ব্যর্থতা, পরাজয়, বন্দী জীবন, হতাশা ও দুঃখজনক মৃত্যু।

এখন হিটলারকেও দেখুন। তিনিও তাঁর পরিবেশেরই সৃষ্টি ছিলেন। জার্মান ফৌজ ও জার্মান জনসাধারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয় এবং মিত্র বাহিনীর শক্তি প্রয়োগ ও জোর-যবরদস্তির ফলে জ্বলে পুড়ে ভস্মীভূত হয়েছিল। জনসাধারণ ফরাসীদের জোর-যবরদস্তির মজা আগেই দেখেছিল। ফৌজ---যারা যুদ্ধের ময়দানে খ্যাতি ও শোহরত হাসিল করেছিল, ১৯১৮ ঈসায়ীতে সন্ধি চুক্তির সময় থেকে—যখন ফ্রান্সের প্রায় এক-তৃতীয়াংশের উপর কব্জা জমিয়ে বসেছিল এবং 'প্রতিশোধ!' 'প্রতিশোধ!' বলে চীৎকার করছিল। জার্মান জেনারেল ১৯১৮ ঈসায়ী থেকেই গোপন সমর প্রস্তুতিতে লিপ্ত ছিল। ঠিক এ যেন হিটলার লোকচক্ষুর সামনে এসে আবির্ভূত হবার আগে থেকেই পুঁজি বেশ যথেষ্ট পরিমাণেই তৈরী হয়েছিল। দেশে অভিজ্ঞ সিপাহী, নিপুণ সিপাহসালার, সমর ও মারণাস্ত্রের উপায়-উপকরণ তথা সাজ-সরঞ্জাম—মোটকথা, যুদ্ধের পরিপূর্ণ ও বিন্যস্ত মেশিন মওজুদ ছিল। আর এই মেশিন শুধু মওজুদই ছিল না—বরং জাতির আর্থিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পের অবস্থাও ছিল বেশ এবং সামগ্রিক উপকরণও যথেষ্টই বিদ্যমান ছিল। কেবল মেশিনটাকে একটু সক্রিয় করে তোলাই বাকী ছিল। আর এই কাজটা নিঃসন্দেহে হিটলার নিজ দায়িত্বে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পরিকল্পনা তৈরী করেন এবং সমগ্র উপায়-উপকরণ দ্বারা সে সব পরিকল্পনা তিনি বাস্তবায়িত করেন। কিন্তু পরিণতির ভাল দিকটা থেকে তিনি বঞ্চিত থাকেন এবং ব্যর্থ ও নিরাশ হয়ে আত্মহত্যা করে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

এরূপ পরিষ্কার বিশ্লেষণের পর এটা আর বলার দরকার পড়ে না যে, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন ও হিটলারের সঙ্গে ছিল তাঁদের দেশ। তাঁদের ব্যক্তিগত উত্থানে তাঁদের দেশবাসীর আসবাব-উপকরণ এবং সরকারের

শক্তির বিরাট অংশ ছিল। মেসিডোনিয়াবাসী বিশ্ববিজয়ী হতে চাইত। অতএব তারা আলেকজাণ্ডারের মত দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন নেতার নেতৃত্বাধীনে উঠে দাঁড়ায়। ফরাসীরা খ্যাতি অর্জন ও বিজয়মণ্ডিত হবার আকাংক্ষী ছিল এবং সে সব জাতিগোষ্ঠী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইত যারা তাদেরকে আর্থিক ও সামাজিক নীচতার মাঝে নিক্ষেপ করেছিল। অতএব নেপোলিয়ন যখন সমরনায়ক হিসাবে তাদেরকে মর্যাদা ও ক্ষমতার নিশ্চিত আশ্বাস দিলেন তখন তারা তাঁর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল। এভাবেই হিটলারের পেছনে ছিল তাঁর গোটা জাতি এবং জাতির সমগ্র উপায়-উপকরণ। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে ছিল কারা? তাঁর উপায়-উপকরণ, তাঁর ইখতিয়ার ও ক্ষমতার অবয়ব কি ছিল? তাতো এই ছিল যে, তিনি যখন সার্বক্ষণিক বিপ্লব অভিযানের উদ্বোধন করলেন এবং তাবলীগ. তালকীন ও দীক্ষার মুকাবিলায় কাফির ও মুশরিকদের জুলুম ও বাড়াবাড়িতে মজবুর হয়ে প্রতি-রক্ষা পরিকল্পনা তৈরী করলেন তখন কাফিরদের প্রত্যেকটি মানুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁর দুশমন হয়ে দাঁড়াল। তাঁর না ছিল কোন ওসীলা আর না ছিল কোন আশ্রয় কিংবা অভিভাবক; একেবারে শূন্য হস্ত ও নিরাশ্রয়। খেয়ে না খেয়ে থাকা আর সাজ-সরঞ্জামহীনতার কষ্ট। কিন্তু তথাপি তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গী, হিম্মত ও মনোবল সর্বদাই বুলন্দ ছিল। মক্কাবাসীরা তাঁর জীবনকে সংকীর্ণ করে ফেলেছিল, কষ্টের পর কষ্ট দিয়ে তাঁর জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছিল; এমন কি তাঁর জীবন নেবার জন্যও ছিল তারা বদ্ধপরিকর। বাধ্য হয়ে তিনি মক্কা পরিত্যাগ করে য়াছরিব বা মদীনাকে স্থায়ী আবাসে পরিণত করেন। আর তা এজন্য করেন, যে কাজ মক্কা থেকে হতে পারছে না—তা সেখান থেকে পূরণ করা হবে এবং পূরণ করাই হবে না শুধু—বরং মক্কাবাসীদের পরাজিত এবং মক্কাকে শিরক ও বুতপরস্তীর নাপাকী থেকে পাক করে ইসলামের যমীনী মারকায বা ভূ-কেন্দ্র বানানো হবে।

এখন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি অংশ এবং প্রতিটি দিকের উপর গভীরভাবে চিন্তা করুন। প্রথমে য়াছরিবকে নির্বাচ-নের ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করুন। য়াছরিব হেজাযের কেন্দ্র স্থান। আবহাওয়া ও উৎপাদন সর্বোত্তম। এখানে প্রচুর পরিমাণে পানি মেলে। যেহেতু স্থানটি পাহাড় দিয়ে ঘেরা সেজন্যে অনেক বেশী নিরাপদও বটে। এর প্রতিরক্ষা গুরুত্বকে অনুধাবন করার জন্য এখান থেকে মক্কা পর্যন্ত অর্ধেক ব্যাসের

বৃত্ত টানুন এবং দেখুন, এর ভেতর প্রতিরক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব কত-খানি স্থান পেতে পারে। কোন যোগ্য ও শ্রেষ্ঠতর সিপাহসালার যদি তাকে প্রতিরক্ষা হেড কোয়ার্টার বানিয়ে উচ্চ স্তরের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত ও
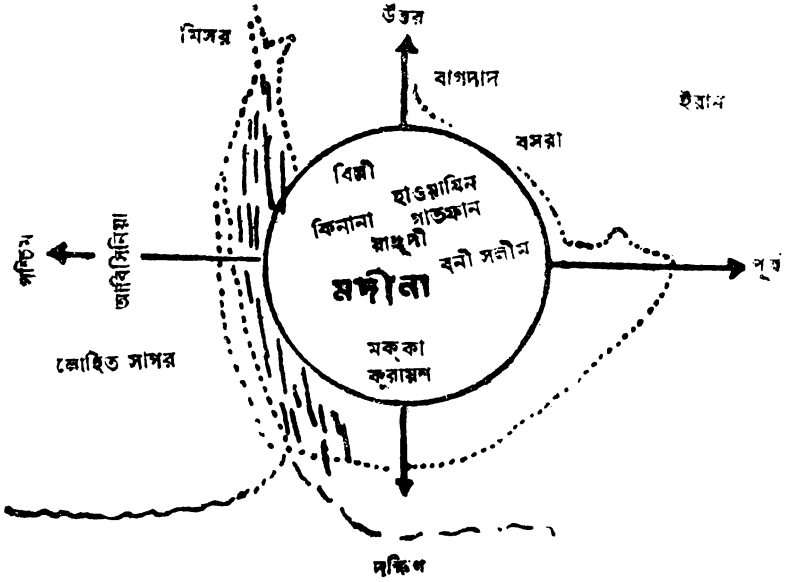
কার্যকরী করেন বা করতে চান তাহ'লে তিনি কতখানি কামিয়াব হতে পারেন এবং বিরুদ্ধ পক্ষের সম্মিলিত শক্তির মুকাবিলায় তার পজিশন কতখানি উত্তম ও শ্রেষ্ঠ হতে পারে তা অনুমেয়। প্রতিরক্ষা স্ট্রাটেজী সৃষ্টিতে এটি একটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চাল যাকে নেপোলিয়নের ভাষায়—অভ্যন্তরীণ মোর্চা বা interior lines বলা হয়।

এই বৃত্তের ভেতর এবং তার আশেপাশে বিভিন্ন আরব কবিলা রয়েছে যারা নিজেদের পথ ও পদ্ধতির তথা চাল-চলনের মালিক ও মুখতার। তিনি যখন মদীনায় তশরীফ নিচ্ছেন তখন মদীনা শহর ছিল না, এটা ছিল একটি জনপদ এবং পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ও পরস্পর সংঘর্ষমুখর কবিলার বাস-ভূমি। শাসন-শৃংখলা ও ঐক্য ছিল দুষ্প্রাপ্য। তাদের মধ্যে খান্দানী মত-ভেদ যেমন ছিল, তেমনি ছিল সামাজিক বিভেদও, ধর্মীয় বিভেদ যেমন ছিল, তেমনি ছিল দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যও; জীবিকা-সংক্রান্ত ব্যাপারে যেমন, তেমনি অর্থনৈতিক বিষয়েও। তিনি তশরীফ নিতেই সমস্ত

ঝগড়া-বিবাদ মিটিয়ে ফেলেন। শত্রুতা ও বিদ্বেষের জায়গায় স্নেহ-মমতা ও আন্তরিকতা, বিচ্ছিন্নতার স্থানে একতা কায়েম করেন এবং ফেতনা-ফাসাদের লীলাভূমি য়াছরিব মদীনাতুন্নবী (সা)-তে পরিণত হয়। তার চতুঃসীমা হারাম (পবিত্র ভূমি) হিসাবে অভিহিত হয়, শহরবাসীদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়। পুরো নাগরিক জীবন একটি মর্যাদাপূর্ণ ছাঁচে ঢালাই হয়। আর এই সংক্ষিপ্ত নগর-রাষ্ট্র (রিয়াসত) ইসলাম ও মুসলমানদের পানাহ্‌গাহ ও আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়। এরপর আঁ-হযরত (সা) তাকে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার পরিপূর্ণতার কেন্দ্রে পরিণত করেন। স্বেচ্ছাসেবী ফৌজ তৈরী হয়। এমন সব স্বেচ্ছাসেবী যাদের না বেতন মিলে, না রেশন কিংবা কাপড়, না হাতিয়ার কিংবা সওয়ারী। তাদের জন্য না ছিল কোন মাধ্যম, আর না ছিল বহনকারী কিছু। কিন্তু শাসন-শৃংখলা ও আনুগত্য তথা ফরমাঁবরদারী ও জীবন উৎসর্গের বেলায় এদের কোন নজীর ছিল না। কোন জোর-যবরদস্তি ছিল না, ছিল না কোন শক্তি প্রয়োগ; নির্দেশ দানের পেছনে ছিল না বল প্রয়োগ রীতি, ছিল না কর্তৃত্বমূলক স্বেচ্ছাচারিতা কিংবা কোন লোভ-লালসা প্রদর্শন। যা ছিল তা হ'ল একটি নৈতিক বিধান কিংবা তাঁর ব্যক্তিত্বের যাদুকরী ও চুম্বক শক্তি, যাতে বিগত সময়ের বন্য কিংবা অর্ধ-বন্য মানুষ সভ্য মানুষে পরিণত হ'ল। একদিকে তাঁর হাত ও বাজু, সঙ্গী-বন্ধু ও জীবন উৎসর্গকারী বিশ্বস্ত জন, আর অপরদিকে পারস্পরিক সম্পর্ক ইখলাস ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ, উচ্চতম পর্যায়ের উৎসর্গীত ও দয়ার্দ্র চিত্ত, ফরমাঁবরদার ও অনুগত, সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু, চতুর ও দৃঢ়চেতা, ধৈর্যশীল ও অল্পে তুষ্ট, ঈমানদার ও স্পষ্টভাষী অর্থাৎ জীবনের সোজা সরল পথে চলতে উৎসাহী পথিক, বাস্তববাদী, উত্তম ও অধম তথা ভাল ও মন্দ সম্পর্কে সজাগ ও অবগত এবং নেক ও বদ-এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণকারী মানুষ। আর এ সবই আঁ-হযরত (সা)-এর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফল, ফল তাঁর চরিত্র ও কর্মের। তিনি যেমন শহরের শাসক, কবিলার মিলন ও ঐক্যসূত্র, তেমনি ফৌজের সিপাহসালারও তিনিই। একদিকে শহরের আইন-শৃংখলাও রক্ষা করছেন, পার্শ্ববর্তী কবিলাগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কও কায়েম করছেন, অন্যদিকে প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার পরিপূর্ণতার জন্য ফৌজের প্রশিক্ষণ ও পরিচালনাও করছেন এবং এভাবে করছেন যে, তাদের পরিশ্রম ও দৃঢ় মনোবলের সামনে রাস্তার প্রাচীর ও দুর্গমতা সম্পূর্ণ অর্থহীন। প্রতিটি রাস্তা এবং প্রতিটি গতিবিধি তকলীদের সংকীর্ণ পথ

থেকে পৃথক, কিন্তু মনযিলে মকসূদের নিকটবর্তীই শুধু নয়, অধিকতর নিকটবর্তী এবং ভবিষ্যৎদৃষ্টি ও সূক্ষ্মদর্শিতার অলৌকিক ফলশ্রুতিতে সুস্পষ্ট।

যেখানে অন্যদের ধারণা ও কল্পনার অতিক্রমও দুরূহ, সেখানে মুসলিম বাহিনী বিদ্যুতগতিতে দূরত্ব অতিক্রম করছে। দুশমন হতবুদ্ধি ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। তারা আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট রাস্তার নিরাপত্তামূলক পরিচয়পত্র নেওয়ার লজ্জাকে বরদাশত করতে পারছে না, আবার তেজারতী কাফেলার লোকসানও সহ্য করতে পারছে না। অতএব তারা রাস্তা বদল করে। কিন্তু তাদের আঁ-হযরত (সা) ও তাঁর জীবন উৎসর্গকারী ভক্তদের সম্বন্ধে ভয় এরপরও কাটে না। বিশেষ করে এই কারণে যে, আঁ-হযরত (সা)-এর প্রেরিত বাহিনী মক্কার বিপুল নিকটবর্তী স্থানে শত্রুর তেজারতী কাফেলার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। আঁ-হযরত (সা) বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সাহাবা সমবায়ে গঠিত বাহিনী গোপন অভিযানে প্রেরণ করতেন এবং সবগুলোই সাফল্যের বার্তা বহন করে নিয়ে আসত। এলাকার প্রাকৃতিক ও স্থানীয় অবস্থা তাঁর মিশনের ক্ষেত্রে আদৌ কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করত না, দীর্ঘপথ কিংবা সাজ-সরঞ্জামের অভাব এই অভিযানে এতটুকু বাধা হ'ত না। শত্রুর গুপ্তচরকে শেষ করা কিংবা তাদের কোন তেজারতী কাফেলাকে বাধা দিতে চাইলে কতিপয় ব্যক্তি রাতের আঁধারে শত শত মাইল সফর করে যেত এবং নবী করীম (সা)-এর ফরমানের এক একটি শব্দের উপর 'আমল করে পুনরায় ফিরে আসত।

দু'বছর আগেকার তুলনায় অবস্থা তখন একেবারে বদলে গেছে। কাফির ও মুশরিকরা তখন দারুণভাবে পর্যুদস্ত। কোথায় তাদের গর্ব ও অহমিকা আর কোথায়-বা তাদের জুলুমের স্তুতি, শক্তির মহড়া ও মদমত্ততা এবং ঐশ্বর্যের নেশায় নিমগ্নতা, আর কোথায় বাণিজ্য বাঁচানোর চিন্তা, জীবিকার উপায়-উপকরণ খতম হয়ে যাবার ভয় আর আঁ-হযরত (সা) দ্বারা প্রহৃত হওয়ার আশংকা! অতএব তারা সমর পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং মদীনার উপর হামলা করে ইসলামের আহ্বায়ক ও তাঁর অনুসারীদেরকে খতম করে দেবার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

কুরায়শদের প্রস্তুতির ভিত্তি ও মেরুদণ্ড টাকা-পয়সা ও বিত্ত-সম্পদের প্রাচুর্য, লোকসংখ্যার আধিক্য, জুলুম ও বিদ্রোহ এবং গোমরাহীর অস্ত্র, আর এদিকে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ যার ভেতর অনাড়ম্বরতা,

মেহনত, আন্তরিকতা, আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিতচিত্ততা, একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই সব কিছু করার প্রবণতা, উত্তম পরিণতির আকাঙ্খা ও গতিশীল ভিত্তি। আঁ-হযরত (সা)-এর হেদায়েত ঃ যুদ্ধের আগেই পা বাড়িও না, কাউকে তকলীফ দিও না। অতএব তাঁর সৈন্যেরা অনাহারে থাকলেও, পিপাসার্ত হলেও এবং কষ্টের ভার বহন করলেও কারো প্রতি জুলুম করত না, অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত করত না, আবার কারুর ধন-সম্পদও ছিনতাই করত না।

বদর

কুরায়শদের অবরোধ, মক্কার একেবারে পাশে মক্কার কাফেলা লুট হয়ে যাওয়া এবং কাফেলার সরদার মারা যাওয়ায় মুসলমানদের ভয় তাদেরকে এতখানি পেয়ে বসে যে, মক্কার তামাম কাফির কুরায়শদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সামরিক পরিকল্পনাসমূহের পূর্ণতা সাধনে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং যখন সিরিয়া থেকে সেই তেজারতী কাফেলার প্রত্যাবর্তনের সময় ঘনিয়ে আসে, যার সরাদর ছিলেন আবু সুফিয়ান, তখন তাদের পেরেশানী দ্বিগুণ-ত্রিগুণ বৃদ্ধি পায়। আবু সুফিয়ান কাফেলার হেফাজতের নিমিত্ত কুরায়শদের সাহায্যপ্রার্থী হন যার কারণে মক্কার সরদার আবু জেহেল স্বীয় অধিনায়কত্বে এক হাযারের অধিক ফৌজ এবং কিছু কবিলা সাহায্যকারী বাহিনী হিসাবে নিয়ে রওয়ানা হয়। আঁ-হযরত (সা)-এর গুপ্তচর শত্রুর সমস্ত প্রস্তুতি এবং গোটা পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত রাখত। তিনি আবু সুফিয়ানের তেজারতী কাফেলা অতিক্রম করে যাবার পূর্বেই সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু মনযিলে মকসূদ (গন্তব্যস্থল) সম্পর্কে কিছু প্রকাশে বিরত থাকেন। গতিবিধি সম্পর্কে যতদূর সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের দরকার ছিল, তা তিনি করেন। রাতের বেলায় সফর করেন এবং এমন পথ ধরেন, যার সম্পর্কে কারও মনে বিন্দুমাত্র ধারণা হওয়াও সম্ভব ছিল না। এ পথ ছিল অত্যন্ত দুরতিক্রম্য ও জটিল। উটের গলার ঘণ্টা তিনি নামিয়ে ফেলেন যার ফলে লোকের ধারণা হয় যে, সম্ভবত আবু সুফিয়ানের কাফেলার সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধবে। কিন্তু বদর প্রান্তরে পৌঁছে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে যাননি। মক্কার কুরায়শদের সাহায্য

পৌঁছুবার পূর্বেই আবূ সুফিয়ান রাস্তা বদল করে কেটে পড়েন এবং যখন বিপদসীমার বাইরে গিয়ে পড়েন তখন কুরায়শদের নিকট এই বলে পয়গাম পাঠান যে, এখন আর ফৌজী সাহায্যের দরকার নেই, কাফেলা বিপদসীমা পেরিয়ে এসেছে এবং মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর মধ্যে কুরায়শ বাহিনী বদরের নিকটবর্তী হচ্ছে। আঁ-হযরত (সা) তাদের সংখ্যা, তাদের সাজ-সরঞ্জাম এবং অবস্থানের সুযোগ যথাযথভাবে জেনে যাচ্ছেন। অতঃপর এও জানছেন যে, কিছু কবিলা যারা তেজারতী কাফেলার হেফাজতের ধারণায় কুরায়শদের সাহায্যার্থে এসেছিল, কাফেলা ভালভাবে ফিরে আসবার পর তারা নিজ নিজ এলাকায় রওয়ানা হয়ে গেছে। দুশমনের রসদ-খোরাক এবং পানির তেমন যুক্তিযুক্ত ইন্তেজাম ছিল না। আবূ জেহেল ছিল লড়াইয়ের ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ। সে তখন বদরের মেলায় আনন্দ করা এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা স্ট্রাটেজী এবং সামরিক চাল ও কূট-কৌশলের কোন কিছুই তার জানা ছিল না। সে আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা জালে আটকা পড়ে। এরপর এমন স্থানে গিয়ে পৌঁছে যেখানে শুষ্ক জলাভূমি এবং প্রচণ্ড গরমের কারণে প্রতিটি প্রাণী সীমাহীন দুরবস্থায় নিপতিত হয়। আঁ-হযরত (সা) পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেন। এভাবে কুরায়শ বাহিনীকে আঁ-হযরত (সা)-এর নির্বাচিত ময়দানে তাঁর সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত যুদ্ধের নক্শা মুতাবিক যুদ্ধ করতে হয় এবং এভাবে তিন শত তেরো জন লোকের মুকাবিলায় এক হাযার সৈন্যের বাহিনী পরাজিত হয়ে পালিয়ে যায়। কুরায়শ সরদাররা মনে করেছিল যে, বদর প্রান্তরের তিন দিকে বালুকাময় জলাভূমি বিধায় সেদিক থেকে হামলা হতে পারে না। তাদের অশ্বারোহী বাহিনী ছিল বিলকুল বেকার। এর বিপরীতে আঁ-হযরত (সা) যে জায়গায় মোর্চাবন্দী করেছিলেন তার পেছনে ছিল পাহাড়। কিন্তু তারা নিজেদের পদাতিক ফৌজের ব্যাপারে ছিল গর্বিত। তারা ভেবে-ছিল যে, মুসলমানদের নির্মূল করা অত্যন্ত মা'মুলী ব্যাপার, বিজয় নিশ্চিত-ভাবে তাদেরই প্রাপ্য। এজন্য যুদ্ধক্ষেত্রের স্থানীয় অবস্থা যদি অনুপযোগী হয়, পানি হয় বন্ধ এবং আঁ-হযরত (সা)-এর মোর্চা উত্তম স্থানেও থাকে তবুও কোন ক্ষতি নেই, কারণ মুসলমানেরা নির্মূল হলেই গোটা অবস্থা তাদের অনুকূলে এসে যাবে। কিন্তু তাদের এ আশা দুরাশা ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। মক্কীয় অশ্বারোহী বাহিনী পানির জন্য অগ্রসর হয় আর অমনি মুসলিম

তীরন্দাযগণের তীরের লক্ষ্যে পরিণত হয়। এরপর তারা ফিরে আসে, মুসলমানদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্‌বান করে। দ্বন্দ্ব যুদ্ধ শুরু হয়। হযরত 'আলী ও হযরত হামযা (রা) কয়েকজন নামকরা কুরায়শকে মৃত্যুর দ্বারে পৌছে দেন। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা ব্যাপকভাবে মুসলমানদের আক্রমণ করে। অতঃপর যুদ্ধের সকল নিয়মনীতি তারা চুলোয় নিক্ষেপ করে। ফলে নিজেদের ধ্বংস তারা নিজেরাই ডেকে আনে। কেননা আঁ-হযরত (সা) এমন মোর্চার উপর ছিলেন যার সামনে ছিল বালুকাময় জলাভূমি। প্রচণ্ড গরম ও প্রবল পিপাসার কারণে কুরায়শদের আক্রমণের গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ ও মন্থর। প্রথমে তারা মুসলিম তীরন্দাযদের তীরের নিশানায় পরিণত হয়। এরপর যখন ক্লান্তি ও পিপাসার কারণে দম বন্ধ হয়ে আসে তখন সজীব ও প্রাণবন্ত মুসলিম ফৌজের সঙ্গে তাদের মুকাবিলা হয় এবং মনে হয় যে, যুদ্ধ কেবল মুসলমানদের সঙ্গেই হচ্ছে না, কুদরতী উপাদানও তাদের মুকাবিলায় কোমর বেঁধেছে। আঁ-হযরত (সা) এক মুঠো ধূলো উড়িয়ে তুফান আসবার আন্দায করে নিচ্ছিলেন এবং এই তুফান যখন আসছিল তখন তার সঙ্গেই নিজের নামকরা ও খ্যাতিমান বীরদের শত্রু-বাহিনীকে আক্রমণের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। দুশমন প্রথম থেকেই বিব্রত ছিল, আর তাদের মনোবলও ছিল অবনমিত। এখন তারা একেবারেই সাহস হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল। এরপর তারা নিজেদের সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে পালিয়ে গেল।

ময়দানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন আঁ-হযরত (সা)-এর হাতে। মুসলমানরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে মদীনায় ফিরে এলেন। এ বিজয় কিন্তু শেষ ও চূড়ান্ত ছিল না। স্থবিরতা ও বিশ্রাম জীবনের বঞ্চনার অপর নাম। সুতরাং ফৌজী ট্রেনিং ও চলাচলের অব্যাহত ধারা আগের মতই চলতে থাকে। যেভাবে ছোটখাট অভিযান পয়লা পাঠানো হ'ত তখনও তেমনি পাঠানো হতে থাকল এবং কখনো কখনো আঁ-হযরত (সা) নিজে সে সবের অধিনায়কত্ব করতে থাকলেন।

ওহুদ

বদর যুদ্ধ কুরায়শদের অহমিকায় প্রচণ্ড আঘাত হানে। বড় বড় সরদার এ যুদ্ধে মারা যায়। যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করবার জন্য আঁ-হযরত (সা)-এর

খেদমতে একটি বড় অংকের অর্থ তাদের পেশ করতে হয়। তারা নিজেদের যখমকে নেকড়ের মত চাটছিল। তাদের পরাজয়ের অবমাননাকর অনুভূতি এত বেশী তীব্র ছিল যে, যুদ্ধে নিহতদের জন্য শোক পালনেও তারা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল। কিন্তু ধন-দৌলত ও শক্তির নেশা তখনো তাদের মস্তিষ্ক থেকে নামল না, তাদের মনে প্রতিশোধ-স্পৃহার আবেগ আরও তীব্র হয়ে উঠল। সমর প্রস্তুতি হয়ে উঠল আরও জোরদার। মাযহাব ও তাহ্‌যীব তথা ধর্ম ও সভ্যতা বাঁচাবার এবং জীবিকা ও সমাজ জীবনকে নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার নামে আরব কবিলাগুলোকে তারা উত্তেজিত করে তুলল। জমা করা হ'ল আরও বেশী টাকা-পয়সা, অস্ত্রশস্ত্র ও ফৌজ। মক্কার বাইরে ক্যাম্প খোলা হ'ল। বড় বড় সব নামকরা অভিজ্ঞ বীর সম্মিলিত বাহিনীতে শামিল হবার জন্য এল। মদীনার পার্শ্ববর্তী য়াহূদীরা এই সুযোগে ফায়দা লুটবার চেষ্টা করল। কেননা তারা আঁ-হযরত (সা)-এর প্রভাব-প্রতিপত্তির বিরোধী। কিন্তু তাদের আবার এও আশংকা ছিল যে, তাদের বাণিজ্যিক প্রতিযোগী কুরায়শ মুহাম্মদ (সা)-এর বিরোধিতায় অধিকতর শক্তিশালী হতে পারে এবং তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থে আঘাত হানতে পারে। অতএব তারা তাদের সঙ্গে কখনো মিলিত হলেও এবং আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানে কুন্ঠিত না হলেও, নিজেদের শক্তিকে অটুট ও অক্ষুণ্ণ রাখে। তাদের আশা ছিল যে, কুরায়শের সঙ্গে বনূ খাযরাজ ও বনূ আওস প্রমূখ (আঁ-হযরতের সহযোগীরা) যখন যুদ্ধে মারামারি কাটাকাটি করে মরবে তখন তাদের উপর ক্ষমতার দাপট খাটিয়ে কায়-কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং মদীনার খেজুর বাগানগুলো দখল করে নেবে এবং সিরিয়ার পরিবর্তে হেজাযকে নিরাপদ আবাসভূমি বানিয়ে তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে জীবন যাপন করবে।

কুরায়শদের নিকট খালিদের মত যোগ্য অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ছিল। তার ব্যাপারে তারা গর্বিত ছিল এবং তারা জানত, বদরে যেখানে আঁ-হযরত (সা)-এর নিকট মাত্র দু'টি ঘোড়া ছিল—বদরের পর মালে গনী-মতের ঘোড়াও তার ভেতর শামিল হওয়াতে তার সংখ্যা ৩৫ পর্যন্ত পৌঁছেছে। এজন্য কুরায়শরা দ্বিতীয় যুদ্ধের পরিকল্পনায় অশ্বারোহী বাহিনী ব্যবহারের ব্যাপারে বিশেষভাবে খেয়াল রাখে যাতে ঘোড়সওয়ার বাহিনীর হামলার দ্বারা মুসলমানদেরকে ঘোড়ার খুরের তলায় পিষে মারা যায়। এজন্য তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, এবারকার যুদ্ধ মদীনার উত্তর দিকের ময়দানে লড়া হবে।

য়াহূদীরা কুরায়শদের প্রস্তুতির খবর জানতে পেরে তারা তাদেরকে রসদ-সামান যোগান দেবার ওয়াদা করে এবং নিজেদের ঘরবাড়ীতে অবস্থান করার দা'ওয়াত দেয়। সারা বছরের প্রস্তুতির পর কুরায়শরা বিশাল বাহিনী নিয়ে মক্‌কা থেকে বহির্গত হয় এবং মদীনার নিকটবর্তী য়াহূদীদের আবাস-ভূমিতে গিয়ে থামে। অতঃপর রসদ ইত্যাদি বন্দোবস্ত করার পর মদীনার দিকে অগ্রসর হয়। মদীনা তিন দিক থেকে ঘর-বাড়ী, প্রস্তর-নির্মিত দুর্গ এবং খেজুর বাগান দ্বারা ঘেরা ছিল। অতএব সে সব দিক থেকে ঘোড়-সওয়ার বাহিনীর যুদ্ধের কোন সুযোগ ছিল না। অবশ্য উত্তর দিকে কয়েক মাইল লম্বা-চওড়া ময়দান ছিল যেখানে বালুকাময় মাটি যেমন ছিল না, তেমনি ছিল না প্রস্তরসংকুলও। অবশ্য স্থানে স্থানে ছোট্ট ছোট্ট টিলা ছিল। এই ময়দান অশ্বারোহী বাহিনীর যুদ্ধের জন্য ছিল খুবই অনুকূল এবং উত্তম।

কুরায়শদের ধারণা ছিল যে, মদীনার উপর হামলার কারণে আঁ-হযরত (সা) বাইরে গিয়ে লড়বেন এবং বদরের সাফল্যের কারণে মদীনাবাসীদের উপর নিজ শক্তির প্রভাব কায়েম করবার চেষ্টা করবেন। যদি তিনি তাই করেন তাহলে তিনি তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর শিকার হবেন। আর যদি প্রস্তর-নির্মিত দুর্গ পরিবৃত স্থানে আশ্রয় নেন তাহ'লে তাদের তিন হাযার ফৌজ সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে কয়েক দিনের ভেতরই মুসলমানদেরকে ধ্বংস করে দেবে। তাদের সমর-পরিকল্পনায় অপর কোন বিকল্প ব্যবস্থার কল্পনা ছিল না। কিন্তু আঁ-হযরত (সা)-কে তাঁর গুপ্তচরেরা দুশমনের অভিপ্রায় এবং তাদের গতিবিধি সম্পর্কে পুরোপুরি সতর্ক করে দিয়েছিল। অতএব তিনি এবারও দুশমনকে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে নিক্ষেপ করে এমন কৌশল অবলম্বন করেন যে, কুরায়শদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ নস্যাৎ হয়ে যায়। তিনি অন্ধকারে দুরতিক্রম্য রাস্তা পাড়ি দিয়ে 'আয়নায়ন-এর মোর্চার উপর কব্জা জমিয়ে বসেন। এই কাজ তিনি অত্যন্ত গোপনীয়তা ও সতর্কতার সঙ্গে করেন। মুনাফিকরা পর্যন্ত তাঁর এ উদ্দেশ্য ধরতে ও বুঝতে সক্ষম হয়নি। তাছাড়া মুনাফিক 'আবদুল্লাহ্ বিন উবায় সলূল নিরাশ হয়ে মুসলিম বাহিনী থেকে সেই সময় কেটে পড়ে। তার কেটে পড়ার দরুন মুসলমানদের কোন ক্ষতি হয় নি, আবার কুরায়শদেরও কোন ফায়দা হবার সম্ভাবনা ছিল না। কেননা তারা কুরায়শদের নিকট গিয়ে আঁ-হযরত (সা)-এর পরিকল্পনা সম্পর্কে

কিছুই বলতে পারত না। আর যে সব খবর মুনাফিকরা তাদেরকে পৌছি-য়েছিল তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল।

আঁ-হযরত (সা)-এর পরিকল্পনা ছিল নেহায়েত সাদামাটা, কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর। তিনি তাঁর কতিপয় ঘোড়সওয়ারকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যবহার করেন, ঠিক সেই সময় যখন বিজয় তাঁর কয়েক কদমের মধ্যে ছিল। মুসলিম তীরন্দাযদের অধৈর্য এবং খালিদের সুযোগ-সন্ধানী দৃষ্টি মুসলিম বাহিনীকে বিপদের মাঝে নিক্ষেপ করে। তথাপি আঁ-হযরত (সা) পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন এবং ভালভাবেই সক্ষম হন। যুদ্ধের ভেতর এমন মুহূর্ত-গুলো দেশ ও জাতির কিসমতের ফয়সালা করে দেয় এবং এমনতর সময়ই সিপাহসালারের যোগ্যতার পরীক্ষা হয়ে থাকে। বস্তুত আঁ-হযরত (সা) পরিমাপ করেন যে, এ মুহূর্তে সঠিক কর্মপন্থা এই যে, মুসলিম বাহিনীর বিক্ষিপ্ত সদস্যদেরকে এমন একটা জায়গায় জমায়েত করা উচিত যেখানে তারা শত্রুর অশ্বারোহী বাহিনীর হামলার পূর্বেই তাদের নাগালের বাইরে নিরাপদ থাকবে যাতে তাদের পদাতিক ফৌজ পালটা হামলা করতে না পারে। অতএব তিনি ওহুদ পর্বতের চূড়ায় আরোহণ করেন এবং সেখানে মোর্চা কায়েম করে তাদেরকে খালিদের অশ্বারোহী বাহিনীর হাত থেকে নিরাপদ করে ফেলেন। সেই নাযুক মুহূর্তে আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতি উৎ-সর্গীতপ্রাণ সাহাবাবৃন্দ জীবনকে বাজী রেখে দুশমনের প্রতিরোধ করেন এবং কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় সাহাবা—যাঁদের মধ্যে হযরত হামযা (রা)-এর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, দুশমনের উপর পালটা আঘাত হানতে গিয়ে শহীদ হন। হযরত 'আলী (রা) ওহুদ গিরিপথ আগলে রাখেন এবং কোন অবস্থাতেই তা হস্তচ্যুত হতে দেন নি। এরই ভেতর মুসলিম বাহিনীর বিক্ষিপ্ত লোক-জন জামায়েত হতে শুরু করে। এরপর দুশমন যে পালটা হামলা করে তা ব্যর্থ হয়। একদিকে ছিল জীবনকে উৎসর্গ করার আবেগোদ্দীপ্ত প্রেরণা আর তাতে আঁ-হযরত (সা) ব্যক্তিগত শৌর্যবীর্য দ্বারা দৃঢ়তার এমন সবক দিলেন যে, শত্রু আর কোথাও সুস্থিরভাবে পা রাখতে পারে নি। তারা চেয়ে-ছিল সামনে অগ্রসর হতে, কিন্তু দুর্জয় লৌহ-প্রাকারসম প্রতিরক্ষাব্যূহ দৃষ্টে তাদেরকে পিছু হটতে হয়, এমন কি শত্রু সেনাপতি আবূ সুফিয়ানকে আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা নৈপুণ্যের স্বীকৃতি দিয়ে ও তাঁর সামনে মাথা নত করে ময়দান পরিত্যাগ করে মক্কায় পালিয়ে যেতে হয়। বদর যুদ্ধে

কুরায়শ বাহিনীকে যদি আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষাগত শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিতে কিছু সন্দেহ ও সংশয় থেকেও থাকে, এবার তা সম্পূর্ণ ঘুচে যায়। ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের কেবল সামরিক বিজয়ই অর্জিত হয়নি, বরং তারা নৈতিক বিজয় লাভেও ধন্য হয়। আর এটা স্বীকৃত নীতি যে, যে পক্ষের শত্রুর উপর নৈতিক বিজয় সাধিত হয় তারা পরাজিত ফৌজের মধ্যে দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার অনুভূতি জন্ম দিতে সক্ষম হয়। এর পর সে আর একাকী সংঘর্ষে নামার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারে না, বরং অন্যের নির্ভরতা ও সাহায্যের আবশ্যক হয়ে পড়ে। এজন্যই নৈতিক বিজয়কেই স্থায়ী বিজয় বলা হয়।

খন্দক যুদ্ধ

ওহুদের পরে কুরায়শদেরকে সাহায্যের জন্য দরজায় দরজায় ধর্ণা দিতে হয়। তারা অন্যান্য কবিলা ছাড়াও য়াহূদীদের নিকটও সাহায্যের দরখাস্ত পেশ করে এবং একথা স্বীকার করে নেয় যে, তারা একাকী আঁ-হযরত (সা)-এর মুকাবিলায় আর আসতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পয়লা দু'টি যুদ্ধেও তারা একাকী ছিল না। কিন্তু এখন শক্তির অহমিকা প্রদর্শনের পরিবর্তে দুর্বলতার স্বীকৃতি দিয়ে বেড়াতে লাগল এবং খোলাখুলি বলতে লাগলঃ আমরা প্রথমে দু'দফা থাপপড় খেয়েছি। এখন অপরাপর কবিলা ও য়াহূদীরা যদি তাদের সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তাহলে তাদের আর কোথাও দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না; ইসলামের বিস্তৃতি এবং আঁ-হযরত (সা)-এর শক্তি সকল নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

য়াহূদীরা সামগ্রিকভাবে কুরায়শদের পেছনে ছিল। কিন্তু সাহায্যের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অন্যরূপ, যদিও ইসলামের শক্তি সম্পর্কে তাদের ভীতি ছিল এবং মুসলমান ও মুশরিকদের যুদ্ধ থেকে তারা ফায়দা লুটবার খা'ব দেখছিল। তাদের মধ্যে দুটি দল হয়ে গিয়েছিল। একটি দল, যাদের আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিল। তারা তাঁর ইনসাফ, উচ্চ মনোবল, প্রশস্ত হৃদয়, যোগ্যতা, মতামতের অভ্রান্ততা এবং নেক নিয়ত দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং তাঁর 'আকীদা-বিশ্বাস দৃষ্টে একথা বলত যে, খুব সম্ভব মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর মনোনীত নবীই

হবেন। কবিলাগুলোর পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও ঐক্য, সংযম ও শৃংখলা, শান্তি ও নিরাপত্তার এমন কোন বস্তু ছিল না, যার উপর আঁ-হযরত (সা)-এর প্রভাব পড়েনি। অতএব তাদের স্বাভাবিক খাহেশ ছিল এটাই যে, বন্য, লম্পট এবং বিশ্বাসের অযোগ্য কবিলাগুলোর মুকাবিলায়—এবং যারা মুশরিক ও বুত-পরস্ত ও (মূর্তিপূজক) বটে—আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা যাক। কিন্তু অপর দল বলত যে, এখনো ইসলামী সমাজ সুশৃংখল ও সুদৃঢ় নয়, এজন্য তাদের উৎসাদন করা যেতে পারে। তারা য়াহূদীদের জুলুমবাজী এবং অবিশ্বস্ততাকে স্বীকার করত না, বরং নিজেদের দোষ-ত্রুটিগুলোর অপবাদও আঁ-হযরত (সা)-কেই দিত। এছাড়া তাদের এও ভয় ছিল যে, যদি মুহাম্মদ (সা) সত্যিই নবীয়ে বরহক হয়ে থাকেন, তাহ'লে তাদের ধর্মগ্রন্থ তওরাত মুতাবিক তিনি তাদের উপর বিজয়ী হবেন এবং একথা তাদের বংশীয় ও ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকার পরিপন্থী ছিল। সুতরাং তারা এসব কারণে বিরোধী ও শত্রুপক্ষের হাত মযবুত করে এখন থেকেই নিজেদের হেফাজতের ব্যবস্থা করার প্রত্যাশী ছিল।

এতদ্ভিন্ন তাদের সামনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রাধান্যের প্রশ্নও ছিল। যাহূদীরা সর্বোত্তম কৃষি জমি এবং ভাল ভাল খেজুরের বাগানের মালিক ছিল। গোত্রগুলোকে একের বিরুদ্ধে অপরকে লাগিয়ে দিয়ে অথবা সূদী কার-বারের মাধ্যমে সেগুলো তারা হাতিয়ে নিয়েছিল। তাদের আশংকা ছিল যে, যদি মুহাম্মদ (সা)-এর মত যোগ্য ও উত্তম মানুষ তাদের স্বীকৃত নেতা হয়ে যান তাহলে সেগুলো আর তাদের কব্জায় থাকবে না। তাঁকে যদি এখন থেকেই বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় তাহলে কুরায়শ এবং অন্য কবিলা-গুলোর বর্তমান অটল ও স্থায়ী বন্ধুত্ব সহজেই খতম করে দিয়ে নিজেদের অবস্থান ঠিক রাখা যাবে। অতএব তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, কুরায়শদের সাহায্য করা হোক এবং যতগুলো কবিলাকে আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তোলা যায়, করে তোলা যাক। অতঃপর এ সিদ্ধান্তকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য য়াহূদীরা দু'টো পন্থা অবলম্বন করে। একটি প্রকাশ্য বিরোধিতা আর অপরটি গোপন বিরোধিতা। কিছু কবিলাকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তারা প্রকাশ্যভাবে কুরায়শ ও তার মিত্রদের যেন সাহায্য করে এবং অন্যদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয় যে, তারা মুহাম্মদ (সা)-এর দলবলের সঙ্গে মিশে যাবে এবং তাদের পরিকল্পনা ও কৌশল সম্পর্কে তাঁর বিরোধী-দেরকে অবহিত রাখবে। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ (সা)-ই যদি কামিয়াব হয়ে

যান, তাহলে কমপক্ষে আমাদের জন্য সুপারিশ করবার একটি দলতো থাকবে যারা তাঁর থেকে কিছু রেয়াত অন্তত আনতে পারবে। সার-কথা, কুরায়শ-দের হামদর্দ কবিলা মদীনার আশেপাশে বর্তমান এবং উপরিউক্ত পন্থায় তারা ভূমিকা গ্রহণ করে নিজেদেরকে নিরাপদ রাখতে চাচ্ছে। যা-ই হোক, এভাবেই সমর্থন ও সহযোগিতার লম্বা-চওড়া জাল বিছিয়ে কুরায়শরা তৃতীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং তাকে যেভাবেই হোক চূড়ান্ত যুদ্ধের রূপ দেবার প্রয়াস পায়। আঁ-হযরত (সা) গুপ্তচর মারফত শত্রুর যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হতে থাকেন। তিনিও প্রতিরক্ষার সকল বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু দুশমনকে নিজের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞতার মাঝে রাখেন। বদর ও ওহুদে তিনি কুরায়শদেরকে নিজের নির্বাচিত ময়দানে তাঁরই যুদ্ধের নকশা মাফিক লড়াই করতে বাধ্য করেন। তিনি এমনই চাল চালেন যে, যার অনিবার্য পরিণতি প্রতিপক্ষের ধ্বংস ও পরাজয় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বদর প্রান্তরে তারা তাদের অশ্বারোহী বাহিনী কাজে লাগাতে পারেনি। আর ওহুদের যুদ্ধে তা ব্যবহারের সুযোগ মিলল, কিন্তু তাও অত্যন্ত ভুল পন্থায়। তারা অশ্বারোহী বাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করে নিজেদের দক্ষিণ ও বাম পার্শ্ব নিরাপদ করে নেয় বটে, কিন্তু যখন আঁ-হযরত (সা)-এর ফৌজের উপর হামলার নির্দেশ হ'ল তখন এই বাহিনী নিজেদের পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ যোগাযোগ কায়েমে ব্যর্থ হ'ল, বরং একটি কোম্পানীকে যখন মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী এসে ঘিরে ধরল তখন অন্যরা কেবল তামাশা দেখতে থাকল। 'ইকরামা যেমন খালিদকে কোন-রূপ সাহায্য দিতে পারেনি, তেমনি খালিদও পারেনি 'ইকরামাকে কোনরূপ সাহায্য করতে। এমনি অবস্থা হয়েছিল পদাতিক ফৌজেরও। এরূপ অবস্থা হবার কারণ ছিল 'ইকরামা ও খালিদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু এটা কে অস্বীকার করতে পারে যে, এর ফল কুরায়শদের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক ও ক্ষতিকর প্রমাণিত হয় এবং তা এজন্য যে, আঁ-হযরত (সা) কুরায়শদের পরিকল্পনাকে উলটিয়ে নিজের প্রতিরক্ষা কৌশলের স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত করে নিয়েছিলেন।

এভাবেই দু'বার পরাজয়ের পর তারা যখন তৃতীয় দফা আক্রমণের প্রস্তুতি নেয় তখন সেখানেও সংখ্যাভিত্তিক প্রাধান্য এবং বস্তুগত উপকরণের আধিক্যকেই চূড়ান্ত উপাদান হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়। আর খেয়াল-খুশি মাফিক তারা বিশাল বাহিনী সজ্জিত করে যেন মুসলমানেরা মুকাবিলার

ধকল সইতে না পারে এবং মদীনার বাইরে গিয়ে না লড়তে পারে, বরং তারা যেন অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। তাদের ধারণা ছিল, অল্প সংখ্যক মুসলমান বিরাট সংখ্যক বাহিনীর বিপুল জালে ফেঁসে গিয়ে অবশ্যই হাতিয়ার সমর্পণ করবে। এই কার্যকলাপের পূর্ণতা সাধনের জন্য তারা শুধু য়াহূদীদেরকেই তাদের শুভানুধ্যায়ী করে নি, বরং যে সব কবিলা আঁ-হযরত (সা)-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যমূলক চুক্তি করেছিল তাদেরকেও তা ছিন্ন করতে উৎসাহিত করে। অনন্তর বনী কুরায়জা তাদের পক্ষপুটে আশ্রয় নেয় এবং মুসলমানদের সঙ্গে প্রতারণা করে শত্রু শিবিরে যোগ দেয়। অন্য কথায়, কুরায়শরা মুসলমানদের নিজেদের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা মুতাবিক চলাচলে অক্ষম করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। একে আজকালকার ইংরেজি পরিভাষায় বলা হয়, "Deny him elbow room for manoeuvre."

কিন্তু আঁ-হযরত (সা) এবারও শত্রুকে বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে কামিয়াব হন। তিনি কতিপয় সাহাবা সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে মদীনার চারপাশে টহল দেন। হযরত সালমান ফারসী (রা) পরিখা খনন করে মোর্চাবন্দ হবার প্রস্তাব পেশ করেন। আঁ-হযরত (সা) এ প্রস্তাব পসন্দ করেন এবং প্রাকৃতিক ও স্থানীয় অবস্থার পুরো ফায়দা উঠিয়ে উপত্যকাসমূহ কিংবা বর্ষাতি নালার সাহায্য নেন। এসব উপত্যকা শুধু কোথাও কোথাও অতিক্রমযোগ্য হয়ে থাকে। অন্যথায় সাধারণত সে সবের প্রান্তদেশ (কিনারা) খুবই বিপজ্জনক হয়ে থাকে, আর এগুলো খুব বেশী গভীরও নয়। যদি সেগুলো খনন করে আরও চওড়া ও গভীর করে দেওয়া যেত তাহলে কোন লোকই একদিক থেকে অপর দিকে যেতে পারত না। তিনি খন্দকের সীমারেখা নির্ধারণ করেন এবং সে সব উপত্যকা থেকেই তার উদ্বোধন করেন যার ফলে মদীনা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে অতি সহজেই নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়ে যায়। উত্তর দিকে বড় কোন উপত্যকা ছিল না, সেইজন্য সেদিকে তিনি খন্দক খননের হুকুম দেন এবং নিজেও এ কাজে অংশ গ্রহণ করেন। একাজও সত্বর পূর্ণতায় পৌঁছে যায়। মদীনার মুনাফিক ও দুর্বলচেতা লোকগুলো নিজেদের অন্তর্নিহিত বদ স্বভাবের প্রমাণ দেয় এবং তাঁর প্রতিরক্ষা কার্যকলাপকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে চেষ্টা চালায় যাতে মুসলমানদের অন্তরে এর ফলে ত্রাসের সঞ্চার হয়। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) fighting

on interior lines নীতির উপর অটল থাকেন এবং তার বাস্তব রূপ ছিল নিম্নরূপঃ
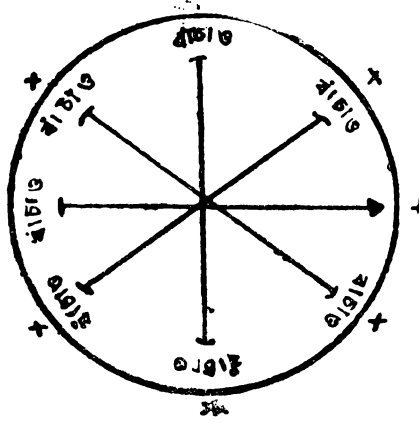
অর্থাৎ যখন দুশমন চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখবে তখন তার বিরুদ্ধে এভাবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবেঃ তাদের একটি অংশের উপর হামলা করতে হবে এবং এমন অতর্কিতে ও বিদ্যুত গতিতে তা করতে হবে যে, তাদের অপরাপর সাথী-বন্ধু যেন জানতে না পারে। ফলে লাভ দাঁড়াবে এই যে, তারা তাদের সাহায্যার্থে আসার পূর্বেই তাদেরকে (প্রথম অংশকে) ধ্বংস করা যাবে। ঠিক এমনি করে দ্বিতীয় অংশের উপর হামলা করে তাদেরকেও ধ্বংস করতে হবে। এমতাবস্থায় আত্মরক্ষারত পক্ষ নিজেদের তলোয়ারের সাহায্যে সবাইকে পালাক্রমে খতম করতে থাকবে এবং চালের সাহায্যে অবশিষ্ট আক্রমণকারীদের প্রতিরোধও করে চলবে।

খন্দক যুদ্ধের প্রতিরক্ষাবৃত্ত যদিও শহরের সীমারেখা থেকে ছোট্ট, তথাপি দুশমন তাঁর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা ও সামরিক চাল সম্পর্কে ছিল বে-খবর। একদিকে মুসলিম বাহিনীর গতিবিধি তথা চলাচলের জন্য যথেষ্ট জায়গা, আর অন্য দিকে শত্রুর ফৌজের জন্য বিরাট খোলামেলা ময়দান। এর উদ্দেশ্য এই যে, মুসলমানদের তলোয়ার যখন একস্থানে দুশমনকে আঘাত হানছে, আহত করছে, তখন তারা এই গতিবিধি ও চালের সাহায্যে স্বয়ং শত্রুর আঘাত থেকে নিরাপদ থাকছে।

অনন্তর খন্দক যুদ্ধের অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, একদিকে একই সময়ে আঁ-হযরত (সা)-এর অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক যুবায়র (রা) শত্রুর

রসদ-সম্ভারের কাফেলার উপর হামলা করে তা লুটে নিচ্ছেন আর অপর দিকে পদাতিক ফৌজ বিভিন্ন স্থানে শত্রুর সেই সব কোম্পানীর সঙ্গে লড়ছে যারা খন্দক পার হবার চেষ্টা করছিল। অতঃপর এও দেখেছি যে, তিনি স্বীয় ফৌজ ছোট্ট ছোট্ট প্লাটুনে বিভক্ত করে তাকে কমযোর করেন নি, বরং তার বিরাট সংখ্যাকে অধীনস্থ অধিনায়কদের নেতৃত্বাধীনে এভাবে মোতায়েন করেন যে, যে-দিকেই দুশমনের বিপদাশংকা দেখা দিক না কেন সেখানে মুহূর্তের ভেতরই একটি মযবুত প্লাটুন পালটা হামলার জন্য যেন পৌছে যায়। একবার শত্রুর জানবায ঘোড়সওয়ার খন্দক পার হয়ে ভেতরে এসে গিয়েছিল। তাদের একটি প্রাণীও জান নিয়ে ফিরে যেতে পারেনি।

কুরায়শদের ধারণা ছিল, আর এ ধারণা পেছনের দু'টি যুদ্ধের আগেও ছিলঃ আমরা এতবড় বাহিনী নিয়ে যাচ্ছি যে, মুসলমানদেরকে কয়েক দিনের ভেতরেই খতম করে ফিরে আসব। কিন্তু মদীনার নিকটে পৌছে খন্দকের মোর্চাবন্দী দেখে তারা ভীষণ রকম বিস্মিত হয়। অবস্থান এত-খানি দীর্ঘায়িত হ'ল যে, এই দীর্ঘতা মুসলমানদের পরিবর্তে স্বয়ং তাদের জন্যই বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াল। খাদ্য, পশুর ঘাস, পানির কষ্ট, মৌসুমের তীব্রতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিভেদ ইত্যাদির ফল এই দাঁড়াল যে, কৃত্রিম ঐক্যের বুনিয়াদ বহুধা বিভক্তির শিকার হল এবং সম্মিলিত বাহিনী অত্যন্ত তাড়াহুড়োর ভেতর দিয়ে নিজ নিজ এলাকায় পালিয়ে গেল। বদর যুদ্ধ যেখানে কাফির ও মুশরিকদের মনে তাদের সিপাহ্সালারের অযোগ্যতার কারণে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং আঁ-হযরত (সা)-এর সামরিক যোগ্যতার অপ্রতিহত প্রভাব ফেলেছিল, আর ওহুদ যুদ্ধক্ষেত্রের পরাজয় ছাড়াও গোটা কুরায়শ সমাজকে নৈতিক পরাজয় স্বীকারে বাধ্য করেছিল, সেখানে খন্দক যুদ্ধ কুরায়শ ছাড়াও তাদের সমস্ত মিত্রশক্তি, সমব্যথী ও সহযোগীদের কমযোরীকেও ফাঁস করে দেয়। এরপর সমগ্র কবিলা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বসে যায় এবং কয়েকটি কবিলা মদীনায় এসে সন্ধির দরখাস্ত পেশ করে এবং নিরাপত্তা লাভ করে।

প্রতিরক্ষা বৃত্ত

খন্দক যুদ্ধের পর তিনি মদীনার বাইরে বিস্তৃততর বৃত্তের দিকে দৃষ্টি-পাত করেন এবং interior lines-এর প্রতিরক্ষা নীতির সাহায্য গ্রহণ করে

প্রথমে নিকটতম দুশমনের হাত থেকে নিজেকে নিরাপদ করেন এবং বনী কুরায়জাকে তাদের ষড়যন্ত্র ও গাদ্দারীর সাজা দেন। এরপর এই বৃত্তের চতুর্দিকে বিভিন্ন অভিযান প্রেরণ করেন। যদিও এসবগুলোর কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, কিন্তু সেগুলোর প্রত্যেকটিই মূল প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা অর্থাৎ হিজরত পরিকল্পনার আওতাধীন ছিল। কতক অভিযান ছিল চালবায, কৌশলী ও অতিমাত্রায় সতর্ক ও ধূর্ত কোম্পানী কিংবা প্লাটুনের, আর কতক ছিল জানাবায কোম্পানীর। কোথাও কাজ করছিল গুপ্তচর আর কোথাও গোপন সংবাদদাতা কিংবা গোয়েন্দা।

হুদায়বিয়ার সন্ধি

খন্দক যুদ্ধ ইসলাম ও কুফর অথবা কুরায়শ ও আঁ-হযরত (সা)-এর ভেতর একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ ছিল। এতে কুরায়শ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গ ও আশে-পাশের সকল সহযোগীরই পরাজয় ঘটেছিল আর তিনি সবার উপর হয়েছিলেন বিজয়ী। শুধুমাত্র কুরায়শ, শুধু মক্কাবাসী এবং কেবলমাত্র বিভিন্ন গোত্র ও কবিলাই নয়, প্রতিটি অমুসলিম কবিলার পায়ের তলার যমীন সরে গিয়েছিল। অন্য কথায় এটাকে এভাবে বলুন যে, ফসল পাকা শেষ, শুধুমাত্র কেটে ঘরে তোলার অপেক্ষা এবং কাটার দরকার এমন স্থান থেকে ছিল যেখানে ফসল পেকেছিল এবং এতটুকু গাফিলতিতে ক্ষতির আশংকা ছিল প্রচুর। হেজাযের কৃষির এই প্রান্ত যেখান থেকে কাটাবার আবশ্যক ছিল তারা ছিল কুরায়শ। অতএব তিনি মক্কার দিকে মুখ ফেরালেন এবং শান্তি ও সমঝোতার পয়গামের মাধ্যমে তাদেরকে সরল ও সঠিক পথে আনবার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু তাঁর কর্ম-পদ্ধতি ছিল একেবারে অভিনব। 'উমরাহ্‌র জন্য তিনি রওয়ানা হলেন আর তার প্রস্তুতি নিলেন ব্যাপকভাবে। সঙ্গী-সাথীদের সংখ্যা বিস্তর, কিন্তু নির্বাচনে অতিমাত্রায় সতর্কতা অবলম্বন করলেন; কুরবানীর উট সরবরাহ করা হল কিন্তু রওয়ানা হবার ব্যাপারটাকে রাখা হল সম্পূর্ণ গোপন আর নিয়মমাফিক অবলম্বন করা হল অপরিচিত এবং দুরতিক্রম্য রাস্তা। কুরায়শরা খবর পেয়ে যায় এবং এটাকে মক্কা দখলের অভিসন্ধি হিসাবে ধরে নেয়। এবং সাহায্যের জন্য তারা এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করতে থাকে। কিন্তু আশেপাশের কতিপয় কবিলা ভিন্ন আর কেউ তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে না। তারা আতংকিত

এবং নিজেদের কল্যাণ কামনায় চিন্তিত ও অধীর হয়ে ওঠে। আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষামূলক কার্যকলাপ কোথায় প্রকাশ পাবে এবং কিভাবে আঘাত হানবে তারা বুঝতে পারে না। হেজাযের বিভিন্ন কবিলা প্রমাদ গোণে যে, তারাও এই আক্রমণের নিশানায় পরিণত হতে পারে। ফলে তারা কুরায়শদের ডাকে সাড়া দেয় না, সম্মিলিত হয় না। তাছাড়া এই কুরায়শ তো তারাই যারা লম্বা-চওড়া ঢাকঢোল পিটিয়ে বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হয় আর হামেশাই পরাজয়ের যিল্লতী গায়ে মেখে ফিরে আসে। তাদের উপর কিভাবে ভরসা করা চলে যারা খন্দক যুদ্ধে সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে পালিয়ে এসেছিল? অবশেষে নিতান্ত মযবুর হয়ে কুরায়শরা যতটুকু পারে সমাবেশ ঘটায় আর সব কবিলা বলেঃ তোমরা অগ্রসর হও এবং মুসলমানদের রুখে দাঁড়াও।

এখন তাদের চিন্তাঃ আঁ-হযরত (সা)-কে রুখব বটে, কিন্তু কোথায়? কোন্ পথ দিয়ে তিনি আসবেন তা কে জানে। কুরায়শদের কিছু সংখ্যক সরদার বলছে যে, বদর ও ওহুদের মত 'উসফানের রাস্তা ধরে আসবেন। কেননা মুহাম্মদ (সা)-এর নীতিই হল যেখানে তিনি হামলা করবেন সেখানকার অবস্থাদি বেশ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং অধিনায়কদেরও প্রত্যক্ষ করার ব্যবস্থা করা। বনী লেহয়ান যুদ্ধের উদাহরণ পেশ করে এবং বলেঃ তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তো শুধু বাহানামাত্র ছিল। কেননা যদি তাদের শাস্তি প্রদানই উদ্দেশ্য হত তাহলে তারা যখন মুকাবিলার ধাক্কা সামলাতে না পেরে পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল তখন তিনি লুটপাট কিংবা পশ্চাদ্ধাবন করার পরিবর্তে গাররান থেকে 'উসফান আসেন এবং কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে মক্কার কাছাকাছি পর্যন্ত পাঠান। এই মতই সঠিক বলে মনে হয়। অতএব তারা ফৌজসহ পয়লা যী-তাওয়া নামক স্থানে অবস্থান করে এবং খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদকে অশ্বারোহী বাহিনীসহ কিরা' আন-না'ঈম পাঠিয়ে দেয় এবং তাকীদ করেঃ 'উসফান-এর গিরিপথে মোর্চাবন্দ হয়ে মুসলমানদেরকে বাধা দিয়ে রাখবে যতক্ষণ পর্যন্ত পদাতিক সৈন্যরা সাহায্যকারী বাহিনী হিসাবে না পৌঁছে। কা'ব বিন লুওয়াই এবং তাদের মিত্র কবিলা হুদায়বিয়ার জলাশয়ের নিকট তাবু ফেলে। তারা বরং মক্কার নিকটে থাকাটাকেই পসন্দ করে এবং এটা এ কথার প্রমাণ, তারা কুরায়শদের শক্তির উপর আস্থাশীল ছিল না. তাদের সাফল্যের

ব্যাপারেও আশাবাদী ছিল না, এমন কি তারা সন্তুষ্টচিত্তে মুকাবিলার নিয়তেও আসেনি।

কুরায়শদের তৎপরতার অবস্থা জেনে আঁ-হযরত (সা) সাহাবাদের বলেনঃ কুরায়শদের হয়েছেটা কি! তাদের মাথায় যুদ্ধের ভূত সওয়ার হয়েছে আর তারা একেবারেই কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে বসেছে। যদি তারা আমার ও অন্য আরবদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়ায় তাহলে তাদের এমন কিছুই ক্ষতি হবে না। যদি অন্য আরবেরা আমাকে কতল করে ফেলে তাহলে কুরায়শদের অভিলাষ পূরণ হবে। আর আল্লাহ্ যদি আমাকে বিজয় দান করেন তাহলে তারা ইসলামে প্রবেশ করুক। তাদের ইসলাম গ্রহণের দ্বারা মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এটাও যদি তাদের মনঃপূত না হয় তাহলে তাদের সম্পূর্ণ ইখতিয়ার থাকবে, সে সময়ও আমাদের সঙ্গে লড়বার মত শক্তি তাদের মধ্যে থাকবে। শেষ পর্যন্ত তারা কী চিন্তা-ভাবনা করছে? আল্লাহ্র কসম! আমি আমার ধর্মের জন্য, আদর্শের জন্য, যে ধর্ম ও আদর্শ প্রচারের জন্য আল্লাহ্ আমাকে পাঠিয়েছেন---তাদের সঙ্গে লড়াই করব। এতে হয় আল্লাহ্ আমাকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবেন, নয় আমার জীবন-প্রদীপ নিবিয়ে দেবেন।

এরপর তিনি এমন চাল চালেন যে, সাপও মরল অথচ লাঠিও ভাঙল না। তিনি যাবার রাস্তা বদলে ফেললেন এবং সাধারণ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অত্যন্ত দুরতিক্রম্য ও বিপদসংকুল পাহাড়ী রাস্তার পথ ধরলেন। তিনি কুরায়শদের আশা-আকাংক্ষার বিপরীত মক্কার নিম্ন এলাকায় হুদায়বিয়ার পাদদেশে তাছনিয়াতুল-মিরার নামক স্থানে উপনীত হন। কুরায়শ অশ্বারোহী বাহিনী দূর থেকে আঁ-হযরত (সা)-এর কাফেলার ধূলো উড়তে দেখতে পায়। তারা তক্ষুণি নিজেদের লোক-লশকরের নিকট গিয়ে সেই অবস্থার কথা তাদের জানিয়ে দিল। সে সময় আঁ-হযরত (সা) এইরূপ অবস্থায় ছিলেন যে, কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়েই তিনি মক্কা প্রবেশ করতে পারতেন। কেননা কুরায়শ বাহিনী তাঁর থেকে কয়েক মাইল পেছনে ছিল। একমাত্র কা'ব বিন লুওয়াই এবং তার সঙ্গী-সাথীদের তরফ থেকে প্রতিরোধের আশংকা ছিল। কিন্তু সেও নীতিগত দিক দিয়ে বাধা দিতে কামিয়াব হতে পারত না। অবশ্য প্রবেশের পর এরা ও অন্যান্য কুরায়শ তাদের উপর হামলা করতে পারত এবং সে মুহূর্তে মক্কার অলিগলিতে ও তার আশেপাশে ভীষণ

রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটত এবং যেহেতু প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার সামরিক অবস্থানের দিক দিয়ে মুসলমানদের ছিল প্রাধান্য, সেহেতু মুসলমানদের নিশ্চিতভাবেই জয়লাভ ঘটত। কিন্তু এভাবে কুরায়শ ও অপরাপর কবিলার ভেতর ঘৃণা-বিদ্বেষ ও প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত। আর তা নিবাতে চাইলেও সহজে নিবত না। সাহাবা (রা)-দের মধ্যে কয়েকজন এ সুযোগে ফায়দা হাসিল করার পরামর্শও দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি সে পরামর্শে মক্কায় প্রবেশ করেন নি, বরং হুদায়বিয়ার উপত্যকায় তাছনিয়াতুল-মিরার-এর নিকটবর্তী স্থানে ছাউনী ফেলেন।

এই প্রকারের সামরিক কূট-কৌশল ও চালকে indirect approach বলা হয়। একে খুব কমই এবং কচিৎ কোন জেনারেল সফলতা ও কামিয়াবীর সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। তাঁর এই কর্মপদ্ধতির সাফল্যের ব্যাপারে পূর্ণ বিশ্বাস ছিল এবং তার একটি প্রমাণ এই যে, যখন বুদায়ল বিন ওয়ারাকা আল-খুযা'ঈ আঁ-হযরত (সা)-এর খেদমতে হাযির হয়ে কুরায়শ ও মিত্রদের সম্পর্কে বাগাড়ম্বরতার সঙ্গে বর্ণনা দিয়ে লড়াই-এর ফলাফল ও পরিণতি সম্পর্কে ভয় দেখাতে লাগল তখন তিনি বলেছিলেনঃ যদিও বাযীতে আপনারা হেরে গেছেন, তবুও সন্ধির প্রস্তাব আমিই প্রথম পেশ করছি।

সংক্ষিপ্ত এই জবাবের প্রতিক্রিয়া বুদায়লের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং সে কুরায়শ ও অপরাপর কবিলাগুলোকে বিশ্বাস করাতে সমর্থ হয় যে, লড়াই করার চেয়ে সন্ধি করা সকল দিক দিয়েই উত্তম।

বুদায়ল অনেক চেষ্টা করে তাদের সন্ধির কথায় রাযী করাতে সমর্থ হলেও তাদের মধ্যে যে শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকা ছিল তখনও তা তাদের মন থেকে মুছে যায়নি এবং উপর্যুপরি পরাজয় ও ব্যর্থতায় তাদের হৃদয়-কন্দরও লজ্জায় ভরে গিয়েছিল। ফলে সন্ধি শর্ত লিখতে ও মুসাবিদা তৈরী করার সময় তারা আপত্তিকর কথাবার্তা বলতে শুরু করে। সে সময় যদি অন্য কোন ব্যক্তি তাদের প্রতিপক্ষ হত তাহলে তখনই সেখানে একটা রক্তপাত ঘটে যেত। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করে পরিস্থিতি সামলে নেন। সুলেহ্‌নামা তৈরী হয়ে যায় আর লোকেরাও এভাবে একটা রক্তপাতের হাত থেকে বেঁচে যায়।

মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পাবেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুরায়শদের কার্য-পদ্ধতি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, পরাজয়ের গ্লানিতে তাদের

মন ভরে গিয়েছিল এবং তাদের অবস্থা ছিল সেই জুয়াড়ীর মত, যে লড়াই-এর ময়দানে বাযী জিততে গিয়ে শেষাবধি কেবল 'ইয্যত ও দৌলতই হারায় না, বরং জীবনের সর্বস্বই হারিয়ে ফেলে এবং তার জীবনে পরাজয়, অক্ষমতা ও হতাশা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এমতাবস্থায় টালমাটাল হওয়া এবং মেজায বিগড়ানো তাদের মানসিক দুর্বলতারই প্রমাণ। এ কারণেই আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে অক্ষম তথা মা'জুর বিবেচনা করে খুবই ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে কাজ করেন এবং তাদের মৃতপ্রায় জীবনের উপর আর কোন চাবুক মারার পরিবর্তে কোমল ও সদয় ব্যবহার করেন। তিনি কুরায়শদের নিশ্চিহ্ন করতে চাননি, তাদের 'ইয্যত-আবরু তথা মান-মর্যাদা খতম করে দিতে চাননি, আর তাদের পৈত্রিক সম্পত্তিও ছিনিয়ে নিতে চাননি; বরং তাদের 'ইয্যত ও মাথা উঁচু করে বাঁচার অধিকার প্রদান করতে চেয়েছেন, তাদের সকল হক প্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন করে রাখতে চেয়েছেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে আঁ-হযরত (সা)-এর বাণী এই যে, এমত অবস্থায় বিজয়ীর কর্ম-পদ্ধতি এমনটিই হওয়া উচিত এবং শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ধৈর্য ও কৌশলের সাহায্যে কাজ করা দরকার।

সন্ধির শর্তাবলীর ক্ষেত্রে দৃশ্যত আঁ-হযরত (সা)-এর তরফ থেকে দুর্বলতারই প্রকাশ ঘটতে দেখা যায় এবং কোন কোন সাহাবা (রা) এতে বিমর্ষও হন। কিন্তু এটাই কামিয়াবী হাসিলের নীতি। আঁ-হযরত (সা)-এর দূরদৃষ্টি সেটা বুঝতে দেরী করেনি এবং যখন তিনি সাহাবা (রা)-দের সন্ধির গভীর রহস্য জানিয়ে দেন তখন তারাও তৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হন।

খায়বার যুদ্ধ

এরপর তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং কেন্দ্রে বসে বিস্তৃততর বৃত্তের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার ছোটখাট অংশগুলোকে বাস্তবায়িত করেন।

য়াহূদীদের শত্রুতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। মদীনা ও তার পার্শ্ববর্তী য়াহূদী ও তার মিত্র গাতফান আঁ-হযরত (সা)-এর বিরুদ্ধে সেনা সমাবেশ করছিল। তিনি তাদেরকে শায়েস্তা করবার জন্য রওয়ানা হন এবং একই চালে উভয়কেই কাবু করেন যে, তাদের শক্তি ও সমাবেশ চিরদিনের জন্য খতম হয়ে যায়। একদিকে গাতফান আর অপর দিকে খায়বারের য়াহূদী।

গাতফান য়াহূদীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। কিন্তু আঁ-হযরত (সা) যখন তাদের উভয়ের মাঝে অভিজ্ঞ কৌশলে গোপনীয়তার সঙ্গে রওয়ানা হন তখন দু'জনেই নিজ নিজ জায়গায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। গাতফান য়াহূদীদের সাহায্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে নিজেদের বাড়ীঘরের হেফাজতের জন্য ফিরে আসে। আর এভাবেই দু'জনকেই একে অপরের থেকে পৃথক করে পর্যায়-ক্রমে উভয়কেই খতম করেন। য়াহূদীদের অবস্থাও ছিল তাই—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ম্যাজিনো লাইন ভেঙে পড়ার সময় যে অবস্থা ছিল ফরাসীদের। জার্মানরা প্রত্যাশার বিপরীত পিছন থেকে হামলা করে ফরাসীদের গোটা প্রতিরক্ষা কাঠামো বেকার ও অথর্ব করে দেয়। একই অবস্থা খায়বারের অধিবাসীদেরও হয়েছিল। ব্যর্থ হয়ে তারা ওয়াতীগ ও সুলালীম কেল্লায় একত্রিত হয়। আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে অবরুদ্ধ করে বনূ গাতফানের উপর আক্রমণ করেন এবং তাদের শক্তি পর্যুদস্ত করে পুনরায় য়াহূদীদের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং তাদের সাফ করে অপরাপর য়াহূদীদের সাময়িকভাবে কৃষিজীবী হিসাবে সেখানে বসতি করার অনুমতি দেন। ফলে য়াহূদীদের বিভিন্ন কবিলার মধ্যে আরও বিভেদ সৃষ্টি হয়।

আঁ-হযরত (সা)-এর জন্য য়াহূদীদের ফেতনাবাজী ও দাগাবাজীর অবসান ঘটানোর খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। তারা মুসলমানদের দুশমনকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করত এবং মুসলমানদের মধ্যে মুনাফিকী, বিভেদ ও অবিশ্বস্ততা সৃষ্টি করতে হামেশা চেষ্টা চালাত। য়াহূদীরা যদি কুরায়শদেরকে সাহায্য না করত তাহলে ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধে বনূ ফুযারাহ, বনূ মুররাহ, বনূ আশজা', বনূ কুরায়জা প্রভৃতি মদীনা অবরোধে অংশ নিতে পারত না। প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার পরিপূর্ণতার জন্য য়াহূদীদের শাস্তি প্রদান ছিল অপরিহার্য। খায়বার যুদ্ধের সিদ্ধান্ত তাদের সামগ্রিক উৎসাদনের জন্যই নেওয়া হয়েছিল এবং এর সাফল্যের পর সেখানকার য়াহূদীদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

প্রতিনিধিদল ও বিভিন্ন অভিযান

য়াহূদীদের থেকে মুক্ত হয়ে তিনি বিভিন্ন গোত্রীয় ও উপজাতীয় এলাকায় বিভিন্ন প্রতিনিধি দল ও অভিযান প্রেরণ করেন। এ সবের ভেতর সেটাই

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দল ছিল যেটাকে প্রতিরক্ষা বৃত্তের পরিবেষ্টনীতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকবর্গের নিকট পাঠানো হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে মদীনার কেন্দ্রীয় মর্যাদা আরও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। কারণ এখান থেকে আসা-যাওয়ার রাস্তা ছিল সহজ এবং দূরত্ব ছিল কম। আর এ জিনিসগুলো মুবাল্লিগ (প্রচারক) দল ও প্রতিরক্ষামূলক অভিযান দু'টোর জন্যই দরকার ছিল।

মক্কা বিজয়

সুদূর প্রসারিত দিকচক্রবাল যখন মেঘমুক্ত হল আর বিপদের মেঘ কেটে গিয়ে সব বাধাই যখন হল অপসৃত, আঁ-হযরত (সা) তখন মক্কার দিকে মনোবিবেশ করলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিশর্ত ভঙ্গ করে কুরায়শ নিজের জালে নিজেই আটকে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের মিত্র কবিলাকে জুলুম-নির্যাতনের যাঁতাকলে ফেলে আঁ-হযরত (সা)-কে মুখোমুখী হতে বাধ্য করল। তিনি একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে রওয়ানা হন এবং পূর্ব নিয়ম মাফিক গোপন পথ ধরে ও আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। এতে সৈন্য-সামন্ত সুশৃংখল ও সুব্যবস্থাপনার সঙ্গে শহরকে চতুর্দিক থেকে এভাবে বেষ্টন করে যে, কয়েকজন ব্যতিরেকে কারও জীবন যেমন এতে বিনষ্ট হয়নি, তেমনি কারও মালও লুণ্ঠিত হয়নি। কারও 'ইয্যত-আবরূর উপর যেমন এতটুকু আঘাত আসেনি, তেমনি কাউকে লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকারও হতে হয়নি। সবাইকে মাফ করে দেওয়া হয়, সবাইকে করে দেওয়া হয় আযাদ।

মক্কার বিজয় ছিল যেন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার পূর্ণতা সাধন। সমস্ত বিরোধিতা, সমস্ত শত্রুতা, সকল ষড়যন্ত্র এবং সব শয়তানী খতম হয়ে যায়। যিনি ছিলেন উপায়-উপকরণহীন, তিনি আজ বিজয়ী এবং সকল ক্ষমতার মালিক। আর যারা জালিম ও বিদ্রোহী ছিল, বাতিল পরস্তির নিশানবর্দার ছিল, তারা আজ দুর্বল ও দুর্ভাগা এবং হাদিয়ে বরহকের সামনে মস্তকাবনত। তিনি আজ তাদের আযাদী ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তাদের গোনাহ্-খাতা মাফ করছেন, জীবনের সবক দিচ্ছেন এবং প্রকৃত 'ইয্যত ও উন্নত মস্তকের রাজপথ খুলে দিচ্ছেন। আর তারা লজ্জিত, অনুতপ্ত, বিস্মিত ও অশ্রু-ভারাক্রান্ত অবস্থায় তাঁর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছে।

এটাই ছিল হিজরতের উদ্দেশ্য, আর এটাই প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার গোপন রহস্য। এর জন্যই ছিল তাঁর যুদ্ধ, আর এই ছিল তাঁর জয়ের অর্থ। এতটুকু অহংকারের প্রকাশ নেই, কারও মনে দাম্ভিকতা কিংবা আত্মাভিমানের এতটুকু ছোঁয়াচ নেই। মাথা মহান আল্লাহ্‌র দরবারে অবনমিত আর যবান তওফীকে ইলাহীর অভিনন্দন পাঠে মগ্ন। সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

মক্‌কা বিজয়ের পর তিনি হেজাযে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি মনোযোগ দেন। বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট কবিলাগুলোকে সরল ও সঠিক পথে আনয়ন করেন এবং তবলীগী দল পাঠিয়ে ঈমানী দওলত ও 'আমলের সম্পদ দ্বারা ভরপুর করে দেন। তাতে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা يدخلون في دين الله افواجا "তারা দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করবে"-এর বাস্তব রূপ লাভ করে এবং কুফর ও শিরক-এর লীলাভূমি হেজায ঈমান ও ইসলামের দোলনায় পরিণত হয়। এরপর তিনি তবুক অভিযানের ঘোষণা দেন এবং এক বিরাট বাহিনীসহ রওয়ানা হন। এতেও মুনাফিকেরা আগের মতই মুনাফিকী আচরণ দেখিয়ে অভিযানকে কমযোর করতে চায়, কিন্তু ব্যর্থ হয়। যেহেতু তিনি এবার মনযিলে মকসূদ-এর (গন্তব্যস্থল) ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন, এজন্য লোকেরা তা বিশ্বাস করতে পারে নি। সেই কবিলা ও তাদের সরদার যাদের মুকাবিলায় এই অভিযান, তারা এতটুকু প্রস্তুতি নেয় নি। ফল দাঁড়াল এই যে, আঁ-হযরত (সা) যখন তাদের এলাকায় পৌঁছলেন তখন তারা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল এবং সন্ধি করে জিযয়া প্রদানে বাধ্য হল।

এই হল সে সব যুদ্ধ ও অভিযানের সংক্ষিপ্তসার, আঁ-হযরত (সা)-এর চিরস্মরণীয় কীর্তি, আর এটাই হল প্রতিরক্ষা কৌশল এবং মুহাম্মদী সমর-শাস্ত্র যা কুফ্‌র ও তাগুতী শক্তির সমস্ত হাতিয়ার ও সকল হাতকড়াকে বেকার বানিয়ে ইসলামের বিস্তৃতি ও উন্নতি এবং মুসলমানদের উত্থান ও সৌভাগ্যের রাস্তা খুলে দিয়েছিল। আঁ-হযরত (সা)-এর সমস্ত উক্তি, 'আমল ও কার্যকলাপ যেমন আমাদের অবশ্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় এবং আমাদের কর্মের আদর্শ হবার দাবি রাখে, তেমনি তাঁর প্রতিরক্ষানীতির বাস্তবায়নও বাধ্যতামূলক ও অনুকরণযোগ্য। আর এর ভেতর কেন, কি এবং কিভাবে

ইত্যাদি ধরনের প্রশ্নের নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য জবাব বিদ্যমান যা ইসলামের মস্তককে উন্নত ও কায়েম করবার সিলসিলায় পরিণত করা যেতে পারে। এটা আলোকরশ্মির সেই সুউচ্চ মিনার যা গোমরাহীর অন্ধকারে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং অবহেলিত ও অবনমিত লাঞ্ছনার মধ্যে আটকে পড়া মুসলমানদেরকে মনযিলে মকসূদের সন্ধান বাতলে দিচ্ছে। হায় আফসোস! ইসলামের সোজা সরল রাস্তায় চলবার দাবিদারেরা এখনও যদি জাগে! এখনও যদি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখে এবং অন্তরীক্ষ থেকে শোনে যে, ইসলামের আহবায়ক (সা) ইসলামের ভিত্তি নির্মাণে এবং তার দৃঢ়তা সাধনে কি কি করেছেন আর কিভাবে করেছেন! ইসলাম কিসের জন্য এসেছিল আর আমরা তার সঙ্গে কিরূপ আচরণ ও ব্যবহার করছি! ছোট-খাট ফায়দা, নীচু স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তা এবং তথাকথিত আধুনিকতার মধ্যে আমরা কি রকম মত্ত! সময়ের ডাক কি? সব কিছু ছেড়ে-ছুঁড়ে নির্জন ও নিরাপদ ঘরের কোণে বসে আমরা ব্যক্তিক সুখ-সুবিধার কি রকমের হিসাব কষছি। এমনিতে আমাদের মধ্যে জ্ঞানী-গুণী ও প্রবীণ ব্যক্তিও আছেন, শিক্ষক ও মুফতীও আছেন, চিন্তাশীল দার্শনিক ও ভাবুক যেমন আছেন, তেমনি আছেন যাদুকরী লেখনী শক্তির অধিকারীও, রাজনীতির ময়দানে ঝানু ও অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ যেমন আছেন, তেমনি আছেন মিম্বর ও মিহরাবের সৌন্দর্য বর্ধনকারী ব্যক্তিবর্গও। কিন্তু অটুট মনোবলসম্পন্ন ও দৃঢ় বিশ্বাসী এবং সাহসী ও দৃঢ়চেতা পুরুষ কোথায়? ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মস্তক তুলে দাঁড়াতে সাহায্যকারী, প্রয়োজনবোধে জীবন দানকারী ব্যক্তির সংখ্যা কতজন আছেন? কিতাব ও সুন্নতের মজলুম তামাশার পাত্রে পরিণতকারীদের সঠিক পথে আনয়ন এবং প্রতিরক্ষানীতির উপর 'আমলকারী কে আছেন? বিচক্ষণতা ও পরিণাম সন্ধানী এবং 'কে বলেছে, কি বলেছে' ইত্যাদি পরিত্যাগ করে কর্ম-ক্ষেত্রে আসবার জন্য কে প্রস্তুত আছেন? রসূল আকরাম (সা)-এর রাস্তার উপর কে চলতে চায়? একমাত্র তওফীকে ইলাহীর সৌভাগ্য লাভ কার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য? ইসলাম আজ এর জবাব চায়, জবাব চায় ঈমান আর সময়ও এর জবাব চায়।

কি শিক্ষা পেলাম

এতক্ষণ পর্যন্ত আঁ-হযরত (সা)-এর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রতিরক্ষা কৌশলের বিষয়গত, ঘটনাভিত্তিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা

করা হয়েছে। এখন দুনিয়ার সে সব কতিপয় শীর্ষস্থানীয় জেনারেল, ব্যক্তিত্ব এবং তাঁদের সৈনিক জীবনের কীর্তি পর্যালোচনা করা হচ্ছে যাঁদেরকে খ্যাতি ও শোহরতের আসমানে উজ্জ্বল নক্ষত্র মনে করা হয়। যেহেতু গ্রন্থকারের একজন সৈনিক হিসাবে তাঁদের অধ্যয়নের সর্বোত্তম সুযোগ মিলেছে এজন্য যা কিছু পেশ করা হবে তা ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করেই করা হবে কিংবা পেশ করা হবে বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর ভিত্তি করেই।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। উত্তর আফ্রিকার আল-আলামীন রণক্ষেত্র অত্যন্ত উত্তপ্ত। মিত্রবাহিনী পরিচালনার ভার ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারীর উপর এবং জার্মান ফৌজের অধিনায়কত্ব মার্শাল রোমেলের হাতে। দু'জনেই যুদ্ধের মশহূর ব্যক্তিত্ব।

ফিল্ড মার্শাল মন্টোগোমারীর হেড কোয়ার্টার। একটি মোটর লরীর উপর অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত ও আরামদায়ক ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এর নাম "কারাভাঁ"। মহাসেনাপতি এতে আরাম করেন। এর ভেতর নেহায়েত মূল্যবান গদীযুক্ত পালংক বিছানা রয়েছে। বিজলী বাতি জ্বলছে। টেবিল-চেয়ার ও আরাম-আয়েশের যাবতীয় দরকারী উপকরণ মওজুদ রয়েছে। দেয়ালে রয়েছে নকশা টাঙানো। ফিল্ড মার্শাল এর ভেতর বিশ্রাম নেন এবং এর ভেতরই অফিসিয়াল কাজ-কর্ম করেন অর্থাৎ এ যেন ঘরের ঘর, আবার অফিসের প্রয়োজনে অফিস আর তা হল ভ্রাম্যমাণ।

ইনি মহাসেনাপতির এডিকং। এডিকং সাহেব বলেন, "আমাদের ফিল্ড মার্শাল সাহেব বড় পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু। এই বয়সেও তিনি বরাবর ব্যায়াম করে থাকেন। মদ ও সিগারেটের ধারে কাছেও যান না।" নিন, এই যে, ফৌজী গাড়ী এসে থামল! ফিল্ড মার্শাল সাহেবের চীফ অব স্টাফ আগমন করছেন। এখন তিনি তাঁর ভ্রাম্যমাণ ঘরের দরজায় নক করছেন। ফিল্ড মার্শাল পালংকের উপর সটান শুয়ে আছেন। আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। চীফ অব স্টাফ বলেন, "জনাবে 'আলী! আমাদের ফৌজ দুশমনের উপর হামলা শুরু করে দিয়েছে।" মন্টোগোমারীর জবাব, "বহুত খুব! পরিকল্পনা একেবারে নিখুঁত।" এই বলে তিনি পাশ ফেরেন এবং ঘুমিয়ে পড়েন। উপদেষ্টা চুপিসারে ও নিঃশব্দে সরে পড়েন এবং আস্তে করে দরজা বন্ধ করে নিজ দফতরে চলে যান। লড়াই চলছে তুমুলভাবে।

এখন এদিকটায় আসুন। এটা জার্মান শিবির। দেখুন না, জার্মান সর্বাধিনায়ক সমরক্ষেত্রেই উপস্থিত নন। ছুটিতে তিনি জার্মান চলে গেছেন। তাঁর এবং তাঁর অধীনস্থ অধিনায়কদের "কারাভাঁ"ও আরাম-আয়েশী উপকরণ দ্বারা সজ্জিত। কিন্তু একটি পার্থক্য আছে। এখানকার খানাপিনার ইন্তেজাম ততটা ভাল নয়। উন্নত ধরনের বরতন, কাঁটা ছুরি কিংবা চামচ কিছুই নেই, নেই কোন মেস। রোমেল সাদাসিধে জীবন পসন্দ করেন। তিনি সেই খাবারই খান যা তাঁর একজন সাধারণ সিপাহী খেয়ে থাকে। এজন্য ইতালীয় জেনারেলদের রোমেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

২৩ তারিখে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ২৬ তারিখে তাঁর ফিরে আসবার খবর পাওয়া গেছে। অতএব তাঁকে দেখে যাওয়াই ভাল। শোনা যায় যে, তিনি খুব কম মদ পান করেন। খুব মেহনতের সঙ্গে কাজ করেন।

নিন, আজ সেই ছাব্বিশ তারিখ। রোমেল ফিরে এসেছেন। তাঁর "কারাভাঁ"তে চঞ্চল-পদক্ষেপ বেড়ে গেছে। যখন থেকে এসেছেন নিজের কাজে নিবিষ্ট। অত্যন্ত তৎপর ও দৃঢ়চেতা জেনারেল। নির্দেশের পর নির্দেশ জারি হচ্ছে। এখন তিনি যুদ্ধের ফ্রন্ট পরিদর্শনে যাচ্ছেন। ছোট-বড় সব অফিসারের মনোবল বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এতখানি কর্মতৎপর যে, আহার-নিদ্রাও তাঁর হারাম হয়ে গেছে।

কি বললেন আপনি? তাদের উস্তাদ অথবা পীর-মুরশিদ! মন্টো-গোমারী এবং রোমেলের?

উস্তাদই বলুন আর পীর-মুরশিদই বলুন, তাঁদের উভয়েরই একজন আর তিনি হলেন নেপোলিয়ন। আর হ্যাঁ, শুধু ফ্রান্সই নয়, সারা য়ুরোপই তাঁর জন্য গর্বিত। তিনি দু'জনেরই শুধু মুরশিদ নন, বরং এরপর যত জেনারেল হয়েছেন, সবাই নিজেদেরকে তাঁর ছাত্রদলের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন এবং এজন্য তাঁরা গর্বিতও। নেপোলিয়ন না বলে তাঁকে মহান নেপোলিয়ন বলুন।

আসুন, কল্পনার চোখে তাঁর শিবিরও পরিভ্রমণ করা যাক। আল্লাহু আকবার! কি রকম দবদবা ও আড়ম্বরপূর্ণ জাঁক-জমকের জেনারেল তিনি। তাঁবুটাই-বা কি রকম শানদার! উপরে সাদা ও নীল ঝালর এবং অভ্যন্তরীণ ভাগ সোনালী কারুকার্যমণ্ডিত। ভাই, আমার ভুল হয়ে গেছে। নেপোলিয়ন তো শুধু জেনারেলই নন, তিনি একজন শাহানশাহ্ও তো বটেন। প্রতিরক্ষা

উপদেষ্টা বার্থিয়ার (Berthier), প্রাসাদ মন্ত্রী ডিউরক (Duroc) এবং আস্তাবল মন্ত্রী কলিন কোর্ট (Couleen Court) সব সময় তাঁর সান্নিধ্যে পড়ে থাকেন। তাঁরা ছাড়াও অন্য অফিসার ও শাসন বিভাগীয় কর্ম-কর্তাদের একটা বিরাট দলও জোঁকের মত তাঁকে সর্বদাই ঘিরে রাখে। সমরক্ষেত্রে সাধারণত তাঁর জন্য তিনটি কামরা নির্দিষ্ট থাকে। কেননা ফ্রান্স ও য়ুরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের সাধারণ নিয়ম এটাই যে, লড়াইয়ের কালে ফৌজের সদস্য নাগরিকদের ঘরে অবস্থান করে। অতএব যখন তাঁবুর আবশ্যকতা নেই তখন কামরা নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে।

তাঁর খাবার খুবই কম। কদাচিত শরাব পান করে থাকেন। দিনে রাতে ছ' ঘণ্টা ঘুমান। আর সময় মিললে তিন ঘণ্টা আরাম করেন। বাকী পনের ঘণ্টা কাজ করে থাকেন। তাঁর উক্তি ঃ "ভিক্টোরিয়ায় আমাদের পরাজয় এজন্য হয়েছিল যে, জোসেফ অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে কাটিয়েছিল। একমিল-এর (Eckmuhl) লড়াইয়ে আমিও যদি রাতের বেলায় শুয়ে পড়তাম তাহ'লে সেই বিস্ময়কর চলাচল করতে পারতাম না যার কারণে আমি পঞ্চাশ হাযার সৈন্যের দ্বারা এক লাখ বিশ হাযারের বাহিনীকে পরাজিত করেছি। আমাকে মার্শাল ল্যেনিস-কে (Lannes) খোঁচা মেরে এজন্যই জাগাতে হয় যে, সে খুবই উদাসীন হয়ে ঘুমিয়েছিল। সিপাহসালারকে ঠিক লড়াইয়ের মুহূর্তে কখনো ঘুমাতে নেই। ঘুমানো উচিত নয়।"

নেপোলিয়নের অল্প নিদ্রা তাঁর একটি মহৎ গুণ বলে মনে করা হয়। তিনি একেবারে ছ' ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন অথবা অবস্থা মাফিক অল্প অল্প করে ঘুমিয়ে সেটুকু পূরণ করেছেন। যা-ই হোক, এর বেশী তিনি ঘুমাতেন না। তাঁর এডিকং তাঁর ঘোড়া নিয়ে তাঁর গাড়ীর পেছনে পেছনে চলে। এতে তাঁর আসন এমন যে, সেটাকে লম্বা ও বিস্তৃত করে তিনি তার উপর ঘুমিয়ে যেতেন। একটি চেয়ার তাঁর উপদেষ্টা বার্থিয়ারের জন্য যার উপর তিনি উপবেশন করেন এবং সমস্ত সময় বসে বসে কাটান। একটা বড় ল্যাম্প লাগানো রয়েছে আর রয়েছে টেবিল যার উপর যুদ্ধের নকশা প্রস্তুত করা হয় এবং যেটাকে বিশটি মোমবাতির সাহায্যে আলোকোজ্জ্বল করা হয়।

নেপোলিয়ন একজন বিরাট ঘোড়সওয়ার। যুদ্ধের ময়দানে যখন যান তখন বিশ মাইল ঘোড়ার উপর বসে অতিক্রম করে থাকেন। ঘোড়ার ডাক ব্যবস্থা চালু থাকে যেন প্রতি দশ মাইলের মাথায় তাজাদম ঘোড়া পাওয়া যায়।

ব্যক্তিত্বের প্রভাব এমন যে, তাঁর সামনে কারও টু শব্দটি করার ক্ষমতা নেই। সমস্ত ইখতিয়ার তাঁরই হাতে। প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি পর্যায়েই তিনি গভীর চিন্তা-ভাবনা করেই কাজ করে থাকেন। একবার যখন কোন স্থির ফয়সালায় উপনীত হন তখন বিদ্যুৎ গতিতেই তা সম্পন্ন করেন। তাঁর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা হয়ে থাকে নমনীয় যেন অবস্থা মাফিক তাতে উপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করা যায়। পরিকল্পনা তৈরী করেন তো অমনি বারথিয়ারকে ডেকে তা লিপিবদ্ধ করার হুকুম দেন। চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সাধারণত রাতের বেলায় করে থাকেন এবং সে সময় তাঁর কামরা যেন প্রতিরক্ষা বিজ্ঞানের লেবরেটরীতে রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধের ময়দানে তাঁকে দশ হাযার যুদ্ধবাজ সৈন্যের সমকক্ষ বলে ধরা হয়ে থাকে। সাফল্য তাঁর পদচুম্বন করে, শোহরত ও খ্যাতি তাঁর অধীনস্থ বাঁদী, দেশ ও জাতি তাঁকে নিয়ে গর্বিত। কিন্তু কর্মক্ষমতা, নৈপুণ্য, দক্ষতা, দৃঢ়তা, চিন্তা-ভাবনা, কর্মের জোশ ও জযবা, সুযোগ-সন্ধানী ও সূক্ষ্মদর্শিতার রাজত্ব ক্রমান্বয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। উপর্যুপরি বিজয় তাঁকে অহংকারী ও গর্বিত করে তুলছে। এখন তিনি আবেগ-তাড়িত, অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী শাসক। সকল কিছুকেই তিনি মর্জি মাফিক দেখতে চান এবং অহংকার ও দাম্ভিকতা তাঁর কর্মোদ্দীপনাকে নিস্তেজ করে দিয়েছে। যেসব গুণের সমাবেশ একদা তাঁকে খ্যাতির আসমানে উঠিয়েছিল এখন তার পর্যায়ক্রমিক অবনতি তাঁকে পতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এমন কি এক পর্যায়ে পরাজয় বরণ করে তিনি গ্রেফতার হন এবং বন্দী দশায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেশ ও জাতির উপরও পতন নেমে আসে এবং তাঁর সমস্ত অগ্রগতি ও খ্যাতি কল্পকাহিনীতে পরিণত হয়।

নিকট ও দূর অতীতের ঐসব নামকরা লোকের অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর আসুন, এখন আপনাকে সাড়ে তেরশত বছর পূর্বেকার মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে চলি।

তখনও খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি। মদীনার উপর হামলার কমাগত খবর আসছে। আশেপাশের য়াহূদীরা কুরায়শদের অভ্যর্থনার জন্য তৈরী হচ্ছে, তাদের জন্য রসদ ও খোরাক জমা করা হচ্ছে। আঁ-হযরত (সা) মসজিদে নববীতে তশরীফ রেখেছেন। মহান সাহাবাবৃন্দ (রা) তাঁর সামনে বিনীত ও ভদ্রভাবে বসে আছেন। মদীনার প্রতিরক্ষার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা চলছে।

কোন কোন সাহাবীর ধারণা যে, বাইরে গিয়ে মুকাবিলা করা উচিত। কারো মতে, প্রস্তর-নির্মিত ছোট দুর্গের মধ্য কেল্লাবন্দী অবস্থায় লড়াই করা উচিত। সালমান ফারসী (রা) ইরানের দৃষ্টান্ত পেশ করছেন এবং খন্দক খনন করে মোর্চাবন্দ হবার প্রস্তাব দিচ্ছেন। আঁ-হযরত (সা) সবার পরামর্শ শুনছেন, কিন্তু নিজে চুপ থাকছেন। এরপর মজলিস ভঙ্গ হয়। রাতের বেলায় আঁ-হযরত (সা) 'ইশার সালাত সম্পাদনের পর মসজিদেই তশরীফ ফরমান, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন, দু'আ করেন, সিজদাবনত হন। আর এভাবেই আঁধার ভেদ করে দিনের আলোক ফুটে বের হয়। সাহাবা (রা)-রা জমায়েত হন। ফজরের সালাত আদায় করেন। এর পর তিনি ঘোড়া চাইলেন। ঘোড়া আনা হ'ল। ঘোড়ার পিঠে না আছে সাজ-সজ্জা, না আছে জীন ও লাগাম! আঁ-হযরত (সা) এবং সাহাবা (রা)-রা নিজ নিজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হন। এক হাত তলোয়ারের বাটে রাখা, আর এক হাত ঘোড়ার গর্দানে। আঁ-হযরত (সা) আগে চলেছেন এবং সাহাবা (রা)-রা পেছনে। শহরের বাইরে তিনি উপত্যকা ও প্রকৃতির চড়াই-উৎরাই পরিদর্শন করছেন এবং ইরশাদ করছেনঃ ওখান থেকে এই পর্যন্ত এই উপত্যকা ব্যবহার করা হবে। এখান থেকে এখান পর্যন্ত খন্দক খনন করা হবে যার চওড়া ও গভীরতা এতখানি। ওখান থেকে এখানকার কাজ অমুক সাহাবীর যিম্মায় থাকবে এবং সেখান থেকে ওখান পর্যন্ত অমুকের দায়িত্বে থাকবে। এভাবে পুরো খন্দক প্রস্তুতির নকশা তৈরী হয়ে যাচ্ছে। আঁ-হযরত (সা) দুপুর পর্যন্ত সীমারেখা চিহ্নিত করে তা দাগ দিয়ে দিচ্ছেন এবং খননের কাজে নিজে শরীক হচ্ছেন। নেহায়েত মামুলী খানা; কয়েকটি খেজুর ও রুটি। খনন শেষে রুটিই কয়েক টুকরো খেজুরসহ মুখে দিয়ে পায়ে হেঁটেই রওয়ানা হয়ে পড়েন এবং খনন কাজ তদারকী করেন। দিনভর এইভাবে কাজ করার পর রাতের বেলায় মসজিদে তশরীফ রাখেন। দস্তরখানা বিছানো হয়। এখানেও সেই অল্প কিছু খেজুর ও যবের রুটি। নিজেও খান এবং সাহাবাদেরও খেতে বলেন। দ্বিতীয় দিন একইভাবে কাজ চলে। কিন্তু আজ সামান্য খেজুর ও যবের রুটিও নেই। আঁ-হযরত (সা) পেটে পাথর বেঁধে নিয়েছেন। কাজ চলছে; সমস্ত সাহাবা (রা) এবং তামাম মুসলমান উপবাস ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তির কষ্ট সত্ত্বেও নিজেদের কাজে ব্যস্ত। তিনি যেখানেই যান মুসলমানদের চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি তাদের উৎসাহ যোগান। সবার সঙ্গে হাসিমুখে ও প্রসন্ন

বদনে মিলিত হন। সংবাদদাতা ও গুপ্তচর সংবাদ সংগ্রহ করে আনে এবং সরাসরি তাঁর খেদমতে পৌঁছে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। আঁ-হযরত (সা) তাদেরকে প্রশ্ন করেন, নির্দেশ দেন। কেউ কিন্তু জানতে পারে না যে, এখানে তিনি কি করতে যাচ্ছেন। জানবায ও চালবাজ বাহিনী রওয়ানা হয় এবং তাদের নেতাদের গন্তব্যস্থল বলে দেওয়া হয়। কিন্তু আর কেউ জানতে পারে না যে, তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মোটকথা, সব কিছুই সতর্কতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সঙ্গে গোপনীয় ও প্রচ্ছন্ন উপায়ে হচ্ছে। তারা দুশমনের রসদ-সম্ভার লুটে নিচ্ছে, বন্দী করে আনছে এবং যুদ্ধের প্রতিটি পরিকল্পনার উপর শৃংখলা ও সহনশীলতার সঙ্গে কাজ করছে। দুশমনের শক্তি বিপুল। মাইলের পর মাইল আক্রমণকারী ফৌজের সদস্যদের মাথা আর মাথাই শুধু নজরে আসে। কিন্তু তথাপি তারা খন্দক পার হতে সক্ষম হয় না। অবরোধ হয় দীর্ঘ। কুরায়শ এবং মিত্রদের ধারণা যে, আঁ-হযরত (সা) মযবুর হয়ে অস্ত্র সমর্পণ করবেন। কিন্তু অবরোধের এই দীর্ঘতা স্বয়ং তাদের জন্য ধ্বংসাত্মক ও তাদের জীবনের উপরই মুসীবতস্বরূপ দেখা দেয়। তাদের ঐক্য ও সংহতি ভেঙে পড়ে। নিজেদের মধ্যে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে এবং শেষাবধি আঁ-হযরত (সা)-এর কৌশল কার্যকরী হয় এবং কুরায়শরা পালিয়ে যায়। এর পর তাদের মিত্রবাহিনী নিজ নিজ পথ ধরে।

বনূ কুরায়জা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, দাগাবাজী ও গাদ্দারী করে। ফলে যুদ্ধ থেকে মুক্ত হতেই তিনি তাদের ঘরবাড়ী অবরোধ করেন এবং তাদেরকে তাদের পাপের খতিয়ান বুঝিয়ে দিয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এর কিছুকাল পর তিনি বনী লেহয়ানকে শায়েস্তা করবার জন্য গমন করেন। বাহিনী সঙ্গেই রয়েছে। মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছেন। কিন্তু গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কিছু জানা নেই। গাররান পৌঁছুলে বনী লেহয়ান নিজেদের নিরাপত্তা হুমকীর সম্মুখীন বলে বুঝতে পারে। তারা ঘরবাড়ী ছেড়ে পাহাড়ে গিয়ে আত্মগোপন করে। আঁ-হযরত (সা) সেখান থেকে 'উসফান তশরীফ নেন এবং সেখান থেকে কিছু ঘোড়সওয়ারকে মক্কার দিকে রওয়ানা করে দেন এবং হেদায়েত দেনঃ এভাবে যাবে যেন মক্কাবাসীরা তোমাদেরকে দেখতে পায়। এরপর তিনি প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেখানে বিভিন্ন স্থানে

বিভিন্ন ধরনের অভিযান প্রেরণ করেন। আর সবগুলোই কামিয়াব হয়ে ফিরে আসে।

খন্দক যুদ্ধের এক বছর গুজরে গেছে। বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে যেসব মালে গনীমত লাভ হয়েছিল তদ্দ্বারা মুসলমানদের অবস্থা এখন ভাল। উট এবং অন্যান্য পশুপালের সংখ্যাও যথেষ্ট। এখন তিনি 'উমরাহ্ আদায় করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং সহস্রাধিক মুসলমানকে সঙ্গে যাবার দা'ওয়াত দেন। প্রস্তুতি শুরু হয়। কোথায় এক বছর হয়েছে, যুদ্ধ চলছিল এবং এখনও যুদ্ধের অবস্থা বিরাজ করছে—আর কোথায় 'উমরাহ্‌র জন্য যাবার প্রস্তুতি। বিস্ময়ের ব্যাপারই বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। আঁ-হযরত (সা)-এর দৃষ্টি বহু দূর দেখছে। প্রস্তুতি যুদ্ধের নয়, মযহাবী ফরয আদায়ের জন্যই এই প্রস্তুতি। কুরবানীর উট সঙ্গে। কিন্তু 'উসফান পোঁছুতে কুরায়শদের প্রস্তুতির খবর পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তা বদলে ফেলেন এবং মক্কার নিকটবর্তী হুদায়বিয়ায় এভাবে পোঁছে যান যে, কুরায়শদের অশ্বারোহী বাহিনী তখন বিলকুল বেখবর। মক্কা এখন সামনে এবং শত্রু সৈন্য তাঁর খোঁজে বহুদূর গিয়ে পোঁছেছে। মক্কা প্রবেশের উত্তম মওকা, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। প্রতিটি কথা, প্রতিটি চলা ও বিরতিতে দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ সুস্পষ্ট। কুরায়শদের প্রতিনিধি বুদায়ল পবিত্র খেদমতে হাযির হয়। সে ধৃষ্টতাপূর্ণ ও হুমকীর ভাষায় কথাবার্তা বলে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) উত্তেজিত হন, কিন্তু তিনি ধৈর্যের সঙ্গে ও শান্তভাবে সব কিছু গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বলেন, "বুদায়ল! আমি কুরায়শদের পরাভূত করেছি, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সন্ধির জন্য আমিই আগে হাত বাড়িয়েছি।" বুদায়ল অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ব্যক্তি। আঁ-হযরত (সা)-এর বাণীর গভীর তলদেশে পোঁছে যায় সে।

আঁ-হযরত (সা)-এর পরোক্ষ এপ্রোচের পরিপূর্ণতার দিক দেখুন। বিনা হাতিয়ারে, বিনা সংঘর্ষে এবং বিনা রক্তপাতে মক্কা এবং শুধু মক্কাই নয়, পুরো হেজাযই জয় করে নিলেন। ভোঁতা ও স্থূল দৃষ্টিধারীরা যদি এটা দেখতে ব্যর্থ হয়, তাহ'লে তারা মক্কা বিজয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করুক। এক বছর পরই বিজয়ীর বেশে মক্কা প্রবেশ তা প্রমাণ করে দিয়েছে।

আল্লাহু আকবার! কী অনাড়ম্বরতা আর কেমন পরিপূর্ণতা! এরই নাম বিজয় ও কামিয়াবী। একেই বলা হয় মর্যাদা ও গৌরব, এটাই নেতৃত্ব ও অধিনায়কত্ব, আর এটাই হ'ল প্রকৃত রণকৌশল ও সৈন্য পরিচালনা। এরূপ কোন দৃষ্টান্ত কি নেপোলিয়নের সৈনিক কর্মকাণ্ডে বিদ্যমান? তাঁর পূর্বসুরিদের ভেতর কি তা মেলে? তাঁর উত্তরসুরিদের ভেতরই মিলবে কি? কামিয়াবী এবং বিজয়মণ্ডিত হওয়ার প্রকৃত মানদণ্ডে কি তা পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়? মুকাবিলায় কি কেউ ক্ষণিকও তিষ্ঠাতে পারে? কাউকে কি অনুকরণের আদর্শ হিসাবে তুলে ধরা যায়? যায় না। এই মর্যাদা কেবল রসূল আকরাম (সা)-এরই। শৃংখলা, সৌন্দর্য এবং অনুকরণের যোগ্য কেবল তাঁরই পবিত্র ও বরকতময় সত্তা। অন্যদের উপর থেকেও চোখ বন্ধ করার দরকার নেই। অগ্রগতি ও উন্নতির প্রশস্ত রাজপথ থেকে মুখ ফেরাবেন না। বস্তুত সঠিক ও বিশুদ্ধ জ্ঞান মুসলমানদেরই উত্তরাধিকার। এটা যেখানেই মিলবে সেখান থেকেই তা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু জ্ঞান অর্জন এক কথা আর মূর্খের মত অনুকরণ করা অন্য কথা। আল্লাহ্ পাক কুরআন মজীদে বার বার তাঁর রসূল (সা)-এর সুন্নত তথা জীবনাদর্শ অনুসরণ করার জন্য বলেছেন। এ কথার অর্থ তো এই নয় যে, উক্ত গণ্ডীর ভেতর কেবল 'ইবাদত-বন্দেগী ও পারস্পরিক লেন-দেন সম্পর্কিত বিষয়াবলীই আসে। সেই 'ইবাদত-বন্দেগী ও পারস্পরিক লেন-দেন—যার মর্ম তো একেবারেই সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে; বরং তাঁর ভেতর তো তাঁর প্রতিরক্ষা নীতিও শামিল। কেননা এটাই তাঁর মিশনকে পরিপূর্ণ সাফল্যের পথে পৌঁছে দেবার মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল এবং এর দ্বারাই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা)-এর দুশমনের পরাজয় ঘটেছিল। এরই সাহায্যে দুনিয়ার বুকে ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এরই উপর আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের অবস্থান ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। অতঃপর আল্লাহ্র মনোনীত পয়গম্বর (সা)-কে যুগের প্রতিবন্ধকতাসমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিরক্ষা কৌশলের সাহায্য গ্রহণ এবং সমরাস্ত্র ও মারণাস্ত্রের পথ অবলম্বন করে রাস্তার বিপদ-আপদ দূর করতে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, মুসলমানরা আজ তাঁর প্রকৃত মর্যাদা খুইয়ে একবার এদিকে একবার ওদিকে দোলকের মত দুলছে। এটা নিশ্চিত যে, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সুন্নতের উপর আমল করলে সে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে পারে। মহফিল গুলযার রাজনীতি, তুখোড় বাগ্মিতা কিংবা কলমের যাদুকরী ও মোহময়ী শক্তি তাকে মনযিলে মকসূদে পৌঁছে

দিতে পারে না। এই সমস্ত পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে ; সে সবের মধ্যেই কোনটির কমতি নেই বরং প্রতিটি বিষয়েরই আধিক্য রয়েছে এবং প্রাচুর্য রয়েছে প্রতিটি বস্তুর, কিন্তু প্রতিরক্ষা নীতির উপর দৃষ্টি রাখবার মত লোকের ঘাটতি রয়েছে। আঁ-হযরত (সা)-এর রাষ্ট্রনীতি, কৌশল ও সমরশাস্ত্রের গুরুত্ব বুঝবার মত লোকের অভাব রয়েছে। সেই আবেগ-উদ্দীপনার কমতি রয়েছে যার সামনে বিশাল ময়দানের বিস্তৃতিও সংকুচিত হয়ে গেছে, পাহাড়ের উচ্চতা হয়েছে অবনমিত, উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমের স্বল্পতা অর্থহীন হয়ে গেছে, প্রতিটি ধূলি-কণা যাদের স্পর্শে সূর্যসম পরিণত হয়েছে, শক্তিশালী হয়েছে কাবু এবং গোটা জীবন-যিন্দেগী আপাদমস্তক রহমতে পরিণত হয়েছে।

মোট কথা, আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা এবং তাঁর আওতায় পরিচালিত সমস্ত যুদ্ধ ও অভিযানের যে দিকটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত এবং যাকে রাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা ও সমরশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার তথা প্রাণবস্তু বলা যেতে পারে তা নিম্নরূপ :

১. প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা হবে সাদাসিধে কিন্তু পরিপূর্ণ। সাদাসিধে হবার অর্থ এই যে, তার ভেতর এমন সুযোগ রাখতে হবে যে, যুদ্ধের পরিবর্তিত অবস্থা মুতাবিক খুব সহজে উপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন যেন করা যায়। কোন রাজনীতিবিদই এটা সঠিকভাবে বলতে পারেন না যে, যুদ্ধের মুহূর্তে অবস্থা কেমন হবে। কিন্তু প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ সম্ভাবনাকে সামনে রাখেন এবং যখন পরিকল্পনা তৈরী করেন তখন সে সব দিকেই খেয়াল রাখেন যেন প্রয়োজন মুতাবিক ও অবস্থা মাফিক তার ভেতর পরিবর্তন করা যায়। যুদ্ধের পক্ষ কোন একটি রাষ্ট্র হতে পারে, আবার একের অধিক রাষ্ট্র মিলিত ও সংঘবদ্ধ ফ্রন্ট বানিয়েও সামনে আসতে পারে। অতএব সেটা সম্মুখে রাখাটা খুবই জরুরী।

প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা শান্তিকালীন সময়ে তৈরী হওয়া উচিত এবং তা বিস্তারিত হওয়া দরকার। এই সঙ্গে সেটা গোপন রাখাও অত্যন্ত জরুরী। পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য বহু লোকের প্রয়োজন হয়ে থাকে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত গোপনীয়তা তাদের কারোর নিকটই প্রকাশিত হওয়া সমীচীন নয়। প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি যিম্মাদারীর পরিপূর্ণতা স্বতন্ত্র ও পৃথকভাবে কোনরূপ গুপ্ত রহস্য প্রকাশ ব্যতীতই সাধন করতে হবে।

এরই সঙ্গে রাজনীতিবিদগণ প্রতিরক্ষা কৌশলেও যথাযথরূপে অভিজ্ঞ হবেন—এটা জরুরী নয়। অনন্তর শান্তিকালীন সময়ে তাঁদের মনোনিবেশ ও লক্ষ্য অপরাপর বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। অতএব যুদ্ধের আগে যদি তাঁরা সেটাকে সঠিক ও নির্ভুল বলেও অভিহিত করেন তাহলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়তেই তার ভেতর ত্রুটি-বিচ্যুতি বের করেন এবং নিজেদের মর্জি মুতাবিক তাঁরা রদবদল করতে চান।

এ পর্যায়ে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা হ'ল এই যে, পরিকল্পনা এমন বানাতে হবে যা মেধাগত দিক দিয়েও গ্রহণযোগ্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন আযাদ ও স্বাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসী এ ব্যাপারে রাযী হবে না যে, তার রাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্রাংশও অপর রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ করা হোক, তা প্রতিরক্ষা কৌশলের দিক থেকে যতই জরুরী হোক না কেন এবং এর দ্বারা যতই বিজয় সাধিত হোক না কেন। তারা যদি পরিকল্পনার এই দিকটা জানতে পারে তাহলে এর বিরুদ্ধে জোর চিৎকার করবে, প্রতিবাদ ধ্বনি উঠাবে এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করবে, ওটা পরিত্যাগ করে অন্য পরিকল্পনা তৈরী করতে। শান্তিকালীন সময়ে যেহেতু কোনরূপ বিপদাশংকা থাকে না কিংবা অনুভূত হয় না সেহেতু এ ধরনের প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করা হয়ে থাকে এবং ফল দাঁড়ায় এই যে, জাতির সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও মনোবলের উপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা প্রতিশোধমূলক দৃষ্টিকোণ থেকেও সর্বপ্রকারের ত্রুটিমুক্ত হতে হবে। অনভিজ্ঞ জেনারেল এই দিকটির উপর লক্ষ্য ও মনোযোগ দেন না, শুধুমাত্র যুদ্ধের মূলনীতিটাকেই সমরশাস্ত্র মনে করেন। অথচ এটা বড় ধরনের ত্রুটি এবং এর ফলাফল অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক ও মারাত্মক হয়ে থাকে।

২. দুশমনকে প্রতিরক্ষা কৌশলের চালবাজীর মাধ্যমে স্বীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে বিলকুল বে-খবর রাখতে হবে। আসল পরিকল্পনার উপর পূর্ণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতা এবং দ্রুততা ও নির্ভীকতার সঙ্গে অতর্কিতভাবে 'আমল করা উচিত যেন দুশমন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

৩. মুজাহিদদের জন্য ইচ্ছার পরিপক্কতা, নির্ভীকতা, দৃঢ়তা এবং সাহসিকতার ন্যায় গুণাবলী অপরিহার্য। তাদেরকে আরামপ্রিয়তার হাত থেকে

দূরে থাকতে হবে, পরিণামদর্শী হতে হবে এবং দুশমনকে কখনোই অবজ্ঞেয় ও খাটো করে দেখতে নেই।

৪. সিপাহসালারকে আসল পরিকল্পনা গোপন রেখে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাগত পর্যায়গুলো নিজের তত্ত্বাবধানে অতিক্রম করা উচিত। তিনি তাঁর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে পরামর্শ এবং প্রতিটি দিক পর্যালোচনা করবেন। কিন্তু পরিকল্পনার ফয়সালা স্বয়ং নিজে করবেন এবং তা নিজের ভেতরই সীমাবদ্ধ রাখবেন। এ ব্যাপারে তাঁর উপদেষ্টাদের সঙ্গে বাহাছ-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া ঠিক হবে না। পরিকল্পনা যখন তৈরী হবে এবং তা কার্যকর করার সময় আসবে তখন অধীনস্থ সিপাহসালারদের সেই অংশটুকু সুযোগ মত অবহিত করতে পারেন যেটুকু তিনি সেই মুহূর্তে কার্যকর করতে চান।

৫. নিজেদের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গতিবিধি খুবই গোপনীয় রাখতে হবে। কিন্তু দুশমনের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সংক্রান্ত তথ্যাদি লাভ করবার জন্য পুরো লক্ষ্য ও মনোযোগ ব্যয় করতে হবে এবং এজন্য গুপ্ত সংবাদদাতা, গুপ্তচর, জানবায কমাণ্ডো ও সুচতুর বাহিনীর পূর্ণ সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।

৬. যুদ্ধ ও সংঘর্ষের ময়দান যখন উত্তপ্ত হবে অর্থাৎ যুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করলে পৌরুষোচিত সাহসিকতা, দৃঢ়পদতা, সহনশীলতা ও আত্মোৎসর্গের ন্যায় গুণাবলী সর্বাধিক উজ্জ্বল ও প্রতিভাত হতে হবে। কেননা এটা কামিয়াবী ও সাফল্যের শেষ ও চূড়ান্ত পর্যায় এবং এ সবের বাস্তবায়নের উপর এর সার্বিক সফলতা নির্ভর করে।

৭. যুদ্ধের ময়দানে সিপাহীই শুধু লড়াই করে না বরং জাতির প্রত্যেকটি সদস্যই লড়ে থাকে। কেউ তলোয়ার চালিয়ে থাকে, কেউ কলমের শক্তির সাহায্য গ্রহণ করে থাকে, কেউ মেহনত ও পরিশ্রম করে এতে সহযোগিতা যুগিয়ে থাকে, কেউ অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি তৈরী করে থাকে। জিহাদ প্রত্যেকের উপর ফরয। অতএব প্রতিটি মানুষের—তিনি পুরুষ হোন আর মহিলাই হোন—প্রতিরক্ষা কৌশল (স্ট্রাটেজী) অধ্যয়ন করা উচিত এবং আঁ-হযরত (সা)-এর প্রতিরক্ষা নীতিকে সম্মুখে রেখে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় ফায়দা লাভ করার জন্য কোশেশ করা উচিত। যে জাতি ও যে কওম প্রতিরক্ষা কৌশল বোঝে না, সমরশাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে, দেশপ্রেম, শাসন

শৃংখলা এবং ঐক্য ও আত্মোৎসর্গের আবেগ কার্যকর ক্ষেত্রে টেনে আনতে পারে না, তারা বেঁচে থাকতে পারে না, মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার তাদের থাকে না।

৮. সর্বোত্তম সিপাহসালার তিনিই যিনি স্বীয় ফৌজকে বুদ্ধিমত্তা, কৌশল ও দূরদর্শিতার সঙ্গে লড়াতে পারেন যেন নিজেদের ক্ষতি সর্বাপেক্ষা কম হয় এবং দুশমন ফৌজের ক্ষতি হয় সর্বাধিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, শত্রুর উপর বস্তুগত ক্ষতির প্রতিকিয়া সর্বাপেক্ষা কম হয়ে থাকে, আর সর্বাধিক ও দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে নৈতিক ক্ষতিগ্রস্ততায়। যদি তাদের মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে অবদমিত ও অবনমিত করা যায় তাহলে আর পুনরায় তারা অবাধ্য আচরণ করতে পারে না।

প্রতিরক্ষা কৌশলের মূলনীতি কয়েকটি মাত্র। আর এগুলো হামেশা অপরিবর্তনীয়। অবশ্য এ সবের বাস্তবায়নের উপায়-উপকরণ পরিবর্তিত হয় এবং পরিবর্তন অবশ্যই হতে থাকবে। সেগুলো পরিবর্তনের জন্য অবস্থা ও পরিস্থিতির উপর নজর রাখা এবং তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অপরিহার্য।

প্রতিটি স্বাধীন মুসলমানকে একথা মনে রাখা উচিত যে, যখন যুদ্ধ ও জিহাদের সময় আসবে তখন তাকে জিহাদের ময়দানে গিয়ে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। অতএব তাকে জিহাদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতিকে জীবনের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবে মনে করতে হবে এবং প্রতিরক্ষা কৌশলের মূলনীতি ও 'আমল সম্পর্কে পুরোপরি অবগতি লাভের জন্য তার সার্বিক প্রয়াস ও কোশেশ চালানো উচিত। এই দায়িত্ব যেখানে পুরুষের উপর অর্পিত হয়ে থাকে সেখানে মহিলাদের দায়িত্ব এই যে, তাদের জিহাদের সহযোগিতামূলক কর্মের জন্য, যে কোন পরিণতির জন্য নিজেদেরকে তৈরী করতে হবে এবং শান্তিকালীন সময়ে তাদের স্থান হবে অন্দর মহল। আর তাদের কাজ হবে ঘরের সৌন্দর্য সাধন ও ব্যবস্থাপনা, যুদ্ধকালীন সময়ে তথা জিহাদের ময়দানে বিজয়লাভ ও সাহায্য প্রদানের জন্য মুজাহিদদের সার্বিক সহযোগিতা প্রদান এবং আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করা।

এটাই ইসলামের দাবি এবং এটাই হাদীয়ে ইসলাম (সা)-এর রাস্তা। এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে উন্নতি ও প্রগতি এবং মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার রহস্য। এরই ভেতর প্রচ্ছন্ন রয়েছে আমাদের সকল রোগের এলাজ ও প্রতিষেধক। হাদীয়ে বরহক (সা)-এর উত্তম আদর্শ এবং তার ফলাফল

ও পরিণতি তাই যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে আর আমাদের পথভ্রষ্টতা ও নিষ্ক্রিয়তার পরিণামও তাই যা আমরা ভোগ করছি।

যুদ্ধের হাতিয়ার
ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত

এই অধ্যায়ে আমরা অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে কিছু কথা বর্ণনা করতে চাই এবং এটা দেখাতে চাই যে, বদর যুদ্ধে যেসব অস্ত্রশস্ত্র আঁ-হযরত (সা) ব্যবহার করেছিলেন, আর বর্তমান যুদ্ধ-বিগ্রহে যেসব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এই দুয়ের ভেতর ফরক কি। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র বলতে কি বুঝায়, সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হ'লে আমার "রং-রূটের অতীত" শীর্ষক বই দেখুন ।

আঁ-হযরত (সা) তাঁর পরিচালিত যুদ্ধগুলোতে প্রতিরক্ষা কৌশল এবং সমরশাস্ত্রের সর্বোত্তম ও মূলনীতির উপর 'আমল করে উম্মতের জন্য নজীরবিহীন শিক্ষা রেখে গেছেন। কিন্তু গাফলতিই বলুন আর অলসতাই বলুন অথবা বেপরোয়াগিরিই বলুন, ইসলামের দাবিদাররা না এ আদর্শের উপর 'আমল করেছে আর না পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞানী-গুণী ও বিশেষজ্ঞমণ্ডলীই এ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আঁ-হযরত (সা) খন্দক যুদ্ধে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন তার উপর সাড়ে তেরো শ' বছরের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে 'আমল করা হ'ল, কিন্তু নাম দেওয়া হ'ল নতুন উদ্ভাবিত পদ্ধতি। ১৯১৪-১৮ 'ঈসায়ী পর্যন্ত পাশ্চাত্যের প্রতিরক্ষা পর্যালোচক দ্রুতগামী তাতারী অশ্বারোহী বাহিনীর তলোয়ার ও নেযাবাযী এবং তোপগুলোকে সক্রিয় পরিণতকারী সিপাহগিরিতে মোহগ্রস্ত ছিল। এজন্য ফৌজে অশ্বারোহী বাহিনীর সংখ্যা হ'ত যথেষ্ট। ছোট বড় তোপগুলোকে কয়েক জোড়া ঘোড়ার সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হ'ত। পল্টনকে সেসব থেকে বাঁচাবার জন্য দ্রুত আঘাতকারী রাইফেল দ্বারা সজ্জিত করা হ'ত। এতদ্ভিন্ন ভারী মেশিন গান দ্বারাও সজ্জিত করা হ'ত এবং সাথে সাথেই মোর্চা খনন করবার জন্য বেলচা ইত্যাদিও দেওয়া হ'ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হ'ল তখন জার্মান তোপখানা কামানের গোলার সাহায্যে এন্টোরিপ ল্যাপ এবং নিমোরকে কয়েক দিনের ভেতর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে, অশ্বারোহী বাহিনীর মুখোমুখী সংঘর্ষ হয় এবং জার্মান বাহিনী বিজয়ী হয়ে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস পর্যন্ত পোঁছে যায়। তখন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিজয়ী বাহিনীকে রুখতে কোন কুরবানীকেই বড় মনে করা হবে না। এরপর পল্টন খন্দকে (পরিখা) ঢুকে পড়ে এবং অশ্বারোহী বাহিনী বাধ্য হয়ে পেছনে ছুটে যায় অথবা তাদেরকে নিজেদের ফৌজের ডান পার্শ্বে ও বাম পার্শ্বে মোতায়েন করে দেওয়া হয়। এভাবে খন্দক যুদ্ধের সফল নিরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়। উভয় পক্ষের পদাতিক ফৌজ একে অপরের বিরুদ্ধে মোর্চার উপর সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে এবং তাদের মধ্যবর্তী অংশকে (No man's Land) বধ্য ভূমিতে পরিণত করা হয়। কেননা দু'পক্ষ হামলার সময় একে অপরের উপর এত বেশী গোলা বর্ষণ করে যে, এতে কয়েক লক্ষ জীবন হানি ঘটে এবং দু'তরফের ফৌজ নিষ্ক্রিয় ও স্থবির হয়ে পড়ে। যেখানে এটা ধারণা ছিল যে, যুদ্ধ কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে সেখানে তিন বছর গুজরে যাবার পরও যুদ্ধ শেষ হবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। খন্দক যুদ্ধে মুশরিকরা এক স্থান থেকে পরিখা পার হবার কোশেশ করেছিল যাতে তারা আদৌ সফল হতে পারেনি এবং এর পর তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু মিত্রবাহিনী যুদ্ধ অব্যাহত রাখার অপর একটি পরিকল্পনা তৈরী করে এবং এই পরিকল্পনায় এমন একটি যন্ত্রের আবিষ্কার ছিল যার ফলে উভয় পক্ষের মোর্চার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড স্বল্পতম জীবন হানির সঙ্গে অতিক্রম করা যায়। অনন্তর তার জন্য এমন রথ তৈরী করা হয় যেটা বলদ কিংবা ঘোড়ার পরিবর্তে মেশিনের সাহায্যে চালানো যায় এবং যার মধ্যে বহু বিপদ থেকে নিরাপদ হয়ে দুশমনের উপর হামলা করা যেতে পারত।

এই যান্ত্রিক রথ বা ট্যাংকের পূর্ববর্তী রথ ১৪৭২ 'ঈসায়ীতে আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এটা হাওয়ার শক্তিতে চলত। এটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব ছিল একজন ফরাসীর। কিন্তু এটা এজন্য সফল হয়নি যে, এটা বাতাসের অনু- কূলেই কেবল চালানো যেত। এর পর আরও একজন ফরাসী এর একটি বয়লার লাগান যেন একে বাষ্পের সাহায্যে সক্রিয় করা যায়। কিন্তু এ প্রচেষ্টাও সফল হয়নি।

১৭৯৯ 'ঈসায়ীতে নেপোলিয়ন একটি নতুন ধরনের রথ তৈরী করেন যার নাম ছিল "জঙ্গী মোটর" (The Automobile in war)। এভাবে সত্তর বছর পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে, কিন্তু সন্তোষজনক সাফল্য কোনটির ক্ষেত্রেই হয়নি। এরপর ১৮৬৫ 'ঈসায়ীতে একজন ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ার এমন রথ তৈরী করেন যা দুরূহ পথেও চলতে পারে। কিন্তু বৃটিশ সরকার এটা এই যুক্তিতে প্রত্যাখ্যান করেন যে, এর ফলে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। অতঃপর জার্মান ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল ভান লিরিজ (Van Lyriz) একটি রেলগাড়ীর উপর দ্রুত আঘাত হানতে পারে এমন কামান স্থাপন করেন, যেন এর সাহায্যে শত্রুর উপর গোলা বর্ষণ করা যায়। বৃটিশ বিশেষজ্ঞগণ মেশিনগানগুলো ঘোড়ার পিঠে উঠিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করার পন্থা বের করেন। ফলে সমরশাস্ত্রের মূলনীতিতে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। ১৯১৪-১৮ 'ঈসায়ীর বিশ্বযুদ্ধে খন্দক-এর (পরিখা) অভিজ্ঞতার নবায়ন উক্ত প্রাধান্য খতন করে দেয়। ১৯১৮ 'ঈসায়ী সনে প্রথমবার নতুন ধরনের লৌহ নির্মিত বৃটিশ যান্ত্রিক রথ ময়দানে এসে দেখা দেয় যার নাম রাখা হয় 'ট্যাংক'। এই নাম নির্বাচনের তাৎপর্য ছিল এই যে, শত্রু এই যুদ্ধাস্ত্রের রহস্য যেন না জানতে পারে। কিন্তু ট্যাংকের কার্যকারিতার সঠিক পরিমাপ নিরূপণ করা হয়নি। এজন্য ১৯১৮ সনে লড়াই খতম হওয়ার পর অধিকাংশ সরকার এর দিকে বিশেষ লক্ষ্য করে নি। কিন্তু জার্মানীর এর উপর বিশেষ মনোনিবেশ ছিল। এর ফল এই দাঁড়াল যে, ১৯৪০ সনের ১০ই মে হিটলার যখন ফ্রান্সের উপর হামলা করেন তখন তিনি ট্যাংক ও উড়োজাহাজের সাহায্যে আকস্মিকভাবে ফ্রান্সকে কাবু করে ফেলেন এবং এভাবেই গোটা য়ূরোপ ছেয়ে ফেলেন।

ট্যাংক কয়েক প্রকারেরঃ কতকগুলো খুব ভারী, লৌহ বর্ম পরিহিত ও সাঁজোয়া। এসবের উপর সাধারণত রাইফেল, মেশিনগান এবং ট্যাংক বিধ্বংসী গোলার প্রতিক্রিয়া হয় না। ভারী হবার কারণে এর গতি খুব কম। কিন্তু এর কামানের আঘাত-সীমা বহুদূর এবং বিরাট শক্তিশালী। এ রকম ট্যাংক ৯৫ টন ওজনেরও হয়।

দ্বিতীয় প্রকারের ট্যাংক-কে বলা হয় ক্রুজার। আকার-আকৃতি ও ওজনে হালকা হবার কারণে এটা দ্রুতগামী হয়। এর কামানের আঘাত

খুব দীর্ঘ হয় না এবং তার গোলা বেশী মোটা লৌহ-প্রাচীর ভেদ করতে পারে না। এর ওজন আনুমানিক ১৫/২০ টন কিংবা তার কিছু বেশী থাকে।

কিছু ট্যাংক আবার ক্রুজার ট্যাংক থেকেও হালকা হয়। হালকা হবার অর্থ এই যে, তার গাত্রাবরণ মোটার দিক দিয়ে কম হয়ে থাকে। অতএব ওজন কম। এটা অবশ্যই দ্রুতগামী হয়, কিন্তু তার ভেতরে উপবিষ্ট সিপাহী বড় কামানের গোলার আঘাত থেকে নিরাপদ হয় না।

সাজোয়া মোটর গাড়ীর উপর মেশিন গান, ছোট পাল্লার কামান এবং বিশেষ ধরনের ক্যারিয়ার থাকে যার উপর মোর্চা (ব্যূহ) বিধ্বংসী ছোট কামান সজ্জিত থাকে। এর সাহায্যে মামূলী আড়ালে থেকে শত্রুর পল্টনকে মেরে তাড়ানো যায়। এগুলোকে ট্রেঞ্চ মর্টার (Trench Morter) বলা হয়।

এখন ফৌজের গুরুত্বপূর্ণ শাখা-প্রশাখা ও যন্ত্রপাতির এবং বিশেষ বিশেষ অস্ত্রশাস্ত্রের বিবরণ দেওয়া যাক।

পল্টন

পল্টনের বিশেষ বিশেষ হাতিয়ার রাইফেল, সঙ্গীন, হালকা ধরনের মেশিন গান, ট্রেঞ্চ মর্টার, হালকা ধরনের ট্যাংক বিধ্বংসী কামান ইত্যাদি। যুদ্ধের ময়দানে চূড়ান্ত যুদ্ধ পল্টনই লড়ে থাকে। এজন্য একে সমরক্ষেত্রের সম্রাজ্ঞী বলা হয়।

পল্টনের হাতিয়ার হালকা হয় যেন সিপাহী অপ্রয়োজনীয় বোঝার কারণে কাহিল না হয়ে পড়ে। এর আঘাত দীর্ঘ হয় না। দীর্ঘ আঘাতের জন্য দূরপাল্লার কামান এবং বড় মেশিনগান ব্যবহৃত হয়।

মেশিনগান

মেশিনগান এমন একটি সমরাস্ত্র যার সাহায্যে এক হাযার গজ দূরত্বের উপর ফায়ার অত্যন্ত কার্যকর এবং অধিক সময় পর্যন্ত অব্যাহতভাবে করা যায়। সাধারণভাবে দু'হাযার গজ পর্যন্ত মেশিনগানের আঘাত খুব উত্তম বিবেচিত হয়ে থাকে। সাড়ে চার হাযার গজ পর্যন্তও ভালভাবে গোলার আঘাত হানা যায়। এর সাহায্যে শত্রুর উপর দিনে রাত্রে সব সময় এমন জায়গায়ও ফায়ার করা যেতে পারে, যেখানে তারা যমীন উঁচু-নীচু হবার কারণে আত্মগোপন করে থাকে এবং শক্তিশালী যন্ত্র ব্যতিরেকে যাদেরকে

দেখাও যায় না। এর থেকে এক মিনিটে দু'শো পঞ্চাশটি গুলী বর্ষিত হয়ে থাকে। গুলী ছাড়া এর সাহায্যে অগ্নিগোলকও নিক্ষেপ করা যায় যেগুলো সাধারণত রাতের বেলা গুলীর আঘাত দেখবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর নাম ট্রেসার কার্তুজ বা অনুসন্ধানী কার্তুজ।

কামান

কামানের সাহায্যে শত্রুর উপর বহু দূর থেকে গোলা বর্ষণ করা হয়, আবার খুব কাছের লক্ষ্যবস্তুতেও গোলা বর্ষণ করা যায়। এটা শত্রু পল্টন, ট্যাংক, মোর্চা, রাস্তা ও বিমান ইত্যাদির বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের গোলার সাহায্য গ্রহণ করা হয়ঃ কতক গোলা বিধ্বংসী হয়ে থাকে, কতকগুলো ট্যাংক বিধ্বংসী এবং কতক মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়। কতক গোলার সাহায্যে ধোঁয়ার সৃষ্টি করা হয় আর কতকগুলো থেকে বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় এবং কতক রাতের বেলা অন্ধকার এলাকায় আলো সৃষ্টির কাজে আসে।

কামানের বড় বিশেষত্ব এই যে, তা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সঠিক লক্ষ্য-বস্তুতে গোলা বর্ষণ করতে পারে। অতঃপর সামান্য সময়ে এর গতি এক লক্ষ্য বস্তু থেকে অপর লক্ষ্য বস্তুর দিকে ফিরানো যায়। আজকাল এর পশ্চাতের দূরত্ব ৮০ মাইল পর্যন্ত। কিন্তু আধুনিক ধরনের রকেট গোলার ব্যবহারের ফলে এর দূরত্ব কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

যে সব কামান সামুদ্রিক জাহাজে ব্যবহার করা হয় তা যমীনের উপর স্থাপিত কামানের থেকে কিছুটা ভিন্ন ধরনের। এগুলোর ব্যাস স্থলভাগের কামান থেকে সাধারণত বড় হয়ে থাকে। এজন্য এগুলোর আঘাতও দীর্ঘ হয় এবং গোলাও হয়ে থাকে ওজনে ভারী। ঠিক এমনি বিমান বিধ্বংসী কামান (Anti-Air Craft Guns) স্থল ও নৌ উভয় প্রকারের কামান থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। ট্যাংক বিধ্বংসী কামানের গোলা আকৃতিতে ভিন্ন হয়।

উড়োজাহাজ

আজকাল উড়োজাহাজ শত্রুর বিরুদ্ধে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এজন্য বিভিন্ন কাজের জন্য উড়োজাহাজও বিভিন্ন আকার-আকৃতির হয়। উদাহরণত, যে উড়োজাহাজ শত্রুর এলাকায় তার সামরিক মোর্চার

বিরুদ্ধে অথবা কোন ইমারত, পুল ইত্যাদির উপর বোমা বর্ষণের জন্য ব্যবহার করা হয়, তার ভেতর লক্ষ্যবস্তুর উপর নিক্ষেপের জন্য বিরাট ওজনের বোমা বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর এসব বোমা মওকামত দেখে শুনে নিক্ষেপ করা হয়। আর বোমা যদি শত্রু ফৌজের উপর বর্ষণ করা হয় তাহলে হালকা বোমা ব্যবহার করা হয়। ব্রীজ, পুল, দালানকোঠা, ইমারত এবং কলকারখানা ইত্যাদির উপর খুব ভারী বোমা ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো এ সবের সাহায্যে বিষাক্ত গ্যাসও ছেড়ে আসা হয়। কোন কোন সময় এসবের দ্বারা ফৌজী কোম্পানী, কামান, মোটর গাড়ী, সামরিক অস্ত্রশস্ত্র ও রসদসম্ভার এবং আহতদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করা হয়। এগুলোর মধ্যে কতকগুলো বোমা বর্ষণকারী (Bombs), কতকগুলো ফাইটার (লড়াকু), আবার কতকগুলো পরিবহন বিমান। বিভিন্ন আকার-আকৃতির বিমানের নামও বিভিন্ন। কিন্তু এ সবের মধ্যে বিশেষ ধরনের জাহাজ এগুলোই।

১৯৩৯-৪৫ ঈসায়ীর যুদ্ধ যতই দীর্ঘায়িত হয়েছে—বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার পরীক্ষাগারের পরিবর্তে রণাঙ্গনের কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষা করা হয়েছে। যেমন ট্যাংক তৈরী করা হয় মাটির নীচে শত্রুর বিছানো সুড়ঙ্গগুলো সাফ করার জন্য।

শত্রু বিমানের বিরুদ্ধে গোলা বর্ষণের জন্য রাডারের ন্যায় যন্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। এর সাহায্যে সমুদ্রে শত্রুর নৌ-জাহাজ এবং ডুবো জাহাজের আগমন বহুদূর থেকে টের পাওয়া যায়। এভাবে এটাও জানা যায় যে, শত্রুর যুদ্ধ বিমান কতটুকু দূরত্বে আছে। রাডারের সাহায্যে গোলার ফিউজ (Fuge) স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে এবং এভাবে এর সাহায্যে কামানের গোলা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে।

নৌ-যুদ্ধের জন্য এমন সব বন্দর নির্মাণ করা হয়েছে যেখানে নৌ-বহর সব ধরনের সমরাস্ত্র নামাতে পারে এবং দুশমনের হামলায় যে ক্ষতি হয় তার থেকে নিজের ফৌজকে বাঁচানো যেতে পারে। যদি দুশমন ভূ-পৃষ্ঠের হয় তাহ'লে সঙ্গীনের সাহায্যে হাতাহাতি যুদ্ধ করা হয়, ট্যাংকের সাহায্যে অগ্নিবৃষ্টি করে তাকে ভস্মীভূত করা হয়। এ সব ছাড়াও এমন যন্ত্র আছে যার সাহায্যে সৈন্যরা পাহাড়ী এলাকায় আত্মগোপনকারী দুশমনের উপর অগ্নিবৃষ্টি করে তাদের ভূ-পৃষ্ঠের মোর্চা ধ্বংস করে দিতে পারে। আমেরিকানরা এ ধরনের অস্ত্র জাপানীদের বিরুদ্ধে অধিক হারে ব্যবহার

করেছে। কেননা ভূগর্ভী মোর্চায় বসে লড়াই করতে তারা বিশেষরূপে পারদর্শী। শুরুতে আমেরিকানরা যখন তাদের সে সমস্ত মোর্চার উপর হামলা করে তখন তাদেরকে ভীষণ জীবনহানির সম্মুখীন হতে হয়। এই যন্ত্রকে অগ্নিনিক্ষেপক (Flame thrower) বলা হয়। আমেরিকান ফৌজ এই যন্ত্রের সাহায্যেই তাদেরকে কাবু করতে সক্ষম হয়।

চালকবিহীন বিমান ও বোমা

জার্মান মিত্রবাহিনী এমন বিমান ব্যবহার করত যা কোনরূপ চালক ব্যতিরেকেই চলত। এসব বিমান রেডিও তরংগের সাহায্যে উডডীন করা হ'ত এবং আক্রমণ স্থলে পৌঁছানোর পর ভূপাতিত করা হ'ত। এর ফলে ভীষণ সম্পদ ও জীবনহানি ঘটত। ভি-২ (V-2) বোমাও এ ধরনের একটি ভয়াবহ অস্ত্র যা রকেটের সাহায্যে উড়ানো হত।

আণবিক বোমা

বর্তমান যুগের সবচেয়ে ভয়াবহ ও বিস্ময়কর আবিষ্কার হ'ল আণবিক বোমা। এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা খুবই ভয়াবহ। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমার সামনে আণবিক বোমার অস্তিত্বও কামানের মুকাবিলায় বন্দুকের মতই। হাইড্রোজেন বোমা তৈরী হয়েছে এবং অধুনা আমেরিকা ও রাশিয়া তার পরীক্ষাও চালিয়েছে। এ ধরনের আরও বহু সমরাস্ত্র ও ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। কিন্তু একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে---তাহ'ল জাতির সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল। একথা সত্য যে, শুধু ইচ্ছাশক্তি ও মনোবল দিয়ে কাজ চলে না, তদবীর ও উপায়-উপকরণও আবশ্যক। জীবনে বেঁচে থাকতে হলে এগুলো ভিন্ন গত্যন্তর নেই। কিন্তু কেবল উপায়-উপকরণ দিয়েই কাজ হয় না। যদি মনোবল অটুট থাকে তাহলে উপকরণের ঘাটতি কোনভাবেই প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

আলহ'ামদু লিল্লাহ্।

নির্ঘণ্ট

নাম

অ

আ

ই

ঈ

উ

এ

ও

ক

কা'ব বিন লুওয়াই ২৮৪, ৩৫৮, ৩৫৯

খ

গ

চ

জ

ট

ড

ত

দ

ন

প

য

র

ল

শ

স

হ

স্থান

আ

ই

উ

এ

ও

ক

জাতি-গোত্র-শ্রেণী-সম্প্রদায়

গ্রন্থ

পবিত্র গৃহ ও স্থান

বিভিন্ন যুদ্ধ

নদ-নদী, সমুদ্র ও উপত্যকা ইত্যাদি

সামরিক পদ ও পরিভাষা

যুদ্ধাস্ত্র

ধর্মীয় পরিভাষা

বিবিধ

গ্রন্থকার-পরিচিতি

মেজর জেনারেল আকবর খান ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে বৃটিশ ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের একটি অভিজাত সৈনিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজা ফযলদাদ খান বৃটিশ সেনাবাহিনীর একজন মেজর ছিলেন। জন্মের পর প্রধানত নানীর কোলেই তিনি লালিত-পালিত ও বর্ধিত হতে থাকেন এবং এই নানীর মুখেই তাঁর পূর্ব-পুরুষদের শৌর্যবীর্য ও বীরত্বগাঁথা শ্রবণ করে বালক আকবর খানের মনেও সৈনিক হবার বাসনা জাগে। স্কুল জীবনে তিনি কয়েকবার সৈন্য বিভাগে যোগ দেবার প্রয়াস চালান। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের বাধা দানের ফলে তাঁর সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়। অবশেষে তাঁর চেষ্টা ফলবতী হয়। সেনাবাহিনীতে যোগদানের ব্যাপারে পরিবারের সদস্যদের অনুমতি আদায়ে তিনি সক্ষম হন। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে তিনি রাজকীয় বৃটিশ-ভারতীয় বাহিনীর অশ্বারোহী ইউনিটে ভর্তি হন। সে সময় অশ্বারোহী ইউনিটের সদস্যদের অশ্ব, সাজ-সরঞ্জাম, ইউনিফরম, তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি নিজেদের সংগ্রহ করার নিয়ম ছিল। চাকুরীর কালে কেবল একটি রাইফেল দেওয়া হত। ভর্তিকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর কয়েক মাস এ বছরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ট্রেনিং শেষে তাঁকে ইরান ও ইরাক-ই-আরব রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। অতঃপর ১৯১৫ সালের সংঘটিত যুদ্ধে তাঁর অপরিসীম বীরত্ব ও সাহসিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'রাজকীয় কমিশন' লাভ করেন এবং বৃটেনের 'রয়েল ন্যাশনাল গ্যালারীতে' তাঁর ছবি স্থান পায়। অধিকন্তু তাঁর একই ইউনিটে সাধারণ সৈনিক থেকে অফিসার হিসাবে নিযুক্তি ছিল বৃটিশ বাহিনীতে একটি বিরল ও ব্যতিক্রমী ঘটনা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর ১৯২০ সনে তাঁর ইউনিট মিরাট ছাউনিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২১ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ ভারত সফরে এলে তাঁকে সম্রাটের এডিকং নিযুক্ত করা হয়। পরবর্তী বছর (১৯২২ ইং) প্রিন্স অব ওয়েল্‌স (ডিউক অব উইণ্ডসর) ভারতবর্ষে বেড়াতে এলে তিনি পুনরায় তাঁর এডিকং নিযুক্ত হন। এ সময় তিনি যুবরাজের এডিকং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এর (বৃটিশ ভারতের শেষ গভর্নর জেনারেল) সঙ্গে প্রথম বার মিলিত হন। বৃটিশ ভারতের সিংহপুরুষ বিখ্যাত

আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের (মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী) সঙ্গে এ সময়কার একটি সাক্ষাতকার তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। এ সাক্ষাতকার তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তা-চেতনায় বিরাট পরিবর্তন সূচিত করে।

মাওলানা মুহামদ আলী এ সময় তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ঃ

"আকবর! যে বীরত্বের জন্য তুমি গর্বিত, তুমি জান না, মুসলিম জাহানকে তা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ১৯১৪—১৮ খৃস্টাব্দে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) তোমাদের কৃতিত্ব তোমার ও তোমার সহযোগী ভারতীয় সৈনিকদের জীবনের একটি সোনালী অধ্যায় বটে। কিন্তু এর একটি দুঃখজনক ও মর্মস্পর্শী দিকও রয়েছে। তোমাদের বীরত্ব আমাদের কাছ থেকে দু'টি সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে। তা হ'ল ঃ

১। জিহাদী প্রেরণা—যা মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার;

২। নিশান-ই-খিলাফত (খিলাফতের প্রতীক)—যার পতাকাতলে মুসলমানরা প্রয়োজনে এক হ'তে পারত।"

১৯২৬ সালে নওয়াব স্যার বুলন্দ জঙ্গ বাহাদুরের কন্যার সংগে আকবর খানের বিয়ে হয়। বিবাহানুষ্ঠানে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ, মিঃ মোতিলাল নেহরু, স্যার তেজবাহাদুর সুপ্রু, ডাঃ যাকির হুসায়ন, স্যার যিয়াউদ্দীন মরহুমের সংগে তাঁহার সাক্ষাত ঘটে। ১৯২৮ সালে লাহোরে নওয়াব স্যার যুলফিকার খান এবং ইসলামের দার্শনিক কবি 'আল্লামা ইকবালের সংগে পরিচয় হয় লেখকের।

১৯৩৯---৪৫ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সংগে পালন করেন। এ সময় তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত মেজিনিউ লাইন রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত মিত্র বাহিনীর অপরাপর সদস্যের সংগে বৃটিশ বাহিনীর অন্যতম সেনানায়ক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। জার্মান আক্রমণের প্রচণ্ডতার মুখে মেজিনিউ লাইন ভেঙ্গে পড়লে বৃটিশ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করে এবং আত্মরক্ষার্থে ডানকার্ক হয়ে বৃটেনে গিয়ে হাযির হয়। অতঃপর ১৯৪২ সালে ছুটি কাটাতে তিনি জাহাজ যোগে ভারতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। পথে জাহাজ ডুবিসহ নৌযুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্য তিনি

প্রত্যক্ষ করেন। এরপরে তাঁকে বর্মা রণাঙ্গনে পাঠানো হয়। এখানেও তিনি অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। যুদ্ধাবসানে ১৯৪৬ সালে তিনি মিরাট এরিয়ার এরিয়া-কমাণ্ডার নিযুক্ত হন। এ সময় তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত বৃটিশ জেনারেল স্যার ফ্রান্সিসস টুকার এবং জেনারেল কার্টিস। '৪৬ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষব্যাপী যে সাম্প্রদায়িক দাংগা সংঘটিত হয় তার ঢেউ ইউ. পিতেও লাগে। ইউ. পি-এর দাংগা রোধে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের সময় তিনি পাকিস্তানের অনুকূলে স্বীয় খেদমত পেশ করেন। '৪৮ সনে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাক-ভারতে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতেও তিনি তাঁর অসীম সাহসিকতা ও যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। ক্রম-পদোন্নতির মাধ্যমে এ সময় তিনি মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন। অতঃপর ৩৭ বছর সামরিক বিভাগে চাকুরী করবার পর তিনি ইসলামের সমর-কৌশল ও প্রতিরক্ষা নীতি সম্পর্কে লেখনী ধারণ করেন। 'হাদীছে দেফা', 'হামারা দেফা', 'আসলাহা-ই-জংগ', 'জিহাদ-ই-সিদ্দীক', 'খালিদ (রা) বিন ওয়ালীদ', 'ইসলামী তরীক-ই-জংগ' প্রভৃতি ইসলামের সমর-কৌশল ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা।

ইফাবা—৮৬-৮৭—প্র/৩৮৫৪—৫২৫০—৬.৩.১৩৯৪/২১.৬.১৯৮৭